যমুনা নদীর মুশায়রা • সেলিনা হোসেন

যমুনা নদীর মুশায়রা

সেলিনা হোসেন

মির্জা গালিব উপমহাদেশের একজন শক্তিশালী কবি। তাঁর জীবন নানা বৈচিত্র্যে ভরপুর। ইতিহাসের ক্রান্তিকালের এই মানুষকে নিয়ে রচিত 'যমুনা নদীর মুশায়রা' পাঠকের এক ধরনের তৃষ্ণা মেটাবে। তাঁরা এই উপন্যাসে পাবেন ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ। পাবেন সাহিত্যের সেই শিল্পকে, যে শিল্পকাহিনীর ভেতরে মানুষের আবেগের জায়গার শক্ত বাঁধুনী।

কবি গালিবকে নিয়ে নানা ধরনের বই রচিত হয়েছে। তিনি দেশ-বিদেশের অসংখ্য গবেষকের গবেষণার বিষয় হয়েছেন। তাঁকে নিয়ে সৃজনশীল মানুষ রচনা করেছেন কবিতা। কারণ তাঁর জীবনদর্শনের নানাদিক আকৃষ্ট করেছে নানাজনকে নানাভাবে।

আবু সয়ীদ আইয়ুব বলেছেন, 'গালিব উর্দু ভাষার দুরূহতম কবি'। তিনি গালিবের উদ্ধৃতি দিয়েছেন ধর্ম সম্পর্কে। গালিব বলেছেন, 'আমি একেশ্বরবাদী, সর্বপ্রকার আচার-অনুষ্ঠান বর্জন করাই আমার নীতি। ধর্ম সম্প্রদায়গুলি লুপ্ত হলে সত্য ধর্মের উপাদান হয়ে যাবে।' গালিবের অনুপুঙ্খ নানা বিবরণ একজন অসাধারণ শক্তিশালী কবির মানস-দর্শন প্রতিফলিত করে।

বিষয়-বৈচিত্র্যের জন্য পাঠকের আকাঙ্ক্ষা এই উপন্যাসে পূরণ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

প্রচ্ছদ ▪ ধ্রুব এষ

আলোকচিত্র : মুনিমা তাহমিন সেতু

সেলিনা হোসেন জন্ম ১৪ জুন ১৯৪৭। রাজশাহী শহর। সেলিনা হোসেনের লেখার জগৎ বাংলাদেশের মানুষ, তার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। বাঙালির অহঙ্কার ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ তাঁর লেখায় নতুন মাত্রা অর্জন করে। জীবনের গভীর উপলব্ধির প্রকাশকে তিনি শুধু কথাসাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন না, শাণিত ও শক্তিশালী গদ্যের নির্মাণে প্রবন্ধের আকারেও উপস্থাপন করেন। নির্ভীক তাঁর কণ্ঠ–কথাসাহিত্য, প্রবন্ধে।

রাজশাহীতে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীতে পড়ার সময়ে বিভাগীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ানশিপ স্বর্ণপদক পান। এরপর ১৯৬৯ সালে প্রবন্ধের জন্য পান ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক স্বর্ণপদক। ১৯৮০ সালে উপন্যাসের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৮১ সালে *মগ্নচৈতন্যে শিস* উপন্যাসের জন্য আলাওল সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮২ সালে অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮৭ সালে *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাসের জন্য কমর মুশতরী পুরস্কার, ১৯৯৪ সালে অনন্যা ও অলক্ত পুরস্কার, ১৯৯৮ সালে জেবুন্নেসা ও মাহবুবুল্লাহ ইনস্টিটিউট প্রদত্ত সাহিত্য পুরস্কার ও স্বর্ণপদক এবং ২০০৯ সালে একুশে পদক সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতি। এছাড়া ১৯৯৪-৯৫ সালে তিনি তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস *গায়ত্রী সন্ধ্যা* রচনার জন্য ফোর্ড ফাউন্ডেশন ফেলোশিপ পেয়েছেন এবং একই উপন্যাসের জন্য ২০১০ সালে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট প্রবর্তিত 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেন। ২০০৬ সালে লাভ করেন দক্ষিণ এশিয়ার সাহিত্যে রামকৃষ্ণ জয়দয়াল হারমোনি অ্যাওয়ার্ডস, দিল্লি। ২০১০ সালে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা থেকে ডক্টর অব লিটারেচার (Honoris Causa) ডিগ্রি লাভ করেন। সাহিত্য অকাদেমী, দিল্লি কর্তৃক সার্ক দেশের লেখকদের জন্য প্রবর্তিত 'প্রেমচাঁদ ফেলোশীপ' লাভ করেন।

ইংরেজি, হিন্দি, মারাঠি, কন্নড়, রুশ, মালে, ফরাসি, জাপানি, উর্দু, মালয়েলাম্, কোরিয়ান, ফিনিস প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর গল্প এবং উপন্যাস।

যমুনা নদীর মুশায়রা

সেলিনা হোসেন

ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ

যমুনা নদীর মুশায়রা
উপন্যাস
সেলিনা হোসেন

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রকাশক
ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ
কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
ফোন : ৭১২৪৭৬০, ০১৭১৫ ৪২৮২১০, ০১৭১২ ২৩৫৩৪২
e-mail : ittadisutrapat@yahoo.com

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অক্ষরবিন্যাস
বন্ধু কম্পিউটার্স

মুদ্রণ
নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস
৩৪ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

লেখকের অন্যান্য উপন্যাস

জলোচ্ছ্বাস (১৯৭২)
জ্যোৎস্নায় সূর্যজ্বালা (১৯৭৩)
হাঙর নদী গ্রেনেড (১৯৭৬)
মগ্ন চৈতন্যে শিস (১৯৭৯)
যাপিতজীবন (১৯৮১)
নীল ময়ূরের যৌবন (১৯৮২)
পদশব্দ (১৯৮২)
চাঁদ বেনে (১৯৯৪)
পোকামাকড়ের ঘরবসতি (১৯৮৬)
নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি (১৯৮৭)
ক্ষরণ (১৯৮৮)
কাঁটাতারে প্রজাপতি (১৯৮৯)
খুন ও ভালোবাসা (১৯৯০)
কালকেতু ও ফুল্লরা (১৯৯২)
ভালোবাসা প্রীতিলতা (১৯৯২)
টানাপোড়েন (১৯৯৪)
গায়ত্রী সন্ধ্যা–এক (১৯৯৪)
গায়ত্রী সন্ধ্যা–দুই (১৯৯৫)
গায়ত্রী সন্ধ্যা–তিন (১৯৯৬)
দীপান্বিতা (১৯৯৭)
যুদ্ধ (১৯৯৮)
লারা (২০০০)
মোহিনীর বিয়ে (২০০১)
কাঠ কয়লার ছবি (২০০১)
আণবিক আঁধার (২০০৩)
ঘুমকাতুরে ঈশ্বর (২০০৪)
মর্গের নীল পাখি (২০০৫)
অপেক্ষা (২০০৭)
দিনের রশিতে গিট্টু (২০০৭)
মাটি ও শস্যের বুনন (২০০৭)
পূর্ণ ছবির মগ্নতা (২০০৮)
ভূমি ও কুসুম (২০১০)

যমুনা নদীর মুশায়রা

উৎসর্গ

অধ্যাপক আবু সয়ীদ আইয়ুব
লেখক গৌরী আইয়ুব
কবি গুলজার
গবেষক পবনকুমার ভার্মা
কবি শঙ্খ ঘোষ
সৈয়দ শামসুল হক

সকলের সঙ্গে এক হয়ে
কবি গালিবকে বুঝতে চেয়েছি

ভূমিকা

এখন থেকে ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় আগের কথা। গালিব সম্পর্কে খানিকটুকু ধারণা ছিল মাত্র। ষাটের দশকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমার শিক্ষক আবদুল হাফিজের কাছে গালিবের গজল শুনেছিলাম। সত্তর দশকের শেষের দিকে আমার বড়ভাই প্রয়াত আবু সৈয়দ গোলাম দস্তগীর আমাকে গালিবের বিভিন্ন শের শোনাতেন, যেসব শের তাঁর প্রিয় ছিল। তখন পর্যন্ত গালিবকে নিয়ে উপন্যাস লিখব, এমন চিন্তা আমার মাথায় আসেনি।

১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় আবু সয়ীদ আইয়ুবের বিখ্যাত বই 'গালিবের গজল থেকে : চয়ন ও পরিচিতি।' বইটি এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে ২০১১ সালের মধ্যে বইটির সাতটি মুদ্রণ হয়। বইয়ের শেষ অংশে কবিজীবনী রচনা করেন গৌরী আইয়ুব।

১৯৮৩ সালের তৃতীয় মুদ্রণের একটি কপি আমাকে দেন আমার বোন শিরিনার স্বামী প্রয়াত সৈয়দ সিরাজুল কবীর। বলেন, আপা বইটি পড়লে আপনি গালিব সম্পর্কে ধারণা পাবেন। অনেক শের-এর অনুবাদ আছে।

বইটি পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। আবু সয়ীদ আইয়ুবের মননধর্মী বিশ্লেষণ আমাকে গালিবকে বুঝতে সাহায্য করে। 'কবিজীবনী' অংশে গৌরী আইয়ুব গালিবের বৈচিত্র্যময় জীবনের নানা দিক তুলে ধরেছেন। তখন আমার মনে হয়েছিল এই জীবন উপন্যাসের উপাদান। লিখবই তখন পর্যন্ত আমি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইনি। তবে বিষয়টি মাথায় রেখেছিলাম।

আমি প্রথম দিল্লিতে যাই ১৯৯৬ সালে। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়ার আমন্ত্রণে। উপলক্ষ ছিল দ্বাদশ বিশ্ব বইমেলা। সে বছর মেলার মূল বিষয় ছিল সার্ক দেশসমূহ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বইয়ের তালিকা অবমুক্ত করার দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়েছিল। তখন আগ্রা শহর দেখতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম। কারণ গালিব ১৮৯৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দিল্লিতে গালিবের কবর দেখারও ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সেবার আর কবর দেখা হয়নি। ট্রাভেল প্যাকেজের সঙ্গে আগ্রা দেখে ফিরে এসেছিলাম।

২০০০ সালের এপ্রিল মাসে আবার দিল্লিতে যাই। ফাউন্ডেশন অব সার্ক রাইটার্স অ্যান্ড লিটারেচার আয়োজিত সার্ক লেখক সম্মেলনে। এবার গালিবের কবর দেখতে যাই। কবর দেখে মন খারাপ হয়। অযত্ন-অবহেলায় পড়ে আছে। পাশে একটি লাইব্রেরি আছে। সেখানে গালিবের উপর রচিত বই পাওয়া যায় কিনা দেখেছিলাম। কিন্তু তেমন ভালো বই পাইনি। দু-চারটে অনুল্লেখযোগ্য বই কিনে ফিরে আসি। এরপর সম্রাট হুমায়ূনের সমাধি দেখতে যাই। সিপাহি বিদ্রোহের সময় মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংরেজরা ক্ষমতা দখল করলে বাদশাহকে এখান থেকে গ্রেফতার করা হয়। গালিব

উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে এই বিষয়গুলো জরুরি বলে আমি এমন ঐতিহাসিক জায়গাগুলো একাধিকবার দেখেছি। লালকেল্লা, জামা মসজিদ, চাঁদনি চক, কাশ্মিরী গেট—এমন অনেক জায়গায় যতবার দিল্লি গিয়েছি ততবার দেখেছি। এ বছরের মার্চ মাসে শেষবার গিয়েছিলাম চাঁদনি চক, জামা মসজিদ চত্বরে।

সার্ক রাইটার্স কনফারেন্সে দেখা হয়েছে কবি, চলচ্চিত্র পরিচালক গুলজারের সঙ্গে। তিনি গালিবের জীবনভিত্তিক টেলিভিশন সিরিয়ালের চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে উপকৃত হয়েছি। তাঁর বই 'Mirza Ghalib : A Biographical Scenario' ২০০৬ সালে কিনে আনি দিল্লি থেকে। দিল্লির সাহিত্য অকাদেমী থেকে আরও কয়েকটি বই কিনি। মনে বেশ জোর পাই। ভাবি যে এবার লেখা শুরু করতে পারবো।

২০০৬ সালে আবার দিল্লি যাওয়ার আমন্ত্রণ পাই। আমন্ত্রণকারী সংস্থা Indian Council For Cultural Relations। তারা আয়োজন করেছে The Africa-Asia Literary Conference। এই সম্মেলনে পরিচয় হয় প্রাবন্ধিক-গবেষক পবনকুমার ভার্মার সঙ্গে। তিনি তখন ICCR-এর ডিরেক্টর জেনারেল। কনফারেন্স রুমের সামনে সব দেশের লেখকদের বই প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়েছিল। চোখ আটকে গেল পবনকুমার ভার্মার বইয়ের ওপর। বইয়ের নাম Ghalib : The Man, The Times। এই গবেষণা গ্রন্থটি আমার খুব কাজে দিয়েছে। গালিব সিপাহী বিদ্রোহের সময় কোন প্রয়োজনে ইংরেজদের সমর্থন দিয়েছিলেন এই বইয়ে তার বিশ্লেষণ আছে। সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর তাঁর কত আপন ছিলেন সে ব্যাখ্যা করেছেন। বিভিন্ন সময়ে কলকাতা থেকে গালিব বিষয়ে কয়েকটি বই কিনি। সব বই পড়া শেষ হলে বুঝতে পারি যে উপন্যাসটি লিখতে পারবো। নিজের ভেতরের ভরসার জায়গাটি তৈরি হয়েছে।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় গালিবের বয়স ছিল প্রায় ষাট বছর। একজন অসাধারণ কবির জীবনবৈচিত্র্য—মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থা এবং রাষ্ট্রক্ষমতায় ইংরেজদের উত্থান ছিল ইতিহাসের ক্রান্তিকাল। এই উপন্যাসে সেটুকু ধরতে চেয়েছি।

পাশাপাশি মনে করি একজন বড় কবি বা সাহিত্যিক একটি বিশেষ সময়ের মানুষ মাত্র নন। তাঁরা সময়কে অতিক্রম করেন। তাঁরা সমকালীন পরিপ্রেক্ষিত লাভ করেন। তাঁদের জীবন ও সময় সাহিত্যেরই বিষয়। সে জন্যই গালিবকে নিয়ে উপন্যাস লেখা।

উপন্যাসের শেষে যেসব গ্রন্থের উল্লেখ করেছি সেসব গ্রন্থের কয়েকটিতে গালিবের কবিতার অনুবাদ আছে। সেখান থেকে আমি কবিতাগুলো সংগ্রহ করে এই উপন্যাসে ব্যবহার করেছি। অনুবাদ বোঝানোর জন্য প্রতিটি কবিতায় উর্ধ্ব কমা ব্যবহার করেছি। আবু সয়ীদ আইয়ুবসহ সকল অনুবাদকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সেলিনা হোসেন

২১ ডিসেম্বর ২০১০

শৈশবের নদী

১৭৯৭। ডিসেম্বরের শীতের সকাল।

রজব হুসেন জং হিসাব করে দেখেন যে, আজ ২৭ ডিসেম্বর। হিজরি ১২১২ সন। রজব মাসের ৮ তারিখ। ভোরবেলা বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে সে তারিখটা দেখে নিয়ে মাথায় রাখেন। খাতায় প্রতিদিনের তারিখ লিখে রাখা তাঁর অভ্যাস। মনে করেন তারিখের হিসাব লিখে রাখলে সময়ের গরমিল হয় না। এভাবে পুরো বছরের তারিখ লিখে খাতা ভরে ফেলেন তিনি, তারপর যত্ন করে সেটা রেখে দেন। শহরের লোকেরা কখনো পুরনো তারিখ খুঁজতে আসে তাঁর কাছে, কখনো তারিখের হিসাবে গোলমাল হলে তাঁর কাছে সমাধান পায়। এমন কি তারিখ নিয়ে গোলমাল বাঁধলে তার সালিশও মিটিয়ে দেন রজব জং। লোকে মনে করে তিনি একজন ভীষণ জ্ঞানী লোক। কেউ কেউ বলে, মজার লোক। তাদের মতে তারিখ নিয়ে এত পাগলামি করার কী আছে! তারপরও সবাই তাঁকে মান্য করে। এ নিয়ে রজব জংয়ের ভেতরে গর্ববোধ আছে। অহংকারের ঝাঁঝটা বেশি জাহির করেন তার স্ত্রীর উপরে। এটি তাঁর আর এক ধরনের অভ্যাস।

রজব হুসেন আগ্রা শহরের পুরনো বাসিন্দা। বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। তাঁর ধারণায় দিনের প্রথম আলো ছড়িয়ে থাকার সময়টিই আগ্রা শহরের সবচেয়ে উত্তম সময়। এটিই কবিতা লেখার সময়। আগ্রা শহর নিজেই কবিতা হয়ে ওঠে এ সময়ে। যেন পাঠ করা যায় শহরের সবটুকু। বলতে ইচ্ছে করে, ভালোবাসার রঙ নেই তো কী হয়েছে, ভালোবাসার কবি আছে। কবির কণ্ঠস্বর আছে। শোনো তার শব্দরাজি। ডুবে যাও ভালোবাসার রঙের নদীতে। সোনালি আকাশে। ভালোবাসার সবুজ দেখো কেমন পল্লবিত হয় বৃক্ষে। শস্যের রঙের দেখো কত আভা। ভালোবাসাকে চিনতে শেখো হে প্রিয় শহরবাসী। রজব হুসেন জংয়ের অভিলাষ ধ্বনিত হয় যমুনায়, তাজমহলে। তোমরা কবিকে ভালোবাসো হে আগ্রাবাসী।

আসলে এ সময়ে রজব হুসেন যমুনা নদীর পাড় ধরে হেঁটে যেতে ভালোবাসেন। মনে করেন, আহ কী অসাধারণ নদী, তাজমহলের ছায়া বুকে

ধরে রাখে। এ নদীই কবির নদী, প্রেমের নদী— ভালোবাসার গভীর জলের স্রোতের নদী। একদিন এই নদীর ধারে বড় হবে একজন কবি। তার কবিতা বেঁচে থাকবে শতাব্দী জুড়ে। নিজেকেই প্রশ্ন করেন রজব হুসেন, কেন এমন ভাবনা মনে আসে তাঁর? এর কি কোনো সূত্র আছে? নাকি নেহায়েতই কবির ভাবনা? কবি দেখতে চান এক কবি থেকে অন্য কবিতে সময়ের বয়ে যাওয়া। সময় তো নদীর মতো বয়। কবির কাছে সময়ই নদী।

প্রতিদিনের মতো আজও হাঁটতে বেরিয়েছেন রজব জং। কুয়াশা তেমন নেই। পাতলা আবরণের মতো নীলাভ কুয়াশা যমুনার ওপর ছড়িয়ে আছে। কানটুপিতে মাথা ঢেকে, লম্বা আচকান পরে শীতের সকালে বের হতে হয়। পোশাকের এই বাহুল্য পছন্দ হয় না বলে হাঁটার জন্য গ্রীষ্ম শরৎ-হেমন্ত ঋতুই পছন্দ তাঁর। শীতের সকালে কখনো দিনের প্রথম আলো কুয়াশায় আড়াল হয়ে যায়। তখন অনুভব তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে না। এটাও তাঁর অপছন্দের আর একটি কারণ। তিনি জানেন নদী এবং দিনের প্রথম আলো দেখা তাঁর কাছে দিন শুরুর শর্ত। ঝড়-বৃষ্টি বা অন্য কোনো বড় ধরনের পারিবারিক ঝামেলা না থাকলে ভোরবেলা হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা পথ এসে থমকে দাঁড়ান রজব। আজ কুয়াশা অনেকটা কেটে গেছে। দিনের প্রথম আলোয় চারদিক ভরে আছে। প্রতিদিন তো দিনের শুরুটা এমন করে দেখা হয় না। আজকের শুরুটা অন্যরকম লাগছে। ঠিকই বুঝে যান যে নদীর প্রবাহে বাড়তি শব্দ যোগ হয়েছে। তরঙ্গের গায়ে মাতাল আবেগ—আনন্দ এবং উৎফুল্ল হয়ে ওঠার ঘটনা ঘটছে। মনে হয় শীতের তীব্রতা কেটে গেছে। এখন উষ্ণ হওয়ার সময়। রজব হুসেন জং চারদিকে তাকিয়ে ভাবেন, হলো কী? যমুনার পাড় ধরে ভোরের মায়াবী আলোয় হাঁটাহাঁটি করার কত দিন তো পার করেছেন কিন্তু তরঙ্গের এমন প্রিয় ধ্বনি কখনো পাননি! আজ হলো কী?

দু'পা এগিয়ে পাড়ের খুব কাছে এসে বলেন, নদী উত্তরটা দাও!

নদীর তরঙ্গ সহস্র কণ্ঠস্বর হয়ে বলে, আজ ছেলেটির জন্ম হবে।

ছেলেটির জন্ম হবে!

আজই রাতে।

বড় হয়ে কী হবে সেই ছেলে?

কবি। বড় কবি।

কবি! চিৎকার করে ওঠেন রজব হুসেন জং।

দু'হাত প্রসারিত করে বলেন, আজ তাজমহলের কাছে গিয়ে বলব, আজই সেই রাত যখন একজন কবির জন্ম হবে। শোনো আগ্রাবাসী এই শহরে আজ

একজন কবির জন্ম হবে। কবির জন্ম একটি বড় ঘটনা। কবির জন্মে আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে শহর। কবির জন্ম হলে মানুষের নিশ্বাস ফুলের সৌরভে ভরে যায়। ওহ, আর কী ভাববেন রজব জং? নাকি ঘরে ফিরে লিখবেন একটি নতুন কবিতা।

দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকেন রজব জং। ভাবতে থাকেন কার ঘরে সন্তানের জন্মের অপেক্ষায় আছে একজন নারী? কে সে? কে এমন পুণ্যবতী নারী? কার গর্ভ এমন ঐশ্বর্যে পূর্ণ? ওহ্, আনন্দ, আনন্দ! থমকে দাঁড়ান রজব জং। চারদিকে তাকান। নিজের স্মরণশক্তিকে তীক্ষ্ণ করে খুঁড়ে ফেলেন স্মৃতির ভূমি। কিন্তু না, কারো নাম মনে আসে না। তাঁর আত্মীয়স্বজনদের কারো ঘরে তো এমন খবর নেই। বন্ধু-বান্ধবও না। দূরের কেউ কি? যার খবর রজব জং রাখেন না। কিংবা যাদের খবর তাঁর কাছে এসে পৌঁছায় না? শহরজুড়ে কত লোক। কয়জনের খবরই বা তিনি রাখতে পারেন? ক্ষণিকের জন্য মনটা বিষণ্ন হয়ে যায়। ভাবেন, সেই মানুষটি যদি তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলতো, আমিই সেই শিশুর পিতা। আমার ঘরে যার আজ জন্ম হবে। আপনার আনন্দ আমাকে মোহিত করেছে। আপনি আমার সন্তানকে দোয়া করুন, এই শহরের হে সর্বোত্তম মানুষ। রজব জংয়ের বুক ভরে যায়। বাতাসে ফুলের ঘ্রাণ ভেসে এলে নিশ্বাস টানেন। পরক্ষণে আবার মন খারাপ হয়। ভাবেন, খবর পাওয়া হবে যদি এই শহরের কেউ হয়। কিন্তু দূরের কেউ হলে আর খবরটি পাওয়া হবে না। দাঁড়িয়ে পড়েন রজব জং। ভাবেন, আসলে তিনি নিজের মনের প্রতিধ্বনি শুনতে পান নদীর তরঙ্গে। এমন একটি অভ্যাস দাঁড়িয়েছে নিজের ভেতরে। তাঁর স্বপ্নের ভেতরে একজন কবির জন্ম তাঁর কাছে সত্যি হয়। আজ রাতে নিশ্চয়ই তাঁর নতুন কিছু লেখা হবে। পাখির পালকের কলমটি দোয়াতের কালিতে চুবিয়ে ভরে ফেলবেন সাদা কাগজের পৃষ্ঠা।

রোদ উঠেছে। ঝলমল করছে চারদিক। মানুষজন বেরিয়ে এসেছে শহরের রাস্তায়। রজব জংয়ের মনে হয় শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। হাতজোড়া আচকানের পকেটে ঢুকিয়েও কাজ হচ্ছে না। হাঁটুতেও শীতের কাঁপুনি। তাড়াতাড়ি হেঁটে বাড়িতে ফেরার চেষ্টা করেন। তাঁর চতুর্থ স্ত্রী ভাঙা কড়াইতে ধানের তুষের ওপর কাঠকয়লা জ্বালিয়ে রাখে। বাড়ি ফিরে হাত-পা সেঁকে নিলে বেশ আরাম লাগে। তারপর গরম পানি দিয়ে গোসল করলে শরীর ঝরঝরে হয়ে যায়।

উৎফুল্ল হতে চাইলেও হঠাৎ করে উৎফুল্ল হতে পারেন না। ভাবেন কার ঘরে শিশুটি জন্মাবে? চিন্তামগ্ন অবস্থায় বাড়ি ফিরতে থাকেন। পথে দেখা হয়

টাঙ্গাওয়ালা ইসমাঈলের সঙ্গে।

ওস্তাদজী আপনার তবীয়ত কি ঠিক নাই?

চমকে ওঠেন রজব জং। বলেন, কেন, কেন একথা বলছ? আমার তবীয়ত ঠিক আছে। বিলকুল ঠিক আছে।

তাহলে কী ভাবছেন? মনে হচ্ছে আপনি গভীর চিন্তায় আছেন?

হ্যাঁ, ভাবছি। গভীর কিছু ভাবছি। ভাবতে ভাবতে বাড়ি যাচ্ছি। আজ রাতে একটি বাচ্চার জন্ম হবে।

হা হা করে হাসে ইসমাঈল। হাসতে হাসতে বলে, আমার ঘরে আটটা বাচ্চা জন্মালো, আবার মরেও গেল। আমি টাঙ্গাওয়ালা টাঙ্গাই চালিয়ে যাচ্ছি। আর একটি বাচ্চা জন্মাবে বলে আপনি অস্থির হয়ে গেলেন ওস্তাদজী।

বিষয়টি তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না ইসমাঈল।

টাঙ্গায় উঠে বসুন। আমি আপনাকে বাড়িতে দিয়ে আসি।

তুমি কখনো দেখেছ যে হাঁটতে বের হলে আমি টাঙ্গায় করে বাড়িতে ফিরি?

ইসমাঈল লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা চুলকিয়ে বলে, না তা দেখি নি। এই আগ্রা শহরে আপনার মতো একজনও নেই যে ঝড়-বৃষ্টি ছাড়া হাঁটতে বের হয় না।

রজব জং খুশি হয়ে বলেন, ঠিক কথা বলেছ। এ জন্যই যমুনা নদী আমাকে এত ভালোবাসে! হা হা হাসিতে নড়ে ওঠে তাঁর শরীর। সাদা চুল এলোমেলো হয়ে যায়। ইসমাঈল মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, আপনাকে খুব সুন্দর লাগছে ওস্তাদজী। এখনো আপনার আর একটি শাদি করার বয়স আছে।

তওবা, তওবা। কী যে বলো। ধর্ম মতে চারটি বিয়ে আমি করতে পারি। এর বেশি আমি করতে চাই না।

শরম পাবেন না ওস্তাদজী। এটা কোনো খারাপ কথা নয়।

রজব জং আর কোনো দিকে না তাকিয়ে দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকেন। দেখা হয় খাজা মোয়াজ্জেমের সঙ্গে। তিনিও কবি। মুশায়রা মাতিয়ে রাখতে পারেন। ভোরবেলা হাঁটতে বের হন। তবে নিয়মিত নয়। যখন ইচ্ছে হয় তখন গজল গাইতে গাইতে পথে হাঁটেন। আজও সেভাবে গুনগুন করতে করতে যাচ্ছিলেন। রজবকে দেখে একগাল হেসে থমকে দাঁড়ান।

কেমন আছ দোস্ত? রজবকে কিছু বলতে না দিয়ে নিজেই বলতে থাকেন, ভোরবেলা বেরিয়েই মনে হচ্ছে চারদিকে সুবাতাস বইছে। তোমার কি মনে হচ্ছে না যে বাতাসে বাড়তি খুশবু আছে? শ্বাস টান, জোরে জোরে শ্বাস টেনে দেখ।

রজব ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকেন। বলেন, তোমার হয়েছে কী?

আমার? হ্যাঁ, আমার কী যেন হয়েছে। আমি বাতাসের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি মনে হচ্ছে।

কী বলছে আগ্রা শহরের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া হাওয়া?

বলছে, আজ রাতে এই শহরে একটি বাচ্চার জন্ম হবে।

বাহ্ বা, বাহ্ বা। মারহাবা দোস্ত খাজা মোয়াজ্জেম।

তোমার খুশির উচ্ছ্বাস দেখে আমার খুবই ভালো লাগছে কবি রজব জং। আমি দেখতে পাচ্ছি আগ্রা শহর জুড়ে খুশির আভা। মানুষজন বেশ সুখে আছে। তোমার কি তাই মনে হচ্ছে?

তোমার উচ্ছ্বাসের কথা বলো? তুমি কোনো টান অনুভব করছো? যে টান শুধু কবির বুকের মধ্যে থাকে?

আমাকে যমুনা নদী একটি বাচ্চার জন্মের কথা শুনিয়েছে। বলেছে ও আজ রাতেই আসছে।

বাহ্ বা, মারহাবা।

খাজা মোয়াজ্জেম উচ্ছ্বাসে উৎফুল্ল হয়ে রজব জংকে আলিঙ্গন করেন। যেন কতকালের পুরনো এই শহরে তাজমহল নির্মাণের পরে আর একটি কালজয়ী ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। আবার দু'জনে যে যার পথে হাঁটতে শুরু করেন।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই ভিস্তিওয়ালা বলে, হুজুর, আপনার বাড়িতে আজকে দুই ভিস্তি পানি বেশি দিয়েছি।

কেন দুই ভিস্তি পানি বেশি লাগবে? বেগম সাহেবারা দিতে বলেছে?

ছোট বেগম সাহেবা দিতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, আজ আপনার গোসল করতে বেশি পানি লাগবে। আজ আপনি পানিতে ভিজে মনের আনন্দ—

মনের আনন্দ প্রকাশ করব? তুমি তাই বলতে চাচ্ছো?

হ্যাঁ, তাই তো বললেন ছোট বেগম সাহেবা।

আচ্ছা যাও। ছোট বেগম সাহেবা তোমার সঙ্গে একটু বেশি কথা বলেছে। এটা ঠিক হয় নি।

গোস্তাফী মাফ করবেন হুজুর। আমার মনে হয়েছে আপনার বাড়িতে কোনো খুশির খবর আছে।

ভিস্তিওয়ালা তাহিরুল্লা খানিকটা চলে যেতেই রজব জং তাকে আবার ডাকেন। ও কাছে এসে দাঁড়াতেই বলেন, তোমার মশকে আর পানি আছে?

না হুজুর। আমি মশক উজাড় করে সবটুকু ঢেলে দিয়েছি। আজ পানি

AMARBOI.COM

ঢালতে আমি অনেক খুশি ছিলাম।

খুশি? কেন?

জানি না। বলতে পারবো না, কিন্তু মনে হয় আমার যদি দুটো পাখা গজাতো তাহলে পাখির মতো শহরের উপর দিয়ে উড়তাম। আনন্দে গান গাইতাম। আমরা ছোট মানুষ হুজুর, আমাদের কি আনন্দ করার সাধ্য আছে!

রজব জং আচকানের পকেট হাতড়ে ওকে দুটো তামার মুদ্রা দিতে গেলে ও দু'পা পিছিয়ে বলে, আমার খুশি মুদ্রা দিয়ে বিক্রি হবে না হুজুর। এ খুশি আল্লাহতায়ালার নিয়ামত। যাই।

রজব জং অবাক হন না। তাহিরুল্লার আচরণ থেকেই তিনি বুঝে যান যে, আজ আগ্রা শহরে খুশির জোয়ার বইছে। তাঁর বেশ ভালোই লাগে। ধীরে সুস্থে গাম্ভীর্য সহকারে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করেন। প্রথমেই দেখা হয় দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে। নিজের ঘর থেকে একগাদা কাপড় নিয়ে বের হয়েছে। বোঝা যায় কাপড় ধোয়ার জন্য চৌবাচ্চার ধারে যাচ্ছে। কারণ ভিস্তিওয়ালা পানি দিয়ে গেছে। রজব জংকে দেখে দাঁড়ায়।

আপনার কিছু লাগবে? আমি কাপড় ধোয়ার কাজে যাচ্ছি। কোনো কাজে ডাকলে আসতে পারবো না। কোনো কাজ থাকলে এখনই বলুন।

না, তোমার সঙ্গে আমার কোনো কাজ নাই। তুমি তোমার কাজে যাও। ও হ্যাঁ, শোনো। নাস্তা তৈরি হয়েছে?

হ্যাঁ, রুটি আর কাবাব বানানো হয়েছে। বাকি হালুয়া, শরবত ওইসব তো আছেই। আরো কিছু থাকতে পারে। খাবার-দাবারের ব্যাপারটা তো বড় বাজী দেখেন।

বহুৎ আচ্ছা। ভীষণ খিদে পেয়েছে। নাশতাটা ভালো না হলে আজ বাড়ি তোলপাড় করে ফেলবো।

পারবেন না।

পারবো না? কেন?

আপনার চেহারা খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছে। এমন চেহারায় কারো রাগ মানায় না। আপনি রাগতেও পারবেন না।

আয়শা আর দাঁড়ায় না। রজব জং তার হনহন করে হেঁটে যাওয়া দেখেন।

নিজের ঘরে যান। আচকান খুলে আলনায় ঝুলিয়ে রাখেন। তারপর কান টুপিটা বিছানার ওপর রেখে জুতো খোলার জন্য বসেন। কয়লার মালশা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে চতুর্থ স্ত্রী। পায়ের কাছে নামিয়ে রাখে মালশা। বলে, আপনার পা কি আমি কয়লার ওপরে ধরব?

ধরো। হিমে পা কুঁকড়ে গেছে।

বুশরা প্রথমে বাম পা, পরে ডান পা আলতো করে আগুনের ওপর ধরে। এভাবে অদল-বদল করে পা সেঁকার কাজ শেষ হয়। তারপর একটি উঁচু টুলের ওপর লোহার আংটা রেখে মালশা বসিয়ে দিলে রজব জং নিজেই হাত সেঁকে নেন। তারপর বুশরার দিকে তাকিয়ে বলেন, হয়ে গেছে। নিয়ে যাও। গোসলের পানি গরম করা হয়েছে?

হয়েছে। আমি মশকে পানি দিতে বলছি।

বুশরা মালশা নিয়ে চলে যাওয়ার উপক্রম করতেই রজব জং বেশ আয়েশী ঢঙে প্রতাপশালীর ভাষায় জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমাকে কি খুব ভালোবাসো বিবি?

বুশরা উত্তর দেয় না। মাথা নিচু করে থাকে।

তুমি কথা বলছ না কেন? কবির সামনে কথা বলতে সাহস লাগে না। কথা বলা যায়। বলো, বুশরা বিবি, বলো।

ভালোবাসা কী তা তো আমি জানি না। বিয়ের পর থেকে দেখতে পাচ্ছি এই বাড়িটা একটা গোয়াল ঘর। এখানে চারটা বিবি খুঁটিতে বাঁধা আছে। আপনার সেবার জন্য তারা এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মালশা নিয়ে দ্রুত পায়ে চলে যায় বুশরা। রজব জং প্রথমে ভুরু কুঁকচান, তারপর তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেন বুশরার কথা। নিজেকেই বলেন, স্ত্রীলোকের কথা শোনা পাপ। ওরা গুনাহগার বান্দা। ওদেরকে মাফ করে দেয়াই উচিত কাজ। আল্লাহ খুশি হবেন।

প্রথম স্ত্রী জোহরা খাবারের আয়োজন নিজেই দেখে। রান্নাও নিজের হাতে করে। দস্তরখানা বিছিয়ে নানা ধরনের হালুয়া, শরবত এবং রুটি-কাবাব সাজিয়ে অপেক্ষা করে। আজও তার ব্যতিক্রম হয় না। তৃতীয় স্ত্রী বিন্দা তার লুঙ্গি-গামছা-তেলের শিশি নিয়ে চৌবাচ্চার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। রজব জং গোসলের জন্য আঙ্গিনায় নামলেও বুশরার কথাগুলো মনে মনে নাড়াচাড়া করেন। বুশরা বয়সে তার পঁয়ত্রিশ বছরের ছোট। মুখ বেশি চলে— শয়তান মেয়েলোক, রজব জং বিড়বিড় করে গালি দেন। দূর থেকে বিন্দাকে দেখেও মেজাজ ঈষৎ গরম হয়। এই মেয়েলোকটিও কম নয়। যে রাতে ওকে ঘরে ডাকেন সে রাতে ওর প্রথম কথা, আর কোথাও জায়গা না পেয়ে আমাকে ডেকেছেন বুঝি? অন্য বউদের কি মাসিক হয়েছে? মাসিক বিষয়টি বিন্দাই চালু করেছে। বাকিরা এটা নিয়ে রসিকতা করে। রজব জং জানেন তার ওপর রাগ ঝাড়ার জন্য বুশরার ঘনঘন মাসিক হয়। যাহোক। আগে গোসল শেষ হোক।

রজব জং আবার স্ত্রীদের মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেন। নিজেকে শাসন করে বলেন, মেয়েলোকদের মাথায় রাখা ঠিক না।

গোসলের জায়গায় পৌঁছালে বিন্দা ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বলে, আপনি কিছু চিন্তা করছেন মনে হয়?

করতেই পারি। তাতে তোমার কী?

আপনি আমার স্বামী। আপনার জন্য আমার চিন্তা হয়।

ভালো কথা বলছ দেখি।

আপনার চুলে তেল দিয়ে দেব?

দাও। তেল দেয়ার সময় বসতে হবে বলে একটি টুল রাখা আছে। রজব জং টুলে বসেন। তার ঘন সাদা চুলের ভেতর হাত ঢুকে যায় বিন্দার। বেশ আরাম লাগে। বিন্দা তার চাইতে প্রায় পঁচিশ বছরের ছোট। শারীরিক গঠন দারুণ। স্বাস্থ্য ভালো। বিছানায় ক্ষিপ্র। উপভোগের আনন্দ ওর কাছ থেকে বেশি পাওয়া যায়। রজব জং এই মুহূর্তে তেল মাখার আনন্দ উপভোগ করেন। আশেপাশে বাড়ির লোকজন কাজ করছে। ছেলেমেয়েরা ঘোরাঘুরি করছে— নইলে বিন্দাকে নিয়ে— না থাক। রজব জং নিজেকে সামলান। বিন্দা হাসির মৃদু শব্দ করে বলে, আজ কি কবিতা লিখবেন?

হ্যাঁ। যমুনা নদীকে নিয়ে লিখবো। যমুনা নদীর কাছ থেকে বার্তা পেয়েছি।

নদী আবার বার্তা পাঠাতে পারে নাকি? যতসব আজগুবী কথা।

হি-হি করে হেসে গড়িয়ে পড়ে বিন্দা।

হাসির শব্দ বেড়ে গেলে তিনি চিৎকার করে বলেন, খামোশ! চুপ। ক্রোধে ধমক দেন রজব হুসেন জং। মেয়েলোকের এমন হাসি শুনলে তার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। বিন্দা অকস্মাৎ চুপ করে যায় ঠিকই, কিন্তু ওর শরীর দুলছে, তার মানে ভেতরে ভেতরে হাসির দমক আছে। এটুকু বুঝেও রজব জং গোসলের জন্য গায়ে পানি ঢালেন। পানি শরীরকে স্নিগ্ধ করে দেয়। ফলে তার রাগ কমে আসে। গোসল শেষ হলে বিন্দা গামছা এগিয়ে দেয়। মনে মনে ভাবে, বুড়োটার গায়ের রঙ এখনো ভীষণ টকটকে। বয়সের কামড় পড়েনি। গায়ের চামড়া কুচকেছে মাত্র। বিছানাতেও বেশ শক্ত। ভাবতেই বিন্দা খানিকটা অন্যমনস্ক হয়। স্বামীকে পায়জামাটা সময় মতো এগিয়ে দেয়া হয় না। রজব জং ধমক দিয়ে বলেন, কী হলো? কিসের ভাবনা?

আপনার কথা ভাবছি। আপনি খুব সুন্দর। মাঝে মাঝে মনে হয় শুধু আপনার দিকে তাকিয়েই থাকি। চোখের পলক যেন পড়তে চায় না।

পায়জামা পরতে পরতে হাসেন রজব জং। সে হাসি ছাড়িয়ে যায় পুরো

বাড়িতে। বাকি তিন স্ত্রী যে যেখানে ছিল হাসির শব্দ কান পেতে শোনে এবং ভুরু কুঁচকে বিন্দার দিকে তাকায়। বিন্দা এমন কী কথা বলল যে স্বামী নামের প্রভুটি এমন জোরে জোরে হাসছে? ওদের হিংসা হয়। হিংসায় ওদের বুক পুড়ে যায়। তারপরও এ বাড়ির নিয়ম অনুযায়ী কখনো কোনো কারণে স্ত্রীদের মধ্যে কলহ হবে না। প্রত্যেকে যার যার ঘরে নীরবে দিন কাটাবে। রজব জং বাড়িতে না থাকলেও মেয়েলোকের উচ্চকণ্ঠ এ বাড়িতে নিষিদ্ধ। তাই জোহরা, আয়শা, বিন্দা এবং বুশরা হাসির ধ্বনিতে গর্জনের আলামত পায়। ওরা স্তব্ধ হয়ে থাকে।

ওদের বিমূঢ় হয়ে থাকা মুখের দিকে তাকিয়ে রজব জং ঘাড় বাঁকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রভুত্বের আনন্দ উপভোগ করেন। ভেতরে প্রবল শ্লাঘার অনুভব। নিজের ঘরে ঢুকে ছোট আয়নার সামনে বসেন। অনেকক্ষণ ধরে চুলে সিঁথি কাটেন। মাঝ বরাবর সিঁথি কেটে দু'পাশে চুল ছড়িয়ে দেন। বুশরা এভাবে সিঁথি কাটা পছন্দ করে। মাঝে মাঝে নিজেও সিঁথি করে দেয়, কিন্তু আজ ওর মেজাজ খারাপ। ওকে না ডাকাই ভালো, হুকুম দিয়ে এসব কাজ হয় না। রজব জং গায়ে আলোয়ান জড়িয়ে নাস্তা খেতে আসেন।

জোহরাকে বলেন, তোমাদের সঙ্গে আমার কথা আছে। ওদের সবাইকে ডাকো। জোহরা কাজের লোককে হুকুম না দিয়ে নিজেই উঠে গিয়ে তিন সতীনকে ডেকে আনে। প্রত্যেকে এসে দস্তরখানার সামনে বসে।

আয়শার জিজ্ঞাসা, আমাদেরকে ডেকেছেন?

রজব জংয়ের মুখে কাবাব আর রুটি। ধীরে সুস্থে চিবুচ্ছেন। তাই হাত উঁচু করে ইশারায় বলেন, বোস। স্ত্রীদের বসিয়ে রেখে বেশ অনেকক্ষণ ধরে রুটি-কাবাব চিবিয়ে শেষ করেন। বুশরা বলে, আপনার দাঁতে কি ব্যথা আছে? গোশত চিবাতে কষ্ট হয়?

খামোশ। বেশি কথা বলবে না।

আমরা আপনার স্বাস্থ্যের খোঁজ নিচ্ছি।

তার দরকার নেই। আমার স্বাস্থ্যের জন্য বদরুদ্দিন হেকিম আছে। প্রয়োজনীয় দাওয়াই সে-ই দেয়। তোমাদের মনে থাকা উচিত। হেকিম ছাড়া স্বাস্থ্যের ভালোমন্দ আর কে বুঝবে? আমি নিজেও বুঝি। বুঝি বলেই তো আমার স্বাস্থ্য এমন টানটান।

কেউ কথা বলে না। রজব জং একবাটি বুটের ডালের হালুয়া খান। জোহরা ভাবে, বুড়োটা খাওয়ার যম। যৌবনকালে যেমন খেতো এখনো তেমন চালিয়ে যাচ্ছেন। হজমও হয়। পেট খারাপ হতে দেখা যায় না। হালুয়া শেষ করে এক গ্লাস কিশমিশ-শরবত খেয়ে বলেন, তোমাদের কাছে একটা খবর

জানতে চাই। কারণ তোমরা মাঝে মাঝে বিভিন্ন বাড়ির অন্দরমহলে যাও।

কী খবর বলুন?

আজ রাতে বাচ্চা হবে এমন কোনো গর্ভবতী নারীর খবর কি তোমাদের কাছে আছে?

চারজনই চুপ করে এক মুহূর্ত ভাবে। তারপর বিন্দার ঠোঁটে মৃদু হাসি ভেসে ওঠে। জোহরা মাথা নেড়ে বলে, আমার জানামতে তেমন কেউ নাই। আমার বয়স হয়েছে। আমি যাদের কাছে যাই তদের কারোই গর্ভ হওয়ার বয়স নাই। সবার মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে।

ও আচ্ছা। রজব জং মাথা নেড়ে আয়শার দিকে তাকান। আয়শা ভুরু কুঁচকে বলে, আমি দুজনকে জানি। কিন্তু দুজনের কারোই আজ রাতে বাচ্চা হবে না। এখনো তিন চার মাস দেরি আছে।

হুঁ। রজব জং বিন্দার দিকে তাকানোর আগেই বুশরা তড়বড় করে তিক্ত কণ্ঠে বলে, আমি কারো গর্ভের খবর রাখি না। গর্ভবতী কারো দিকে তাকাতে আমার গা রি-রি করে।

কেন, তুমি মা হতে পারো নি বলে?

বিন্দা ঠেস দিয়ে কথা বলে। আমিও তো মা হতে পারিনি। তাই বলে আমি অন্যের গর্ভকে হিংসা করি না। ওটা গুণাহর কাজ।

রজব জংয়ের ঠোঁটে তখন শরবতের গ্লাস। জোহরা ও আয়শার ঠোঁটে মৃদু হাসি। ওদের দিকে তাকিয়ে বুশরা হিংস্র কণ্ঠে বলে, আপনাদের হাসি দেখে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। আগ্রা শহরে কার কার পেট বেধেছে সেইসব হিসেব আমাদের রাখতে হবে নাকি? আমাদের আর কোনো কাজ নাই।

খামোশ! রজব জং দস্তরখানার ওপর ঠক করে গ্লাস রাখেন। বুশরার দিকে তর্জনী তুলে বলে, তুমি এখন যাও।

বুশরা উঠতে দেরি করলে চিৎকার করে বলেন, যাও বলছি, যাও এক্ষুণি।

বুশরা চলে গেলে রজব জং বিন্দার দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমার কাছে কোনো খবর আছে?

আছে। আমার বান্ধবী, আবদুল্লাহ বেগ খাঁয়ের স্ত্রী আমাকে বলেছে, দু'একদিনের মধ্যে ওর প্রসব হতে পারে। বলেছে যে কোনো সময় ব্যথা উঠতে পারে।

রজব জং খুশিতে মাথা নেড়ে বলে, আবদুল্লাহকে আমি চিনি। ও তো খাজা গোলাম হুসেন খাঁর মেয়েকে বিয়ে করেছে। গোলাম হুসেন আগ্রার অভিজাতদের একজন। আবদুল্লাহকে ঘরজামাই করেছে গোলাম হুসেন খাঁ।

বেশ কথা। বাচ্চাটি নানার বাড়িতে জন্ম নেবে।

আজ রাতে আমার বান্ধবীর প্রসব নাও হতে পারে।

হতেও পারে। সবই খোদাতালার ইচ্ছা। তিনিই জানেন তিনি কী করবেন। আজ একটি পবিত্র রাত।

আপনার কাছে মনে হচ্ছে কেন আজ পবিত্র রাত?

মনে হওয়ার কারণ আছে। এখনই বলবো না। তোমরা সব সময় কবির মনের কথা বুঝবে না। কবির মনে স্বপ্ন থাকে, নতুন চিন্তা থাকে। কবি নদীর যে কথা বুঝতে পারে, সাধারণ মানুষ তা পারে না। কবি ফুলের যে শোভা দেখতে পায় সাধারণ মানুষ তা পায় না।

বিন্দা হেসে বলে, তাহলে কবিই কি সবার উঁচুতে? আর কেউ নাই? মানুষের চিন্তার কি শেষ আছে? মানুষের উচ্চতা মাপার সাধ্য মানুষের আছে?

রজব জং গরম চোখে তাকান বিন্দার দিকে।

আমার খাওয়া শেষ হয়েছে। তোমরা এখন যাও।

রজব জং নিজের ঘরে ঢুকে লেখার টেবিলে বসেন। যমুনা নদীকে নিয়ে কবিতা লিখে নিজের খাতার পৃষ্ঠা ভরান। তুমিই আমার প্রেমিকা যমুনা। তুমিই একের ভেতর অনেক। নতুন নতুনরূপে অপরূপ হয়ে ভরে দাও আমার হৃদয়। তুমিই সত্যি প্রিয় নদী। তুমিই তুমি।

কয়েকটি কবিতা লেখার পর অস্থির হয়ে ওঠেন রজব জং। কবিতায় মন বসে না। ঘরে পায়চারী করেন। এক সময় বেরিয়ে আসেন রাস্তায়। ভাবেন, আবদুল্লাহ বেগ খাঁয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আসবেন। যদিও লোকটি চাকরি করে। কবিতার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তাতে কী, লোকটি সজ্জন। ভাবতে ভাবতে রজব জং টাঙ্গায় উঠে গোলাম হুসেনের বাড়িতে আসেন।

বেশ বড় বাড়ি। বিশাল গেট। দারোয়ান তাকে দেখে সালাম দেয়। রজব জং মৃদু হেসে সালামের জবাব দিয়ে বলেন, তোমার হুজুর বাড়িতে আছে?

হুজুর দিল্লি গিয়েছেন।

হুজুরের জামাই কোথায়? আবদুল্লাহ বেগ?

তিনি আলোয়ারে। দু'একদিনের মধ্যে আসবেন। হুজুরও দু'একদিনের মধ্যে চলে আসবেন। আপনার শরীর ভালো তো জনাব?

খোদার মেহেরবানি। ভালোই আছি।

শীতটা খুব জাঁকিয়ে পড়েছে।

রজব জং ওর কথার কোনো জবাব না দিয়ে হাঁটতে শুরু করেন। সামনে

টাঙ্গা ডেকে উঠে পড়েন। বাড়ি ফিরে চুপচাপ বসে থাকেন। ভাবেন দুপুরের ঘুমটি গেল। সকালে নদীর যে কণ্ঠস্বর তার মাথায় ভর করেছে সে উত্তেজনা তাঁকে প্রবলভাবে সক্রিয় রেখেছে। দুপুরের খাওয়াও ঠিক মতো হলো না। বিকেল হওয়ার আগেই বিন্দাকে বললেন, তোমার বান্ধবীর খবর আনতে যাও।

খবর! খুশির খবর হলে আমি কি উপহার পাব?

কী চাও? কী পেলে তুমি খুশি হবে?

বাব্বা, আমার খুশির এত দাম! আমার জীবন ধন্য হয়ে গেল। বিন্দা শব্দ করে হাসে।

এত জোরে হাসার কিছু হয় নি। তুমি কী চাও তা আমায় বলো।

জরি বসানো ঘাঘরা চাই। আমি ময়ূরের মতো পেখম তুলে এই বাড়িতে ঘুরে বেড়াবো। সেই দৃশ্য দেখে আপনি একটি নতুন কবিতা লিখবেন।

নতুন কবিতা? হ্যাঁ, ভালোবাসার কবিতা লিখবো।

বাহ, বেশ মজা। তাহলে নতুন কবিতার জন্য আমি আর একটি ঘাঘরা কি পেতে পারি?

না, সেটা তুমি পেতে পারো না। কবিতার জন্য ঘাঘরা চাইলে কবিতার অসম্মান হয়।

বেশ চাইবো না। খুশির খবরের জন্য পাব না?

পাবে।

জরি বসানো ঘাঘরা কিন্তু।

বেশ তাই দেবো।

বিন্দার খুশির খবর শুনে অন্যদের মুখ কালো হয়ে যায়। কেউ কোনো কথা বলে না। শুধু বাঁকা চোখে দেখে যে বিন্দা অনেকক্ষণ ধরে সেজেগুজে বাড়িতে ডেকে আনা টাঙ্গায় উঠে বান্ধবীর বাড়িতে যায়। রজব জং টাঙ্গাওয়ালাকে হুকুম দিয়েছে যে বিন্দা যতক্ষণ ওই বাড়িতে থাকবে সে ততক্ষণ অপেক্ষা করবে। অন্য কোনো যাত্রী বহন করতে পারবে না। বিন্দার জন্য এটিও একটি বড় সম্মান। ফলে সতীনদের বুক আরেক দফা পুড়তে থাকে।

সন্ধ্যার পরে উৎফুল্ল চিত্তে ফিরে আসে বিন্দা। বলে, আপনার ধারণাই বোধহয় সত্যি হবে। প্রসব ব্যথা উঠেছে আমার বান্ধবীর। মনে হয় আজ রাতেই বাচ্চাটি হয়ে যাবে।

তোমার কি ওর কাছে থাকার দরকার ছিল?

না, না ওদের অনেক আয়োজন আছে। ওদের মেয়ের প্রথম বাচ্চা হবে। ধাত্রী-মা আনা হয়েছে তিনজন। আত্মীয়স্বজন তো আছেই। অভিজাত

পরিবারের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। নিজের ঘরে যেতে যেতে বলে, আমার উপহারের কথা আপনার মনে থাকে যেন।

রজব জং উত্তর দেন না। স্ত্রীদের এত বায়না তার খুব অপছন্দ। মাঝে মাঝে মেজাজ বিগড়ে যায়। তবে আজ একটি সুখবরের অপেক্ষায় আছেন বলে তাঁর ভেতরে ক্রোধ জন্মায় না। রাতের খাবার খেয়ে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার চিন্তা করেন। একই সঙ্গে ভাবেন, আজ বিছানায় বিন্দাকে চাই। বিন্দাকে ঘরে ডেকে সে কথা বলতেই বিন্দা আনন্দে মাথা নেড়ে সায় দেয়।

রাতের খাবার তাড়াতাড়ি খেয়ে নিও।

তাড়াতাড়ি তো খেতে পারব না। জোহরা বাজীর নিয়ম সবাইকে এক সঙ্গে খেতে হবে।

আমার হুকুম—

হুকুমে কাজ হবে না। তাহলে রান্নাঘরে তালা পড়বে। আপনি কারো গলা শুনবেন না, কিন্তু নীরব যুদ্ধ চলবে। তার চেয়ে ভালো আমি রাতে খাব না। বলব, শরীর খারাপ, খেতে ভালো লাগছে না। আমি ঘুমুতে গেলাম।

তোমার খিদে পাবে না?

পাবে তো। পেলে আর কী করব। সহ্য করে থাকবো। তারপর গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলে, আপনার বয়সটা যদি আর একটু কম হতো। তাহলে বিছানা যমুনা নদী হয়ে যেত। দুজনে সাঁতার দিয়ে পার হয়ে যেতাম। এখন যুৎ লাগে না।

স্বামীর কাছ থেকে কোনো কটু কথা শোনার আগেই ও দ্রুতপায়ে সরে পড়ে। রজব জং মন খারাপ করেন। তারপর রাগ ঝেড়ে নিয়ে ভাবেন, মেয়েলোকেরা বুঝতে পারে না যে কোন কথায় খসমের মন খুশি থাকবে, কোন কথায় থাকবেন না। মেয়েলোকদের খসম ছাড়া আর গতি কী। তারপর আবার বড় কথা। বড় কথা ওদের মানায় না। ওরা সন্তান পয়দা করবে বংশ রক্ষার জন্য। ওদের দায়িত্ব ওইটুকুই। ওরা রান্না করবে। সবার থালায় ভাত দেবে—স্বামী এবং সন্তানকে। রান্নাঘরে থাকা ওদের দায়িত্ব। বড় কথা ওদের মুখে শোভা পায় না। যারা বলে তারা বেতমীজ মেয়েলোক। এই জীবনটা ওদের নিয়েই কাটাতে হলো। আসলে উচিত ছিল তালাক দিয়ে এক একটিকে বাপের বাড়িতে ফেরত পাঠানো। তিনি তা করেন নি। শহরের সম্মানিত সজ্জন ব্যক্তি বলে করেননি। কিন্তু মেয়েলোকেরা এসব কিছু অনেক সময় বুঝতে পারে না।

গজগজ করেন রজব হুসেন জং। তবে রাতটা দারুণ কাটে। নিজের ভেতরে নতুন শক্তি অনুভব করেন। ভোরের আলো ফোটার আগেই হাঁটার জন্য

বেরিয়ে পড়েন। আজও যমুনার প্রবাহে খুশির ধ্বনি শুনতে পান তিনি। সূর্য ওঠার আগেই হাঁটতে হাঁটতে খাজা গোলাম হুসেনের বাড়ির সামনে দিয়ে একটি চক্কর দেন। দ্বিতীয় চক্কর দেয়ার সময় দারোয়ানের সামনে পড়েন। ও একগাল হেসে বলে, কেমন আছেন হুজুর? হাঁটতে বেরিয়েছেন বুঝি?

হ্যাঁ, তাই তো। আমি তো রোজই হাঁটি। তোমাদের কি খবর? বাড়িতে ভালো আছে সবাই?

হ্যাঁ, সবাই ভালো আছেন। আমাদের জন্য খুশির খবর হয়েছে হুজুর। আমাদের হুজুর নানা হয়েছেন। পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে। মা আর ছেলে ভালো আছে বলে আমাদেরকে জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, আমরা যেন সব অতিথিদের খবরটি দেই। একটু পরে আমার কাছে এক ডালা মিষ্টি পাঠানো হবে অতিথিদের জন্য। হুজুর আপনি যদি একটু বসতেন?

না, না, আমি এখন আর বসবো না। তবে খবর শুনে খুবই খুশি হয়েছি। দোয়া করি বাচ্চা যেন সুস্থ থাকে, ভালো থাকে। আবদুল্লাহ বেগ খাঁ ভাগ্যবান ব্যক্তি। ও আলোয়ার থেকে এলে আমি ওর সঙ্গে দেখা করবো। আচ্ছা যাই।

সেলাম হুজুর।

ফিরতে ফিরতে রজব জংয়ের মনে হয় আজ তাঁর ইচ্ছে করছে পায়ে হেঁটে আগ্রা শহর প্রদক্ষিণ করতে। ঘরে ঘরে গিয়ে বলতে হবে, শিশুটির জন্ম হয়েছে। ও কবিতার দুনিয়া জয় করবে। ও সময়কে অতিক্রম করবে। ওর কবিতা শতাব্দী অতিক্রম করবে। আমাদের মুখ উজ্জ্বল হবে। হাঃ, আগ্রাবাসী আমাদের আগ্রা টিকে থাকবে আগামী দিনের কবির কবিতায়। তোমরা তাঁর জন্য জয়ধ্বনি করো।

ছেলেটির নাম রাখা হয় মির্জা নওশা নজমুদদৌলা দবীরুল মুল্ক আসাদুল্লাহ খাঁ বাহাদুর নিজামে জং। আদর করে সবাই মির্জা নওশা বলে ডাকে।

ধুমধাম করে আকিকা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে খাজা গুলাম হুসেন। নিমন্ত্রিত হয় রজব জংয়ের পরিবার। বিন্দা ঘোষণা দিয়েছে নতুন ঘাঘরা ছাড়া অনুষ্ঠানে যাবে না সে। অন্য তিনজনও ঘোষণা দেয়, বিন্দা অনুষ্ঠানে নতুন ঘাঘরা পরে যাবে, আর আমরা পুরনোটা পরব তা হবে না।

বিন্দা আঙুল উঁচিয়ে বলে, আমি একটি খুশির খবর এনে দিয়েছি বলে আমি উপহার হিসেবে একটি ঘাঘরা পাব। তোমরা তো তা পাবে না।

উপহার পাও আর যা পাও, আকিকা অনুষ্ঠানে তুমি নতুন ঘাঘরা পরে যেতে পারবে না।

বিন্দা রজব জংয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

আমার উপহার দিবেন না?

দেব। কিন্তু কখন দেব আমি কিন্তু তোমাকে তা বলিনি। আমার সময় সুযোগ মতো দেব। যখন খুশি তখন দেব। তোমার সময়মতো দেবো না। এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে।

আপনি কিন্তু কবির মতো কথা বললেন না। আমার সঙ্গে চালাকি করলেন।

কী, এতবড় কথা।

তাহলে কি দিবেন না?

রজব হুসেন জং বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকেন। তারপর চেঁচিয়ে বলেন, মেয়েলোকদের প্রশ্রয় দিলে মাথায় উঠে। এ জন্য মেয়েলোকদের পায়ের নিচে রাখতে হয়।

এভাবে কথা বলবেন না। আপনি কী—

তুমি আমাকে শিক্ষা দিচ্ছো? যাও এখান থেকে, যাও যাও বলছি।

চলে যায় বিন্দা। বাড়ি থমথম করে। কাজের লোকেরা যে যার মতো নীরবে কাজ করে। কারো মুখে কথা নেই। আকিকা অনুষ্ঠান উপলক্ষে মুশায়রার আয়োজন করেছে গোলাম হুসেন। তার জন্য অনেকগুলো কবিতা লিখতে হবে। গুলাম হুসেন বলেছেন, আপনাকে আমি সবার উপরে দেখতে চাই। পারবেন তো? তবীয়ত ঠিক আছে তো? এখন তো বয়সটাই শত্রু। হা-হা করে হেসে কথাগুলো বলেছিলেন গুলাম হুসেন। তার বয়সও কম নয়। রজব জংয়ের কাছাকাছি হবে। দু'এক বছর ছোট হলেও হতে পারে। রজব জং আরাম কেদারায় বসে মাথাটা এলিয়ে দেন। জানালা দিয়ে বাইরে তাকান। বাড়ির প্রাচীরের ওপরে লতিয়ে আছে ফুলের লতা। গোলাপি ফুলে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। আহ, জীবনটা ভীষণ সুখেই কেটেছে। দুঃখ তাঁকে ঘায়েল করতে পারে না। আরাম কেদারায় দু'চোখ বুজে রেখে সময় উপভোগ করেন রজব জং। বুঝতে পারেন তাঁর ভেতরটা তৈরি হচ্ছে। আজ রাতে লিখতে পারবেন। রজব জং চোখ বুজেই থাকেন। মনে মনে বলেন, খোদা মেহেরবান। সে রাতে খেয়েদেয়ে ঘরে আর কোনো স্ত্রীকে ডাকার ইচ্ছে হয় না। আজ রাত তাঁর একার। এভাবে কোনো কোনো রাতে কবিতা তাঁকে একা করে ফেলে। তখন এক অদ্ভুত সময় তাঁকে ঘিরে রাখে— যেন অন্ধকারই আপন, অন্ধকারই দুনিয়া। অন্ধকারই আলো তাঁর কাছে। আলো-অন্ধকারে উল্টাপাল্টা এ সময়ই তাঁর ভেতরে জ্বলে-নেভে। বাতাসে মোমের শিখা নড়লে অন্ধকারের আঁকিবুকি তৈরি হয় কাগজের ওপর— তাঁর পাখির পালকের কলম দ্রুত চলে। কলম

কালির দোয়াতের মধ্যে ডোবে আর ওঠে। এমন দুনিয়াই তো নিজে গড়েছে একজন কবি। খোদাতালার মেহেরবানি যে আগ্রার জ্ঞানীগুণীরা বলেন, এ সময়ের সবচেয়ে বড় কবি রজব জং। আগ্রার মুখ উজ্জ্বল করে রেখেছেন। এসব কথা শুনলে জীবন ধন্য হয়ে যায়। রজব জং রাতের আকাশে নিজের চেহারা দেখতে পান।

আকিকা অনুষ্ঠানের রাতে মুশায়রায় মাতিয়ে দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় আবদুল্লাহ বেগ খাঁয়ের হাত জড়িয়ে ধরে বলেন, তুমি ভাগ্যবান পিতা। ছেলেটি একটা কিছু হবে। বড় কিছু। ইতিহাসে ওর নাম থাকবে।

আপনি দোয়া করুন ওস্তাদজী। পুত্রটিকে যেন আমি বড় কাজের যোগ্য করে তুলতে পারি। আমি নিজে একজন সৈনিক। আমার ছেলেও সে রকম কিছু হবে বলে মনে করি। আমি চাই ও হিন্দুস্তানের সম্রাট হবে।

সম্রাট! রজব জং বিস্ময়ে একজন নতুন পিতার স্বপ্নের কথা শোনেন।

অবাক হচ্ছেন কেন ওস্তাদজী? সৈনিকের ছেলে লড়াই করে ক্ষমতা দখল করবে। লড়াই ছাড়া সৈনিকের তেজ থাকে না। তেজ না থাকলে রক্ত গরম থাকে না। একটি দেশের জন্য সৈনিকই সবচেয়ে বড় শক্তি।

আমার তা মনে হয় না। রজব জং শীতল কণ্ঠে বলেন।

আপনার কী মনে হয়?

আমার মনে হয় দেশের জন্য কবিই সবচেয়ে বড় শক্তি।

কবি! হা-হা করে হাসে আবদুল্লাহ বেগ খাঁ।

রজব জং কিছুটা রাগত স্বরে বলে, হেসো না আবদুল্লাহ, কবিই মানুষকে ভালোবাসা শেখায়। কবিই দেশকে ভালোবাসতে বলে। কবি ছাড়া মানুষের আত্মার মুক্তি নাই। সৈনিক চেনে রক্ত। কবি চেনে হৃদয়। কোনটা উত্তম আবদুল্লাহ?

দুটোই। আবদুল্লাহ বেগ খাঁকে একটুখানি চিন্তিত দেখায়। তারপর বলে, মানুষের সবটুকুই মানুষের জন্য প্রয়োজন। এখানে উত্তম বা নিচ বলে কিছু নেই। তবে সৈনিকের জীবন অনেক ইতিহাসের সাক্ষী। আমি আপনাকে আমাদের পূর্বপুরুষের হিন্দুস্তানে আসার কাহিনী শোনাবো।

তোমার কথায় আমি খুশি হয়েছি আবদুল্লাহ। তুমি তো বেশ ভাবুক লোক। শুধুই সৈনিক নও।

এবার হা-হা করে হাসেন রজব জং। আবদুল্লাহ ঈষৎ অবাক হয়ে বলে, আমার কিছু ভুল হলে মাফ করবেন ওস্তাদজী।

না, কিছু ভুল হয়নি। তুমি তোমার পরিবারের কথা বলো। আমি জানি

তোমার পূর্বপুরুষরা তুর্কী।

আমার পূর্বপুরুষরা ঐবক জাতির তুর্কী ছিলেন।

ঐবক শব্দটি বুঝিয়ে বলো। কবি মানুষ তো শব্দের অর্থ না জানলে জানতে খুব ইচ্ছা করে।

ঐবক তুর্কী শব্দ। 'আয়' এবং 'বক' শব্দ মিলে তৈরি হয়েছে ঐবক। তুর্কী ভাষায় 'আয়' শব্দের অর্থ চাঁদ এবং 'বক' শব্দের অর্থ পূর্ণ। পুরো মানেটি হলো 'শ্রেষ্ঠ পুণ্যাত্মা।'

বাহ্ বেশ সুন্দর ব্যাখ্যা।

আমি দাদাদের কাছে জেনেছি যখন ইরান ও তুরানে কিয়ানি প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখন তুরানীদের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। অনেকদিন পর্যন্ত তুর্কীরা শাসন ক্ষমতা ও অর্থবিত্ত থেকে বঞ্চিত থাকে। তবে একটা দারুণ কথা কি জানেন ওস্তাদজী, তুর্কীরা কিন্তু কখনো তলোয়ার হাত ছাড়া করেনি।

তলোয়ার তো শৌর্য-বীর্যের প্রতীক। রজব জং মাথা নাড়িয়ে সায় দেন।

প্রাচীনকাল থেকেই তুর্কীদের মধ্যে একটি রীতি চালু ছিল। যেমন পিতা যে সম্পত্তি রেখে যেতেন তার থেকে পুত্র তলোয়ার ছাড়া অন্যকিছু পেতো না। পুরো সম্পত্তি এবং ঘরবাড়ি সব মেয়েরা পেতো।

বাহবা, তাই বলো। রজব জং আবদুল্লাহর কাহিনী শোনায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

সে জন্যই বলছিলাম আমার ছেলে তো পিতার তলোয়ার পাবে। তলোয়ার দিয়ে জয় করবে হিন্দুস্থান।

আবার ধ্বনিত হয় আবদুল্লাহর ঘর ফাটানো হাসি। হাসে রজব জংও। তলোয়ারের গল্পে সে নিজেও খুব উৎফুল্ল বোধ করে বলে, তারপর কী হলো?

ইতিহাস তো অনেক লম্বা ওস্তাদজী। দীর্ঘ সময় পরে ইসলামের যুগে ওই তলোয়ারের বদৌলতে তুর্কীদের ভাগ্য আবার ফেরে। সলজুকী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কয়েকশ বছর ধরে তারা ইরান, তুরান, শাস ও রোম, এক কথায় কুচক এশিয়া শাসন করে। এক যুগ পরে সলজুকী শাসনের শেষ হলে সেই বংশের সন্তানেরা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এদের মধ্যে ছিলেন তুরসম খাঁ, ধনী পুত্রদের একজন। তিনি সমরকন্দে বাস করতে থাকেন। এই তুরসম খাঁয়ের সন্তানদের একজন ছিলেন আমার দাদার বাবা। তিনি সমরকন্দ থেকে হিন্দুস্তানে আসেন। তুর্কীস্তানের এলাকার প্রধান শহর ছিল সমরকন্দ। এলাকাটি ছিল তুর্কীস্তানের জৈহুন নদীর ওপারে। একটি বড় কাফেলা সমরকন্দ থেকে হিন্দুস্তানে এমনভাবে আসতে থাকে যে তখন যে কেউ মনে করতে পারবে

একটি নদী বুঝি নিচের দিকে বয়ে যাচ্ছে।

বাহ্, তুমি দেখছি কবির মতো কথা বলছ আবদুল্লাহ। আমার তো মনে হয় তোমার ছেলে কবিও হতে পারে।

কবি। আবদুল্লাহর ভুরু কুঁচকে যায়।

রজব জং সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলেন, হ্যাঁ আবদুল্লাহ কবি, কবি। কবিই তামাম দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ধন। কবিই তো পারে মানুষের হৃদয়ে ঢুকতে।

ওস্তাদজী আমি সেই জন্য আপনাকে শ্রদ্ধা করি। আপনি প্রতিদিন যমুনা নদীর পাড়ে হাঁটতে যান। আপনাকে দেখতে পাই তাজমহলের সামনে বসে থাকতে। আপনাকে দেখতে পাই আগ্রার সাধারণ মানুষের সঙ্গে গল্প করতে। আপনিই তো আগ্রার যোগ্য বাসিন্দা। তবে আমার ছেলে কবি হবে কিনা কে জানে।

হতেও তো পারে। আল্লাহ মেহেরবান।

হ্যাঁ, হতেও পারে। আবদুল্লাহও একই ভঙ্গিতে বলে। তার সন্তানের জন্মের পরে আগ্রার একজন বয়সী কবির এমন উচ্ছ্বাস তাকে অভিভূত করে। আবদুল্লাহর মনে হয় রজব জংয়ের চেহারায় আলোর আভা। যেন আকাশের একটি তারা নেমে এসেছে তার কপালে। সেখান থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আগ্রা। একমাত্র খোদাতালাই তো এমন আভায় ভরিয়ে দিতে পারে মানুষের জীবন। সত্যি কি তার ছেলে এমন গৌরবের অধিকারী হবে? আবদুল্লাহ দ্বিধায়-দ্বন্দ্বে শিহরিত হয়। তারপর অন্যমনস্ক হয়ে বলে, আমার বাবার ভাষা ছিল তুর্কী। তিনি হিন্দুস্তানের ভাষা বুঝতে পারতেন না। তবে আমার বাবা খুব বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন। কাজেও পারদর্শী ছিলেন। সে যুগে শাহ আলমের দরবারের জুলফিকারদৌলা মীর্জা নজক খাঁয়ের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। প্রতিপত্তি দেখাতেও কম যেত না। তিনি আমার বাবাকে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি দিয়েছিলেন। পরে সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত করেন। বাবাকে পহাসুর পরগনাটিও দিয়েছিলেন। আমি বড় হলে লক্ষ্ণৌ যাই। সেখানে আমি নবাব আসাফ্‌দ্দৌলার কাছে চাকরি পাই। কয়েক মাস পরে আমাকে ওখান থেকে হায়দরাবাদে পাঠানো হয়। ওখানে আমি তিনশ ঘোড়ার অধিনায়কের পদে চাকরি করি। বেশ ছিলাম। টগবগে ঘোড়াগুলো আমাকে যে কেমন করে দিত বলতে পারবো না। ওগুলোর কপালে ছিল রাজটিকা। ওদের ক্ষুরে ছিল সঙ্গীতের ধ্বনি। ওস্তাদজী ওই প্রাণীগুলো আমাকে চিত্তের স্বাধীনতা দিতো। কল্পনার গতি দিত। আমার ফৌজী জীবনের যে সময় আমি ওখানে কাটিয়েছিলাম আমার মুগ্ধতার শেষ ছিল না। এ জন্য আমি খোদাতালার কাছে শুকরিয়া জানাই। তিনি আমাকে বেঁচে

থাকার বৈচিত্র্যের স্বাদ দিয়েছিলেন। ওস্তাদজী ঘোড়া যে মানুষকে অন্যরকম করে দিতে পারে আমি তখন তা বুঝেছিলাম।

সেই চাকরি ছেড়ে চলে এলে যে?

ষড়যন্ত্র। ফৌজী জীবনের ষড়যন্ত্র খুব কঠিন ওস্তাদজী। কেউ যদি আর একজনকে ডিঙিয়ে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হতে চায় তাহলে সেসব কলহ করে টিকে থাকা কঠিন হয়। আমিও সেই রকম কলহে টিকতে পারিনি। চাকরি হারিয়ে আগ্রায় চলে যাই আসি।

তোমার শ্বশুরও তো বেশ জাঁদরেল ফৌজী অফিসার। আমি অবশ্য তাকে অনেক আগে থেকে চিনি। তোমার ব্যাপারে তিনি তো কিছু করতে পারতেন।

আবদুল্লাহ মাথা নাড়ে। এর দ্বারা শ্বশুর সম্পর্কে তার মনোভাবের কিছুই বোঝা যায় না। বলে, আমি এখন আলোয়ারে ভালোই আছি। রাজা বখতার সিং আমাকে আমার মনমতো চাকরি দেন নি। তবে আমি মনে করি একদিন আমার এই অবস্থা কেটে যাবে। আমি উঁচু জায়গায় উঠতে পারব। শ্বশুরের সাহায্য দরকার হবে না। আপনারও কি তেমন মনে হয় না যে মানুষই তার চেষ্টায় নিজের জায়গা তৈরি করতে পারে? অন্যের সাহায্যের খুব একটা দরকার হয় না?

হ্যাঁ, তা তো ঠিকই। নিজের চেষ্টাই প্রথম কাজ। আমাদের নবীজী ভিক্ষুকের হাতে কুঠার তুলে দিয়েছিলেন।

আমার বিশ্বাস আমি ভবিষ্যতে বড় একজন ফৌজী অফিসার হবো। যদি আল্লাহতালা আমার ভাগ্যে তেমনটি লিখে থাকেন। আমার জন্য দোয়া করবেন ওস্তাদজী।

আল্লাহ তোমার সহায় হোন আবদুল্লাহ। তুমি আলোয়ারে কবে ফিরছ?

সাতদিন পরে যাব। আমার ছেলেকে আমি এখনো ঠিকমতো কোলে নিতে পারি নি। ওকে কোলে নিয়ে, বুকে জড়িয়ে ধরে, কপালে চুমু দিয়ে তবেই যাব। ছেলের গায়ের উষ্ণতা কী সেটাই তো বুঝি নি ওস্তাদজী।

মাশআল্লাহ। তোমার ছেলের জন্যও দোয়া করি। তোমার ভাই নসরুল্লাহ কেমন আছে?

আপনাদের দোয়ায় ভালোই আছে ওস্তাদজী।

আজ তাহলে আসি। তোমার শ্বশুরকে আমার সালাম দিও। বড় ভালো লাগলো তোমার কথা শুনে। এটাও আল্লাহর মেহেরবানি, যে সময়টা তোমার সঙ্গে কাটালাম তা আনন্দে ভরে উঠেছিল। বিদায়।

AMARBOI.COM

বিদায় ওস্তাদজী। আপনি যে একটি চমৎকার মুশায়রা উপহার দিয়েছেন সে জন্য আপনাকে শুকরিয়া।

দিনে দিনে বড় হয় ছোট শিশু।

রজব জংয়ের প্রবল আগ্রহ শিশুটিকে নিয়ে। শিশুটিকে দেখার ইচ্ছা হয়— ওর হাসি দেখতে ইচ্ছে হয়। মসৃণ ত্বকে তেল মাখিয়ে ত্বক উজ্জ্বল হয়ে উঠলে তার মনে হবে এই বুঝি জীবনের অপূর্ব সময়। এই অপূর্ব সময় তার জীবনে হয়েছিল। কিন্তু কোনো পুত্র সন্তান নেই। হঠাৎ করে দুঃখ তাঁকে প্লাবিত করে। পরক্ষণে সেটা আবার কাটিয়ে ওঠেন। নিজেকেই বলেন, অনেক হয়েছে। যে বয়সে পৌঁছুছে সে বয়সের প্রান্তে দাঁড়িয়ে এই দুঃখ করা উচিৎ নয়। বরং জন্ম নেয়া শিশুটির কথা ভেবে সময়কে ভরে তোলাই উচিত। বিন্দাকে নতুন ঘাঘরা কিনে দিয়ে তাকে লাগানো হয়েছে বান্ধবীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করে বাচ্চাটির খোঁজখবর করার জন্যে। কাজটি বিন্দা ভালোই করছে। যখন এসে বাচ্চাটিকে নিয়ে নানা কথা বলে তখন রজব জং হাঁ করে শোনেন।

আজ ও দুই ঝিনুক দুধ ফেলে দিয়েছে। গিলেনি। আমার বান্ধবী তো খুব মন খারাপ করল। বললাম, দুই ঝিনুক দুধ ফেলে দিয়েছে তো কী হয়েছে, যেটুকু খেয়েছে তাতেই ওর পেট ভরে গেছে। তোমার ছেলে, মাশআল্লাহ বেশ সুন্দর হয়ে বড় হচ্ছে। দেখবে তোমার ছেলের জন্য বিবি পছন্দ করতে গিয়ে তোমার মাথা গরম হয়ে যাবে। এত মেয়ের বাবা আসবে যে তুমি ভাবতে পারবে না কাকে ছেড়ে কাকে পছন্দ করবে। আমার কথা শুনলে আমার বান্ধবী খুব মজা পায়। আমি এত সুন্দর ছেলে আগ্রায় দেখিনি। জোয়ান বয়সে ও খুবসুরুত আদমি হবে।

এমন নানা কথা বিন্দার কাছ থেকে শোনা হয় বলে দিনের অনেকটা সময় বিন্দার সঙ্গে কাটে। বিন্দা বলেও সুন্দর করে। বাচ্চাটির হাত-পা নাড়া, হাসি-কান্না, দুধ-পানি খাওয়া, ঘুমিয়ে থাকা ইত্যাদি নানা কিছুর বর্ণনা মনোযোগ দিয়ে শোনেন রজব জং। তবে বাড়ির চার নারী বুঝতে পারে না যে অন্যের সন্তান নিয়ে তাদের স্বামীর এত আগ্রহ কেন? রহস্যটা কী? আগ্রায় কত মানুষের সন্তান জন্মায়, নিজেদের আত্মীয়-পরিজনের কত সন্তান জন্মায় কই তাদের নিয়ে তো রজব জংয়ের কোনো মাথাব্যথা নেই, তাহলে এখানে কেন? একদিন সকালে নাস্তা খাওয়ার সময় জোহরা জিজ্ঞেস করে, পরের ছেলেকে নিয়ে আপনার রহস্য কী?

রজব জং মৃদু হেসে বলেন, যমুনা নদী।

যমুনা নদী? নদীর সঙ্গে রহস্যের কী সম্পর্ক?

নদীই তো বলেছিল, আজ শিশুটির জন্ম হবে।

আপনার মাথা খারাপ হয়েছে। নদী কি কথা বলে? এমন আজব কথা কে বিশ্বাস করবে?

কী বললে?

কথাতো ঠিকই বলছি। নদীর কথা বলে আপনি আমাদের ধোঁকা দিচ্ছেন। আমাদের আত্মীয়-স্বজনেরা এমন কথা শুনে হাসবে। আপনি তো বাচ্চার মাকে কোনো দিন দেখেন নি যে আপনার কোনো টান তৈরি হয়েছে।

কী বললে?

যা বলেছি তা আপনি সবই বুঝতে পারছেন। বলছি, বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

বাড়াবাড়ি? বাড়াবাড়ির তোমরা কী বোঝ? মূর্খ মেয়েলোকের কথাই এমন হয়।

আপনি আমাদের সঙ্গে এভাবে কথা বলবেন না। আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। বিন্দা পরের বাড়ি গিয়ে বাচ্চা নিয়ে হ্যাংলামি করে সেটাও আমাদের পছন্দ হচ্ছে না।

তোমাদের পছন্দ-অপছন্দের ধার তো আমি ধারি না। জোহরা বিবি তোমাদের বাড়াবাড়ি করার সাহস হলো কেন?

আমরা মোটেও বাড়াবাড়ি করছি না।

করছ। চিৎকার করে ওঠেন রজব জং। নাস্তার প্লেট-বাটি-গ্লাস উল্টে ফেলে দিয়ে চলে যান। জোহরা কাজের লোকদের বলে, এগুলো পরিষ্কার কর।

একটু পরে রজব জং বাইরে চলে যান। তখন প্রথম প্রশ্নটি করে আয়শা।

কী হয়েছে আপা?

কার ঘরে কোন সন্তান হলো তাকে নিয়ে আমাদের স্বামীর এত খোঁজখবর কেন? বিন্দাই বা এত যাওয়া আসা করবে কেন? আমাদের কি মানইজ্জত নেই।

বিন্দাও সায় দেয় একই ভঙ্গিতে। বলে, নিজের কোল খালি। সে হিসেব কে রাখে। বান্ধবীর বাচ্চার জন্য এত যাওয়া আসা আর সহ্য হয় না।

একমাত্র বুশরাই কোনো কথা বলে না। স্বামীর বিরুদ্ধে তিনজনের এমন ক্ষোভ প্রকাশ দেখে ওর ভালোই লাগে। ও সবার ছোট। ওর বঞ্চনা সবচেয়ে বেশি এই পরিবারে। বুড়ো স্বামীর কাছে ওর যৌবনের যতই মূল্য থাক ওর কাছে তো স্বামীর শরীর মূল্যহীন। ওর কোনো আনন্দ নেই। সুতরাং যার সম্পর্কে কথা হচ্ছে তাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার ওর নেই। ও অবসন্ন বোধ করে। হাই তোলে। আলোচনায় ওর আগ্রহ নেই দেখে বিন্দা ওকে খোঁচা

AMARBOI.COM

দিয়ে বলে, তুমি কিছু বলছো না যে?

আমার বলার কিছু নাই তাই বলছি না। তোমাদের আছে তোমরা বলো।

ও বাবা, তুমি দেখছি বুড়ার দিকে ভিড়েছ।

বুশরা ঠোঁট উল্টায়। বলে, আমি তোমাদের মতো নিমকহারাম না। বুড়ার রস তোমরা খেয়েছো, আবার কথাও বলছো। আমি তো কিছু পাই নি। কথা বলে আয়ু কমাতে চাই না।

বাকি তিনজন হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। ওদের সবার ছোট বুশরা। যৌবন টগবগ করছে। বুড়ার হাত ধরতে ওর ঘেন্না তো হবেই। বুড়াটা ওর প্রতি সুবিচার করে নি। যে অন্যের প্রতি সুবিচার করে না সে কি কবি হতে পারে? প্রথমে বিষয়টি জোহরা ভাবে। তারপরে আয়শাও একই ভাবনা ভাবে এবং সবশেষে বিন্দাও। তখন ও সবার দিকে তাকিয়ে বলে, আমি আর আমার বান্ধবীর বাড়িতে যাব না। আমার কি দায় পড়েছে যে পরের ছেলের খোঁজখবর করার?

জোহরা নরম-সরম মহিলা। মৃদু হেসে বলে, দায় তো তোমার পড়ে নি। দায় পড়েছে তোমার স্বামীর। তুমি হুকুম পালন করছ। পালন না করে পারছ না।

স্বামীর দায় আমার ঘাড়ে চাপবে কেন? আমি আর পারব না।

পারবে। আয়শা ব্যঙ্গের স্বরে বলে, আর একটা ঘাঘরা পেলে ঠিকই পারবে। কি পারবে না? ঘাঘরা পরে ফুর্তিও তো কম করো নি।

বিন্দা খানিকটা বিব্রত হয়ে চুপ করে থাকে।

কথা শুনে বুশরা হি-হি করে হাসে। হাসির শব্দ একটু জোরেই হয়। তারপর নিজে নিজেই বলে, ভাগ্যিস বুড়াটা বাড়িতে নেই। থাকলে এমন করে হাসতে পারতাম না। আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

জোহরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, এসব কথা ভেবে আমাদের কাজ নেই। আমরা তো স্বাধীন মেয়েমানুষ না।

আয়শা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, মেয়েমানুষের আবার স্বাধীনতা কি? ওরা যা বলবে সে হুকুম পালন করতে হবে। আমরা ক্রীতদাসী। আমাদের বাড়ির চাকরানিগুলো আমাদের কাছে যেমন আমরাও স্বামীদের কাছে তেমন।

আবার হি-হি করে হাসে বুশরা। ওর সঙ্গে হাসে অন্যরাও। কেউ জানে না ও কেন হাসছে। আয়শা বলে, এই মেয়েটা একটা পাগলি। এই বিয়েটা ওর মাথা এলোমেলো করে দিয়েছে। আহা, বেচারা! বুঝতে পারি কত কষ্ট করে ও বেঁচে আছে।

ঠিকই বলেছেন, পাগলি ছিলাম না। এই বাড়িতে এসে পাগলি হয়েছি। আমি একদিন আরও বড় পাগলি হয়ে যাব। তখন আপনারা আমাকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখবেন। আগ্রার লোকেরা জানবে কবির বউ পাগলি হয়ে গেছে।

আহ্ থাম। আয়েশা ধমক দেয়। বুশরা আর কথা বলে না। ওর চোখ ছলছল করে। ও কাঁদতে কাঁদতে নিজের ঘরে চলে যায়। বাকিরা নির্বাক বসে থাকে। বুশরার কান্নায় ওদের মনে হয় ওদের বুকের ভেতরে একটি করে বুশরা আছে। তবে ওরা ওর মতো যেমন হাসতে পারে না, তেমন কাঁদতেও পারে না। ওদের বুকের ভেতরে পাথরের স্তর পড়া শুরু হয়েছে। একদিন ওদের সুখ-দুঃখ বোধ বলে আর কিছু থাকবে না।

আগ্রায় আর একটি অনুষ্ঠানের জমজমাট আয়োজন শুরু হয়। নবাব ফখরুদ্দৌলা আহম্মদ খাঁয়ের বোনের বিয়ে। বাড়ির সামনে বিশাল সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। গানবাজনা চলছে। রাতদিন সানাই বাজছে। নবাবের বোনের বিয়ে হচ্ছে আবদুল্লার ভাই নসরুল্লা বেগ খাঁয়ের সঙ্গে। রজব জংয়ের বাড়িতে দাওয়াতপত্র নিয়ে আসে আবদুল্লাহ।

ওস্তাদজী আমার ভাইয়ের বিয়ে। নবাবের বোনের সঙ্গে।

রজব জং মৃদু হেসে বলে, এখন তো এটা শহরের গল্প। লোকে দেখা হলেই এই একটা কথাই বলে।

শীত গিয়ে বসন্ত এসেছে ওস্তাদজী। আমার ভাইয়ের জীবনে বসন্তের ফুল ফুটতে যাচ্ছে। আপনি ওকে দোয়া করবেন।

রজব জং অভিভূত কণ্ঠে বলেন, আবদুল্লাহ তুমি আসলেই একজন কবি। তোমার বুকের ভেতরে কবিতার আগুন আছে। তোমার ছেলেও কবিতার আগুন নিয়ে বড় হবে। দেখো আমার কথা ফলবে।

আপনি বিয়ের অনুষ্ঠানে আসবেন। নবাব প্রচুর খানাপিনার আয়োজন করেছেন। অনেক আনন্দ হবে। রাতভর গানবাজনা হবে।

আমি আসব আবদুল্লাহ।

আপনার বিবিদের আনবেন। আমার আব্বাজান মেহমান আনা নেয়ার জন্য শহরের সব টাঙ্গা ভাড়া করেছেন। কারো কোনো অসুবিধা হবে না।

আমরা তোমার দাওয়াত গ্রহণ করছি আবদুল্লাহ। বিয়ে বাড়িতে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।

শুকরিয়া।

AMARBOI.COM

আবদুল্লাহ চলে গেলে রজব জং বিবিদের ডেকে দাওয়াতের কথা বলেন। সবার মুখ থমথমে। নতুন কাপড় না দিলে কেউই দাওয়াত রক্ষা করতে যাবে না, এমন মনোভাব নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। বিষয়টি বুঝে রজব জং নিজেই বলে, আমি সুফিহানকে খবর দিয়ে দিচ্ছি। ও এসে তোমাদের পোশাক ঠিক করে দেবে। তবে তোমরা তো জানো আমার সর্বোচ্চ খরচের হিসাব সুফিহানের কাছে আছে। কেউ যদি তার বেশি দামের কাপড় চাও তাহলে তার পোশাক বানাবে না সুফিহান। এসব নতুন করে বলার কিছু নাই। ঠিক হ্যায়?

হ্যাঁ, ঠিক আছে। আপনার হিসেবের মাত্রা আমাদের মনে আছে। আমরা ভুলি না।

বুশরা বলে, আপনার জন্য নতুন পোশাক বানাবেন না?

না। আমি রমণী নই যে অনুষ্ঠান দেখলেই নতুন পোশাকের কথা ভাবব। এটা তারাই ভাবে যাদের মধ্যে জ্ঞানের অভাব আছে। যারা কবিতা বোঝে না।

বুশরা স্বামীর কথা উপেক্ষা করে আবারও বলে, একটা নতুন পোশাক পরলে আপনাকেও দুলহার মতো লাগতো।

খামোশ। রজব জং ধমক দেয়। আজ রাতে তুমি আমার ঘরে থাকবে। তোমার শাস্তি আছে।

বুশরা মুখে ওড়না চাপা দেয়। ওর ভীষণ হাসি পাচ্ছে। ও নিজেকে সামলাতে পারছে না। ও ছুটে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে।

রজব জং জোহরার দিকে আঙুল তুলে বলে, আমি সন্ধ্যা হলেই রাতের খাবার চাই।

জোহরা ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই কাজের লোকদের ডেকে দস্তরখানা বিছাতে বলে। শুরু হয় খাবারের আয়োজন। এত প্লেট-গ্লাস-বাটি-পিরিচ সাজাতে হয়, আবার গোছাতে হয়— শুধু একজন মানুষের জন্য। জোহরার বুক ভেঙে দীর্ঘশ্বাস আসে। তার দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। দুজনেই দিল্লিতে থাকে। আয়শার তিন মেয়ে হয়েছিল, দুটো বাঁচেনি। যেটি বেঁচে আছে সেটি স্বামীর সংসারে আগ্রাতেই থাকে। খুব ভালো নেই মেয়েটি। সংসারে নানা অশান্তির মধ্যে দিন কাটায় তার মেয়ে। আয়শার অনেক দুঃখ। স্বামীর কাছ থেকে মেয়েটির জন্য তেমন কিছু টাকা পয়সা আদায় করতে পারে না। আসলে লোকটি নিজেকে ছাড়া অন্যের কিছু বুঝতে চায় না। জোহরা নিজেও বোঝে যে এই সংসারে তারও কোনো আনন্দ নেই। দিনগুলো ধোঁয়ায় ভরা— কাঠকয়লার চুলোয় রাঁধতে দম আটকে আসে। তারপরও তাকে রাঁধতে

হবেই। প্রথম বিবির রান্না ছাড়া কাবাব রুটি মুখে ওঠে না রজব জংয়ের। অন্য কেউ রাঁধলে তিনি ঠিকই টের পান।

সন্ধ্যায় খেয়েদেয়ে খুশি হয়ে যান রজব জং। জোহরার দিকে তাকিয়ে বলেন, বহুত আচ্ছা। জোহরার মুখে কথা ফোটে না। মনে মনে আল্লাহকে ডাকে। হায় আল্লাহ, একটা মানুষকে খুশি করার জন্য কতই না খাটনি। আজ ওকে কাচ্চি বিরিয়ানি রাঁধতে হয়েছে। কালকে গোশতের শুরুয়া আর মোগলাই পরোটা করতে হবে। এভাবে প্রতি বেলার খাওয়ার হুকুম দিয়ে দেন কবি রজব জং। মানুষটি কী লেখে? যার বুকের ভেতর এত ফাঁকা সেখান থেকে মালমসলা বের হয় কী করে? রাতে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে বুক ভেঙে কান্না আসে। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে জোহরা।

পরদিন সকালে যমুনা নদীর ধারে হাঁটতে গেলে রজব জংয়ের মনে হয় আজও নদীর স্রোতে বাড়তি শব্দ আছে। সে শব্দে কান্না আছে— গভীর দুঃখ আছে। রজব জং দাঁড়িয়ে পড়েন। ভাবেন, দুঃখ কোথায়? সামনের দিনে তো আগ্রায় উৎসব। বাদ্যযন্ত্রের শব্দে মানুষ আনন্দ-ফুর্তি করছে। কবুতর ওড়াচ্ছে। রঙিন কাগজে সাজানো হয়েছে বাড়িঘর। রঙ-বেরঙের ঘুড়িতে ছেয়ে যাচ্ছে আকাশ। মাঞ্জা সুতায় কেটে যাচ্ছে কোনো কোনো ঘুড়ি। এত কিছুর মধ্যে দুঃখ কেন? রজব জং জোরে জোরে হাঁটেন। বসন্তের বাতাস ছুঁয়ে যায় শরীর। শীত ফুরোলে হাঁটার আনন্দ দ্বিগুণ হয়। একগাদা কাপড় গায়ে জড়াতে হয় না। কিন্তু আজকে বসন্তের আমেজ নেই রজব জংয়ের মনে। নদীর কলধ্বনিতে ক্রন্দনের শব্দ তাঁকে কাবু করে ফেলে। মন খারাপ করে ভাবেন, বাড়িতে ফিরে যাবেন।

ফেরার পথে দেখা হয় টাঙ্গাওয়ালার সঙ্গে।

ওস্তাদজী আজ আপনার মন খারাপ মনে হচ্ছে?

তবীয়ত ঠিক নেই রে।

টাঙ্গায় ওঠেন। বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

সেই ভালো। আজ মনে হচ্ছে হাঁটতেও ভালো লাগছে না।

রজব জং টাঙ্গায় ওঠেন। হাঁটতে বেরিয়ে টাঙ্গায় বাড়ি ফেরা তাঁর জীবনে কখনো হয় নি। বুকের ভেতর থেকে দুশ্চিন্তা বের করতে পারেন না রজব জং। অস্বস্তি নিয়ে গোসল করেন। বিন্দা বা বুশরা কারো দিকে তাকান না। নাস্তাটাও ঠিক মতো খাওয়া হয় না। কেবলই মনে হয় কিছু একটা ঘটবে।

নসরুল্লাহ বেগ খাঁয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে আবদুল্লাহর কোলে দেখতে পান তার ছেলেকে।

আবদুল্লাহ রজব জংকে দেখে বলেন, এই যে আমার মির্জা নওশা।

তোমার পুত্রকে আমার কোলে একটু দাও। দাদুভাই এসো আমার কোলে।

রজব জং দু'হাত বাড়ালে শিশুটি ঝাঁপিয়ে তার কোলে আসে। আবদুল্লাহ হাসতে হাসতে বলেন, আপনাকে আমার ছেলের খুব পছন্দ হয়েছে।

ওর বড় হওয়াটা আমার দেখা হবে না। অতদিন কি আর বাঁচব! কে জানে!

আপনি যদি একশ' বছর বেঁচে থাকেন তাহলে ওর বড় হওয়া দেখতে পাবেন। হায়াত মউত আল্লার হাতে। আমিই বা ওর কতটুকু দেখতে পাবো, কে জানে! আমার খুব ইচ্ছা ছেলে আমার একজন জাঁদরেল ফৌজি অফিসার হবে।

রজব মৃদু হেসে বলেন, যাই। মেহমানদের সঙ্গে কথা বলি। বড় ভালো লাগছে শহরের অভিজাতদের মাঝে এসে। বেশ জাঁকজমক অনুষ্ঠান হচ্ছে।

আবদুল্লাহর কোলে ফিরে যায় মির্জা নওশা। বাড়ি ফিরে বিন্দা হাসতে হাসতে বলে, আমার বান্ধবী আবার গর্ভবতী হয়েছে।

আবার সন্তান! রজব জং বিন্দার চোখে চোখ ফেলেন।

হবে না কেন? বড়টির তো এক বছরের বেশি বয়স হলো। তাছাড়া দেখতে দেখতে দিন চলে যায়। বাচ্চাকাচ্চার কি বড় হতে সময় লাগে নাকি।

নতুন ঘাঘরায় চমক তুলে বিন্দা ঘরে যায়। রজব জং বিমোহিত হয়ে ভাবেন বিন্দা একটা দারুণ যমুনা নদী। বর্ষার ভরা তরঙ্গে কলধ্বনির উচ্ছ্বাস। কিন্তু আজ বিন্দা নয়, আজ বুশরা। ওর রাগী মেজাজ শরীরকে তীব্র মাদকতায় ভরিয়ে দেয়। সে আনন্দ উপভোগ বিরল ভাগ্য। রজব জং দুই নারীকে নিয়ে কবিতার পঙ্‌ক্তি আওড়ান। যৌবন এবং ক্রোধ তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তি হয়।

রজব জং ঘরে পায়চারি করেন। বিছানায় বুশরা আসে নি। বলে দিয়েছে আজ ও পারবে না। ওর মাসিক হয়েছে। খবরটা দিয়ে গেছে আয়শা। বুশরাকে পোষ মানানো কঠিন। রজব জং জানেন। তখন তিনি আয়শার দরজায় মৃদু শব্দ করেন। দরজা খুললে হালকা সুগন্ধী এসে নাকে লাগে রজব জংয়ের। খুবই স্নিগ্ধ লাগছে প্রায় প্রৌঢ় আয়শাকে। হালকা নীল রঙের দোপাট্টা মাথার ওপরে। আয়শা বিস্ময়ে চোখ তুলে বলে, আমাকে কিছু বলবেন?

আমার ঘরে এসো।

আমার গর্ভবতী হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

আমি তোমাকে বিছানায় চাই। আগ্রায় অনেক নারী আজ রাতে গর্ভবতী হবে তাতে আমার কিছু যায় আসে না। এসো।

হুকুম দিয়ে নিজের ঘরে যান রজব জং।

মধ্যরাত। নিঃসাড় ঘুমুচ্ছে আয়শা। মেঝেতে গড়াচ্ছে নীল ওড়না। ঘুম

আসে না রজব জংয়ের। মধ্যরাতে জীবনের খোঁজখবর করতে গিয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজের জন্য রজব জংয়ের ভীষণ মায়া হয়। ভাবেন, যমুনার প্রবাহ থেকে তিনি নানা অর্থ বুঝে নেন। অর্থটা নিজের ভেতরে তৈরি করেন। এভাবে তাঁর কবিতার স্বরূপ নিজের ভেতরে সঞ্চিত হয়। নিজেকে বেশ বড় মানুষ মনে হয় তখন। কিন্তু তাঁর জীবনকে ঘিরে যে সব নারী জীবনযাপন করছে তিনি কি কোনোদিন তাদের হৃদয়ের কিংবা শরীরের কোনো শব্দ শুনেছেন? প্রবল অস্বস্তিতে রজব জং নিজের লেখার টেবিলে এসে বসেন। পাখির পালকের কলমটি দোয়াতে ডুবিয়ে কাগজের ওপর আঁকিবুঁকি টানেন। ভরে যায় কাগজের পৃষ্ঠা। সেটা আর আঁকিবুঁকি থাকে না। কালিতে কালো হয়ে ওঠে কাগজ। কালো হতে থাকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা।

সেদিকে তাকিয়ে নেশা হয় রজব জংয়ের। মনে করতে পারেন এটিও তাঁর শিল্পকর্ম। তিনি নারীর মুখ আঁকার চেষ্টা করেন, পারেন না। পাখি আঁকতে চান, পারেন না। তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে আয়শার মুখের দিকে তাকান। আজই প্রথম অনুভব করেন ভীষণ দুঃখী চেহারা। দুঃখ যমুনা নদীর মতো বইছে আয়শার মুখে। পরক্ষণে মনে হয় শুধু মুখে নয়, দুঃখ আছে শরীর জুড়ে। আয়শার পুরো শরীর যে এতক্লান্ত, এত সুখহীন তা কোনোদিন মনে হয় নি তাঁর। তাঁর খাতার সাদা পৃষ্ঠায় আঁকা কালো ছোপ তো আয়শার শরীর। এমনই কালো, নিকষ কালো। তবে তাঁর কেন মনে হলো তিনি কোনো নারীর মুখ আঁকতে পারছেন না। চারজন নারী দুঃখের কালো নদীতে ডুবে শিল্পের ছবি হয়ে আছে তাঁর জীবনে। তিনি তো সেখান থেকে মুক্তোই কুড়িয়েছেন সারা জীবন। এই প্রথম নিজেকে খুব স্বার্থপর মনে হয়।

বাকি রাতটুকু আরাম কেদারায় শুয়ে কাটিয়ে দেন। প্রবল অনুতাপে ভরে থাকে বুক। এই অনুতাপ সিক্ত শরীরটা তিনি আর বিছানায় নিতে চান না। যদি আয়শার শরীরে ছোঁয়া লাগে তবে তা হবে ভীষণ অন্যায়। এই অন্যায় কাজটুকু আজ রাতে তিনি নাই বা করলেন।

কবি রজব হুসেন জং এই প্রথম নিজের জন্য মমতা অনুভব করেন।

একদিন বিকেল বেলা আবদুল্লাহর সঙ্গে দেখা হয় রজব জংয়ের। আবদুল্লাহ মির্জা নওশাকে নিয়ে যমুনার ধারে ঘুরতে এসেছিলেন। রজব জংকে দেখে এগিয়ে আসেন।

কেমন আছেন ওস্তাদজী? তবিয়ত ঠিক আছে তো?

একদম ঠিক নেই। রাতে মাঝে মাঝে জ্বর হয়। বেশ দুর্বল হয়ে গেছি।

তুমি কেমন আছ আবদুল্লাহ?

আমার তবিয়ত ঠিক আছে। কিন্তু মনে শান্তি নেই।

কেন, মন খারাপ কেন? আমি তো শুনেছি তুমি আর একটি পুত্র সন্তানের পিতা হয়েছো।

মুখে হাসি ছড়িয়ে আবদুল্লাহ বলে, হ্যাঁ আমার আর একটি পুত্র হয়েছে। মির্জা নওশার বয়স তো তিন বছরের বেশি হয়ে গেল। ওর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি চাই আমার ছেলে ফারসি ভাষায় শিক্ষা লাভ করবে।

ফারসি ভাষায় কেন? উর্দুই তো শিক্ষার যথার্থ ভাষা।

ফারসি ভাষায় জ্ঞান লাভ করলে আমার ছেলে একজন ভালো ফৌজি অফিসার হবে।

চুপ করে থাকেন রজব জং। বাচ্চাটি এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। দৌড়ে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে বাবার কাছে। বলছে, ওই পাখিটা ধরে দাও। বাড়িতে নিয়ে ওটা আমি পুষব।

পাখি না আব্বা, তোমাকে আমি ঘোড়ার বাচ্চা কিনে দেব। তুমি ওটার সঙ্গে খেলবে।

রজব জং বুঝতে পারেন আবদুল্লাহ মনেপ্রাণে ছেলেকে একজন সৈনিক বানাবে। তুর্কী রক্ত তার শরীরে টগবগ করে। মির্জা নওশা কি একজন সৈনিক হওয়ার জন্য তৈরি হবে? রজব জং দ্বিধায় পড়েন।

তখন শুনতে পান শিশুকণ্ঠের ধ্বনি, না আব্বা আমি ঘোড়ার বাচ্চা চাই না। আমি পাখি চাই। আমাকে পাখি ধরে দেন। ওই যে কী সুন্দর পাখি।

ও মাঠের ভেতরে দৌড়ে যায়।

রজব জং আবদুল্লাহর ঘাড়ে হাত রেখে বলে, যার এত সুন্দর ছেলে তার মন খারাপ থাকবে কেন?

ওস্তাদজী, আমি ঠিক করেছি আলোয়ারে আর বেশি দিন থাকব না।

রজব হাসিমুখে বলেন, কেন ছেলেকে আগ্রায় রেখে দূরে থাকতে ভালো লাগছে না?

না, আসলে তা নয়। আমার ছেলেরা ওদের নানার বাড়িতে খুব যত্নে আছে। আমার বিবি ছেলেদেরকে দু'চোখের আড়াল করে না। আসলে আলোয়ার থেকে চলে আসতে চাইছি অন্য কারণে। রাজা বখতাওর সিংয়ের কাছে মনমতো একটা চাকরি পাব এই আশ্বাসে সেখানে গিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে মনমতো চাকরি দেন নি। যে চাকরি করছি সেটা আমার ভালো লাগছে না।

এমন হলে তো মন খারাপ হবেই।

তাই তো ঠিক করেছি ওখান থেকে সব ঝামেলা চুকিয়ে-বুকিয়ে আসব। আগ্রা শহরে একটা কাজ করব। রুটি-রুজি আল্লাহর হাতে। ভাগ্যে যা আছে তা হবে।

আমারও তাই বিশ্বাস। ভাগ্যে যা আছে তা হবেই। আমাদের কি সাধ্য আছে খোদাতালা যা কপালে লিখেছেন তা উল্টে দেয়ার। তবে এটাও ঠিক খোশ দিলে কাজ করতে না পারলে কাজে মন বসে না।

তখন মির্জা নওশা এসে হাত ধরে টানাটানি করে বলে, আব্বা বাড়ি যাব। বাড়ি চলেন। আম্মার কাছে যাব। আমার খিদে লেগেছে।

চলো আব্বাজান।

আবদুল্লাহ ছেলেকে কোলে তুলে নেন।

যাই ওস্তাদজী।

আলোয়ায় কবে যাচ্ছ?

একদিন পরেই যাব।

ফিরে এসে আমার বাড়িতে এসো। তোমার শ্বশুর ভালো আছে?

হ্যাঁ, আব্বাজান ভালো আছে।

চলে যায় আবদুল্লাহ। রজব জং ভাবে, জীবন এমনই। সুস্থির থাকা খুব কঠিন। মনে মনে আবদুল্লাহর জন্য দোয়া করেন। খোদাতালার অসীম দয়া। আবদুল্লাহ ভালো থাকুক।

একদিন এক বাড়িতে নসরুল্লাহ বেগের সঙ্গে দেখা হয়। সে বেশ বড় চাকরি নিয়ে বহাল তবিয়তে আছে। তার বিবির বড় ভাই তাঁকে একটি সরকারি ফৌজের দলপতির দায়িত্বে নিযুক্ত করে দিয়েছে। বড়ভাইয়ের মতো নসরুল্লাহও রজব জংকে খুব মান্য করে। মুশায়রা রজব জং যেমন জমায়, অন্যরা তেমন জমাতে পারে না।

ওস্তাদজী কেমন আছেন? তবিয়ত ঠিক আছে তো?

ভালোই আছি। আবদুল্লাহ কেমন আছে? ও কি আলোয়ার থেকে চলে এসেছে?

না, রাজা বখতাওর সিং তো আমার ভাইকে আসতে দেয়নি। হঠাৎ করে সিংয়ের রাজ্যের এক ছোট জমিদার বিদ্রোহ করেছে। সেই জমিদারের বিদ্রোহ দমন করার জন্য সৈন্যদল পাঠানো হয়েছে। সেই সঙ্গে আমার ভাইকেও পাঠানো হয়েছে। অনেকদিন আমার ভাইয়ের কোনো খবর পাই না। আল্লাহ মালুম কেমন যে আছে।

AMARBOI.COM

ওর ছেলেরা ঠিক আছে তো?

হ্যাঁ, ওরা ঠিক আছে।

মির্জা নওশা কেমন আছে?

ও তো ওর নানার নয়নমণি। নানার বাড়ির আদরযত্নে দিব্যি আছে, বলেই হাসে নসরুল্লাহ। তারপর আবার বলে, আমার আব্বাজান ওদের কথা খুব ভাবেন। কিন্তু উপায় কী, ভাইয়া আগ্রায় থাকে না দেখে এখানে এনে রাখাও যায় না। সবই খোদাতালার ইচ্ছা।

রজব জং বিষণ্ন হয়ে যান। কেন, তা বুঝতে পারেন না। ভাবেন মৃত্যু নিয়ে একটি কবিতা তাঁর মাথায় এসেছে। আজ রাতেই লিখতে পারবেন। রাতে টাঙ্গায় করে বাড়ি ফেরার পথে দেখতে পান আকাশ জুড়ে পূর্ণিমার চাঁদ। জ্যোৎস্নায় ফকফক করছে প্রান্তর, নদী, শহরের রাস্তা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাড়িঘর এবং গাছগাছালি। এত সুন্দর জ্যোৎস্না দেখেও বিষণ্নতা কাটে না রজব জংয়ের। ভাবেন, মৃত্যুর কবিতাটা তাঁকে লিখতেই হবে। মৃত্যুচিন্তা কখনো তাঁকে এমন করে পেয়ে বসে নি। আজ রাত শুধু তাঁর একার। রজব জং দু'হাতে মুখ ঢাকেন। ভাবেন, পূর্ণিমার চাঁদ দেখবেন না, জ্যোৎস্না-ভাসা প্রান্তরও নয়। বুঝতে পারেন এত কিছু দেখার মধ্যে শান্তি নেই। ক্রমাগত বয়স বাড়ছে। শরীর ভাঙছে। বুশরা ভীষণ জেদি হয়ে উঠেছে। অন্যরা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। রজব জং দু'হাতে মুখ ঢেকে রাখলে টের পান চোখ পানিতে ভরে যাচ্ছে। কেন যে এমন লাগছে তার কোনো ব্যাখ্যা নিজের কাছেও নেই। এক সময় পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মোছেন।

বাড়ির দরজায় টাঙ্গা থামলে টাঙ্গাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার নাম কী বেটা?

মুখলুস বখশ।

বিবি আছে?

আছে।

বাচ্চালোগ?

ছয়টা। বড় বেটির বয়স বারো বছর। শাদী ঠিক করেছি। আপনাকে দাওয়াত দেব হুজুর। আমার বেটির শাদীর মজলিসে আসবেন। আসবেন তো হুজুর?

জরুর আসব। তুমি দাওয়াত দিও।

হুজুর আপনার বিবিদের নিয়ে আসবেন।

রজব জং মাথা নেড়ে সায় দেন। তাতে টাঙ্গাওয়ালা বুঝতে পারে না যে

তিনি বিবিদের নিয়ে আসবেন কি আসবেন না। রজব জং আচকানের পকেট থেকে টাকা বের করে ভাড়া চুকিয়ে দেন। বাড়ির দারোয়ান গেট খুলে দাঁড়িয়ে আছে। বারান্দায় জোহরার মুখোমুখি হন। জোহরা কোনো প্রসঙ্গে না গিয়ে সরাসরি বলে, দস্তরখানা তৈরি আছে।

আমি আসছি। বলতে বলতে নিজের ঘরের দিকে যান।

দরজায় দাঁড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে বলেন, আমার তবিয়ত ঠিক নেই। আজ রাতে কিছু খাব না।

বন্ধ করে দেন দরজা। জোহরা বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে ওড়নায় চোখের পানি মোছে। এই মানুষটাকে তার বোঝা হলো না। সংসারটাকেও না। মানুষটাকে একথা বললে, সঙ্গে সঙ্গে বলবে, এত কথা জানার দরকার কী।

সত্যি তো এত কথা জানার দরকার কী! জোহরা কাজের লোকদের ডেকে দস্তরখানা গুটিয়ে ফেলতে বলে। আয়শা এগিয়ে এসে বলে, খাবে না কেন?

তুমি গিয়ে জিজ্ঞেস কর।

অত দায় ঠেকে নি। শুধু রাত দুপুরে দরজা ধাক্কা দিয়ে সেবা করার জন্য ডাকলে তা সহ্য হবে না।

সহ্য তো হতেই হবে। এত বছরে কি না করে উপায় ছিল আমাদের? আমরা যা করতে বলেছে করেছি। অনুগত দাসীর মতো করেছি। আমি তো মাঝে মাঝে ভাবি আমরা কি স্ত্রী না দাসী?

চুপ করে থাকে আয়শা। দস্তরখানা উঠে গেলে জোহরা আয়শাকে বলে, চলো আমরা খেয়ে নেই। বেশি রাত করে খেলে আমার শ্বাসকষ্ট হয়। শরীরটা দিন দিন খারাপ হচ্ছে।

হেকিমের কাছ থেকে ওষুধ নিলেই তো হয়।

ভালো লাগে না।

কালই আমি হেকিমকে আনার জন্য খবর দেব।

চারজনে খেতে বসে। কখনো তাদের পছন্দমতো রান্না হয় না। রজব জংয়ের ইচ্ছে অনুযায়ী রান্না কী হবে তা ঠিক করা হয়। সবার জন্য একই রান্না হয়। বুশরা হাসতে হাসতে বলে, বুড়াটা রান্নার আগে যদি বলতো খাবে না, তাহলে আমরা নিজেদের ইচ্ছামতো রান্না করতাম।

সে সুযোগ আমরা খুবই কম পেয়েছি।

আমাদের ইচ্ছেও হয় নি।

আসলে বন্দি হয়ে থাকার কারণে আমাদের ইচ্ছেগুলো মরে গেছে।

জোহরা তাড়া দেয়। এত কথা না বলে খাওয়া শেষ কর সবাই।

AMARBOI.COM

আমি খাব না। খেতে ইচ্ছে করছে না। বুশরা উঠে দাঁড়ায়। বিন্দা ওর হাত টেনে ধরে বলে, বস। অল্প করে খাও। না খেয়ে রাত কাটালে আমাদের ইচ্ছাগুলো মুক্তি পাবে না। ওগুলোতো মরেই গেছে।

ওসব নিয়ে আমি আর ভাবি না। না খাওয়ার ইচ্ছাটাও কি বন্দি?

বিন্দা ওর প্রশ্নের ধার দিয়ে না গিয়ে বলে, বোস। তুমি বসলে আমাদের খাওয়ার ইচ্ছা জোরদার হবে।

ওসব তো অন্যের ইচ্ছায় খাওয়া।

বুশরা বিন্দার হাত ছাড়িয়ে নিজের ঘরে যায়। একটু পরে ওরা শুনতে পায় বুশরা কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার ধ্বনি ভেসে আসছে মৃদুলয়ে। প্লেটের ওপর একজনের হাত স্তব্ধ হয়ে থাকে, একজন এক লোকমা মুখে দিতে গিয়ে মাঝপথে থামিয়ে রাখে হাত, আর অন্যজন প্লেটের খাবারগুলো এলোমেলো করে পানি ঢেলে দেয়। তিনজন পরস্পরের দিকে তাকায় না। যে যার মতো উঠে যায়। কাজের লোকেরা এসে প্লেট-গ্লাস গোছাতে থাকে।

তখন ওরা শুনতে পায় তিনজনের ঘর থেকেও কান্নার শব্দ আসছে। সে শব্দ ছড়িয়ে যাচ্ছে বাড়িতে এবং গেট পেরিয়ে চলে যাচ্ছে আগ্রার রাস্তায়। শহরের উপর দিয়ে কিংবা নদীর স্রোতে। বিভিন্ন শ্রেণীর কাজের নারীরা অভিজাত শ্রেণীর নারীদের বুকফাটা আর্তনাদে সঙ্গী হয়ে যায়। ওদের অনুভব তীব্র হয়ে ওঠে এবং সকলেই প্লেট-গ্লাস-বাটি, চামচ-পিরিচ ইত্যাদি তুলে নিয়ে যেতে যেতে ভাবে আহারে, ওদের সঙ্গে আমাদের তফাতটা এই যে ওরা ধনী আর আমরা গরিব। আমাদের ঘরে রোজ রোজ রুটি-কাবাব থাকে না, ওদের ঘরে থাকে, কিন্তু কান্নার শব্দটা একই রকম। এখানে তফাত নেই। আহারে, এই একটা জায়গায় ওরা আর আমরা একই। ওরাও আমাদের মতোই কান্নাকাটি করে। বুকভাঙা কান্না।

আহারে— বলতে বলতে কাজের নারীরা চলে যায়। খাবারের ঘ্রাণে আজ ওদের ক্ষুধার উদ্রেক হয় না। বুশরার মতো সবচেয়ে ছোট কাজের মেয়ে ইসতা বলে, আজ আমি রাতে কিছু খাব না। রোজ রোজ রুটি আর ডাল খেতে আমার ভালো লাগে না। আমাদের জন্য রোজ রোজ কেন কাবাব থাকে না কিংবা কাচ্চি বিরিয়ানি, গোশতের শুরুয়া?

আহারে— ছোটটির কথা শুনে বয়সী নারীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বয়সী নারীদের আহারে ধ্বনি উড়ে যায় আগ্রা শহরের উপর দিয়ে। যমুনা তো তাজমহলের ছায়া বুকে ধারণ করে। এইসব নারীর আক্ষেপের ধ্বনি নদীর তরঙ্গে মেশে না। তবু তারা উচ্চারণ করে, আহারে। আজ বেশ রাত পর্যন্ত গল্প

করতে করতে রাতের খাবার খায় ওরা। এভাবে খাওয়া শেষ করতে ওদের বেশ ভালো লাগছে। ওরা তো অবসর উপভোগ করতে পারে না। অবসরও ঠিক মতো পায় না। একজন বলে, আজকের রাতটা খুব সুন্দর।

কেন? অন্যজনের প্রশ্ন।

এই যে গল্প করতে করতে খেতে পারছি। অন্য রাতে এমন মজা করে খাওয়া হয় না।

তাড়াতাড়ি শেষ কর। ঘুমাতে হবে না? রাত না পোহাতে আবার কাজে লাগতে হবে।

এক রাত না ঘুমালে কি হবে? আজ রাতে যে আনন্দ পেলাম তা দিয়ে ঘুমের রেশ পুরে যাবে। ঘুম লাগবে না।

হি হি করে হাসে সবাই। আবার সতর্ক থাকতে হয়, যেন শব্দ না হয়। ওড়না দিয়ে মুখ চাপতে হয়। তখন ওদের নাকে ফুলের ঘ্রাণ এসে ঢোকে। সবাই চমকে চারদিকে তাকায়। বুঝতে পারে ওদের চারদিকে ফুরফুরে বাতাস বইছে। বাতাস ওদের জন্য ফুলের গন্ধ বয়ে নিয়ে এসেছে। ওরা সবাই বুকভরা বাতাস টেনে বলে, কী সুন্দর রাত।

দুঃসংবাদ বাতাসের বেগে ধায়।

আবদুল্লাহ বেগ খাঁয়ের মৃত্যু সংবাদ মুহূর্তে ছড়িয়ে যায় আগ্রা শহরে। খবরটা শুনে রজব জং বিড়বিড় করে বলেন, মির্জা নওশা, মির্জা—। পিতা হারিয়ে ছেলেটি কীভাবে বড় হবে এই চিন্তা তাকে ব্যাকুল করে তোলে।

সকলেই জেনে যায় যে, রথতাওর সিং জমিদারের বিদ্রোহ দমন করার জন্য সৈন্য দল পাঠিয়েছিল। সেই লড়াইয়ে শত্রুর গুলিতে মৃত্যু হয় আবদুল্লাহর। খবরটা পেয়ে বিন্দা তার বান্ধবীর কাছে গিয়েছিল। ফিরে এসে বলে, আগ্রায় একজন নারী বিধবা হলো।

আরও একটু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, এই শহরের নারীরা হয় সতীনের ঘর করে, নয়তো তারা বিধবা হয়। বিন্দা শব্দ করে কেঁদে উঠলে রজব জং ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ান। বিন্দা জোরে জোরে কাঁদে শুনেও আজ তিনি ধমক দেন না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকেন। বিন্দাকে চোখ মুছতে দেখে রজব জং জিজ্ঞেস করেন, তোমার বান্ধবীর বড় ছেলেটিকে দেখেছ?

মির্জা নওশাকে? দেখেছি।

কী করছিল ও?

অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে খেলছিল। দুরন্ত ছেলে। কেউ ওকে সামলাতে পারে

না। তাছাড়া মৃত্যুর খবর বোঝার মতো বয়স তো ওর নয়। আপনি যে অন্যের ছেলেকে নিয়ে কেন এত ভাবেন তা আমি বুঝি না।

আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে ও বড় একটা কিছু হবে।

কী হবে?

একজন কবি হতে পারে।

কবি। আপনি কি নিজের ছোটবেলা ভাবছেন?

রজব জং ওর কথা উপেক্ষা করে ঘরে ঢুকে যান। তাঁর শরীর খারাপ লাগছে। বিছানায় শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জ্ঞান হারান। চার স্ত্রীর কেউ কিছু জানতে পারে না। কারণ স্বামী না ডাকলে তারা সে ঘরে ঢোকে না।

জ্ঞান ফিরলে তিনি দেখতে পান বিকেলের স্নিগ্ধ আলো ঘরে ছড়িয়ে আছে। জানালা দিয়ে ফুরফুরে বাতাস আসছে। তিনি বিছানায় উঠে বসে থাকেন। হাঁটুর ওপর মাথা রাখেন। কখনো পিছনে দু'হাত ঠেকিয়ে মাথা ঝুলিয়ে দেন। ভাবেন, ছেলেটি খুব দুরন্ত। পিতার মৃত্যু বোঝার বয়স হয় নি। হ্যাঁ, সবই ঠিক আছে। একদিন মৃত্যু বুঝবে, বেঁচে থাকা বুঝবে। কবিতার পঙ্‌ক্তিতে উজাড় করবে। নিশ্চুপ বসে থাকতে তাঁর ভালোই লাগছে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকলে আস্তে আস্তে দিনের আলো কমতে দেখেন। এই দৃশ্য তো প্রকৃতির কবিতা। রজব জং নিজেকে খুব সুখী মানুষ ভাবেন।

কয়েকদিন পরে নসরুল্লাহ বেগের সঙ্গে দেখা হয়। ভাইয়ের মৃত্যুতে প্রবলভাবে শোকাহত নসরুল্লাহ। চোখ বসে গেছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। দু'হাতে ভেজা চোখ মুছতে থাকেন।

সবই খোদাতালার ইচ্ছা নসরুল্লাহ।

নসরুল্লাহ চোখ মুছে বলেন, ভাইয়াকে রাজগড়ে কবর দেয়া হয়েছে। আমরা জিয়ারত করে এসেছি। ভাইয়ার মৃত্যুতে আমার আব্বাজান খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন।

এত বড় শোক, সামলানো কঠিন। আল্লাহ মেহেরবান। বান্দার কি সাধ্য আল্লাহর ইশারা বোঝার। বখতাওর সিং আবদুল্লাহর পরিবারের জন্য কি ব্যবস্থা করেছে?

পরিবারের ভরণপোষণের জন্য দুটি গ্রাম দিয়েছে। দুই ছেলের জন্য দৈনিক খরচের ভাতা দিয়েছে। এই ভাতা অনেক দিন ধরে চলবে।

বহুৎ আচ্ছা। শুকরিয়া। মির্জা নওশা কেমন আছে?

ওরা দুই ভাই ভালোই আছে। নওশা তো ভীষণ চঞ্চল। দুরন্ত। বেশ

বুদ্ধিমানও হয়েছে ছেলেটি। মজার মজার কথা বলে। নানা রকম প্রশ্নও করে। দেখতেও খুব সুন্দর।

বাহ, খুব ভালো।

যাই ওস্তাদজী। আপনি ওদের খোঁজ খবর রাখেন এটা আমার খুব ভালো লাগে। এখন একজন ওস্তাদজী রেখে ওর পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে হবে। আব্বাজান এসব দেখাশোনা করছেন।

সালাম দিয়ে চলে যায় নসরুল্লাহ। রজব জং যমুনা নদীর পাড়ে এসে দাঁড়ান। যেন শুনতে পান গালিবের বড় হয়ে ওঠার খবর। এখন শুধু নদীর তরঙ্গ থেকে নয়, আগ্রার চারদিক থেকে শব্দ আসছে, গালিব, গালিব। কোথায় গেলে? এদিকে এসো। যেন মা ডাকছে ছেলেকে। দুরন্ত ছেলেটিকে সামলাতে ব্যস্ত থাকে মা।

গালিব। গালিব। আবার কে ডাকছে? ছেলেটির দাদা। পিতৃহীন ছেলেটির দিকে খেয়াল রাখতে হয়। পিতার না থাকা ছেলেটিকে নানা পথে নিয়ে যেতে পারে। ছেলেটির জীবনে এটি বড় অশান্ত সময়। দাদার কাছে ছেলেটির অনেক রকম প্রশ্ন থাকে। কোনো প্রশ্ন ঠিক মতো দিতে না পারলে কিংবা প্রশ্নটি ওর মনঃপুত না হলে ও ছুটে বেরিয়ে যায়। বাগানে কিংবা রাস্তায়। বাড়ি ফিরে এসে দাদার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে, আপনাকে বাঘে খাবে দাদা। আপনি কি বাঘকে ভয় পান?

হ্যাঁ, পাই। ভীষণ ভয় পাই। বাঘের হালুম ডাক শুনলে আমার বুকের ভেতরটা শুকিয়ে যায়। তুমি কি তলোয়ার দিয়ে বাঘ মারতে পারবে?

পারব। আপনি তো আমাকে শিখিয়েছেন দাদা যে আমি তুর্কী বংশের সন্তান এবং সেই বংশের যারা নিজের জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনি বলেছেন আমি ঐবক। তুর্কীদের মধ্যে আমার শ্রেষ্ঠত্ব পূর্ণ চাঁদের মতো উজ্জ্বল।

বাহ, সাবাস। আমি তো তোমাকে শিখিয়েছি যে তুমি সমরকন্দের জমিদার সন্তান। আমি তোমাকে তোমার শ্রেষ্ঠত্বের সবটুকু গল্প বলে যাব। প্রতিদিন একটু একটু করে।

আপনি তলোয়ারের কথা বলেন দাদু।

তুর্কীদের নিয়ম অনুযায়ী ঘরবাড়িসহ সম্পত্তি পায় মেয়েরা, আর ছেলেরা পায় তলোয়ার।

ছেলেটি হেসে দাদার হাত ধরে টেনে বলে, চলেন তাজমহল দেখে আসি। ওখানে অনেক ফুল ফোটে। এত ফুল কেন ওখানে ফোটে দাদা?

ওগুলো সব ভালোবাসার ফুল।

ধুত, ভালোবাসার আবার ফুল কি? সব তো গোলাপ। আমি গোলাপ ফুল ভালোবাসি।

গালিব। গালিব।

ওর চাচা নসরুল্লাহ ওকে ডাকছে।

গালিব, ওস্তাদজী এসেছেন, পড়তে এসো।

হ্যাঁ, আমি তো পড়তে চাই চাচা। আমি আসছি।

ওস্তাদজী আমি কবিতা লেখা শিখব। আমার লেখা এক একটি রুবাঈ মানুষের হৃদয়ে গেঁথে থাকবে।

তুমি কবিতা লিখবে গালিব?

হ্যাঁ, লিখব।

তুমি একটি বীর জাতির বংশধর। তুমি সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে একটি তলোয়ার পেয়েছ।

ওই তলোয়ার আমার কাছে কলম হবে।

হি-হি, হা-হা করে হাসে গালিব।

রজব জং আকস্মিক চিন্তায় চমকে চারদিকে তাকান। ভাবেন হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছেন তিনি। কিন্তু না, যমুনা নদীর তরঙ্গে আজকে বাড়তি কোনো শব্দ নেই। যমুনার প্রবাহ স্থির। রজব জং খুশি মনে বাড়ি ফেরেন। প্রবীণ কবি বুঝে যান যে ছেলেটি 'গালিব' ছদ্মনামে কবিতা লিখবে। 'গালিব' মানে বিজয়ী। ও ঠিক বিজয়ী হবে।

শৈশব পেরিয়ে এখন দুরন্ত কৈশোরকাল তাঁর। সবচেয়ে কাছের বন্ধু বংশী। কাছাকাছি বাড়িতে দুজনে থাকেন। দাবা খেলতে খেলতে রাত হয়ে গেলেও সমস্যা নেই। একছুটে বাড়ি চলে যাওয়া যায়। আর মাতো জানেই ছেলে কোথায় আছে। লোক পাঠিয়ে বসিয়ে রাখেন বংশীদের বাড়ির দরজায়। দুই বাড়ির মাঝে আছে দুটি গলি। আর এক গলিতে থাকে বারবণিতা মাছিয়া। দু'বন্ধু প্রায়ই দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে পান আগ্রার চেনাজানা কেউ কেউ সে বাড়িতে আসছেন। সন্ধ্যাবেলায় গানের আসর বসে ওই বাড়িতে।

একদিন গালিব বংশীকে বলেন, চলো আমরা ওই বাড়িতে গান শুনতে যাই।

বংশী এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলেন, আমাদেরতো ওই বাড়িতে যেতে মানা।

গালিব ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বলে, কেন?

আমরা যে বড় হইনি।

গান শোনার জন্য বড় হতে হয়? গালিবের কৌতূহলী জিজ্ঞাসা।

বংশী ঘাড় নাড়িয়ে বলে, হয়।

গান শোনার জন্য আমি তাড়াতাড়ি বড় হতে চাই। এক লাফে বড় হওয়া যায় না বংশী?

বংশী সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলে, চলো ঘুড়ি ওড়াতে যাই। মাঠে যাব। বাড়ির ছাদে না।

চলো, চলো। গালিবের উৎসাহিত কণ্ঠ। ঘুড়ি যখন আকাশের কাছাকাছি চলে যায় তখন আমার কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে।

কবিতা! বংশীর দুচোখে বিস্ময়। ওই যে কানহাইয়ালাল আসছে। ওকেও বলবো যে আমাদের মির্জা নওশা কবিতা লিখতে চায়।

আমি ঘুড়ি নিয়ে কবিতা লিখবো। চলো দৌড়াই। এক দৌড়ে কানাইয়ের হাত ধরে মাঠে যাই। ওর হাতে নাটাই আর ঘুড়ি আছে।

দু'বন্ধু দৌড়াতে দৌড়াতে পার হয়ে যায় ঘটিয়াওয়ালি নামের বড় বাড়িটি, তারপর শালিমশাহের তাকিয়া, কাশ্মিরিওয়ালা গলি এবং নিজেদের বাড়ি কালেমহল।

বন্ধুদের সঙ্গে আগ্রার ধূলিকণা, যমুনার ওপর থেকে ভেসে আসা বাতাস, কৈশোরের খেলাধুলার আনন্দ গায়ে মেখে ফুরিয়ে যেতে থাকে শৈশব। একদিন চাচা বললেন, আরও পড়ালেখা শিখতে হবে মির্জা নওশা। এবার নতুন ওস্তাদ দেবো।

আমি কবিতা লিখবো চাচা?

কবিতা লিখবে?

আমার মাথার ভেতরে অনেক ভাবনা ভেসে বেড়ায়। অনেক ছবি দেখতে পাই। আমার স্বপ্নের ভেতরে...।

হয়েছে থামো। কাল থেকে তোমাকে ফারসি শেখানোর জন্য বাড়িতে ওস্তাদ আসবে। মনে রেখো আগে লেখাপড়া শিখতে হবে। পারস্য থেকে এসেছেন ওস্তাদ আবদুস সামাদ। তিনি তোমাকে ফারসি ভাষা শেখাবেন।

গালিব খুশি হয়ে মাথা নেড়ে বললেন, চাচাজান আমি পড়ালেখা ঠিকমতো করবো। আপনি দেখবেন আমি একটুও অমনোযোগী হবো না চাচাজান।

আমি তোমাকে দোয়া করি মির্জা নওশা।

নসরুল্লাহ তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

পরদিন থেকে শুরু হয় ওস্তাদের কাছে পাঠগ্রহণ। ওস্তাদ তাঁদের বাড়িতে

AMARBOI.COM

থাকেন। তিনি নিয়মিত তাঁকে পাঠদান করেন। এর আগে তাঁকে পাঠদান করতেন আর একজন ওস্তাদ। নতুন ওস্তাদকে প্রথমে ভয় পেলেও গালিব দেখলেন তিনি একজন অমায়িক মানুষ। শুধু বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদানই করেন না। সাহিত্যও পড়ান। কবিতা পাঠ করতে শেখান। নিজেও পাঠ করেন। তিনি আরবি ভাষা জানেন। সে ভাষার কথাও গালিব জানতে পারেন। বেশ আনন্দে কেটে যায় ওস্তাদের কাছে শেখার সময়। মনে হয় বুকের ভেতরে উড়ে বেড়ায় পাখি, নাকি প্রজাপতি। ছুঁতে পারেন না, কিন্তু অনুভবে ধরে রাখেন সেসব কিছু। মনে হয় গাছের দিকে তাকালে বুঝতে পারেন যে ফুলটি ডাল থেকে ঝরে যায়নি, কিন্তু তারপরও ফুলটি তাঁর মুঠিতে ধরা পড়েছে। সে ফুলের সৌরভে ভরে গেছে তাঁর শরীর। থমকে যান তিনি। কবিতা কি তাহলে এমনই?

বন্ধুদের সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে বলেন, মাঝে মাঝে ওস্তাদজী চলে গেলে ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাই। কোনো কোনো দিন দেখতে পাই সূর্য ডুবে যাচ্ছে। কারো নাটাই থেকে ছুটে গিয়ে ঘুড়ি উড়ছে। এলোমেলোভাবে। বেধে যাবে কোনো গাছের মাথায়, নয়তো পড়বে মাটিতে বা নদীতে। আমার মন খারাপ হয়ে যায়। মনে হয় কি যেন ধরতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ধরতে পারছি না। আমি ঘুড়ি নিয়ে একটি কবিতা লিখবো। দেখবে তোমাদের ভালো লাগবে।

কানহাইয়ালাল বলেন, কবিতাটি আমাকে দিও। আমি রেখে দেবো।

ঠিক আছে, তোমাকেই দেবো। চলো, আমরা এখন পায়রার লড়াই দেখে আসি।

হ্যাঁ, চলো চলো। পায়রার লড়াই দারুণ খেলা।

যেতে যেতে গালিব বলেন, ঘুড়ি ওড়ানো, দাবা খেলা, পায়রার লড়াই না থাকলে তো সারাক্ষণই বাড়ির সামনের পাথর বাঁধানো অংশে বসে থাকতে হয়। নইল ইউসুফের সঙ্গে খেলতে হয়। শুধু এইটুকু একদমই ভালো লাগে না।

বন্ধুরা হাঁটতে হাঁটতে বলে, যা করে আনন্দ পাও তাহলে তাই করো।

কানহাইয়া আগ্রহ নিয়ে বলে, কাল খেলতে না এসে ঘুড়িকে নিয়ে কবিতা লেখো।

আমিও তাই ভেবেছি। ওস্তাদজী ছুটি দিলে আমি কবিতা লিখবো।

দিন যায়। কয়েকদিন পরে লেখা হলো কবিতা। লিখলেন উর্দু ভাষায়। ঘুড়িকে দিল বলে উল্লেখ করলেন। বন্ধুরা খুশি। সবাই নিজের হাতে কপি করে নিল। বন্ধুদের পকেটে কবিতা থাকে। তিনি উৎসাহী হয়ে উঠলেন। সুযোগ পেলে বড়দেরও কবিতা শোনান। দু-একটি আসরে যাওয়ার সুযোগ হলো।

কবিতা শুনে রজব জংয়ের খুশির সীমা নেই। তিনি মাথায় হাত দিয়ে বলেন, বড় শায়ের বনেগা। বেশ কাটছে দিন। ওস্তাদ মুহম্মদ সামাদও তাঁর কবিতার প্রশংসা করেন। ঘুড়ির মতো অনেক উঁচুতে ছুটে যায় কল্পনা। মাঝরাতে ছাদে উঠে আকাশ দেখেন। শীতের কুয়াশা গায়ে মাখেন। শিশিরে পা ডোবান আর যমুনার বুকে তাজমহলের ছায়া দেখেন। বুকের ভেতরে গজলের ধ্বনি যমুনার তরঙ্গ হয়।

মাঝে মাঝে মুশায়রায় কবিতা পড়ার সুযোগ হয়। রজব জংয়ের উৎসাহের অন্ত নেই। তিনি তাঁকে বিভিন্ন আসরে নিয়ে যান। প্রবীণ কবি তাঁকে নানা উপদেশ দেন। অনেক সময় আসর থেকে ফেরার পথে নিজেই তাঁকে বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দেন। তিনি প্রবীণ কবির হাত ধরে টাঙা থেকে নামেন। আনন্দে-উচ্ছ্বাসে হৃদয় ভরে থাকে। কোনোদিন মাকে গিয়ে বলেন, আম্মাজান আজ আমার একটুও ক্ষিদে নেই। পানির তিয়াসও পায়নি।

কেন এমন লাগছে বেটা?

কবিতার শ্রোতারা আমাকে বাহ্, বাহ্ বলেছে। অনেকবার মারহাবা বলেছে।

মা চোখ বড় করে বলেন, মাশাল্লাহ। খোদা মেহেরবান। আমার বাচ্চা বড় কেউ হবে। এখন চলো বেটা দুটো রুটি আর কাবাব খাও।

মায়ের হাত ধরে তিনি খেতে বসেন।

একদিন 'শের-এ-সুখন'-এর আসর থেকে বাড়িতে ফিরলেন। সেদিন বন্ধুদের সঙ্গে ফিরেছিলেন। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই কান্নার রোল শুনতে পেলেন। বংশীধরের হাত চেপে ধরে বললেন, বাড়িতে কান্নাকাটি কেন বংশী? আমার ভয় করছে।

চলো দেখি।

সবাই বাড়ির গেটে এসে থমকে দাঁড়ালো। শুনতে পেলেন গালিবের চাচা নসরুল্লাহ বেগ হাতি থেকে পড়ে মারা গেছেন।

চাচাজান মরে গেছেন? হাউমাউ করে কাঁদলেন গালিব। আব্বাজান নাই, চাচাজান নাই। আমাদেরকে কে দেখবে?

কালেমহলের পাথরের সিঁড়িতে বন্ধুদের সঙ্গে বসে রইলেন অনেক রাত পর্যন্ত। আজ কেউ তাঁকে খেতে ডাকলো না। তিনি নিজেও ঘুমানোর কথা মনে করলেন না। কেমন করে যেন রাত কেটে গেল।

চাচাজানের দাফন হয়ে গেল। অনেক আত্মীয়স্বজন এলো বাড়িতে। ফিরোজপুরের ঝিরকা ও লোহারুর নওয়াব আহমদ বখশ খান এলেন। তিনি

AMARBOI.COM

তাঁর চাচার শ্বশুর। গালিবকে অনেক আদর করলেন। তাঁর পড়ালেখার খোঁজখবর নিলেন। তাঁর প্রথম শিক্ষক মৌলানা মুয়াজ্জম তাঁর প্রশংসা করলেন। এই বয়সেই তিনি কত ভালো ফারসি শিখেছেন সে খবর দিলেন ওস্তাদ মুহম্মদ সামাদ। কবি রজব জং উচ্ছসিত ভাষায় তাঁর গজল লেখার কথা জানালেন। আহমদ বখশ খান খুশি হয়ে বললেন, ওকে আমি দিল্লি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবো। একদিন নিশ্চয় ও সম্রাটের দরবারে মুশায়রায় অংশ নিতে পারবে।

ওস্তাদ আবদুস সামাদ খুশি হয়ে বললেন, ওকে দোয়া করবেন হযরত। ও খুব ভালো ছেলে।

গালিব কাছে দাঁড়িয়ে সবকিছু শুনলেন। একদিকে চাচাজানের মৃত্যুশোক অন্যদিকে স্বপ্নের ভবিষ্যতের হাতছানি। তিনি বুঝলেন এখন তাঁকে বুঝতে হবে কেমন করে কি করবেন। কোথায় যাবেন, কি হবে তাঁর ঠিকানা।

একদিন বাড়ি খালি হয়ে গেল। চোখের সামনে জেগে রইলো মায়ের পাংশু বিবর্ণ চেহারা। নানার বাড়িতে দিন কাটে। মামারা যত্ন করেন। দিনগুলো আগের মতো কাটছে। ওস্তাদের কাছে পাঠ নিচ্ছেন। বন্ধুদের সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন, দাবা খেলছেন। কবিতা লিখছেন। যমুনা নদীর ধারে সূর্যাস্ত দেখছেন।

একদিন মামার কাছে শুনলেন তাঁর বিয়ে ঠিক করেছেন নওয়াব আহমদ বখশ খান। পাত্রী ঠিক হয়েছে তাঁরই ভাই কবি ইলাহি বখশ খানের মেয়ে উমরাও বেগম।

মামা বললেন, ভালোই হয়েছে। তুমি অভিভাবক পেয়েছো। ওরা তোমাকে দিল্লিতে নিয়ে যাবে। বিয়ের পরে তুমি দিল্লিতে বাস করবে।

মা বললেন, বেটা তোমার নসীব ভালো। নওয়াব পরিবারে বিয়ে হলে তুমি ভালো থাকবে। তোমার বছরের ভাতা আছে। তা দিয়ে সংসার চলবে।

গালিব শুকনো মুখে শুধু বললেন, আম্মাজান—

মা তাঁকে কাছে টেনে আদর করে বললেন, ঘাবড়িয়ো না বেটা।

তিনি সবার সামনে থেকে সরে এলেন। তিনি ঘাবড়াননি। শুধু ভাবলেন, আব্বাজান, চাচাজান যখন নেই, তখন তো একটা কিছু তাঁকে আঁকড়ে ধরতে হবে। নইলে তিনি ভাসবেন কি করে? নানাজান গুলাম হুসেন খাঁও বেঁচে নেই। চারদিকে প্রবল শূন্যতা। মা আছেন বলে বুকের জোরটুকু শেষ হয়ে যায়নি। আছে ছোট ভাইটি। বোনটি। কতদূরই বা যেতে পারবেন তিনি। মন খারাপ হলে একা একা থাকেন কোথাও কোনো আড়ালে গিয়ে। বন্ধুরাও খুঁজে পায় না তাঁকে। এভাবে তিনি নিজের চারপাশে বৃত্ত তৈরি করেন। একদিন মুরুব্বীরা

তাঁর বিয়ের দিন ঠিক করেন।

আজ গালিবের বিয়ে।

বিয়ের কথা তাঁকে তেমন উচ্ছল করে না। আত্মীয়স্বজন নানারকম তামাশা করে। তিনি কিছু বলেন না। চুপ করে থাকেন। বারবার মনে হয় নানাজান বেঁচে থাকলে তিনি হয়তো বিয়ে বিষয়ে কিছু জানতে পারতেন। বাবার কথাও খুব মনে হয়। আসলে বাবার চেহারাই তো মনে নেই। কত ছোট বয়সে বাবা তাঁকে ছেড়ে গেলেন। বিয়ের দিনে বাবা নেই, চাচা নেই ভেবে তাঁর খুব কান্না পায়। তিনি বাগানের ফুল গাছের আড়ালে বসে অনেকক্ষণ কাঁদেন। নানা মারা যাওয়ার পরে চাচা ভরণপোষণ করেন। এখন চাচাও নাই। তাঁর বিয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন চাচার শ্বশুর। বড় মুরুব্বী। ভাবেন, এসব কথা এখন ভেবে লাভ নেই। কিন্তু কান্নাকাটি করে শান্ত হতে না হতেই লোকজন সামনে এসে দাঁড়ায়।

আপনি এখানে কী করছেন দুলহা? সবাই আপনাকে খুঁজছে।

আপনারা যান। আমি আসছি।

আমাদেরকে বলা হয়েছে আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে।

আমি পরে যাব।

না, এখুনি যেতে হবে।

আপনারা আমাকে আমার আব্বাজানের জন্য কাঁদতে দিবেন না?

হকচকিয়ে যায় উপস্থিত লোকেরা। কী বলবে বুঝতে পারে না। তারপর এক পা দুপা করে পিছিয়ে চলে যায়। একটু পরে তাঁর মামা নিজেই আসেন।

কী হয়েছে মির্জা নওশা?

চাচাজান আব্বাজান ছাড়া আমার বিয়ে হবে এটা আমি ভাবতে পারছি না।

যাঁরা মারা যান তাঁরা নেকবান হলে বেহেশতে যান। তোমার আব্বাজান চাচাজান নেকবান মানুষ। তাঁরা তোমাকে দোয়া করবেন। বিয়ে তো হবেই। বিয়ের সব আয়োজন শেষ হয়ে গেছে। এসো, ঘরে চলো।

যেতে যেতে মামাকে জিজ্ঞেস করেন গালিব, বিয়ে হলে কি আমার ঘুড়ি ওড়ানো বন্ধ হয়ে যাবে?

কেন বন্ধ হয়ে যাবে। তুমি যত খুশি ঘুড়ি ওড়াতে পারবে। আমি তো জানি তুমি রাজা বলবান সিংয়ের সঙ্গে ঘুড়ির প্যাঁচ লড়তে ভালোবাসো। ওই বাড়ির ছাদে তোমাকে আমি ঘুড়ি ওড়াতে দেখেছি।

তিনি শক্ত করে মামার হাতের মুঠি ধরেন। নির্ভরতার জায়গা খুঁজে নেন।

দুপুরবেলা মা বলেন, এই খুশবু পানি দিয়ে তুমি গোসল করবে।

AMARBOI.COM

কেন আম্মাজান?

আজ তোমার বিয়ে। তোমার শরীর সুগন্ধীতে ভরে থাকবে। তোমার শেরওয়ানি, পাগড়িতে খুশবু মাখিয়ে রাখা হয়েছে।

তিনি ভীষণ লজ্জা পান। কথা বলতে পারেন না। মা তাঁর গায়ে পানি ঢেলে দেন। তিনি চোখ বুজে পানির খুশবু উপভোগ করেন। ভাবেন, বিয়ে হলে মানুষের একজন সঙ্গী হয়। সেই সঙ্গীর সঙ্গে মানুষ সারা জীবন থাকে।

হয়েছে, গোসল শেষ। এবার গা মুছে ফেল।

মা তাঁকে নতুন একটা গামছা এগিয়ে দেন। তাঁর গা মোছা হলে নতুন পায়জামা পরতে দেয়া হয় তাঁকে।

এতকিছু সব নতুন কেন আম্মাজান?

আজ যে তোমার খুশির দিন।

বিয়ে মানে কি খুশির দিন?

হ্যাঁ, বেটা। আজ তোমার তেমন দিন।

খুশির দিন তো নাও হতে পারে আম্মা। দুজনের ঝগড়াঝাটি হতে পারে।

তা তো পারেই। তারপর আবার ঝগড়া মিটমাটও হয়ে যায় বেটা।

যদি না হয়? যদি কেউ কাউকে দেখতে না পারে? তখন কী হবে?

ওহ বেটা, আজকের দিনে এসব কথা ভেবো না।

তাহলে এসব ভাবনা সারা জীবনের জন্য থাকুক আম্মাজান।

তাঁর মা এক মুহূর্ত থমকে তাঁর মুখের দিকে তাকান। তারপর মৃদু হেসে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, দোয়া করি তোমার জীবন সুখে-শান্তিতে কাটুক।

মাকে জড়িয়ে ধরে তিনি বলেন, আম্মাজান সুখ-শান্তি কী?

বড় হতে হতে একটু একটু বুঝবে। এসব ব্যাপার একদিন দুদিনে বোঝা যায় না। চলো খাবে। তোমার জন্য আজ অনেক কিছু রান্না হয়েছে।

ইউসুফ খাবে না? ছোটি খানম?

দুজনেই দস্তরখানার সামনে বসে আছে। একটু পরে চেঁচামেচি শুরু করবে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরিপাটি করে চুল আঁচড়ান গালিব। চুলকে ফাঁপিয়ে আঁচড়াতে তিনি পছন্দ করেন। আর ইউসুফ সুযোগ পেলেই তাঁর চুল এলোমেলো করে দেয়। খেতে খেতে গালিব মাকে বলেন, চাচাশ্বশুর বলেছেন বিয়ের পরে আমি দিল্লিতে থাকব।

হ্যাঁ, তোমার শ্বশুর খুব বড়লোক। তিনি তো দিল্লিতে থাকেন। তোমাকেও

দিল্লিতে থাকতে হবে।

তখন ইউসুফের সঙ্গে খুব কমই দেখা হবে আমার। আমার ছোট ভাইটির সঙ্গে খেলাধুলাও বন্ধ হয়ে যাবে।

ইউসুফ সঙ্গে সঙ্গে বলে, আমি আপনার মতো দাবা খেলতে পছন্দ করি না।

তুমি যেটা পছন্দ করো আমি তো সেটাই খেলি। আমি তো না বলি না।

আহ, তোমাদের কথা বন্ধ কর। খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো হচ্ছে না।

দুজনে চুপচাপ খায়।

সন্ধ্যায় দুলহার সাজে সাজানো হয় গালিবকে।

ছোটভাই ইউসুফ একটু পর পর ওর শেরওয়ানি ধরে টানে, নাগরা জুতা খুলে নিয়ে যায় এবং এক সময় বলে, আমিও বিয়ে করব। আম্মাজান আমাকে নতুন পোশাক দিন।

হঠাৎ করে গালিবের মনে হয় ইউসুফ বোধহয় পাগলামি করছে। ওকে কেমন এলোমেলো দেখাচ্ছে। পরক্ষণে মনে হয় ধুত বাজে ভাবনা। আজকের দিনে খারাপ চিন্তা করতে নেই। তবু ভীষণ ভয় করতে শুরু করে।

এক সময় মামাকে বলে, মামা বিয়ের পরে যখন বাড়ি ফিরব তখন আমাকে যমুনা নদীর ধারে নিয়ে যাবেন।

রাতের বেলা যমুনা নদীর ধারে? ওখানে কেন যাবে?

আমার যেতে ইচ্ছে করছে সে জন্য যাব। তখন আমার সঙ্গে কেউ থাকবে না। আমি একা থাকব।

পাগলামি করবে কেন মির্জা নওশা।

এটা পাগলামি নয় মামা।

অতটুকু ছেলের গম্ভীর কণ্ঠে অলৌকিক কিছু একটা ধ্বনিত হয়। অবাক হয়ে তাকান গালিবের দিকে। বলেন, জীবন খুব কঠিন মির্জা নওশা। আমি বুঝেছি যে তুমি কবিতা লেখার কথা ভাবছো।

তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি ভয় পাই না।

তোমাকে জীবিকার চিন্তা করতে হবে। ভাবতে হবে কীভাবে সংসার চালানো যায়।

যখন করতে হবে তখন করব। এখন আমি যা বলেছি তা হতে হবে। আমি যমুনার তীরে যাব।

মামা ওকে কিছু না বলে ক্রুদ্ধ হয়ে বাইরে বের হন। টাঙ্গা সাজানো হয়েছে

AMARBOI.COM

কিনা দেখার জন্য একে-ওকে ডাকেন। তখন রজব জং বরযাত্রী হয়ে যাবার জন্য টাঙ্গা থেকে নামেন।

কেমন আছেন ওস্তাদজী?

শরীরটা বেশি ভালো নেই। তারপরও আসতে হয় যে কবি মির্জা নওশার বিয়ে। আমি তো না এসে পারি না। আমার এই জীবনে একজন কবিকে আমার দেখা হলো।

আমার বোনের ছেলে বায়না ধরেছে যে বিয়ের অনুষ্ঠানের পরে ওকে একা একা যমুনা নদীর পাড়ে যেতে দিতে হবে।

তাই নাকি। মারহাবা। বহুৎ খুশির খবর।

খুশির খবর? কী বলছেন আপনি?

তুমি বুঝতে পার নি, কিন্তু আমি ঠিকই বুঝেছি ওর মনের খবর। তুমি ওকে একা না ছাড়তে চাইলে আমি ওর সঙ্গে থাকতে পারি।

আপনাদের মনে এমন পাগলামির ভাব কেন ওস্তাদজী তা আমি বুঝতে পারছি না।

বুঝবে না, বুঝবে না। রজব জংকে অস্থির দেখায়। তোমার টাঙ্গা তো তৈরি দেখছি। বিসমিল্লাহ বলে রওনা কর তোমরা।

আমি মির্জা নওশকে নিয়ে আসছি।

রজব জং খুশিতে উচ্ছ্বসিত। এই ছেলেকে তাঁর বোঝা হয়ে গেছে। ও একটা কিছু হবে। ওকে নিয়ে আর কোনো চিন্তা নেই। ওর জন্মের সময়ে যমুনা নদী তো এই খবরই দিয়েছিল।

যমুনা নদীর পাড়ে গালিব একা

আজ তাঁর বিয়ের রাত। মানুষজনের খোশগল্পে, দামি আহারে অর্ধেক রাত পার হয়ে গেছে। বাকি রাতটুকু তাঁর একার। বন্ধুদেরকেও সঙ্গে রাখেননি।

তিনি সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছেন। তিনি জানেন তাঁর মামা দূরে লোকলস্কর রেখে দিয়েছে। ওরা মাঠের মধ্যে বসে আছে। তাঁর যখন বাড়ি ফেরার ইচ্ছে হবে তখন টাঙ্গাওয়ালা তাঁকে নিয়ে বাড়ি ফিরবে।

একজন ফৌজী অফিসার হয়ে জীবনকে লড়াইয়ের ময়দানে নিয়োজিত রাখার ইচ্ছে তাঁর নেই। এই বয়সেই নিজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া তাঁর হয়ে গেছে।

তিনি দু'হাত উপরে তুলে চিৎকার করে বলেন, যমুনা নদী, আজ থেকে আমি স্বাধীন। আমার মতো করে আমি বড় হব। যমুনা নদী, তুমি আমার বন্ধু।

তোমার পাড়ে পাড়ে ঘুরে আমি শৈশব কাটিয়েছি। নদী, তুমি আমাকে সারা জীবন ভালোবাসা দিও। মানুষের জীবনে নদীর ভালোবাসা খুব দরকার। আমি যেখানেই থাকি না কেন আগ্রা শহরকে ভালোবাসার কথা জানাবে আমার শরীর। এর প্রতিটি ধূলিকণা লেগে থাকবে আমার শরীরে। এই শহরের গাছের ওপর আমার ভালোবাসা বৃষ্টির বিন্দু হয়ে ঝরবে। আজ রাতে তোমাকেই সাক্ষী করছি যমুনা নদী।

গালিব দু'হাতে চোখের জল মোছেন।

কয়েকদিন পরে তিনি আবার যমুনা নদীর পাড়ে আসেন। বলেন, নদী আমি দিল্লি চলে যাচ্ছি। আমি কবি হব।

শহরের বর্ষা-বসন্ত

গালিব এখন দিল্লিতে।

এই শহরে তিনি স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য এসেছেন। নিজের ইচ্ছায় আসেননি। তাঁকে আনা হয়েছে। বিবাহের সম্পর্ক ধরে তিনি এসেছেন।

আগ্রা ছেড়ে আসার সময় মন খারাপ হয়েছিল। দু'মাস ধরে দিল্লির অলিগলি, বাজার, পথঘাট, নদীর ধার, জামা মসজিদ, লালকেল্লা ইত্যাদি নানা স্থানে ঘুরেছেন। কিন্তু মন-খারাপ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। গলার কাছে বড় একটা পাথর আটকে আছে। নামবে না, সরছে না। মাঝে মাঝে মনে হয় তাঁর নিজের কিছু করার নেই। অদৃশ্য সুতো তাঁকে বেঁধে রেখেছে।

এখন পর্যন্ত দিল্লি তার কাছে একটি ধূসর শহর। শহরের চারদিকে ছাই ছড়ানো। পায়ে পায়ে সেই ছাই ওড়ে। আর কবুতরের ডানায় আটকে থাকা ছাইয়ের রেণু ঢেকে দেয় সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত। ঠিকমতো বোঝা যায় না দিনের আলো এবং রাতের অন্ধকার।

অথচ তার চোখ দিল্লির শরীরে লেগে থাকা রঙের বাহার খোঁজে। যে রঙ তিনি শৈশব এবং কৈশোরে আগ্রা শহরে দেখেছিলেন। আগ্রার যমুনা নদী, তাজমহল, আগ্রা ফোর্ট এবং ঘুড়ি ওড়ানোর অসীম আকাশ তাঁর পক্ষে ফেলে আসা কঠিন ছিল। কিন্তু সেই কঠিনকে মানতে হয়েছে তাঁকে।

কারণ প্রয়োজনের তাড়না কঠিন জিনিস। প্রয়োজনের তাগিদে রক্তের সম্পর্কের পরিবার ছেড়ে আর একটি পরিবারের ছত্রছায়ায় নিজের জায়গা মেনে

AMARBOI.COM

নিতে হলো তাঁকে। বিবাহ-সূত্র এই বন্ধনের সেতু। সেই সেতুতে পা রেখেই দিল্লি শহরে বাঁচতে আসতে হলো।

এই শহরে খানিকটা থিতু হওয়ার পরে তিনি ভাবলেন, যে শহরে প্রাণের টানে আসা হয় না সেটা কি বাসের উপযোগী শহর? নাকি সেই শহর একটি কারাগার? আর যে বিবির বন্ধন তাঁকে দেয়া হলো তার নাম কি প্রেম নাকি বেড়ি?

তাহলে কি দাঁড়ালো? পায়ে বেড়ি পরিয়ে একজন কিশোর-কবিকে বন্দী করে আনা হয়েছে কারাগারে। কারণ তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন কয়েকজন মুরুব্বী। এদের একজন তাঁর শ্বশুর। তিনিও কবি।

এক সূর্যোদয়ের সময়ে তিনি শহরটাকে কারাগার বলে ঘোষণা করলেন। প্রথমে নিজের কাছে, পরে অন্যদের কাছে। কারাগারের বন্দীকে যে বেড়ি পরিয়ে আটক করা হলো তাঁর নাম—উমরাও বেগম।

তিনি দু'হাত উর্ধ্বে তুলে বললেন, ওহ্ দিল্লি!

আগ্রায় মুশায়রায় যোগ দেয়ার সুযোগ হয়েছিল। দিল্লি শহরে মুশায়রার আসর আছে, কিন্তু তাঁর যাওয়ার সুযোগ এখনো হয়নি। শ্বশুর বলেছেন সুযোগ করে দেবেন। চাচাশ্বশুর নওয়াব আহমদ বখশ প্রভাবশালী ব্যক্তি। দেখা যাক কি হয়। লালকেল্লার সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে খুঁজে ফেরেন মুশায়রার আসর। আগ্রা-বাসের সময় লেখা রুবাই বুকের ভেতরে গুঞ্জরিত হয়। নতুন ভাবনা আসে মাথায়। গজলের পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করতে করতে পার হয়ে আসেন চাঁদনি চক। পৌঁছে যান যমুনার তীরে। দেখতে পান ধূসর শহরটা যমুনার জলে কালো ছায়া ফেলেছে। শহরের শরীরজুড়ে অন্ধকার। একই সঙ্গে তিনি অনুভব করেন তাঁর বয়স বেড়েছে। তিনি যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছেন।

ওহ্ দিল্লি! এই শহরে তিনি এখন যৌবনের আনন্দে মাতোয়ারা। শহরটি তার ধূসরতা নিয়ে কবির চোখে ধূসর মাধুর্যে পরিণত হলো। বন্দিজীবন এবং বয়সের সঙ্গে কবিতার যৌবন নিয়ে তিনি নতুন চোখে দেখতে শুরু করলেন দিল্লিকে।

ভাবলেন এই হোক তাঁর শেষ ঠিকানা। যমুনার তীরে দাঁড়িয়ে দেখতে পান দিগন্তে নেমে আসা আকাশের গায়ে সেঁটে আছে শৈশবের ছেঁড়া ঘুড়ির টুকরো। সেই টুকরো বিশাল ক্যানভাসে পরিণত হয়ে তাঁর যৌবনের সময়কে চিত্রিত করে। সেখানে গেঁথে থাকে হাজার হাজার পঙ্‌ক্তি—তাঁর রচিত গজলের পঙ্‌ক্তি এবং শের।

তিনি আনন্দের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন, ওহ্ দিল্লি!

একদিন বিকেলবেলা তাঁর শ্বশুর ইলাহি বখশ আত্মীয়পরিজনের সামনে ঘোষণা দিলেন, আগামীকাল উমরাও আর মির্জা নওশার বাসর। এখন থেকে ওরা স্বামী-স্ত্রীর জীবনযাপন করতে পারবে।

পরদিন ধুমধাম করে আয়োজন হয়। দিনভর চলতে থাকে নানা কাজ। বাড়িতে মণ্ডা-মিঠাই আসতে থাকে। বোঝাই হয়ে যায় ঘর। কোর্মা-পোলাও রান্না হয়। উমরাওয়ের বিছানায় নতুন চাদর বিছানো হয়। বদলে যায় বালিশের কভার। দরজা-জানালার পর্দা। নতুন পর্দায় বাতাস ছুঁয়ে যায়। দুরন্ত বাতাসের চপল আবেগ। ঝোলানো পর্দায় চমৎকার কারুকাজ। উমরাও নিজে পছন্দ করে দিয়েছেন।

সারাদিন বাড়িতে আটকে থাকতে হলো গালিবকে। বাড়িতে তাঁকে মির্জা নওশা বলে ডাকে সবাই। কিন্তু নামটি তাঁর একটুও পছন্দ নয়। শুনলে মেজাজ খারাপ লাগে। তারপরও সয়ে থাকেন। ভাবেন, এখনো নামটা ঝেড়ে ফেলার সময় হয়নি। কবিতা লিখে যখন বড় হবেন তখন বাদ দেবেন।

তাঁর জন্য নতুন জামাকাপড় এসেছে। বেশ জমকালো পছন্দসই। তাঁরও ভালো লাগলো দেখে। মৃদু হেসে ভাবলেন, এটি পরলে তাঁর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরবে না কারো। এমনিতেই দিল্লিতে তাঁর পরিচিতি হয়েছে শহরের সুদর্শন যুবক হিসেবে।

মাঝে মাঝে হেঁটে গেলে কানে আসে প্রশংসার ধ্বনি।

বাহ্, শাহেনশাহ একজন।

মনে হয় লালকেল্লার যুবরাজ।

মুঘল সম্রাটের পুত্র যেন।

তিনি মনে মনে হাসেন।

কুফরি চাঁদ পোশাক নিয়ে এসে বলে, বিকেলে এই পোশাক পরবেন মির্জা নওশা।

আমি একা পরবো?

না, আমি এসে পরতে সাহায্য করবো। বিশেষ করে নাগরা জুতাতো আমাকে পরিয়ে দিতে হবে।

ঠিক হ্যায়। বহুৎ আচ্ছা। তিনি খুশি হয়ে বলেন।

অভিজাত পরিবারের সন্তান হিসেবে তাঁর এই অহমবোধ আছে। অহমবোধ প্রকাশ করতে তিনি পছন্দও করেন। মনে করেন এটি প্রকাশ না করলে নিজের

অবস্থান দৃঢ় থাকবে না। জন্মসূত্রে যে আভিজাত্য পেয়েছেন তাকেতো ধুলায় নামাতে পারেন না।

আপনি কিছু খাবেন?

হ্যাঁ, মণ্ডা-মিঠাই আর বেদানার রস।

জাফরানি শরবত?

এখন না।

শামী কাবাব? আপনি খুব পছন্দ করেন।

এটাও এখন না। পরে। আমি বলবো তোমাকে।

আপনি এখন কি করবেন?

দাবা খেলবো।

একা?

বন্ধুরা কেউ না এলে একাই তো।

আচ্ছা।

বেরিয়ে যায় কুফরি চাঁদ। আবার কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসে খাবার ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে। সবকিছু সাজিয়ে দিয়ে বলে, আর কিছু মির্জা নওশা?

কুফরি চাঁদ তুমি শাদী করেছো?

দশ বছর হলো করেছি।

বালবাচ্চা আছে?

দু'টা বেটি আর একটা বেটা আছে।

বহুৎ আচ্ছা। শুনে খুশি হলাম।

পকেট থেকে একমুঠো টাকা বের করে কুফরিকে দিয়ে বললেন, আমার খুশির দিনে তোমাকে বকশিশ কুফরি চাঁদ। তোমার বালবাচ্চাকে জামা-কাপড় কিনে দেবে।

খুশিতে লাল হয়ে যায় কুফরি চাঁদের মুখ। টাকা নিতে নিতে বলে, শুকরিয়া মির্জা নওশা।

কুফরি চাঁদ চলে যাবার পরও গালিব পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। পকেট বোঝাই টাকা। সকালে শ্বশুর তাঁকে দিয়েছে। অবশ্য সবই তার প্রাপ্য টাকা। তিনি ভাতা হিসেবে পান।

তিনি জানালার পাশে এসে দাঁড়ালেন। খুব মন খারাপ হয়ে গেলো। দেখা যাচ্ছে রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, হেঁটে যাওয়া মানুষের সারি, ছোটখাটো দোকানপাট। মনে পড়লো আগ্রায় অনুষ্ঠিত বিয়ের দিনের কথা। কিশোর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। তেমন কিছু বোঝার বয়স ছিল না তখন। সেটা ছিল বিয়ের দলিল

মাত্র। সামাজিক স্বীকৃতি।

আজ তাঁকে বিবাহিত জীবনের ছাড়পত্র দেয়া হচ্ছে। তাঁর আর উমরাওর জন্য একটি বিছানা সাজানো হয়েছে। যখন খুশি তখন দু'জনে ওই বিছানায় ঘুমুতে পারবেন। এবং অন্য আরও অনেক কিছু করার অনুমতি আছে। যা মন চায়, তা।

তারপরও বুকটা কেমন ধুকপুক করে। আনন্দ খুঁজে পাচ্ছেন না।

মনে হচ্ছে উমরাও তাঁর জীবনের বেড়ি। রেশমি সুতোর বাঁধন নয়, একদম লোহার তৈরি বেড়ি। তারপরও আজ তার একটি আনন্দের দিন।

আম্মার কথা মনে হয়। ভাই ইউসুফ এবং বোন ছোটি বেগমের কথাও মনে হচ্ছে। মনে পড়ে আগ্রার অন্যতম অভিজাত ধনী নানাজান খাজা গোলাম হুসেন খাঁকে। ওহ্! কি তাঁর শান-শওকত! আম্মাজান সেই কালেমহলে থাকেন। এতোকিছু ভাবনার পরও তার মন খারাপ কাটে না। মন ভার হয়ে থাকে। দিল্লিতে আসার পরে সমাজে নিজের অবস্থান আরও বেশি করে বুঝতে পারছেন। বুঝতে পারছেন যে আত্মীয়স্বজনের বিত্তবৈভব যতোই থাকুক না কেন, তা দিয়ে অভাব থাকে না, কিন্তু মর্যাদা নেই। আনন্দও মেলে না। স্বস্তিতো নয়ই। যে ছেলে অকালে বাবা আর চাচাকে হারায় তাঁর জীবনের খুঁটিতে জোর থাকে না।

গালিব জানালার শিকে মাথা রাখলেন। চোখ জলে ভরে উঠলো। পিতা আবদুল্লাহ বেগ খাঁ মারা গেছে তার পাঁচ বছর বয়সে।

চাচা নসরুল্লা খান ভাইয়ের পরিবারের দায়িত্ব নিলেন। ভালোই কাটছিল দিন। কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্য এমনই যে তিনিও মারা গেলেন।

গালিব জানালার কাছ থেকে সরে এলেন। ঘরে পায়চারি করলেন। দাবার ছকে ঘুঁটি সাজালেন, কিন্তু মন বসাতে পারলেন না। দু'হাতে মাথা চেপে ভাবলেন, যার পারিবারিক শেকড় থাকে না, তার মতো দুর্ভাগা আর কেউ হতে পারে না।

আমি সেই দুর্ভাগাদের একজন। আভিজাত্যের বড়াই আছে, কিন্তু শেকড়ে মাটি নাই, সেটা বড়ই আলগা। শেকড়ে মাটি দিয়ে নিজেকেই ভরতে হবে নিজের জায়গা জমিন।

মির্জা নওশা!

বুক ধড়ফড়িয়ে ওঠে। ঠিক মায়ের কণ্ঠ যেন।

আম্মাজান!

গালিব চারদিকে তাকান। বুঝতে পারেন, তাঁরা তো আগ্রাতে আছেন।

আজ এই খানাপিনার রাতে তাদের কোনো দাওয়াত নেই। তাঁর শ্বশুর তাদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেননি। আর একজনের পুত্রের দায় নিজেই পালন করছেন বলে এই অবহেলা। তাঁর নাকের বাঁশি ফুলে উঠে—অভিমানে এবং ক্ষোভে। খানিকটুকু রাগেও। যে রাগ শেষ পর্যন্ত উমরাওয়ের ওপর গড়ায়।

আম্মাজান আমি ভালো আছি। এ বাড়িতে আজ একটি আনন্দের দিন পালিত হচ্ছে। আমার পায়ের বেড়ি আজকে আরও শক্ত হবে। আম্মাজান আপনি আমার জন্য একটুও ভাববেন না। আমি আপনাকে দেখতে আসবো।

বাইরে টুনটুন শব্দ হয়।

গলায় ঘুন্টিবাঁধা খচ্চরগুলো পিঠে মালের বোঝা নিয়ে চলে যাচ্ছে। তিনি আবার পকেটে হাত রাখেন। টাকা স্পর্শ করেন। আজ থেকে যে পারিবারিক জীবন তাঁর হতে যাচ্ছে তার জন্য তাঁর কোনো দায় নেই। যে অর্থ তিনি ভাতা পান, তা দিয়ে দিব্যি রাজার হালে চলে যায়। তিনি বিলাসী যুবক, টাকা ওড়াতে ভালোবাসেন। দিল্লি শহরের নানা কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করেছেন। এখানে তাওয়ায়েফ—মুক্ত নারীরা আছে। তিনি তাঁদের কাছে যেতে পারেন। যাবেনও। দুই-একজনের বৈঠকখানায় সময় কাটিয়ে এসেছেনও।

চাচা নসরুল্লাহ খাঁয়ের মৃত্যুর পরে পারিবারিক জায়গীর ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। বরাদ্দ করেছিল পেনসন। তখন তিনি অনাথ বালক। তার ভাগে বরাদ্দ পড়েছিল বছরে সাতশ টাকা। সে সময়ে তাঁর অভিভাবক হয়েছিলেন নানাজান। ঝিরকা ও লোহারুর নওয়াব আহমদ বখশ খান গালিবের বরাদ্দের চেয়েও বেশি অনুদান তাঁকে দেন। দিল্লিতে বাস করেন গালিবের ফুপু। তিনি তাঁকে অর্থ দেন। আগ্রায় মা যে পিতার সম্পত্তি লাভ করেছেন সেখান থেকেও টাকা আসে। আলোয়ারের মহারাজা তাঁকে একটি গ্রাম দান করেছিলেন। সেই তালরা নামের গ্রাম থেকেও ভালই আয় হয়।

এইসব হিসেব করে বুঝে নিলেন পরিবার টানতে তাঁর কোনো অসুবিধা হবে না। স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছেমতো জীবন কাটিয়ে বেঁচে থাকতে পারবেন। সুতরাং কবিতা ছাড়া তাঁর আর কিছু চাইবার নাই।

বিকালেই নতুন পোশাকে সেজেগুজে মেহমানদের অপেক্ষা করতে লাগলেন। একে একে বিভিন্নজন আসতে শুরু করেছে। প্রত্যেকেরই মুগ্ধ দৃষ্টি পড়ে তাঁর ওপর। তিনি বিনম্র ভঙ্গিতে সালাম দেন।

সাবাশ! বহুৎ খুবসুরত। মাশাল্লাহ।

অনেকের মুগ্ধ উচ্চারণ তাঁর দু'কান ভরে বাজে।

সন্ধ্যার পরপরই খানাপিনা করে চলে যায় সবাই। বেশকিছু স্বর্ণ মুদ্রা

উপহার পান তিনি।

রাতে উমরাওয়ের ঘরে তাঁকে নিতে আসে বাড়ির কয়েকজন দাসী। ওদের পরিচিত মুখগুলো আজ ভীষণ রহস্যময়। মিটিমিটি হাসিতে ওরা অন্যরকম, অচেনা। যেন ওদের সঙ্গে এটি মির্জা নওশার নতুন দেখা।

একজন হাসিমুখ উঁচু করে বলে, তবিয়ত আচ্ছা তো?

জরুর। বহুত আচ্ছা।

খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়ে ওরা। একজন উমরাওয়ের ঘরের দরজা খুলে দেয়। বাতাসে দুলে ওঠে পর্দা। এই পর্দাগুলো কেনার আগে উমরাওয়ের কাছে আনা হয়েছিল পছন্দের জন্য। গালিব মনে মনে প্রশংসা করে বলেন, সুন্দর পছন্দ করেছে।

খাটের ওপর বসে আছেন উমরাও। জড়োয়া গয়না আর রেশমি ঘাঘরার জৌলুসে ফুটে আছে ও। বিয়ের সময় গালিবের বয়স ছিল তেরো। উমরাওয়ের এগারো। এখন দুজনে যৌবনপ্রাপ্ত। উমরাওয়ের হাসিতে বিদ্যুৎছটা, যেন আলোর রশ্মির ঝিলিক তুলে পেরিয়ে যাবেন যে কটা বছর বাঁচবেন তার সবকটা দিন।

গালিব খাটের কাছে এগিয়ে আসতেই উমরাও বলেন, বারান্দায় পানি রাখা আছে, আমাদেরকে ওজু করতে হবে।

ওজু? কেন? আমি দুপুরে গোসল করেছি। একদম পবিত্র আছি।

কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ঝরে পড়ে।

উমরাও ভুরু কুঁচকে বলেন, ওজু তো করতেই হবে। নফল নামাজ পড়তে হবে। আল্লাহর কাছে শোকর আদায় করতে হবে। নেকবন্দ বান্দাই আল্লাহ পাকের অসীম দয়া লাভ করে।

গালিব কথা বললেন না। ঘরের আর একপাশে গিয়ে ঘুমুনোর পোশাক পরতে লাগলেন। তার আগে বিরক্তির সঙ্গে ঝলমলে পোশাক খুলে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলেছেন।

উমরাওয়ের কাছে এসে বললেন, আমি কিছু স্বর্ণ মুদ্রা উপহার পেয়েছি। সেগুলো তোমাকে দিতে চাই।

আপনি পোশাকগুলো ওইভাবে ফেললেন যে?

আমার ইচ্ছা।

পোশাকগুলো আমার আব্বাজান কিনেছেন।

তুমি গুছিয়ে রাখো।

আমি কি আপনার দাসী?

AMARBOI.COM

তাহলে বাড়ির দাসীদের ডাকো।

এখন এই ঘরে ওদের আসার হুকুম নাই।

তাহলে কাল সকালে করবে।

দাসীরা কালকে যখন দেখবে যে পোশাকগুলো মেঝেতে পড়ে আছে ওরা এই কথা সবাইকে বলে দেবে।

বলে দিলে দেবে। ওদের যা খুশি তা ওরা করবে। আমার কি বলার আছে?

আব্বাজান এই কথা শুনলে দুঃখ পাবেন।

গালিব গলার স্বর উঁচু করে বলেন, তাহলে তুমি গুছিয়ে ফেলো।

হায় আল্লাহ, আমার এমন বদনসীব।

উমরাও বেগম কাপড়গুলো গোছাতে শুরু করেন। গালিব দূরে দাঁড়িয়ে তার কান্নার ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনতে পান। বিরক্তিতে তার মেজাজ খচে থাকে। দুপদাপ করে উমরাওয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলেন, আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম বিবি।

স্বর্ণ মুদ্রা?

হ্যাঁ। মুদ্রাগুলো নেবে কিনা জানতে চেয়েছিলাম।

মুদ্রাগুলো আপনি ওইখানে রাখেন। আমি নামাজ পড়ে নেবো।

এখন নিতে অসুবিধা কি? আমি দিতে চেয়েছি।

চাইলেই আমার নিতে হবে নাকি?

হ্যাঁ হবে। এটা আমার হুকুম।

আমি দাসী না যে হুকুম পালন করবো।

উমরাও গালিবের মুখোমুখি দাঁড়ান।

গালিব স্ত্রীর এই ঔদ্ধত্যে বিস্মিত হন। যতোদিন তাঁরা দু'জনে আলাদা থাকতেন পরিবারের মুরুব্বিদের হুকুমে, ততোদিন তাঁর এক ধরনের অবাধ স্বাধীনতা ছিল। স্ত্রীর সঙ্গে এমন মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ না থাকায় বিতণ্ডাও হয়নি। এখন বুঝতে পারছেন জীবনযাত্রা অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে। আজকে যখন শরীর নিয়ে উৎসব পালনের কথা, তখনই সংঘাতের সূত্রপাতের শুরু। উমরাও গলার স্বর আর এক ডিগ্রি উঁচু করে বললেন, আমি আগে নামাজ পড়বো। আল্লাহর কাছে শোকর আদায় করবো।

তাহলে তুমি নামাজ পড়। আমার ঘুম পাচ্ছে।

ঘুম! উমরাও তীব্র দৃষ্টিতে তাকান।

তুমি তো জানো বিবি আমি ঘুমাতে ভালোবাসি।

আপনাকে আমি এতো বছর নামাজ পড়তে দেখিনি। ভেবেছি আমরা যখন

সংসার করতে শুরু করবো তখন থেকে আপনি নামাজ পড়বেন।

তাহলে আমি আমার ঘরে চলে যাই?

উমরাও দু'হাত দিয়ে গালিবকে বাধা দিয়ে বলেন, আপনি নিজের ঘরে গেলে আমার আব্বা দুঃখ পাবেন।

আচ্ছা ঠিক আছে। আমি আজ রাতে এখানে থাকবো। কিন্তু প্রতিদিন না। যখন খুশি হবে তখন।

হায় আল্লাহ আমার এমন বদনসীব।

গালিব বিছানার ওপর থেকে মখমলের চাদরটা টান মেরে উঠিয়ে মেঝেতে ছুঁড়ে দেন। তারপর বিছানায় ওঠেন। বালিশ টেনে শুতে শুতে বলেন, নামাজ পড়ে তাড়াতাড়ি আসো। নইলে তোমার আব্বাজান আবার দুঃখ পাবেন।

উমরাও বিস্ময়ে-বিমূঢ় হয়ে চেঁচিয়ে বলেন, কি বললেন?

গালিব কথা বলেন না। কোলবালিশ টেনে নিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে স্ত্রীকে পৃষ্ঠদেশ দেখান। উমরাও এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে নিজের পোশাক বদলিয়ে নামাজ পড়তে যান। গালিবের চোখে ঘুম নামার আগে তিনি ভাবলেন, এমন ধর্মপরায়ণ বিবি নিয়ে তিনি কতটা এগোতে পারবেন? এতো রক্ষণশীল মানুষ কি তাঁর স্বাধীনতা সহ্য করবেন? তিনি দ্বিধা নিয়ে চোখ বুঁজে থাকেন। তাঁর ঘুম আসে না। দিনভর তিনি ভেবেছেন আজ একটি আনন্দের দিন। কিন্তু কীভাবে পুরো বিষয়টির উত্তেজনা থিতিয়ে গেলো, বরং আনন্দের বদলে নিরানন্দে তিনি নিজেকে ডোবালেন। তিক্ত হয়ে গেলো শারীরিক সম্পর্কের সূত্র।

হাঃ শ্বশুরবাড়ি। হাঃ, নতুন আনন্দ।

কতোদিন কাটালেন দিল্লি শহরে! কতো নিষিদ্ধ আনন্দের স্বাদ একটু একটু করে পেতে শুরু করেছেন! উমরাও এর বাইরে এক পবিত্র চিন্তার মধ্যে আছে। যে স্ত্রীকে তাঁর এসবের বাইরে রাখতে হবে তাঁর শরীরের সবটুকু পাওয়া হবে কি!

হাঃ, ইলাহী বখশ খান! তিনি মঅরুফ ছদ্মনামে লেখেন। আর আমার তখল্লুস আসাদ। দেখা যাবে পাল্লা কার ভারী হয়। মঅরুফ অর্থ প্রসিদ্ধ, আসাদ অর্থ সিংহ।

গালিব ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন উমরাও তখনো জায়নামাজে। দু'হাত তুলে দোয়া মাঙছেন।

গালিব আবার ঘাড় ফেরালেন। ভাবলেন, কবি মঅরুফ তাঁকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন। ছেলের মতো আদর করেন। শ্বশুরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অনেক উদার। খানিকটা বন্ধুত্বের মতো। তাঁকে নির্দিষ্ট সময়ে ভাতা দিতে কোনো

কার্পণ্য করেন না।

মাঝে মাঝে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে বলেন, নাও, খরচ করো। এই বয়সে অর্থ ব্যয় করা শিখতে হয়। এই বয়সে অর্থ ব্যয় করতে না পারলে মন ক্ষুদ্র হয়ে থাকে। ক্ষুদ্র মন নিয়ে বড় গজল লেখা যায় না।

গজল! ওহ্ গজল! গজলই জীবনের সবচেয়ে বড় সঙ্গী। বিছানার সঙ্গী গজলের জায়গা কখনো নিতে পারে না। বিছানার সঙ্গী গজলের মতো মায়াবী হতে পারে না। বরং শরাব আর তাওয়ায়েফদের রঙিন নেশার মধ্যেই গজলের পঙ্‌ক্তি খোলে বেশি। এর মধ্যে দু'একজন তাওয়ায়েফের সঙ্গে তো তার দেখা হয়ে গেছে। ওদের হাত ধরে ঘুঙুরের ঝঙ্কার শোনা হয়ে গেছে। উমরাও আর কিইবা দিতে পারবে তাকে।

তাওয়ায়েফের ভাবনার মাঝে তাঁর চোখ বুজে আসে। তন্দ্রার আচ্ছন্নভাব কেবল লাগতে শুরু করেছে তখন অনুভব করলেন পিঠে উমরাওয়ের হাত।

ঘুমিয়েছেন?

তিনি সাড়া দেন না। ভাবেন, উমরাও আর একটু এগিয়ে আসুক।

ঘুমিয়েছেন?

তিনি পাশ ফেরেন।

উমরাও মৃদু হেসে বলেন, নামাজ পড়ে আমার মন অনেক শান্ত হয়েছে।

খোদাতালার কাছে কি দোয়া চাইলে?

যেন শান্তির সংসার পাই। যেন সৎ ভালো মানুষ স্বামী পাই। স্বামী যেন নেকবান হন।

এটুকু বলে উমরাও থামলে তিনি তার হাত মুঠিতে ধরে বললেন, আর কিছু চাওনি? বালবাচ্চা চাওনি?

চেয়েছি।

বেটা না বেটি?

বেটাও চেয়েছি, বেটিও চেয়েছি।

কয়জন চেয়েছো?

দশজন।

দশজন? গালিব উঠে বসেন।

উমরাও মৃদু হেসে বলেন, আপনি কয়জন চাইতেন?

আমি, আমি সাতজন চাইতাম।

আমিও এখন থেকে সাতজন চাইব। আল্লাহ যেন আমাদের দুজনের ইচ্ছা পূরণ করেন।

গালিব মৃদু হেসে তাঁকে বুকে টানেন।

এভাবেই শারীরিক সম্পর্কের সূচনা, প্রেম থেকে নয়—প্রয়োজন থেকে। প্রয়োজন যৌনজীবন এবং বংশরক্ষার। সংসার গড়ে তোলার আদিম এবং অকৃত্রিম বাসনা থেকে। তারপরও দুজনে দুই জমিনের বাসিন্দা রয়ে গেলেন। যেটুকু কাছে আসা দরকার সেটুকুই কেবল।

ভোর হলো। ঘুম ভাঙলে গালিব দেখলেন উমরাও তাঁর দিকে পিঠ ফিরিয়ে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছেন। হাঁটু মোড়ানো, বুকের কাছে জড়ো করা। হাত দু'টো হাঁটুর সঙ্গে লাগানো। তিনিও উমরাওয়ের দিকে পিঠ ফিরিয়ে শুয়ে ছিলেন। দুজনের পিঠ দুজনের সঙ্গে লেগেছিল। তিনি উমরাওয়ের ঘুম না ভাঙিয়ে উঠে পড়লেন। বেশ ভালো ঘুম হয়েছে। শরীর ঝরঝরে লাগছে। ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে স্ত্রীকে দেখলেন। দিল্লি শহরে আসার পরে স্ত্রীকে ভেবেছিলেন পায়ের বেড়ি, আজকের রাতের পরেও সে ধারনা তাঁর ভাঙলো না। তিনি বুকের ভেতরে এই চাপা অনুভব নিয়ে দরজা খুললেন। দিনের স্নিগ্ধ বাতাস গায়ে মাখলেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপরূপ ভোর দেখলেন। কিন্তু বুকের ভেতর থেকে কারাগার এবং পায়ের বেড়ি শব্দগুলো উড়িয়ে দিতে পারলেন না। দেখলেন সেগুলো স্থায়ী হয়ে আছে। তিনি স্ত্রীর ঘরের দরজা টেনে দিয়ে বহির্মহলে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। পেছনে ফিরে একবার তাকালেন।

আজ থেকে অন্দরমহলে যাতায়াত অবাধ হয়ে গেলো। তবে শ্বশুরবাড়িতে আর নয়। নিজের বাড়ি করতে হবে। একটি ভাড়া বাড়ি খুঁজে দেখা দরকার। শুনলেন বাতাসে ভাসছে শের :

'রও মে হ্যায় রখ্‌শ—এ উমর কঁহা দেখিয়ে থমে
ন হাথ বাগ পর হ্যায়, ন পাও হ্যায় রকা সে।
ছুটে চলেছে জীবনের ঘোড়া, কে জানে কোথায় থামবে
না আছে হাতে লাগাম, না পা আছে রেকাবে।'

সাত দিনের মাথায় আগ্রা থেকে ছেলেবেলার বন্ধু কানহাইয়ালাল এলো বেড়াতে। বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে গালিব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

কেমন আছো বন্ধু?

ভালো খুব ভালো। যমুনা নদীর স্রোতের মতো ভালো আছি।

ছোটবেলায় আমরা এভাবেই কথা বলতাম।

তোমাকে জিজ্ঞেস করলে তুমি বলতে—

থাম, থাম আমি বলি। গালিব হাসতে হাসতে বলেন, আমি বলতাম ঘুড়ি

ওড়ানোর মতো ভালো আছি। আর বংশীধর বলতো, আমি দাবা খেলার মতো ভালো আছি।

দু'বন্ধু হাসিতে ঘর ভরিয়ে ফেলে।

আমাদের স্মৃতিগুলো এখনও ভীষণ তাজা।

আমাদের স্মৃতিগুলো খুব সুন্দর।

এসো আমরা দাবা খেলি। গালিব দাবার ঘুঁটি সাজান।

কানহাইয়ালাল দাবার বোর্ডের অপর পাশে বসে। বলে, দাবা খেলা আমাদের নেশার মতো ছিল।

আমাদের মধ্যে পাকা ওস্তাদ ছিল বংশী।

ও এখনো রোজ দাবা খেলে। মাঝে মাঝে খেলায় বসলে ওর রাতও চলে যায়।

কানহাইয়ালাল দাবার ঘুঁটি জড়ো করে রাখে বোর্ডের ওপর।

খেলবে না?

না। আমরা গল্প করবো।

তখন বাড়ির ভেতর থেকে খাবার আসে দুজনের জন্য। নানারকম খাবার। কানহাইয়ালাল হাসতে হাসতে বলে, বাব্বা এতো খাবার! তুমি কি রোজ খাও বন্ধু?

খাই তো। গোশত না খেলে আমার হয় না। গোশতো আমার রোজ চাই।

সেজন্য এমন টগবগে সুন্দর চেহারা হয়েছে। তোমার দিকে তাকালে চোখ ফিরতে চায় না। তোমার বিবি কি বলে?

ও আর বলবে কি। ও তো আমার পায়ের বেড়ি। সেজন্য এই শহর আমার কারাগার।

কিন্তু আমি তো দেখেছি তুমি অনেক স্বাধীনতা ভোগ করো। যতোবার দিল্লি এসেছি ততোবারই দেখেছি তোমার স্বাধীনতার শেষ নাই।

স্বাধীনতা! পায়ে বেড়ি থাকলে স্বাধীনতা থাকে না।

থাক, এসব কথা। এসো খাওয়া-দাওয়া করি আর ছোটবেলার কথা বলি।

দু'জনে রুটি-মাংস খায়। নানারকম হালুয়া খায়। ফল খায়। শরবত খায়। মনের সুখে খেয়েদেয়ে কানহাইয়ালাল রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বলে, অনেকদিন পরে পেটপুরে ভালো ভালো খাবার খেলাম। তুমি খুব সুখে আছ বন্ধু।

বেশিদিন শ্বশুরবাড়িতে থাকবো না।

কেন?

এখন নিজের সংসার আলাদা করতে হবে তো। বিবি বলেছে, তাড়াতাড়ি

বাড়ি ভাড়া করতে।

বাড়ি ভাড়া করলে খাওয়া-দাওয়ার কমতি হওয়ার তো কথা নয়। তখন তোমার বিবি রাঁধবে।

হ্যাঁ, রাঁধবে তো। বাল-বাচ্চা হবে। সংসার ভরে উঠবে। বলেই হাসেন গালিব। সঙ্গে কানহাইয়াও হাসে। হাসতে হাসতে বলে, তোমার কবিতা তো থাকবে সংসারে? নাকি কবিতা লেখা ছেড়ে দেবে?

কবিতাই আমার সঙ্গী। যেখানেই যাই কবিতা আমার সঙ্গে থাকবে। অন্য যা কিছুই হারাই না কেন, কবিতা কখনো হারাবো না বন্ধু।

মনে আছে ঘুড়ি ওড়ানো নিয়ে তুমি আট-নয় বছর বয়সেই কবিতা লিখেছিলে।

ঘুড়িগুলো আকাশে এলোমেলোভাবে ওড়ে। ঘুড়ির কোনো ঠিকানা থাকে না। তা নাহলে যাদের হাতে নাটাই থাকে তাদের ইচ্ছামাফিক ঘুড়িগুলো ঘুরপাক খায়। যেন নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওড়াউড়ি। সুতোর টান যার হাতে তার হাতেই ধরা থাকে ঘুড়ির পায়ের বেড়ি। ঘুড়ি উড়ানো বেশ মজার খেলা ছিল কানহাইয়া।

তোমার কাছে তা শুধু খেলা ছিল না, ছিল কবিতাও। মনে আছে তোমার সেই মসনবীর দুটি পঙ্‌ক্তি?

কোনটা বলো তো, ভুলে গেছি।

ঘুড়ি ওড়া দেখে তুমি লিখেছিলে :

'আমার বন্ধু আমার গলায় একটা সুতো বেঁধে দিয়েছে
তার ইচ্ছে মতো নিয়ে যায় যেখানে খুশি।'

হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে। আমি তো ওই মসনবীর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আহ বন্ধু তুমি আমাকে গভীর আনন্দ দিলে, হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার আনন্দ। মনে হচ্ছে আমি যেন সাত রাজার ধন মানিক পেয়েছি।

এই দেখো তোমার উর্দু কবিতাটি আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।

কানহাইয়া কবিতাটি পকেট থেকে বের করে গালিবকে দেয়। পুরনো কাগজটি দু'হাতে ধরে গালিব চুমু দেয়। এরপর নিজের লেখার খাতার ভেতরে ঢুকিয়ে রাখে।

এবারে আমার দিল্লি আসা সার্থক হয়েছে মির্জা নওশা। তোমার এমন পূর্ণ খুশি মুখ আমি আগে দেখিনি।

গালিব বন্ধুকে জড়িয়ে ধরেন। তার গভীর আন্তরিক স্পর্শ কানহাইয়াকে অভিভূত করে। তিনি বুঝতে পারেন কবিতার সঙ্গেই মির্জা নওশার প্রেম বেশি।

জীবনের বাকিটুকু কবিতাকে কেন্দ্র করেই ঘুরপাক খায়। ও কি পারবে নিজেকে এভাবে ধরে রাখতে? কানহাইয়া দ্বিধা কাটিয়ে ভাবে, পারবে। পারবে বলেই ওর সময় ওকে ছেড়ে এগিয়ে যাচ্ছে। মনে মনে বলে, বন্ধু তুমি ভালো থাকো।

দু'টো দিন হাওয়ার বেগে উড়ে যায়। অনেক রাত পর্যন্ত দুজনের দাবা খেলা চলে। গালগল্প চলে। একসময় খেলা বন্ধ করে গালিব শের লেখেন। বন্ধুকে পড়ে শোনান। তারপর বন্ধুকে বলেন, আমার বাপদাদার হাতে ছিল তলোয়ার। আমি সেটাকে কলম বানিয়েছি। আমার সামনে যুদ্ধ নাই, রক্তপাত নাই, মৃত্যু নাই। আমার কলমে আছে প্রেম। প্রেম দিয়ে জয় করবো দুনিয়া।

আগ্রা ফেরার পথে কানহাইয়ার মনে হলো ছোটবেলার বন্ধু মির্জা নওশাকে এবার অন্যরূপে দেখা হলো। ও আর আগের মির্জা নাই। ও এখন সামনেই এগিয়ে যাবে। আর পেছন ফিরে তাকাবে না।

বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় গালিব ওকে বলেছেন, আগ্রায় গিয়ে আম্মাজানকে বলো আমি শিগ্রি তাঁকে দেখতে আসবো। আম্মা যেন আমার জন্য দোয়া করেন।

কানহাইয়া কালেমহলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে শুনতে পায় কান্নার শব্দ। সে চমকে ওঠে। যে মাকে ছেলের খবর দেয়ার জন্য এসেছে সে খবর কি দেয়া হবে না? মা কি তার ছেলের জন্য আর অপেক্ষা করে নেই?

ভেতরে ঢুকে আত্মীয়-পরিজনের ভিড় দেখে বুঝল, তার আশঙ্কা সত্যি। মির্জা নওশা মাকে হারিয়েছেন। কানহাইয়াকে দেখে বাড়ির একজন পরিচারক এগিয়ে এলো।

আপনি না দিল্লি গিয়েছিলেন? কবে এলেন?

আজকে। এক্ষুণি। মির্জা নওশার খবর দিতে এসেছিলাম তাঁর আম্মাজানকে।

তিনি আজ ফজরের আজানের সময় ইন্তেকাল করেছেন। আছরের সময় জানাজা হবে।

কানহাইয়ালাল নিজের সঙ্গেই বলে, আজ থেকে আগ্রা তোমার জন্য অন্ধকার হয়ে গেলো বন্ধু। তুমি আর ঠিকমতো যমুনা নদী দেখতে পাবে না। ঘুড়ি-ওড়ানোর শৈশবটি কি মনে রাখতে পারবে?

কানাহাইয়ালাল দু'হাতে চোখ মুছতে মুছতে বাড়ি ফেরে। অনেক রাতে গালিবকে চিঠি লিখতে বসে।

একদিন নওয়াব আহমদ বখ্‌শ খাঁ নিজেই বললেন, ছেলেটি তো বেশ লিখছে। শেরগুলো চমৎকার। বাদশাহর দরবারে ওর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। দু'একবার মুশায়রায় বসতে পারলে জ্ঞানী-গুণীজনের চোখে পড়বে। বাদশাহর নজরেও পড়বে।

ইলাহি বখশ খান গালিবের প্রশংসা শুনে খুশি হন। তিনি জানেন আহমদ বখশ পারবে গালিবের একটা ব্যবস্থা করতে। দরবারে আহমদের ভালো প্রভাব আছে। নওয়াব আহমদের আশ্বাসে গালিব তো ভীষণ খুশি। নিজে নিজে ঠিক করলেন ভালো করে ফারসি ভাষা শিখবেন। আগ্রায় তার ওস্তাদ ছিলেন আবদুস সামাদ। তিনি তাঁকে ভাষাটা শিখিয়েছিলেন। খোদ পারস্য থেকে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু কবিতা লেখার মতো ভাষাজ্ঞান হয়নি তাঁর। আরও ভালো করে শিখতে হবে।

গালিবের এমন ইচ্ছার কথা শুনে ইলাহি বখশ সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বললেন, তুমি ঠিকই চিন্তা করেছো।

আব্বাজান আমার মাতৃভাষা তো তুর্কি, সেজন্য ফারসি ভালো করে শেখা দরকার।

হ্যাঁ, তা ঠিক। তাছাড়া ইসলামি দুনিয়ার সাহিত্যের ভাষা ফারসি। ইসলামি দুনিয়ার জ্ঞানীগুণীর সামনে তোমার গজল পৌঁছাতে হলে ফারসিতে লিখতে হবে। হিন্দুস্থানের সরকারি ভাষাও ফারসি। সেজন্যও ভাষাটা ভালো করে শেখা দরকার।

ঠিক বলেছেন আব্বাজান।

আমি তোমার জন্য একজন শিক্ষক ঠিক করে দেবো। দেখবো তিনি যেন তোমাকে দর্শন, চিকিৎসা, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদিও শেখান।

গালিব শ্বশুরের সামনে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেও মনে মনে বলেন, আমি কবিতার জন্য ফারসি শিখতে চাই। কবিতাই আমার শেষ কথা।

কয়েকদিনের মধ্যে মুহম্মদ মুয়াজুম তাঁর শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। শুরু হলো নতুন জীবন। মনপ্রাণ দিয়ে শেখার চেষ্টা করেন। ফারসি ভাষার কবি শওকত বুখারি, অসীর ও বেদিল তার প্রিয় কবি হয়ে গেলেন। বিশেষ করে বেদিল হলেন সবার মধ্যে বেশি পছন্দনীয়। তিনি নিজে নিজে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। ফারসি কবিতার জন্য অনুসরণ করলেন বেদিলকে। তাঁর আসল নাম অনুযায়ী কবিতার তখল্লুস হলো আসাদ। ফারসি কবিতার শব্দ ও শৈলী উর্দু কবিতায় ব্যবহার করার ফলে বেশ ভিন্ন প্রয়োগ ঘটলো। তিনি দেখলেন তাঁর কবিতার ভক্ত যেমন

তৈরি হলো, তেমনি নিন্দুকও। তাঁর মজাই লাগলো। দিল্লির জ্ঞানীগুণীর দৃষ্টিতে তাঁর কবিতা পড়েছে, এটাই ঘটনা। ফারসি শেখার পাশাপাশি কবিতার এই নতুন যাত্রায় তাঁর দিন বাতাসের বেগে ধেয়ে চলে।

কিন্তু গোল বাধে অন্দরমহলে।

স্বামী ঠিকমতো তাঁর ঘরে আসেন না! মাঝে মাঝে রাতগুলো বহির্মহলে নিজের ঘরে কাটিয়ে দেন। গালিব হাত-পা নেড়ে বোঝানোর ভঙ্গিতে বলেন, বিবি আমার এখন অনেক কাজ।

কাজ? উমরাও চোখ কপালে তোলেন। অভিজাত পরিবারের আবার কাজ কি? তাঁদের চাকর-নফররা কাজের জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

গালিব গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, কবিতাও লিখে দেবেন?

কবিতা? উমরাও চোখ গরম করেন। অভিজাতরাও কবিতা লেখেন। চাকর-নকররা কবিতা লেখে শুনলে আব্বাজান কষ্ট পাবেন। আব্বাজানও কবি।

গালিব হাসলেন। উমরাও বিরক্তির স্বরে বলেন, সংসারে আপনার মন নাই।

মন থাকবে না কেন? মন অবশ্যই আছে।

আপনি বেহিসাবে টাকা খরচ করেন।

টাকা খরচ করতে আমি ভালোবাসি। দরকার হলে আমি ঋণ করে ঘি খাবো।

আমাদের সংসারে মেহমান আসছে। সন্তানের জন্য খরচ আছে।

উমরাও লাজুক ভঙ্গিতে বলেন।

গালিব দু'হাতে উমরাওয়ের হাত ধরে বলেন, ওর জন্য ভাবতে হবে না। সন্তানের খরচ আমি ঠিকই রাখবো।

সন্তানের খবরে আপনি খুশি তো?

খুশি, খুশি। ভীষণ খুশি।

কিন্তু আপনি ওর দিকে ঠিকমতো নজর দিচ্ছেন না।

তোমার কি খেতে ইচ্ছা করছে বলো আমাকে।

উমরাও অন্যদিকে মুখ ঘোরান। তাঁর আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। মানুষটি গত তিন দিন তাঁর কাছে আসেননি। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। নিজের ফারসি শিক্ষা, নিজের কবিতা। ইদানীং শুনতে পান তিনি তাওয়াফদের ঘরে যাতায়াত করেন। সত্যি-মিথ্যা আল্লাহ মালুম। মিথ্যা হলে উড়া উড়া খবর তার কাছে আসবেইবা কেন?

কি হলো এমন চুপ হয়ে গেলে যে?

আমার আলাদা করে কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না। আমি তো সবই খাচ্ছি। যখন যা চাই আম্মাজান নিয়ে আসেন।

আচ্ছা, ঠিক আছে আমি তোমার জন্য আম নিয়ে আসবো।

না, না, লাগবে না।

তুমি আঁতকে উঠলে কেন?

উমরাও নিম্নকণ্ঠে বলেন, আমি আম খেতে ভালোবাসি না।

আজ রাতে আমি তোমার সঙ্গে থাকবো।

আমার শরীর ভালো লাগছে না। আম্মাজান একজন দাসীকে আমার ঘরে ঘুমাতে বলেছেন।

ওহ, আচ্ছা।

গালিব আর কথা না বলে বেরিয়ে আসেন। বুঝতে পারেন উমরাওয়ের মনের সুতো কোথাও কেটে গেছে। ওটা এখন গোত্তা খাওয়া ঘুড়ির মতো কোথাও মুখ থুবড়ে পড়বে।

কয়েকদিন পরে বন্ধু হুসাম-উদ-দৌলা খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে গালিবের বাড়িতে এলেন। তিনি নিজেও কবি। গালিবের কবিতার ভক্ত। তার কবিতার নতুন কাব্যরীতি হুসামকে মুগ্ধ করে। তিনি গালিবের কবিতা সে সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ গজল রচয়িতা মীর তকী মীরকে দেখাতে লক্ষ্ণৌতে নিয়ে যান। তিনি কবিতা পড়ে উচ্ছ্বসিত হন। বলেন, এই ছেলের একজন ওস্তাদ মিললে ও অসাধারণ কবি হবে। নাহলে ও হয়তো পথ হারিয়ে ফেলতে পারে।

ওহ, মীর তকী মীর! আমার প্রিয় কবি।

গালিব হুসামকে জড়িয়ে ধরেন।

আমি খুব খুশি বন্ধু, তুমি আমার কবিতা মীর তকী মীরকে দেখাতে নিয়ে গেছো। আমি তার মূল্যবান মত পেয়ে আস্থা পাচ্ছি। এখন অনায়াসে বলতে পারবো :

হৈঁ অওর-ভী দুনিয়া-মেঁ সুখনবর বহুঃ অচ্ছে।
কহতে হৈঁ কেহ গালিব-কা অন্দাজ-এ বঁয়া অওর॥

'দুনিয়াতে খুব ভালো কবি আরও আছেন
লোকে বলে গালিবের বলার ভঙ্গিই আলাদা ॥'

হা-হা হাসিতে উচ্ছ্বাস ছড়ান তিনি।

মীর তকী বলেছেন ওস্তাদ পেলে তুমি সিধে রাস্তায় থাকবে।

যে কবির এতো ভালো বন্ধুরা আছে তাঁর ওস্তাদ লাগে না। আমি পারবো বন্ধু।

তাহলে চলো তাওয়াফদের বৈঠকখানায় জমিয়ে আড্ডা দেবো।

তুমি শরবত আর ফল খাও। আমি পোশাক বদলে আসছি।

তুমি তো বন্ধু পোশাক-বাহাদুর হয়েছো।

আমি তো সবার থেকে আলাদা হতে চাই। অন্যরা যে পোশাক পরে আমি তা পরবো কেন? শহরের সবাই আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে বন্ধু। বলবে, হ্যাঁ গালিবই পারে নিজেকে অন্যদের চেয়ে অন্যরকম রাখতে।

হুসাম মৃদু হেসে শরবতের গ্লাস মুখে তোলে।

গালিব অন্য ঘরে যান।

তাঁর নিজস্ব ধারার কলাহ টুপি, পায়জামা ও মিহি সুতার কুর্তা পরেন।

গায়ে সুগন্ধী মাখেন। ভাবেন তাওয়াফদের তন্বী শরীর আর টানা চোখের অপার বিস্ময় বিমুগ্ধতা তাকে ঘিরে উপচে পড়ে। তিনি আলোড়িত। সেই সঙ্গে শরাব তাঁর তৃষ্ণা মেটায়। জীবনের মাধুর্য তো তিনি বুঝতে শিখে গেছেন। তবে কেন উপভোগ করবেন না। নিজের শের বলতে থাকেন গুনগুনিয়ে :

'তুমি যেন আমার কাছেই থাকো
যখন আর কেউ থাকে না ॥'

এই তো বছর কয়েক আগে যখন তিনি একা একা পথে হাঁটতেন, যখন পালকির ব্যবহার তেমন বাধ্যতামূলক ছিল না, তখন একজন মুরশিদ তাকে বলেছিলেন, শোনো, সবকিছু নিষেধের পক্ষে আমি না। বিধিনিষেধ জীবনের অনেক আনন্দ নষ্ট করে। শোনো মিয়া, বুঁদ হয়ে যেতে আমি বারণ করি না। বারণ করা উচিত বলে মনে করি না। নেশা করো, ইচ্ছামতো পান করো, খাও, মজা করো—আনন্দে ডুবে যাও। মনে রেখো আনন্দ করার কৌশল শিখতে হবে। ভুল করা চলবে না। মনে রেখো বুদ্ধিমান মাছি মধুতে বসে না। কারণ মধু তাকে ডুবিয়ে দিতে পারে। আটকে গেলে ওড়ার সাধ্য থাকে না। বুদ্ধিমান মাছি বসে মিছরিতে।

আহ্, কি গভীর উপদেশ। আমি তো তার উপদেশ মতো চলতে শিখেছি। আমি জানি তাওয়াফদের কাছে কতোটুকু যেতে হবে, কতোটুকু হবে না। আমি জানি উমরাও আমার পায়ের বেড়ি—স্বাধীনভাবে হাঁটতে পারি না—পা আটকে যায়। তারপরও ওকে নিয়েই তো আমার সংসার। কিন্তু আমার আনন্দ উদযাপনের কোনো জায়গা বাদ দিয়ে আমার সংসার না।

সেদিন অনেক রাতে বাড়ি ফিরলেন পুরো মাতাল হয়ে। মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরা সেদিনই প্রথম।

কয়েকদিন পরে সন্তান প্রসব করলেন উমরাও বেগম।

বাড়িতে আনন্দের জোয়ার।

ইলাহি বখশ খুশি হয়ে বললেন, মির্জা নওশা তুমি পিতা হয়েছো। আল্লাহর কাছে শোকর আদায় করো।

আমি তো নামাজ পড়ি না আব্বাজান।

নফল নামাজ পড়ে শোকর আদায় করো। আমি তো জানি তুমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ো না।

গালিব আর কথা না বাড়িয়ে শ্বশুরের সামনে থেকে সরে গেলেন। ঘরে ফিরে ভাবলেন, তিনি একটি শের লিখবেন। কিন্তু সন্তান লাভের আনন্দ প্রকাশের জন্য তাঁর কোনো শের বা মসনবী মাথায় এলো না। তিনি দোয়াত-কলম রেখে দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

কুফরি চাঁদ রেকাবি ভর্তি মণ্ড-মিঠাই নিয়ে এলো। বললো, হুজুর খান।

খাবো? আমি তো এখনো বাচ্চার মুখ দেখিনি।

বাড়ির দাসীরা কখন আপনাকে বাচ্চার মুখ দেখাবে, কে জানে। দু'চার পাঁচ দিন তো চলেই যাবে।

এতোদিন পর? আজ দেখতে পারো না?

মনে হয় না। এ বাড়ির নিয়ম তো এমনই। তবে আপনার শ্বশুর আপনাকে ছেলের মতো ভালোবাসেন। তিনি ইচ্ছা করলে আগে দেখাতেও পারেন। আল্লাহ মালুম। বাচ্চার জন্য দোয়া করেন হুজুর।

দোয়া! হ্যাঁ দোয়া তো করছি।

নামাজ পড়েন। মিঠাই খান হুজুর।

কুফরি চাঁদ মিষ্টি বোঝাই রেকাবি রেখে চলে যায়।

গালিব গালে হাত দিয়ে বসে থাকেন। ভাবেন, সংসারে নতুন মানুষ এসেছে। এবার নিজের ঘর গোছাতে হবে। শ্বশুরবাড়িতে আর বেশি দিন থাকা ঠিক নয়। কথাবার্তায় শুনতে পাচ্ছেন তাঁর চাচা-শ্বশুর নওয়াব আহমদ বখশ খান নওয়াবী ছেড়ে দেবেন। তখন হয়তো নওয়াব হবেন তাঁর বড় ছেলে শামস-উদ্-দিন। আমিন-উদ্-দিন ও জিয়া-উদ্-দিন তার বৈমাত্রেয় ভাই। এই দুই ভাইয়ের সঙ্গে শামস-উদ-দিনের সম্পর্ক ভালো না। গালিবের বন্ধুত্ব আমিন ও জিয়ার সঙ্গে। শুধু বন্ধুত্ব বললে কম বলা হবে, প্রবল ঘনিষ্ঠতা দু'ভাইয়ের সঙ্গে বেশি। তারাও তাকে ঘনিষ্ঠ আপনজন মনে করে। নিজেরা যে জ্ঞানের চর্চা করে তার সাথী মনে করে। মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে প্রবল আড্ডা হয়। সে আড্ডা মন ভরিয়ে দেয় গালিবের। নিজেকেই বলেন, কবিতার আড্ডার চেয়ে আর বড়

কি আছে তার জীবনে!

মিষ্টি খেতে পারছিলেন না। ভাবলেন সন্তানের মুখ না দেখে মিষ্টি খাবেন না।

মনও খারাপ হয়ে থাকলো। কিছু লিখতে পারলেন না।

বিকালে তাঁর জন্য একটা সুন্দর কুর্তা নিয়ে এলো জিয়া-উদ্-দিন।

হাসিমুখে বললেন, পিতা হওয়ার উপহার। পিতা হওয়ার গৌরব নিয়ে আনন্দ করুন মির্জা নওশা। যান, কুর্তাটা পরে আসুন।

আপনার বোন কোনো উপহার পাবে না?

পাবে, নিশ্চয়ই পাবে। ওর জন্য মোতির মালা এনেছি। আমার স্ত্রী নিজের হাতে মালাটি পরিয়ে দেবে বলে নিয়ে গেছে। আমাদের পরিবারে একজন নতুন শিশু ও এনেছে।

গালিব হাসতে হাসতে অন্য ঘরে গিয়ে নতুন কুর্তা পরে এলেন।

জিয়া-উদ্-দিন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, বাহ, খুবসুরত। মির্জা নওশা আপনার সৌন্দর্য ফেটে পড়ছে। আপনি যখন কলাহ টুপি, মিহি নয়নসুখের কুর্তা পরে কোনো মুশায়রায় যান, তখন পালকি থেকে নামার সময় দাঁড়িয়ে থাকা সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। কারো দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরতে চায় না। যতোক্ষণ আপনার ওপর ধরে রাখা যায় ততোক্ষণ আপনার ওপরই থাকে।

গালিব মৃদু হেসে চুপ করে থাকেন।

জিয়া আরও বলেন, আল্লাহ আপনাকে শারীরিক সৌন্দর্য দিয়েছে, আবার কবিতার মেধা দিয়েছে। আপনি আল্লাহর কাছ থেকে সব পেয়েছেন। শোকর গোজারি করবেন মির্জা সাহিব।

গালিব এবারও চুপ করে থাকেন।

কুফরি চাঁদ রেকাবিভরা মণ্ডা-মিঠাই নিয়ে আসেন। জিয়া-উদ্-দিন ছোট রেকাবিতে মিষ্টি নিয়ে বলেন, আসুন বাচ্চার জন্য দোয়া করি।

এবার আর গালিব মিষ্টি না খেয়ে পারলেন না। বেশ অনেকগুলো মিষ্টি খেয়ে ফেললেন। তারপর আফসোস করে বললেন, এখনো বাচ্চার মুখই দেখিনি।

দেখবেন, দেখবেন। এতো তাড়া কিসের। আমি তো আমার সন্তানকে দেখেছি দিন পনেরো পরে।

হা-হা করে হাসে জিয়া। গালিব হাঁ করে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন। জিয়ার হাসির শব্দ তার কানে মধুর ধ্বনি তোলে। জিয়া ফারসি এবং উর্দু ভাষায় লিখছে। উপন্যাস লেখার চিন্তা করছে। কবিতা লিখছে। ও শুধু কবি না, ও

অনেককিছু হতে চায়। ইতিহাস, ভূগোল, নৃ-তত্ত্ব, শব্দজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে জানার জন্য পড়াশোনা করেন। এতো মনোযোগী লোক তার চারপাশে নেই। তিনি নিজেও তো এতো পড়াশোনা করেন না। বই কেনেন না। ধার করে বই আনেন।

কি ভাবছেন মির্জা নওশা?

কিছু না।

সন্তানটি কবে দেখবেন এই চিন্তা মাথায়?

তাও না।

তাহলে কি? আচ্ছা আমি যাই।

জিয়া-উদ্-দিন চলে যাবার পরও গালিব বসে থাকেন। গালিব জানেন, জিয়া তার চাইতে ভালো ফারসি জানেন। গালিব ঠিক করলেন জিয়ার সম্মানে কসীদা লিখবেন। সুন্দর কসীদা, যেন নওয়াব জিয়া-উদ্-দিন ওই কসীদা পড়ে ধন্য হয়ে যায়।

কালির দোয়াত আর কলম খুলে বসলেন। কিন্তু লেখা হলো না। বুঝলেন, মাথা কাজ করছে না।

কয়েকদিন পরে খবরটি তাঁকে দিলেন ইলাহি বখশ খাঁ।

ভোররাতে মারা গেছে তোমার সন্তানটি।

মারা গেছে? কি অসুখ করেছিল?

কোনো অসুখ করেনি।

অসুখ করেনি? আর আমার বাচ্চাটি মরে গেলো?

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যান গালিব। কাঁদতে পারেন না, চিৎকার করেন না। ক্রোধও প্রকাশ করতে পারেন না।

এখন আমি অন্দরমহলে যাবো।

ইলাহি বখশ কিছু বলার আগেই তিনি স্ত্রীর ঘরে আসেন। দু'হাতে দরজার খসখস সরান। মেঝেতে রাখা হয়েছে মৃত শিশুকে। পাশে উমরাও জায়নামাজের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদছেন।

কয়েকজন দাসী নিস্তব্ধ বসে আছে। তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়ায়। গালিব মৃত শিশুর পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসে মাথায় হাত রাখেন। তাকিয়ে থাকেন ওর মুখের দিকে। বোঁজা চোখ, মাথাভর্তি চুল।

একজন দাসীর দিকে তাকিয়ে বলেন, ওকে কেন ঢেকে রাখা হয়নি?

প্রত্যেকে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে উমরাও জায়নামাজের ওপর উঠে বসেন।

AMARBOI.COM

গালিব বলেন, তুমি তো আমাকে ডেকে ওকে দেখাতে পারতে বিবি?

আমার তবীয়ত ঠিক ছিল না।

উমরাও দুহাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে দেন। গালিব নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে আসেন। উমরাওয়ের শরীর ভাল ছিল না এ খবর কেউ তাঁকে দেয়নি। বহির্মহল-অন্দরমহলের টানাপোড়েনে তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি শ্বশুরবাড়ির বিধিনিষেধ উপেক্ষা করা। ঘরে ফিরতে ফিরতে ভাবলেন, তিনি নিজে কি নিজের কবিতা, মুশায়রা ইত্যাদি নিয়ে একটু বেশি ব্যস্ত না? হয়তো তাই। সেটিও একটি কারণ হতে পারে। তিনি বুকের ভেতরে ভার বোধ করলেন। সেদিন সন্তানের লাশ দাফন করে ফিরে আসার পরে নিজেকে একজন নিঃস্ব মানুষ বলে মনে করলেন তিনি। লিখলেন শের :

'আহত চোখের নৈরাশ্যের মহিমা জানে না আকাশ;

হেমন্তহীন বসন্ত বিফল দীর্ঘশ্বাসের মধ্যেই জন্ম নেয় ॥'

রাতে উমরাওয়ের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে দেখলেন ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। আজ এতো তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে গেলো উমরাও? বোধহয় শরীর খারাপ।

মৃদুস্বরে ডাকলেন, বিবি।

ভেতর থেকে কোনো সাড়া আসে না। দরজায় টুকটুক শব্দ করলেন।

দরজা খুললো একজন দাসী।

হুজুর। বেগম সাহেব ঘুমিয়ে গেছেন। বলেছেন, রাতে যেন ডাকাডাকি না করি। অনেক কান্নাকাটি করেছেন। কাঁদতে কাঁদতে—

আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন যাচ্ছি। সকালে আসবো।

দরজায় টাঙানো ভারি খসখসের আড়ালে দাসী বন্ধ করে দেয় দরজা। সেই শব্দ তাঁর মস্তিষ্কে আঘাত করে। তিনি খুব বিপন্ন বোধ করেন। বালিশে মুখ গুঁজে রাখলে রাত কাটে না। চারদিকে অন্ধকার গাঢ় হয়ে থাকে। ভাবলেন, দ্বিতীয় সন্তানটি আবার কবে আসবে?

দিন পনেরোর মাথায় ইলাহি বখশ তাঁকে ডেকে বললেন, মির্জা নওশা আমার এই বংশলতিকাটা নকল করে দাও।

জ্বী, আচ্ছা।

তিনি বংশলতিকার কপিটি হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলেন। তিনি জানেন তাঁর শ্বশুর কবি ও ধর্মগুরু। বিভিন্ন লোককে শিষ্য করেন। শিষ্য সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে তিনি তাঁর বংশলতিকা নানা তথ্যসহ শিষ্যদের মাঝে বিতরণ

করেন। যাতে তাঁর ব্যাপারে শিষ্যদের মনে কোনো ভ্রান্তি না থাকে। বংশলতিকার এক কপি সবাইকে দিতেন। সেজন্য তালিকা নকলের প্রয়োজন পড়ে।

তালিকা নকল করতে গালিব বিরক্ত বোধ করলেন। তিনি তামাশা করার জন্য এমনভাবে নকল শুরু করলেন যেন তাঁর শ্বশুর বুঝতে পারেন যে এই কাজটি তাঁকে করতে দেয়া ঠিক হয়নি। লতিকার প্রথম নামটি লিখে দ্বিতীয় নামটি বাদ দেন। এভাবে পুরো লতিকার সব নাম লিখলেন না। লিখলেন একটি বাদ দিয়ে আর একটি। নকলের এমন তামাশা দেখে ইলাহি বখশ তো রেগে আগুন।

ধমক দিয়ে বললেন, এ কি করেছো? এটা কেমন তামাশা হলো?

গালিব শ্বশুরের ক্রোধ গায়ে না মেখে স্বাভাবিকভাবেই বললেন, বংশ লতিকা নিয়ে আপনি কিচ্ছু ভাবেন না আব্বাজান। আসলে এই লতিকা তো খোদাতালা পর্যন্ত পৌছানোর একটা মই। মই বাওয়া তো সহজ কাজ। মাঝখান থেকে যে একটা সিঁড়ি সরিয়ে দিয়েছি এতে কিছু আসবে যাবে না। কারণ মানুষ তো লাফিয়ে লাফিয়ে উপরে উঠতে পারে।

খামোশ, মির্জা নওশা।

গালিবের নকল করা কাগজটি তিনি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেন।

তোমাকে কাজটি দেয়াই আমার ভুল হয়েছে। অন্য যে কেউই আমাকে কাজটি করে দেবে।

ইলাহি বখশ হনহন করে চলে যান। গালিব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। ভাবলেন, বেঁচে গেলাম। এমন একটি কাজ আমাকে দ্বিতীয়বার করতে হবে না। ওহ, বড় বাঁচা বেঁচে গেছি। কি যে ঝামেলায় পড়তাম এই বোঝা টানতে হলে।

ইলাহি বখশ একদিন আজাদ নামের একজনের একটি শের পড়ে একটু অবাক হলেন। খানিকটা হতাশও। মির্জা নওশা এমন দুর্বল একটি শের লিখেছে তা তিনি ভাবতে পারলেন না। তিনি তাঁর বৈঠকখানায় গালিবকে ডাকলেন।

আমাকে ডেকেছেন আব্বাজান?

হ্যাঁ, বোস। আমার খুব মন খারাপ হয়ে গেছে তোমার এমন একটি দুর্বল শের পড়ে।

গালিব শুকনো মুখে শ্বশুরের সামনে বসেন। তিনি আরও বলেন, কবি ফজলে হক বলেছে তোমার লেখার দুর্বোধ্যতার কারণে সমালোচনা হচ্ছে। তুমি তো জানো ফারসিতে অসাধারণ দখল আছে ফজলে হকের। ও ভবিষ্যতে পণ্ডিত হবে। ভালো কবিও হবে সন্দেহ নেই।

AMARBOI.COM

আমি তাঁর গুণমুগ্ধ।

বেশ বেশ। ওর সঙ্গে আলোচনা করে নিজের কবিতার সংশোধন করবে।

জ্বী, ঠিক আছে। আমার কোন শেরটির কথা আপনি বলছিলেন—

শোন, আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি। ইলাহি বখশ পত্রিকার পাতা উল্টিয়ে পড়লেন :

'আসাদ তুমনে বনাই যে গজল খুব
আর ও শের রহমৎ হ্যায় খুদা কী।
আসাদ যে গজল তুমি বানালে
সে যে করুণাময় ঈশ্বরের দান!'

এটি খুবই দুর্বল শের আসাদ, খুবই খারাপ।

গালিব দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, এটা আমার লেখা নয়। কখনোই না। এই আসাদ নিশ্চয়ই অন্য কেউ হবে।

এটা তো আরো খারাপ কথা। এই বাজে শের তোমার নামে চলে যাবে।

গালিব উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলেন, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার মনে হয় এটা আরও এমন হবে যে আমার ভালো লেখাগুলো ওর নামে চলে যাবে।

ইলাহি বখশ মাথা নেড়ে বললেন, ঠিক, ঠিক বলেছ। আমার মনে হয় তোমার নিজের অন্য একটি তখল্লুস ঠিক করতে হবে।

গালিব এক মুহূর্ত ভেবে বললেন, আমি এখন থেকে আমার ছদ্মনাম রাখবো গালিব।

ইলাহি বখশ নিজেই উচ্চারণ করলেন, গালিব। শব্দটা শ্রুতিমধুর মনে হলো। তিনি আবার উচ্চারণ করলেন, গালিব, গালিব। গালিব মানে বিজয়ী। ভালোই হবে, গালিবই রাখো। ভালোই শোনাচ্ছে।

আপনার পছন্দ হয়েছে?

এ নিয়ে আর বলার কিছু নাই। গালিবই শেষ কথা। এই নামেই তোমার খ্যাতি হবে। তুমি বিজয়ী হবে।

গালিব খুশি হয়ে নিজের ঘরে এলেন।

রাতে উমরাও তাঁকে গভীর আগ্রহে কাছে টানেন। দু'জনের বুকের ভেতরে সন্তান হারানোর কষ্ট। দুজনের বুকের ভেতরে হাহাকারের উথালপাতাল। দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে চোখ মোছেন। একসময় গভীর রাতের মায়াবি পরশ দু'জনকে স্বস্তি দেয়।

মাস দু'য়েক পরে খবর হয় উমরাও গর্ভবতী হয়েছেন।

গালিব সেদিন কুফরি চাঁদকে বলেন, আমার জন্য একটা বাড়ি খুঁজতে হবে

কুফরি চাঁদ।

এখান থেকে চলে যাবেন?

যাওয়াই তো উচিত। আর কতোদিন শ্বশুরবাড়িতে থাকবো। অনেক বছর থেকেছি।

কুফরি চাঁদ মাথা নাড়েন।

এই মহল্লাতেই বাড়ি দেখবো হুজুর?

দেখতে পারো। বিল্লিমাঁরো মহল্লা আমার ভালোই লাগে। তাছাড়া আমার বিবি হয়তো ওর আব্বাজানের বাড়ির কাছে থাকতে পছন্দই করবে।

কুফরি চাঁদ চলে গেলে গালিব ভাবলেন, তার জুয়াখেলার আড্ডাটা বিল্লিমাঁরোতেই জমে উঠেছে। নতুন জায়গায় গেলে আর একটি আড্ডা গড়ে তোলার হাঙ্গামা অনেক। কোতোয়ালি পুলিশ তো চোখে চোখে রাখে। ইলাহি বখশ প্রভাবশালী মানুষ। তিনি একদিকে কবি, অন্যদিকে ধর্মগুরু। তাঁর অনেক শিষ্য। সবাই তাঁকে পীরের মতো মানে। যাহোক, এভাবে সুযোগ নেয়া তাঁর ঠিক নয়। তিনি নিজেকে শাসন করলেন। তিনি খাঁটি কবি বলে অনায়াসে তাঁর তখল্লুস ঠিক করে দিয়েছেন। তিনি এখন মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব।

একই সঙ্গে তাঁর মনে হলো দুরকিজানের কথা। চমৎকার গজল গায়। অপূর্ব কণ্ঠস্বর। তেমন বিনয়ী এবং সুন্দরী। তিনি তাঁকে ডোমনি বলে ডাকেন।

তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে খোদাতালার মহিমার কথা স্মরণ করলেন। ভাবলেন, খোদাতালা দুরকিজানকে নিজের হাতে তৈরি করেছেন এবং শুধু এই গালিবের জন্য। সেজন্য দুরকিজান তাঁর প্রেমে মুগ্ধ। নিজের শের নিজেকেই শোনালেন:

'মনে পড়ে যায় কতো অতৃপ্ত বাসনার ক্ষতচিহ্ন বুকে রয়েছে;
হে ঈশ্বর, আমার কাছ থেকে পাপের হিসাব চেয়ো না ॥'

একটি শের গেয়ে নিজেকে শান্ত করতে পারলেন না। গাইলেন আরও একটি :

'ফুলবাগিচার রূপ দেখতে চাই, আবার ফুল তুলতেও চাই—
হে বসন্তের স্রষ্টা, আমার মন পাপী।'

গুনগুন করতে করতে পায়চারি করলেন। কতোটা সময় কেটে গেলো হিসাব করতে পারলেন না। কতোটা সময় কখন যায় সে হিসাব রাখা কঠিন। কতোটা সময় নিজের খুব আপন হয়ে ওঠে সে হিসেবেও মেলে না। বড় যন্ত্রণা, বড় টানাপোড়েনে দিনের আয়ু ফুরোয়। শুধু জেগে থাকে গজল। তাঁর প্রিয় কবিতা এবং বুকের ভেতরে আলো জ্বালিয়ে রাখা গভীর এবং অন্তবিহীন সময়।

সে সময়ে ফজলে হক আসেন। তিনি এসেছেন ইলাহী বখশের কাছে।

কিন্তু তাকে শিষ্য পরিবেষ্টিত দেখে গালিবের ঘরে আসেন।

কেমন আছেন মির্জা নওশা?

আমি ভালোই আছি, শুধু সন্তান হারানোর বেদনা বুকের ভেতরে ক্ষতের মতো টিকে আছে। আপনি কেমন আছেন?

আমি ভালোই আছি। কিন্তু কতোদিন ভালো থাকতে পারবো তা জানি না।

এটা তো আমিও বলতে পারি। আমরা কেউ জানি না কতোদিন ভালো থাকবো।

মির্জা নওশা পৃথিবীর নিয়ম এমন।

মাফ করবেন হজরত, আমার এই ডাক নামটি একদম পছন্দ না। কেউ আমাকে এই নামে ডাকুক তা আমি চাই না। আপনি আমাকে মির্জা বলে ডাকবেন।

জরুর। যে নামে ডাকতে বলবেন সে নামেই ডাকবো। কবির নামে কি আসে যায়। কবির কবিতাই বলবে কবির আসন কোথায়।

জরুর। ইদানীং দেখতে পাচ্ছি মুশায়রায় আমার কবিতা তেমন সাড়া জাগাতে পারছে না। শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রথমদিকে যেমন বাহবা পেয়েছি এখন তেমন পাচ্ছি না।

মির্জা আপনার কবিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। আপনি উর্দু কবিতায় প্রচুর ফারসি শব্দ ব্যবহার করছেন।

বেশি হচ্ছে কি?

সবাই তাই বলছে। সেজন্য আপনার কবিতা শ্রোতার মনে দাগ কাটতে পারছে না।

আপনি কি মনে করছেন হজরত?

আমারও এমন লাগছে। আপনি তো জানেন কবিতা দুর্বোধ্য হলে তা শ্রোতার হৃদয়ে তেমন সাড়া জাগায় না। শ্রোতার মনের সঙ্গে কবিতার দূরত্ব তৈরি হয়। আমি এ কথাটি আপনাকে বলতাম। আমার মনে হয় আপনি নিজে আবার নতুন করে ভাবুন।

গালিব চুপ করে থাকেন। মন খারাপ হয়। তাঁর উর্দু কবিতার একটি দীওয়ান করবেন বলে কবিতা গোছাচ্ছেন, কিন্তু পাঠক যদি তাঁর কবিতার সংকলনটি গ্রহণ না করে তাহলে কেমন হবে!

কি ভাবছেন মির্জা?

আমার উর্দু গজলগুলো দিয়ে একটি দীওয়ান করার কথা ভাবছি হজরত। আপনি আমাকে সহযোগিতা করবেন?

করবো, জরুর করবো। গজল বাছাইয়ের সময় আমাকে দেখাবেন। আমি দুর্বোধ্য গজলগুলো আলাদা করে দেবো।

এটা আমার খুব দরকার। আপনার কাব্যশাস্ত্রে দখল অসাধারণ। আপনি সহযোগিতা করলে দীওয়ানটি নিয়ে আমার চিন্তা নেই।

ঘাবড়াবেন না। শান্ত মনে এগোন। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। এখন যাই।

ফজলে হক চলে গেলে গালিব অস্থিরতা অনুভব করেন। কিছুতেই নিজের মন খারাপ অবস্থা থেকে বের হতে পারেন না। ভাবেন দুরকিজানের কাছে যাবেন। ওর সুরেলা কণ্ঠে নিজের গজল শুনলে হয়তো মনটা শান্ত হবে। চুপচাপ বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে।

মধ্যরাত পর্যন্ত দুরকিজানের গজল শুনলেন। তারই লেখা। ইদানীং তার লেখা গজল ছাড়া দুরকিজান গায় না। গালিব শরাব নিয়ে বসেন। দুরকিজান গাইছেন :

'দিল-এ নাদাঁ তুঝে হুয়া কেয়া হ্যায়?
আখির ইস দর্দ কী দওয়া কেয়া হ্যায়?...
ওরে অবুঝ মন তোর কি হয়েছে?
এ ব্যথার নিরসন কোথায় রয়েছে?'

গভীর নিমগ্নতায় গেয়ে যায় তাওয়াফ। এটি তার পেশা। গালিবের প্রেমে পড়ে সে পেশা ভুলতে বসেছে। মাঝে মাঝে অন্য তাওয়াফরা তাকে গালমন্দ করে। বলে, বাইজির পেশা প্রেমে পড়া নয়। প্রেম দিয়ে ক্ষুধা মিটবে না। কিন্তু দুরকিজান কারো কথায় কান দেয় না। সে গালিব ছাড়া কিছু বোঝে না। গালিব তো সাধ্যমতো ওকে ভরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। এরজন্য তার কোনো আক্ষেপ নেই। প্রয়োজনে ধার করবে।

রাত হয়ে গেলে দুরকিজান গালিবের হাত টেনে ধরে বলে, বাড়ি যান হজরত।

বাড়ি!

হ্যাঁ, বাড়ি যেতে হবে।

যদি না যাই? আমাকে থাকতে দেবে না?

এখানে থাকা যাবে না হজরত। উঠুন।

দুরকিজান তাঁকে টেনে ওঠায়। দরজার বাইরে এগিয়ে দেয়। যতোক্ষণ গালিব চলে যেতে থাকেন ততোক্ষণ ও দাঁড়িয়ে থাকে। গালিব জানে ও দাঁড়িয়েই থাকবে। তারপরও তিনি পেছন ফিরে তাকাবেন না। এটুকু তাঁর সঞ্চয়।

AMARBOI.COM

বাড়ির সামনে এসে দেখলেন কুফরি চাঁদ দাঁড়িয়ে আছে।

কি হয়েছে কুফরি?

আপনার জন্য বসে আছি।

যাও, ঘুমুতে যাও।

খাবেন না?

গালিব নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। কাপড় বদলানোরও সময় হলো না। বিছানায় গড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এলো।

কয়েকদিন পরে এক মুশায়রার আসরে জ্ঞানীগুণীজনের সামনে অপদস্ত হলেন। খেয়াল করলেন তাঁর আগে যারা কবিতা পড়লেন তারা সবাই খানিকটা ভিন্ন ঢঙে নিজেদের উপস্থাপন করলেন। আজ যেগুলো পড়া হলো দেখা গেলো সেগুলোর অর্থে গোঁজামিল আছে, শব্দও ভারী ভারী। যেন বেশ আড়ম্বর করে লেখা হয়েছে কবিতাগুলো এবং খানিকটা উদ্দেশ্য নিয়েও। গালিব শঙ্কিত বোধ করেন। যখন দেখতে পান উপস্থিত শ্রোতারা তালি দিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন তখন খুবই মুষড়ে পড়েন। বুঝতে পারেন আজকের পরিবেশ তাঁকে নাজেহাল করার জন্য সাজানো। তাদের কেউ কেউ তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন আর বাহবা ধ্বনি দিচ্ছিলেন।

বেশ ধৈর্য ধরে তিনি বসে আছেন। ভাবছেন, এই বুঝি তাঁকে পড়ার জন্য ডাকা হবে। তেমনটিই হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তার আগেই হাকিম আগা জান আইশ উঠে দাঁড়ালেন।

হাতে ধরা কাগজটি নাড়তে নাড়তে বললেন, আমি মির্জা গালিবকে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছি। পড়তে চাই।

পড়ুন, পড়ুন।

সবাই হাততালি দিয়ে আগা জানকে স্বাগত জানালেন।

আগা জান পড়তে শুরু করলেন ;

'সে কাব্য অর্থহীন, যা বোঝেন শুধু কবি
আনন্দ তো হবেই, যদি অন্যে পায় সে ছবি।
মীরকে বুঝি, মির্জাকেও, কিন্তু গালিব যা লেখেন
ঈশ্বর তাকে রক্ষা করুন, তিনিই জানেন কে বোঝেন!'

আগা জানের কবিতা শুনে সবাই হর্ষধ্বনি করে। নানা কথা বলে অর্থহীন কবিতাকে তুলোধুনো করে। গালিব নিশ্চুপ বসে থাকেন। অপমানে, অবজ্ঞায় তিনি বাকরুদ্ধ হয়ে যান। মুশায়রার আসরে কেন তাঁকে অপমান করা হলো?

সবার থেকে আলাদা ভয়ে ভিন্নমাত্রার কবিতা লিখলেই বিদ্রুপ করতে হবে? এভাবে সামনে বসিয়ে? সবাই মিলে এক হয়ে? প্রবল দুঃখ এবং ক্রোধ তাঁকে একাকার করে ফেলে। তিনি আসর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে থাকেন। দিল্লির পরিচিত রাস্তাকে নিষ্ঠুর বলে গাল দেন। পালকি থেকে নেমে রাস্তায় পায়চারি করেন। আবার পালকিতে ওঠেন।

বেশ রাত হয়েছে। তাঁর দু'চোখ বেয়ে জল গড়ায়। ভাবলেন, প্রথমে নিজেকে শান্ত করবেন চোখের জল দিয়ে ধুয়ে। তারপর নিজের প্রতিজ্ঞা পূরণ করবেন কবিতার শক্তি দিয়ে।

বৃষ্টি নেমেছে। ধুয়ে যাচ্ছে দিল্লির ধুলিমলিন রাস্তা। তিনি দু'হাতে চোখের জল মুছলেন। দিল্লি আসার পরে চোখে অনেক স্বপ্ন জমেছে। বাদশাহর দরবারে কবিতা পড়বেন, বড় একটা জায়গা হবে সেখানে। সে আশাও পূরণ হয়নি এখনো। নওয়াব আহমদ বখশ খান বাদশাহর দরবারে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তারপরও কিছু হলো না।

আজ দিল্লির কবিমহলে এভাবে হেনস্তা হলেন? তাহলে কি—। না, পরাজয়ের কথা ভাবলে চলবে না। বিজয়ী তাঁকে হতেই হবে। তাওয়াফদের কণ্ঠে তাঁর গজল ধ্বনিত হয়। এইসব বাইজি তাঁর গজল পৌঁছে দিচ্ছে শহরের নামজাদা ব্যক্তিদের কানে। তারা তো ইচ্ছে করে শুনতে না চাইলেও শুনছে তাঁর গজল। একজন গাইতে শুরু করলে তাদের না শুনে উপায় নেই।

তিনি পালকি ঘুরিয়ে দুরকিজানের বাড়ির দিকে নিতে বললেন। এখন এটিই তার আশ্রয়স্থল। দরজার বাইরে থেকেই তিনি শুনলেন তাঁর গান ভেসে আসছে ঘরের ভেতর থেকে।

'কোই উম্মীদ বর নহী আতী
কোঈ সুরত নজর নহী আতী।'

সুরেলা কণ্ঠ তাঁর হৃদয়ে জলের ধারায় প্রবেশ করে। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মৃদু শব্দ করেন দরজায়। দুরকিজান দরজা খুলে অবাক হয়ে যায়। বলেন, আপনি?

তোমার কাছেই এসেছি আশ্রয় খুঁজতে।

কি হয়েছে আপনার?

বসতে দেবে না?

আসুন, আসুন।

গালিব ঘরে ঢুকে বসলে দুরকিজান একটি পরিষ্কার ওড়না এনে তাঁর মাথা-মুখ মুছিয়ে দিয়ে এক গ্লাস শরাব এনে দেয়।

আপনার মুখ দেখে মনে হয় আজ আপনি অনেক কষ্ট পেয়েছেন।

হ্যাঁ, ডোমনী, আজ দিল্লির গুণীজনেরা আমার গজল নিয়ে উপহাস করেছে।

উপহাস?

দুরকিজান গালিবের পায়ের কাছে বসে।

আজ আমি তোমার কাছে থাকবো ডোমনী। তোমার বুকে মুখ রেখে আজ আমি ঘুমাবো। বল তুমি না করবে না?

না, আমি না করবো না। আজ আমি গান গেয়ে আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দেব। আমি বৃষ্টিকে বলবো, বৃষ্টি আজ রাতে তুমি এই কবির জন্য শরাব হও।

গালিব বিস্ময়ে চেঁচিয়ে বলেন, দুরকিজান, তুমি আমাকে এতো ভালোবাস!

আহ, ভালোবাসা! কারো কোনো উপহাস আপনাকে ছুঁতে পারবে না। আমি সব উপহাস আমার গজলের সুরে শুষে নেবো।

আহ্ ভালোবাসা, ভালোবাসা!

আমি পালকির বেহারাদেরকে বলি দিনের আলো শুরু হওয়ার আগে আপনাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে।

বলো। গালিব গদিতে পিঠ ঠেকিয়ে হেলান দিয়ে বসেন। শরাবের পেয়ালায় চুমুক দেন। বেজে ওঠে দুরকিজানের সঙ্গীত। সুরের লহরী ছড়াতে থাকে ঘরের ভেতরে। গালিবের বুকের ভেতরে ধ্বনিত হয় দুরকিজানের ভালোবাসার কণ্ঠস্বর, আপনি যদি কখনো দুঃখ পান আমার কাছে আসবেন। আমি আপনার দুঃখ নিজের বুকে নেবো। দুঃখ আপনাকে ছুঁতেই পারবে না।

ওহ; ডোমনি! গালিব চোখ বোজেন।

সুরের ইন্দ্রজাল প্রদীপের মৃদু আলোয় মায়াবী হয়ে ওঠে। গালিব ভাবেন, কোথাও এমন স্বর্গ থাকে বলেই তো বেঁচে থাকার মতো দুঃখ থেকে বেরিয়ে আসা যায়। আহ্, আজ আমার জীবনে তেমন গভীর রাত উপস্থিত হয়েছে। এ রাতের সবটুকু সুধা আমি ভোগ করবো। কেউ আমাকে উপহাস করে আর ঘায়েল করতে পারবে না।

গালিব তাকে বুকের মধ্যে টানলেন। আর সে দু'ঠোঁটে মুছে দিল গালিবের গড়িয়ে পড়া চোখের জল। গালিব বললেন :

'চোখের জল প্রেমকে করেছে আরো নির্ভীক
আর হৃদয় হয়েছে নির্মল ও পবিত্র ॥'

বাইরে রাতজাগা পাখির ডাক মিলিয়ে গেলো দিল্লির বিশাল আকাশে। মেঘহীন আকাশ থেকে বৃষ্টির ঝরেপড়া আর নেই।

বাইরে চমৎকার স্নিগ্ধ বাতাস বইছে। ঘুলঘুলির ছোট পথে ছুটে আসছে ঘরে। তখন প্রদীপ নেভানো হয়েছে। সরিয়ে রাখা হয়েছে শরাবের শূন্য পেয়ালা।

মাসখানেকের মধ্যে বাড়ির ব্যবস্থা হয়ে যায়। গালিব উঠে আসেন নিজের ঠিকানায়। বিল্লিমাঁরো মহল্লায় কাসিম জান গলিতে তাঁর বাড়ি। নিরিবিলি। ছিমছাম। উমরাও বেগম পছন্দ করেছেন। তাঁর প্রসবের সময় ঘনিয়েছে বলে বাড়ি গোছানোর তদারকি ঠিকমতো করতে পারছেন না। দাস-দাসীদের দেখিয়ে দিচ্ছেন।

কয়েকদিন পরে তিনি একটি মৃত সন্তান প্রসব করলেন।

গালিব নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। উমরাওয়ের বুকফাটা কান্নার শব্দ তিনি আর শুনতে চাইলেন না।

কয়েক মাস পরে খবর পেলেন তাঁর ছোট ভাই মির্জা ইউসুফ পাগল হয়ে গেছে। তিনি গিয়ে দেখলেন পাগলামির তেমন বড় কোনো মাত্রা নেই। চুপচাপ বসে থাকে, অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কখনো রেগে ওঠে।

তিনি খুব কাছে বসে ডাকেন, ইউসুফ ইউসুফ।

চমকে তাকান ইউসুফ। আপ্রাণ চেষ্টা করেন তাঁকে চেনার, কিন্তু পরক্ষণে মুখ ঘুরিয়ে ফেলেন। গালিব ভাইয়ের হাত ধরেন। অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকেন। একসময় ইউসুফ ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নেন। তারপর উঠে চলে যান।

আজিফও এসেছেন তার সাথে। কবিতা লেখেন। উমরাওয়ের চাচাতো ভাইয়ের ছেলে। গালিব তাকে খুব ভালোবাসেন। আজিফও গালিবের ভক্ত। কোথাও একসঙ্গে যাওয়ার সুযোগ পেলে সুযোগ ছাড়েন না।

ইউসুফ উঠে চলে গেলে গালিবের পিঠে হাত রেখে আজিফ বলেন, মির্জা সাহেব চলেন যাই।

যাবো? কোথায়?

বাড়িতে যাবেন।

সেখানে আমার সন্তান নেই আজিফ।

কাউকে কাউকে এভাবে দুর্ভাগ্যের মোকাবেলা করতে হয়।

দুঃখ পাওয়া কি আমার ভাগ্য?

দুঃখ সবাইকে পেতে হয় মির্জা সাহেব। আপনি তাঁর থেকে বাদ যাবেন কেন? আপনি কি খোদাতালার প্রিয় বান্দা?

আমাকে এমন আঘাত দিচ্ছো কেন আজিফ?

আপনার মন শক্ত করার জন্য। আপনাকে উঠে দাঁড়াতে হবে। আপনার ভেঙে পড়া চলবে না।

আমার পাঁচ বছর বয়সে আব্বা মারা গেছেন। আমি তো সেই শৈশব থেকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। আমার আর নতুন করে উঠে দাঁড়ানো কি?

চলুন।

আজিফ হাত ধরে টানে। গালিব ওর হাত শক্ত করে ধরে বাড়ির বাইরে আসে। ইউসুফের স্ত্রী পর্দার আড়ালেই ছিল। সামনে আসেনি। মেয়ে দুটিকেও দেখা হলো না। শুধু কাজের লোক। গালিব দু'হাতে চোখ মুছলেন। এভাবেই জীবন চলে যায়।

এভাবে জীবনের রশিতে গিটঠু পড়ে।

নয় মাস জীবিত থাকার পরে তাঁর তৃতীয় বাচ্চাটি মারা গেলো।

সেদিন বিকেলে আকাশে ঘন কালো মেঘ ছিল। ঝড়ো বাতাস ছিল। বৃষ্টি ছিল না। হয়তো বৃষ্টি হতে পারে এমন একটি আভাস ছিল। তিনি জানালার ঘুলঘুলি দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন। মাথায় ভীষণ দুশ্চিন্তা।

দেখতে পাচ্ছেন তাঁর সামনে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘনিয়ে উঠেছে। এদিকে শরাব এবং তাওয়াফদের পেছনে অনেক টাকা উড়িয়েছেন। ঋণ হয়েছে অনেক। এর মাঝে এই অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিলে দিন চালানো মুশকিল হবে।

তখন কাল্লু মিয়া ঘরে ঢোকে।

হুজুর।

কেমন আছে আমার বাচ্চা? জ্বর কমেছে? হাকিমের কাছ থেকে যে দাওয়াই আনা হয়েছে, তা কি আছে, নাকি শেষ হয়েছে?

কাল্লু মিয়া নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে।

কথা বলছো না কেন কাল্লু মিয়া? হাকিমকে ডেকে আনতে হলে যাও ডেকে নিয়ে এসো। নাকি আমাকে যেতে হবে হাকিমের কাছে?

না, না আপনার যেতে হবে না হুজুর।

তাহলে কি বলতে এসেছো তুমি?

বাচ্চা মারা গেছে।

মারা গেছে?

কাল্লু মিয়া দু'হাতে মুখ ঢাকে।

এমন আকস্মিক আঘাতে বিমূঢ় হওয়ার মতোও অবস্থা ছিল না তাঁর। তিনি কাল্লু মিয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, কি বললে?

কাল্লু মিয়ার মুখ থেকে কথা বের হয় না। যেন কতো কাল আগে ও কথা শিখেছিল এখন তা ভুলে গেছে। হাজারবার চেষ্টা করেও মনে করতে পারছে না। ও বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

গালিব আবার চিৎকার করে বললেন, কি বললে? তারপর হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। কেঁদেকেটে শান্ত হওয়ার পরে ভাবলেন তিনি এক পথ হারানো নাবিক। কেবলই পথ খোঁজার চেষ্টায় ক্লান্ত এবং বিপর্যস্ত।

কাল্লু মিয়া তাকে কাঁদতে দেখে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েই ছিল।

তিনি তাঁকে বললেন, যাও সবাইকে খবর দাও।

তারপর নিজে অন্দরমহলে গেলেন।

মৃত সন্তান বুকে জড়িয়ে বসে আছেন উমরাও বেগম। গালিবকে দেখে পাগলের মতো বললেন, না, না ওকে আমি দেবো না। কারো কাছেই দেবো না।

উদ্‌ভ্রান্ত উমরাওকে কি বলবেন তিনি? চারপাশে দাসীরা দাঁড়িয়ে আছে। একজন বলে, হুজুর আপনি চলে যান। বেগম সাহেবাকে আমরা দেখবো।

তিনি ফিরে এলেন নিজের ঘরে।

বুকের ভেতরে হাতুড়ির শব্দ হয়। তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন ঘরের মাঝখানে। তিনি দুঃখ পেলে ছুটে যান তাওয়াফদের কাছে। তাঁর জন্য শরাব আছে। উমরাও দুঃখ পেলে কি করেন? তাঁর কি আছে? নিজেকেই উত্তর দেন, ওর নামাজ আছে। কুরআন পাঠ আছে।

বৃষ্টি মাথায় করে আমিনউদ্‌দিন, জিয়াউদ্‌দিন, জয়নাল এলো। সঙ্গে আরও কেউ কেউ। জয়নাল এসে ওর ফুপুর কোল থেকে শিশুটিকে নিলো। ও যখন দু'হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটি চাইলো উমরাও একটুও আপত্তি করে না। ওর কোলে দেয়। বলে, সাবধানে নিও। ব্যথা পায় না যেন।

না, ফুপি আমি একটুও ব্যথা দেবো না।

কোথায় দিয়ে রাত পার হয়ে গেলো তার হিসেব করলেন না গালিব। নির্ঘুম কেটে গেলো সময়। বাচ্চার দাফন করে আত্মীয়রা চলে গেছেন। বাড়ি আবার সুনসান। বাড়িতে যারা আছে তাদের কারো কণ্ঠে কোনো শব্দ নেই।

সকালে হালুয়া আর রুটি নিয়ে এলো কাল্লু মিয়া, হুজুর।

গালিবের নির্ঘুম দৃষ্টিতে ক্লান্তি নেই।

হুজুর আপনি রাতে ঘুমাননি।

আমার তো ঘুম পাচ্ছে না কাল্লু মিয়া।

একজন পাওনাদার এসেছে টাকার জন্য।

ও জানে আমার বাচ্চাটি মারা গেছে?

আমি তাকে বলেছি।

তারপরও দাঁড়িয়ে আছে?

বলেছে, টাকা না দিলে যাবে না।

গালিব টাকার ছোট ঝুলিটি ঝেড়ে যা পেলেন তা কাল্লু মিয়ার হাতে দিলেন। বললেন, এটা নিয়ে ওকে যেতে বলো। পরে আবার দেবো।

একটু পরে শুনতে পেলেন পাওনাদারের চেঁচামেচি। এতো অল্প টাকা নিয়ে সে যাবে না। গালিব ঘরে বসে চিৎকার শুনলেন। একটি মৃত শিশুর স্মরণে যে বাড়িটি এতোক্ষণ নিঃশব্দ ছিল সে বাড়ি এখন পাওনাদারের উচ্চকণ্ঠে বিব্রত। কাল্লু মিয়া লোকটির হাত ধরে বাড়ির বাইরে বের করে দিতে চাইলে সে ঘুষি মারলো। তারপরও কাল্লু মিয়া কিছু বললো না দেখে গালিব খুশি হলেন। মনে মনে বললেন, এখন চিল্লাচিল্লি করার সময় নয়।

সময় যে কখন কীভাবে কার পক্ষে কাটবে কেউ তা জানে না। যেমন কাটেনি মুঘল সম্রাটদের। গত কয়েকদিন ধরে তিনি ইতিহাসের নানাকিছু জানার চেষ্টা করছেন। কারণ দরবারে স্থান পাওয়ার আগে তিনি যদি ইতিহাসটা ঠিকমতো জানতে পারেন সেটা তাঁর অবস্থান তৈরিতে সহায়ক হবে বলে মনে করছেন। যদিও তাঁকে দরবারে জায়গা করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে মাত্র, কিন্তু এখনো তেমন কিছু হয়নি। হতেই হবে। সম্রাটের দরবারে তাঁকে যেতেই হবে। দরবারের সভাসদদের একজন হয়ে।

কতোদিন বাড়ির বের হলেন না। খেলেন, ঘুমুলেন। উমরাওয়ের সঙ্গে সময় নিয়ে কথা বললেন। উমরাও জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এতো পড়েন?

পড়ি না, খাই।

কি খান?

রুটিরুজি।

সেটা আবার কি?

সামনে আমাদের খারাপ সময় আসছে বিবি।

শুনেছি নওয়াব বদল হবে।

তখন আমার ভাতা নিয়ে ঝামেলা হতে পারে।

জানি। এসব ভাবলে আমারও ঘুম আসে না।

তুমি বেশি ভেবো না বিবি।

আপনাকে নিয়েই তো বেশি সমস্যা। আপনি জুয়াখেলা ছেড়ে দেন। তাহলে আর দেনা করতে হবে না।

আহ্ বিবি, এসব কথা থাক।

উমরাওকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়েন। একজন থেকে বই ধার করে এনেছেন। সময়মতো বই ফেরত দিতে বলেছেন তিনি। বইটাতে তেমন কিছু নেই, এরচেয়ে বিভিন্নজনের কাছে চিঠি লিখে নানাকিছু জানতে হবে। বুড়োদের জিজ্ঞেস করেও নানা বিষয় জানা যাবে। তাঁর শ্বশুরও অনেক কথা বলতে পারবেন।

ইলাহি বখশ বলতে থাকেন মুঘল সাম্রাজ্যের টুকরো টুকরো খবর।

ঘটনার টানাপোড়েনের ইতিহাস আমরা জানবো না তো কে জানবে মির্জা নওশা, ইলাহি বখশ গালিবের দিকে তাকিয়ে বলেন, নানা কথা আমরা বড়োদের কাছে শুনেছি, আর বাকিটা তো আমরা নিজেরা দেখেছি।

আমি জানি আমার জন্মের সময় মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থা ছিল।

আওরঙ্গজেব সাম্রাজ্যের যে বিস্তার ঘটিয়েছিলেন সেই সীমানা কমিয়ে দেয়া হয়েছিল দিল্লি ও তার আশেপাশে।

কি কারণে এটা করা হয়েছিল?

তোমার জন্মের কয়েক বছর আগে সম্রাট শাহ আলম অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি গোলাম কাদিরের কাছে বন্দি অবস্থায় ছিলেন। গোলাম কাদির ছিল রোহিলা বর্গের সেনাপ্রধান। তিনি কিছুকালের জন্য দিল্লি দখল করেছিলেন।

গালিব মাথা নেড়ে বলেন, শুনেছি তিনি তা বেশি দিন ধরে রাখতে পারেননি।

হ্যাঁ, অল্প দিনের মধ্যেই মারাঠাদের হাতে তার পতন হয়। মারাঠারা ছিল রোহিলা সেনাদের চেয়ে অনেক বেশি কঠোর। অভিজাতদের লোকের সামনে অপমান করতে তারা বেশ আনন্দ পেতো।

গালিব মৃদু হেসে বলেন, জন্মের সময়ের বাতাস আমার শরীরে লেগে আছে।

উঁহু, তা লেগে নেই। তোমার জন্ম হয়েছে আগ্রায়।

আগ্রায় হলেও বাতাস তো সব দিকেই বয়। সেজন্যই আমার এতো কষ্ট।

ইলাহি বখশ হাসতে হাসতে বলেন, তোমার ব্যক্তিগত কষ্ট দিয়ে ইতিহাসের কিছু যাবে আসবে না মির্জা বখশ। সবাইকে নিজের মতো করে বেঁচে থাকার জায়গা তৈরি করতে হয়। আমি তোমাকে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলি শোন।

AMARBOI.COM

তোমার জন্মের সময় মুঘল সম্রাটই ছিল ক্ষমতার অধীশ্বর। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ব্রিটিশরা সম্রাটের কাছ থেকে বাংলার দেওয়ানী নিয়ে নেয়।

এভাবেই চলেছে অনেক বছর।

আস্তে আস্তে ব্রিটিশরা ক্ষমতালোভী হয়ে ওঠে। কিন্তু যেহেতু সম্রাটই ছিলেন আইনত সার্বভৌম, সেজন্য তড়িঘড়ি করে কোনোকিছু না ঘটিয়ে তারা কৌশল অবলম্বন করে।

ইলাহী বখশ হাতের কাছে রাখা গ্লাস থেকে পানি পান করেন। গালিবের মধ্যে জানার আগ্রহ তীব্র হয়ে উঠেছে।

মুঘল সম্রাটের অবস্থা ক্রমাগত নাজুক হয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু তাদের গ্রহণযোগ্যতা ছিল অনেক বেশি। তাই তারা চেষ্টা করছিল ব্রিটিশদের অনুমোদিত সম্রাটের সম্মানজনক ভূমিকাটুকু যেন ঠিক থাকে।

কারণ সাধারণ মানুষের কাছে সম্রাট ছিল এই দুনিয়ায় সবার চেয়ে উঁচুতে। তার নামেই জাদু ঘটে যায়। তিনি পৃথিবীকে শাসন করার জন্য সাধারণের কাছে এসেছেন। সে জন্য ব্রিটিশরা একটু সাবধানে পা ফেলছে। কারণ সাধারণের মনোভাব উপেক্ষা করার সাধ্য ব্রিটিশদের নাই।

তাছাড়া লালকেল্লার চার দেয়ালের মধ্যে সম্রাটের রক্ষা ব্যবস্থা ভীষণ মজবুত। কোনো ফুটো নেই যে পিঁপড়ে ঢুকবে। সম্রাট ও তার পরিবার বিচারব্যবস্থা দিয়েও সুরক্ষিত।

সম্রাটের দরবারে অনুমতি ছাড়া ব্রিটিশরা ঢুকতেও পারে না।

ব্রিটিশরা আস্তে আস্তে সাম্রাজ্য দখল করছে। একদিন ওরা পুরো ক্ষমতা পেয়ে যাবে। এই তো?

ভবিষ্যতই তা বলবে। তবে সাধারণ মানুষের কাছে সম্রাটের যে সম্মান তা যদি সম্রাট ধরে রাখতে না পারেন তাহলে আমাদের ভাগ্যে কি আছে তা আমরা জানি না।

আব্বাজান আমি চাই না মুঘল সাম্রাজ্য ব্রিটিশদের হাতে চলে যাক।

আমিও চাই না।

দুজনেই এমন একটি বাসনার কথা বলার পরে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন।

ইলাহি বখশ একটুক্ষণ পরে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলেন, একবার এমন একটি গল্প চালু হয়েছিল লোকের মুখে মুখে। একবার একজন মানী ব্যক্তি সম্রাটের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেয়েছিলেন। কিন্তু সম্রাটের সামনে পৌছানোর আগেই তিনি ভয়ে ঠক্‌ঠক করে কাঁপছিলেন। ঘেমে নেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। শেষে তিনি কোনো রকমে দেখা করে বাঁচেন।

গালিব শব্দ করে হাসেন। শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে বলেন, আমার এমন অবস্থা হবে না। আমি সাহসের সঙ্গে সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হতে পারবো।

মাশআল্লা আমারও তাই বিশ্বাস। তাছাড়া কোনো কবির বুক ভয়ে কাঁপবে এটা আমি ভাবতেই পারি না। ভাবতেও শরম লাগে।

আমার যাবার সুযোগ হলে আপনি আমার জন্য শরমের ভাগী হবেন না।

শুকরিয়া মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব।

শ্বশুরের এমন সম্বোধনে গালিব লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করেন।

সে দিনের ঘটনা তোমাকে সবটা বলিনি মির্জা নওশা। সেই ব্যক্তি পরে বলেছিলেন, আমি কি করে ভাববো যে পৃথিবীর সম্রাটের সামনে যাওয়ার ডাক পাবো। সম্রাটের সামনে যাওয়ার আহ্বান আমার কাছে মৃত্যুর মতো মনে হয়েছিল। যখন ছোপদার আমাকে হাঁক দিয়ে বললো, সম্মানের সঙ্গে এগিয়ে যান, এখন আপনি পৃথিবীর সম্রাটের দ্বারস্থ। তিনি দীর্ঘ আয়ু লাভ করুন এবং তাঁর সমৃদ্ধি ঘটুক। যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনসহ আপনি প্রবেশ করুন এবং তাঁকে অভিবাদন করুন।

গালিব উদগ্রীব কণ্ঠে বলেন, তারপর?

ইলাহি বখশ দম নেয়ার জন্য থেমেছিলেন। মৃদু হেসে বলেন, সেই ব্যক্তি দরবারের আদব-কায়দা শিখেই এসেছিলেন। তিনি প্রথামত নত হয়ে সম্রাটকে সাত সেলাম জানিয়ে কুর্নিশ করেছিলেন।

সেদিন সবকিছু ঠিকঠাক মতো শেষ করেছিলেন সেই ব্যক্তি, কিন্তু বিষয়টি আমরা শুনেছিলাম কৌতুকের সঙ্গে। সবাই খুব মজা পেয়েছে এই ঘটনা শুনে।

কিন্তু এখন আপনি আমাকে বললেন, ব্রিটিশ ও মুঘল সম্রাটের অবস্থা ব্যাখ্যা করে। আমি জানতে পারলাম তুলনামূলক অবস্থা হিসেবে।

সাবাস, মির্জা সাবাস। আমি তোমাকে বিষয়টি বোঝাতে পেরেছি।

আর কোনো ঘটনা আছে? মনে পড়ে?

শুনেছিলাম একটি ঘটনা। একবার এক ইংরেজকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন সম্রাট। সেই সেনাপ্রধান সম্রাটকে নজরানা দিতে গিয়েছিলেন। তার সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিলেন। সবাই একে একে সম্রাটকে অভিবাদন করেছিলেন। তারপরে স্বর্ণমুদ্রা উপঢৌকন দিয়েছিলেন। সম্রাট ওদের দিকে তাকিয়েও দেখেননি।

সম্রাটের দরবারের জৌলুস কমে এলেও তাদের আত্মমর্যাদা প্রখর আছে। এটাই আমাকে খুশি রাখছে।

হ্যাঁ, মির্জা নওশা, অভিজাত মুসলমানদের জন্য মুঘল সম্রাট এখনও

বেহেশত। এভাবে যদি থাকে তাহলেও আমরা মনে করবো আমরা ভালো আছি।

আমার গজল নিয়ে আমি কবে দরবারের মুশায়রায় যেতে পারবো?

ধৈর্য ধরো মির্জা নওশা।

শ্বশুরের উপদেশে গালিবের মন খারাপ হয়। তাঁরতো ধৈর্য ধরতে ভালো লাগছে না। দিল্লির বাইরে লক্ষ্ণৌতেও তাঁর কবিতার খ্যাতি পৌছেছে। মীর তকী তাঁর প্রশংসা করেছেন। তারপরও কি বাদশাহর দরবারে পৌছার সময় হয়নি?

বাড়ি ফেরার পথে আবার মীর তকীর উপদেশের কথা মনে হলো। একজন ভালো ওস্তাদ তাঁকে সঠিক পথ দেখাবে, কিন্তু তাঁর ওস্তাদ দরকার নেই। তিনি মনে করেন তিনি সঠিক পথে আছেন। তাঁর অভিজ্ঞতাই তাঁর ওস্তাদ। জীবনের কাছ থেকেই তিনি দর্শনের শিক্ষা পেয়েছেন। তাঁর দুঃখ আছে, কারাগারের বন্দী জীবনের অনুভব আছে, প্রেম আছে, আর্থিক কষ্ট আছে, আভিজাত্যের অহংকার আছে—এতো কিছুই তো একজন কবির ওস্তাদ। কবির আবার একজন ওস্তাদ লাগবে কেন, যে তাঁকে সারাক্ষণ শেখাতে থাকবে, উপদেশ দেবে? না, আমি ঠিক পথেই আছি।

গালিব পালকি থামিয়ে তুফতার বাড়িতে নামলেন। তুফতা তখন বৈঠকখানায় বসে আরও অনেকের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলেন। গালিবকে দেখে সহাস্যে বললেন, কি খবর মির্জা সাহেব? ভালো আছেন তো?

জরুর, ভালো আছি।

বসুন। আপনি এসে আমাদের আড্ডা জমজমাট করে দিলেন। পকেটে গজল আছে তো?

পকেটে আজ গজল নেই। আমি হযরত ইলাহি বখশের কাছে মুঘল সাম্রাজ্যের দিনকালের কাহিনী শুনতে গিয়েছিলাম।

হ্যাঁ, আপনার শ্বশুর কবি মঅরুফ তো এসব বিষয় ভালো জানেন।

দরবারের জৌলুস কমে এসেছে, নজরানাও কমে এসেছে, সম্রাটের দেয়া খিলাৎও সস্তা দামের হয়ে পড়েছে।

তুফতা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত সম্রাটই সর্বেসর্বা। তিনি সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী।

মারহাবা! মারহাবা!

গালিব ছাড়া বাকিরা হর্ষধ্বনি করে। যেন এটি একটি আনন্দদায়ক ঘটনা। গালিব চুপ করে থাকেন।

তুফতা জোর দিয়ে বলেন, সম্রাট এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎসে

আছেন। এখনো যে কোনো উৎসবের সময় তাঁকে সাত রকম শস্য, প্রবাল, রুপা দিয়ে ওজন করা হয়। অবশ্য আর্থিক সংকটের কারণে আর আগের মতো হীরে-জহরৎ, সোনা দিয়ে ওজন করা হয় না।

তুফতা থামতেই আর একজন বয়সী মানুষ বলেন, এখনো বকরি-ঈদের দিন তাঁর নামে উট জবাই করা হয়। তার জন্মদিন দেওয়ানী-আম-এর সরকারি উৎসবের দিন। তিনি অসুস্থ হলে তাঁর জন্য প্রার্থনার আয়োজন করা হয়।

তুফতা গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, আমরা এখনো সম্রাটের শাসন চাই। এই হিন্দুস্থানে সম্রাটই শাসনের ক্ষমতায় থাকবেন।

মারহাবা, মারহাবা। বহুৎ আচ্ছা বাৎ।

এবার গালিবও অন্যদের সঙ্গে হর্ষধ্বনি করেন। সম্রাটের আর্থিক দুর্বলতার দিকটি তাঁর মন খারাপ করে দিলেও সবার হর্ষধ্বনি তাঁকে উৎফুল্ল করে। তিনি মনের জোরও পান।

তুফতা আবার বলেন, আগে সম্রাটের কাজকর্ম সাধারণ মানুষকে জানানোর জন্য কাগজ প্রকাশ করা হতো। এখন আর সেটা করা হচ্ছে না। সাধারণ মানুষ এখনও তাকে পীর ও মুরশিদ মনে করে। তিনি সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিকতার গুরু। দিল্লির বাইরেও তাঁকে এভাবেই দেখা হয়। দিল্লির ছোট ছোট রাজ্যের শাসকদের, এমনকি মারাঠের ব্যবহৃত মুদ্রাতে সম্রাট শাহ আলমের নাম খোদাই করা আছে।

যে বয়সী ব্যক্তি আগে কথা বলেছিলেন তিনি আবার বলেন, এই একই প্রথা গোয়ালিয়রেও প্রচলিত ছিল। ওদের মুদ্রায় মুঘল সাম্রাজ্য ব্রিটিশদের হাতে চলে যাবার পরও দ্বিতীয় আকবরের নাম মুদ্রিত ছিল।

গালিব উৎফুল্ল কণ্ঠে বলেন, ইতিহাসের নানা কিছু জানার চেষ্টা করছিলাম বেশ কিছুদিন ধরে। আজ অনেককিছু জানা হলো। শুকরিয়া তুফতা। এখন যাই?

আমাদেরকে গজল না শুনিয়ে যাবেন?

সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঠিক করলেন তাঁর কবিতা নিয়ে যেসব সমালোচনা হচ্ছে এদের সামনে আজ তার একটু জওয়াব দেবেন।

মনে মনে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে আবৃত্তি করলেন :

'প্রশংসার কাঙাল আমি নই
পুরস্কারের জন্যও নই লালায়িত
কবিতা যদি অর্থবহ নাও হয়
তবে আমার সত্যি কিছু যায় আসে না।'

একটু থেমে আবার বললেন :

'কপাল আমার। রচনাগুলো যে সত্যিই জটিল।
সেগুলি পড়ে খ্যাতিমান ও লব্ধ-প্রতিষ্ঠ
কবিরা বলেন, সোজা গড়নে লেখ!
কিন্তু আমার পক্ষে যে সবচেয়ে কঠিন
সহজ চালে কিছু লেখা।'

তিনি থামলে অন্যরা বললেন, মারহাবা, মারহাবা। তুফতা মৃদু হেসে বাহবা দিয়ে বললেন, মির্জা সাহেব আমার মনে হয় আপনার মনে আরও কিছু পঙ্‌ক্তি আছে।

আছে, আছে, বলে তিনি বললেন,
'শব্দের জাদুকরী সম্ভার থেকে
সঠিক চয়ন গালিবই করতে পারে।'

আবৃত্তি শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে আবার তুমুল করতালিতে ভরে গেলো ঘর। গালিবের মুখে পরিতৃপ্তির হাসি খেলে যায়। এখানকার শ্রোতারা তাঁকে আঘাত করার জন্য মুখিয়ে নেই। এরা হৃদয় দিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেছে। গালিবের মনে হয় তাঁর মাথা আকাশ সমান উঁচু হয়ে গেলো। আনন্দের শেষ নেই আর।

তুফতা গালিবকে বুঝতে পারেন। গালিব কিসের জবাব দিলেন তাও বুঝতে পারেন। তিনি খুশি হন এই ভেবে যে কবিকে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ দেয়ার এটিই সহজ উপায়। নইলে কবি দুঃখের আগুনে পুড়তেই থাকেন।

পালকিতে ওঠার সময় তিনি তুফতাকে বলেন, শুকরিয়া।

তুফতা খুশি হয়ে তাঁর দু'হাত জড়িয়ে ধরেন। গালিবের বুকের ভেতর থেকে সব ভার নেমে যায়। তিনি প্রবল শক্তিতে নিজের ভেতরে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পালকিতে বসে মুখে মুখে বলতে থাকেন :

'যদি আগুন জোরদার হয়
আমি তাকে দ্বিগুণ বাড়াতে পারি
বুঝতে পারি মৃত্যুকেও
খোলা তলোয়ারের রশিতে
নিক্ষেপ করতে পারি নিজের শরীর
খেলা করি ছোরাছুরি নিয়ে আর—
চুম্বনে স্পর্শ করি তীক্ষ্ণমুখ তীরগুলিকে।'

তিনি অনবরত বলে যেতে থাকেন নিজের রচিত শের নিজেকেই। পালকির ভেতরে তাঁর কণ্ঠস্বর গুনগুন ধ্বনি তোলে। তিনি নিজের ভেতরে মগ্ন হতে থাকেন।

পালকি এসে থামে বাড়ির দরজায়। তিনি পালকি থেকে নামতে ভুলে যান।

বেহারারা ডাকে, হুজুর। তিনি সাড়া দেন না।

হুজুর আমরা বাড়িতে এসে গেছি। তিনি সাড়া দেন না।

কাল্লু মিয়া হাঁটু গেঁড়ে বসে ডাকে, হুজুর নামুন।

আমিতো নামতেই চাই। আমাকে তোমাদের বলতে হবে কেন?

আপনি তো নামছেন না হুজুর।

তোমরা যাও আমি নামবো। আমার যখন মনে হবে তখন।

পালকির ভেতরে গরম লাগবে হুজুর। হাতপাখা আনবো?

না, আমি ভালো আছি। এখন আমার মাথার ভেতরে গজলের বর্ষা। তুমি যাও কাল্লু মিয়া।

কাল্লু মিয়া সরে যায়। দূরে গিয়ে বসে থাকে। শুনতে পায় গালিবের কণ্ঠস্বর :

'আকাঙ্ক্ষায় আক্রান্ত এই হৃদয়
এখানে যে, আর একটুও জায়গা নেই
যেখানে পূর্ণতা আসতে পারে
তবুও ঝিনুকের মধ্যে গর্জন করে চলে
সেই অশান্ত এক সমুদ্র—'

এই একটি পঙ্‌ক্তি রচনা করার জন্য তিনি পালকির ভেতর বসে আছেন—তিনি নিজে এক অশান্ত সমুদ্র। পালকির মতো ঝিনুকে বসে গর্জন করছেন। ওহ, কবিতা!

তিনি পালকির বাইরে পা বাড়ান। শরীর বেরিয়ে আসে। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস তাঁকে স্নিগ্ধ করে দেয়। তিনি বুকভরে শ্বাস টানেন। তিনি আকাশের দিকে ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে বলেন, দেখো আমার প্রিয় দিল্লি শহর, দেখো বর্ষা-বসন্ত ঋতু, আমি ওদের উপহাসের প্রতিশোধ নিয়েছি।

আমাকে উপহাস করে এমন সাধ্য এ শহরের কারো নেই।

তখন তিনি দেখতে পান মেঘের ফাঁকে সূর্যের চিকন আলোর রেখা। কাল্লুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, কাল্লু আমি ঘরে যাচ্ছি। বেহারাদের এই ঝিনুকটা সরিয়ে নিতে বলো।

কাল্লু হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। বুঝতে পারে না যে পালকি কীভাবে ঝিনুক হয়! শুধু দেখতে পায় দীর্ঘদেহী সুদর্শন মানুষটি নিজের বাড়িতে ঢুকছেন। দিল্লি শহরের মানুষেরা তাঁকে চেনে।

AMARBOI.COM

এই চেনা মানুষটির স্নেহছায়ায় তার দিন কাটে ভেবে কাল্লুর মুখে বিজয়ীর হাসি ফুটে ওঠে।

কুঠুরি ও বারান্দা

গালিব এখন চিঠি লিখছেন।

তখনো রাত ফুরোয়নি। রাত্রি অবসানের মৃদু আলো ছড়াতে শুরু করেছে মাত্র।

তিনি লিখছেন, শোনো, পৃথিবী দুটি। একটি আত্মার, অন্যটি মাটি ও জলের পৃথিবী। সাধারণত নিয়ম একটাই। অর্থাৎ যারা মাটিজলের পৃথিবীতে অপরাধী, তারা আত্মার পৃথিবীতে শাস্তি পাবে। যারা আত্মার বিশ্বে অপরাধী, তারা মাটিজলের বিশ্বে শাস্তি পাবে।

তিনি আরো কিছু লিখতে চাইছিলেন। কিন্তু দিনের প্রথম আলো দেখার জন্য কুঠুরি ছেড়ে বাইরে এলেন। মুগ্ধ হয়ে গেল মন। অপার বিস্ময়ে দু'চোখ মেলে ঈশ্বরের পৃথিবী দেখে মুখে মুখে আওড়ালেন—

'একটি কথা, একটু মৃদু হাসি, সামান্য ইঙ্গিত
আমার আশা প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে,
যদি জানাও তুমি আমার প্রতি মনোযোগী—
আমি আলোয় শিহরিত উল্লাসময় নগরীতে পরিণত হতে পারি।'

এভাবেই নিজেকে তিনি নিজের কবিতায় ফুটিয়ে রাখেন। ভাবেন, আলো এবং নগরের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক তৈরি করে বিহ্বল হন। দিনের প্রথম আলো এবং দিল্লির পথঘাট-বাড়িঘর তাঁর চেতনাকে হরণ করে। তিনি দিনের আলো ছুঁয়ে নগরীতে হেঁটে যান। তাঁর মাথায় ভর করে কবিতা। তিনি একের পর এক লিখতে থাকেন। টেবিলের ওপর নুয়ে আসে তাঁর মাথা। আজও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। আলোর বিকাশ দেখলেন। একজন-দু'জন মানুষকে রাস্তায় বের হতে দেখলেন। মাথায় চলছে অলৌকিক আলোর রশ্মির বুনন। তিনি বিমুগ্ধ চিত্তে দু'হাত ওপরে তুলে কিছু করতে চাইলেন। কিন্তু কী করবেন, ভাবতে পারলেন না। ফিরে আসেন টেবিলে। যে পিদিমটি জ্বলছিল, ফুঁ দিয়ে তা নিভিয়ে দিলেন। ঘরে আলো প্রবেশ করেছে। টেবিলের ওপর রাখা রাতের খাওয়ার প্লেটটি নামিয়ে রাখলেন মেঝেতে। মাংসের হাড়, পেঁয়াজের টুকরো ইত্যাদিতে প্লেটটা নোংরা হয়ে আছে। শুধু সুরার গ্লাসটি তিনি কখনো নোংরা

হতে দেন না। কারণ, পানপাত্র ছাড়া তাঁর দিন ভালো যায় না।

এলোমেলো হয়ে থাকা বিছানাটি ঝেড়েঝুড়ে ঠিক করলেন। নিজেকে বললেন, এখন আমাকে ঘুমুতে হবে; অন্তত ঘণ্টা দুয়েক। বন্ধুরা আসার আগে। বন্ধুরা এলে লুডোর ছকের ওপর জুয়া খেলা হবে। দারুণ উত্তেজনা।

তিনি শুয়ে পড়লেন।

ঘুমে জড়িয়ে পড়ার আগে নিজের একটি ঘটনার কথা মনে পড়লে হো হো করে হাসলেন। ভাবলেন, এই হাসি ঘুমের জন্য উপাদেয় সুরা।

ঘুমানোর আগে নিজেকে বললেন, তোমার আরেকটু হিসাব করে চলা উচিত গালিব। এত বেহিসাবি চললে তো ঋণের বোঝায় মুখ থুবড়ে পড়বে এবং মরবে। আর বেশি কিছু তিনি ভাবতে পারলেন না। ভীষণ ঘুমে তলিয়ে গেলেন।

গালিবের ঘুম যখন ভাঙল, তখন সূর্য মধ্যখানে। প্রচণ্ড গরম। কুঠুরির মধ্যে কোনো বাতাস আছে বলে মনে হয় না। গরমে ঘেমে নেয়ে উঠেছেন। বালিশ ভিজে গেছে। সঙ্গে চুলভর্তি পুরো মাথাটা। মহাবিরক্তিতে হাত পাখাটা খুঁজলেন। পেলেন না। হয়তো উমরাও বেগম সরিয়ে রেখেছেন।

তাঁর স্ত্রী সংসারের শৃঙ্খলার জন্য সবকিছু গুছিয়ে রাখেন। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। তক্তপোষের নিচে পা নামিয়ে দিয়ে বুঝলেন, পায়ের কাছে চটি নেই। কোথায় রেখেছেন মনে করতে পারলেন না। দেখলেন, ঘরের কোণে এলোমেলো পড়ে আছে তাঁর মদ খাওয়ার পেয়ালাগুলো। উমরাও বেগম আগে পেয়ালাগুলো ধুয়ে রাখতেন। এখন রাখেন না। কারণ, তিনি তাঁর স্বামীকে মদপান থেকে বিরত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিরত করতে পারেননি।

এই প্রসঙ্গ উঠলেই গালিব বলেন, সুরা তো আকাশের ঝলমলে সূর্য। তোমার-আমার সংসারে আলো দেয়।

আলো? সংসারে আলো?

গালিব ভ্রু কুঁচকে বলেন, হ্যাঁ, তাই তো। মিথ্যে তো বলিনি।

উমরাও বেগম রাগত স্বরে বলেন, যে সংসারে সাতটি সন্তান জন্ম নিয়ে এক বছর বয়সের আগেই মরে যায়, সেই সংসারে আলো থাকে নাকি? যত্তসব উদ্ভট ভাবনা। রাতদিন মদ খেয়ে মানুষের মাথা ঠিক থাকে নাকি?

থাকে, থাকে। সে তুমি বুঝবে না যে, কীভাবে থাকে।

কবিতা লেখা আরেক বিশৃঙ্খলা। বিশৃঙ্খল কাজের জন্য মদভরা মাথাই যথেষ্ট।

উমরাও বেগম দাঁত কিড়মিড় করতে করতে রাগ ঝাড়েন। গালিব কবিতার

ভাষায় বলেন—

'আমি মানুষের স্বভাব পেয়েছি; মানুষ
থেকেই আমার জন্ম, আমি গর্বিত যে
আমি পাপ করতে পেরেছি, আমার
দ্রাক্ষার বন্দনা কখনোই পরিত্যাগ করব না,
ঝড়ের ঘূর্ণিতে আমি সব সময় ঝাঁপিয়ে পড়ব।'

শেষ হলে চোখ বড় করে দু'হাত নেড়ে বলেন, বুঝলে, দ্রাক্ষার বন্দনা কখনোই পরিত্যাগ করব না। বুঝলে, আমি গর্বিত যে, আমি পাপ করতে পেরেছি। কবিতা লেখাও আমার পাপ। আমি পাপের পাঁকে ডুবে আছি।

তারপর স্ত্রীকে বলেন, তাহলে তুমি আমার মদ খাওয়ার পেয়ালাগুলো ধোবে না?

না, কখনোই নয়।

তবে তা-ই হোক।

হবেই তো।

আমি একটা সমুদ্র এনে কুঠুরিতে রাখব। সুরা খেয়ে, পেয়ালাগুলো সেখানে ডুবিয়ে রাখব।

তা-ই করেন। একটা সন্তান যার কপালে টেকে না, তাঁর আবার কবিতা, তাঁর আবার দ্রাক্ষার বন্দনা।

চোখ পানিতে ভরে যায়। কাঁদতে কাঁদতে চলে যান উমরাও বেগম। মন খারাপ হয়ে যায় তাঁর, কিন্তু অল্পক্ষণের জন্য। তিনি এত কিছু করতে ভালোবাসেন না। অনুশোচনা তাঁর অভিধানে নেই। অনুশোচনাকে তিনি ঘৃণা করেন।

একবার একজন ধর্মপ্রাণ মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল জামা মসজিদের সামনে। তিনি মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে বের হয়েছেন। গালিবকে পছন্দ করেন, কিন্তু তাঁর শরাবে আসক্তি সহ্য করতে পারেন না। দেখা হতেই বললেন, কেমন আছেন মির্জা সাহেব?

গালিব বুঝে যান যে তিনি কি বলবেন। তারপর মাথা নেড়ে বলেন, ভালো আছি। জামা মসজিদের সিঁড়িতে ভালো কাবাব বিক্রি হয়। কাবারের জন্য এসেছি।

তিনি শক্ত কণ্ঠে বলেন, সুরার জন্য আপনার কাবাব লাগে শুনেছি। শরাব পান খুব খারাপ কাজ মির্জা সাহেব। এর ফল ভয়াবহ।

গালিব শান্ত কণ্ঠেই বলেন, শরাবে কি এমন খারাপ জিনিস আছে?

ধর্মপ্রাণ মানুষটি তাঁকে বোঝানোর জন্য উৎসাহ নিয়ে বলেন, শরাবীর প্রার্থনা কবুল হয় না। আর প্রার্থনা কবুল না হলেতো বেহেশতের দরজা বন্ধ থাকে।

গালিব শক্ত কণ্ঠে বলেন, শরাবের সঙ্গে যাঁর প্রতিদিনের লেনদেন তিনি আর কিসের জন্য প্রার্থনা করবেন? তাঁর তো প্রার্থনার দরকার নেই।

ধর্মপ্রাণ মানুষটি তাঁর উত্তর শুনে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। আর একটি কথাও না বলে হনহন করে চলে যান। সেদিনও তাঁর কোনো অনুশোচনা হয়নি। যে তাকে অযাচিত উপদেশ দেবে তিনিতো তাকে ঠিক উত্তরটিই দেবেন। নিজের অনুভবের প্রকাশতো তিনি করবেনই।

সেই সকালে তিনি চটি খুঁজে পা ঢোকালেন। এক ঝলক বাতাস তাঁকে ছুঁয়ে যায়। তিনি স্বস্তি বোধ করেন। তখন উমরাও বেগম ঘরে ঢোকেন।

যাক, আপনার ঘুম ভেঙেছে তাহলে?

ভাঙবে না কেন? ঘুম তো আমার ভাঙবেই। তুমি কী আশা করেছিলে—

খবরদার, বাজে কথা বলবেন না। ঘুম পেলে আপনি মরার মতো ঘুমান। আপনার প্রচণ্ড নাক ডাকে। সেই শব্দ আপনি টের পান না। আর যখন আপনার ঘুম ভাঙে, আপনি মনে করেন, ঘুমটা বুঝি এলো আর গেল।

হ্যাঁ, তাই তো, এ রকমই ভাবি।

আজ আড্ডা হবে না?

হবে, বন্ধুদের সঙ্গ ছাড়া আমার কাছে দিনের অর্থ মরে যায়। উমরাও, তোমার মতো নারী হয় না।

আমি আমার প্রশংসা শুনতে এখানে আসিনি।

তবে কেন এসেছো?

গরিবুল্লাহ মহাজনের কাছ থেকে যে আপনি ঋণ করেছেন, সেই ঋণের টাকা পরিশোধ করতে বলে গেছে মহাজনের লোক।

বলবেই, তাকে বলতেই হবে। যে টাকা পায়, সে তো বাড়ি এসে তাগাদা করবেই।

এতই যদি বোঝেন, তাহলে টাকা দিচ্ছেন না কেন?

থাকলে তো দিতামই। আর যা আছে, তা সব দিয়ে দিলে আমার দ্রাক্ষারস কোত্থেকে আসবে বিবি!

এসব আমি বুঝি না। বাড়িতে লোক এসে টাকা চাইলে আমার অপমান লাগে। আমি অপমান সইবার জন্য আপনার সংসারে আসিনি। এই শহরে আমার আব্বা একজন অভিজাত মানুষ। তাঁর মান-সম্মান আছে।

ব্যস, ব্যস, থাম। তুমি তো কবিতা শোনার জন্য আমার সংসারে এসেছো।

না। খবরদার, এসব কথা বলবেন না। আমি আপনার তামাশা বুঝি।

চেঁচিয়ে ওঠেন উমরাও বেগম। রেগে আগুন হন। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে চুপসে যান তিনি— মীর্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব। তিনি অভিজাত পরিবারের সন্তান। সে জন্য তাঁর গর্ববোধ আছে। সেখানে ধাক্কা লাগলে তিনি বিপন্ন বোধ করেন। তার চরিত্রের এই দিকটি তাঁর বিবি ভালোভাবে জানেন। সুতরাং আঘাত করার জন্য এটি একটি উত্তম জায়গা। সেই প্রসঙ্গ তুলেই বললেন, ছোটবেলায় আব্বা আর চাচাকে হারিয়ে দাদা আর চাচীর কাছে বড় হয়েছেন। তারা আপনাকে তেমন কিছু শেখাতে পারেননি।

ভুল কথা। তারা আমাকে আমার মর্যাদার জায়গাটি ঠিকই চিনিয়ে দিয়েছিলেন। শোনো আমার কথা। কবিতায় বলছি—আমার পূর্বপুরুষেরা শত পুরুষব্যাপী যোদ্ধা ছিলেন, আভিজাত্যের পদমর্যাদার জন্য আমাকে কবিতা লিখতে হবে না।

ফুঃ, কবিতা।—উমরাও বেগম তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করেন।

কবিতা দিয়ে আভিজাত্যের মর্যাদা হয় নাকি? বাজে কথা। দিল্লির রাস্তায় ঘুমিয়ে থাকা অনেকেই কবিতা লিখতে পারে। তাদের পেটে রুটি আর আণ্ডা নাও থাকতে পারে। তাতে কী আসে-যায়?

কবিতা লেখার জন্য বাদশাহর দরবারে জায়গা হয় বিবি। আর শৈশবে আমি খেলাধুলা এবং ঘুড়ি উড়িয়ে সময় কাটিয়ে দিতাম। অভিজাত লোকজনের সঙ্গে আমার দাদা আর চাচার খুব যোগাযোগ ছিল। তাদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল। আমার কখনো কোনো অসুবিধা হয়নি।

ফুঃ, আবার সেই অভিজাতদের গল্প, যা বলতে আপনি ভালোবাসেন। কিন্তু সে কথা বলছেন না কেন যে, তারা আপনাকে কোনো শিক্ষায় শিক্ষিত করেননি। আপনার ভবিষ্যতের কথা তারা ভাবেননি। আপনি সৈনিক হিসেবে শিক্ষিত হননি, কোনো জীবিকার জন্য শিক্ষা পাননি, এমনকি কোনো সরকারি চাকরির যোগ্যতা আপনার নাই।

আহ, বিবি থাম।

উমরাও বেগম থামেন না। চেঁচিয়েই বলেন, শুধু নওয়াবদের কাছ থেকে ভাতা নিতে শিখেছেন। ঝিরকার নবাব আপনাকে বছরে যে দেড় হাজার টাকা ভাতা দেয়, সেটা আবার আপনার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয় আপনাকে।

যে কথাগুলো আমার জানা আছে সেই কথাগুলো তুমি আবার আমাকে বলছ কেন?

বলছি এ জন্য যে, যদি আপনি নিজেকে বদলানোর চেষ্টা করেন।

তা কখনোই হবে না। অনুশোচনা আমার চরিত্রে নেই।

তা আমি জানি। যেটা আমি জানি, সেটাই আপনি আবার আমাকে বললেন।

হো হো করে হাসেন তিনি। ভাবেন, এও মন্দ নয়। মদ, জুয়া, আড্ডা, কবিতা এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয় বিবির সঙ্গে ঝগড়া। এই তো বেঁচে থাকা। উমরাও বেগম ঘর ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর খিদে পেয়েছে। এখন কাকে বলবেন যে, তার রুটি-মাংস দরকার। তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়ান। একটু পরই মাংসের ঘ্রাণ তাঁর নাকে লাগে। তিনি বারান্দার কোণে রাখা পানি দিয়ে মুখ ভিজিয়ে নেন। দেখেন, উমরাও বেগম দস্তরখানার ওপর রুটি-মাংসের প্লেট রাখছেন।

আমি জানতাম, তুমি আমার জন্য খাবার আনতে গেছ। তুমি কখনোই আমাকে অভুক্ত রাখতে পার না।

উমরাও বেগম মৃদু হেসে বলেন, সবই আল্লাহর ইচ্ছা।

ইদানীং তুমি ধর্মকর্মে মন দিয়েছ। দিবেই যার সাতটি সন্তান মরে যায় তার আর অন্য উপায় থাকে না। তাঁকেতো এক জায়গায় আশ্রয় নিতে হয়।

আপনাকে এ পথে আনতে পারলাম না। উমরাওর বিষণ্ন কণ্ঠ উপেক্ষা করে তিনি মৃদু হেসে বলেন, সবই আল্লাহর ইচ্ছা।

উমরাও মশকরা বোঝেন না। তিনি কথা না বাড়িয়ে ঘর ছাড়েন। গালিব বোতল থেকে গ্লাসে সুরা ঢালেন। রুটি ছিঁড়ে মুখে পুরলে তাঁর কাছে কুঠুরির ভেতরের আলো অপূর্ব মনে হয়। এই সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকাকে আনন্দে ভরে তুলতে হয়। তাঁর জন্য মদ আর কবিতাই শেষ কথা। তিনি গুনগুন করে কবিতা আওড়াতে আওড়াতে বেশ মনোযোগ সহকারে রুটি-কাবাব খেতে থাকেন। একটু পর ছোট সোরাই ভর্তি পানি নিয়ে আসেন উমরাও বেগম। তিনি চোখ তুলে পরিতৃপ্তির আনন্দে উমরাওর দিকে তাকান।

তুমি কি খেয়েছ বিবি?

কেমন করে খাব? যার খসম দুপুর পর্যন্ত ঘুমায়, তার নসিব তো বদনসিব।

ব্যস, ব্যস। আর বলতে হবে না। তুমি খেতে যাও। আল্লাহর দোহাই, আমি বলছি, তুমি খেতে যাও। আজ মাংসের কাবাব তোফা। জিহ্বায় স্বাদ লেগে থাকছে। একটি কবিতা শোনো বিবি—

'স্বর্গ এই মহাবিশ্বে ধ্বংস ডেকে আনুক,
কিন্তু প্রেমের শপথ আরো, আরো শক্তিশালী হোক।
পাপ, পাপ।'

উমরাও উঠে পড়েন। ঘরের চৌকাঠ ডিঙাতেই তার চটির ফিতা ছিঁড়ে যায়। তিনি সেটা হাতে নিয়ে চলে যান।

এবার রুটি-কাবাব নয়, মদের পেয়ালায় তাঁর মনোযোগ ডুবে যায়। তিনি ভাবেন, প্রিয়তমা, তোমাকে এগিয়ে আসতে দেখে ভাবলাম, গোলাপের পাপড়ি দাঁতের ফাঁকে রেখে তুমি আসছ। কাছে এলে দেখলাম, গোলাপের পাপড়ি নয়, সে তোমার রঙিন ঠোঁট। তিনি এক চুমুকে পেয়ালার সুরা শেষ করে বলেন, জীবন কি সুন্দর। উল্লাসময় নগরীতে আমি বেঁচে আছি সৌন্দর্যে অবগাহন করে। ধন্য, ধন্য বেঁচে থাকা।

হাসেন তিনি, যেন হাসিতে মুক্তা ঝরে। হাসিতে তাঁর সুদর্শন চেহারা আরো উদ্ভাসিত হয়। তাঁর দৈহিক কান্তির বিচ্ছুরণ এই নগরীর কোথাও কোথাও নারী-হৃদয়ে ঢেউ ওঠায়। তিনি তা বোঝেন, বুঝে-শুনে এগোন। এগোলেই দেখতে পান, বিশাল নীল সমুদ্রের হাতছানিতে আশ্চর্য রংধনু। পানের পেয়ালা আবার ভরে ওঠে। তিনি বলে যান কবিতা—

'মদিরাতেই জীবন, পেয়ালাটি আঁকড়ে ধরলে
হাতের রেখাগুলো হৃদয়তন্ত্রীর মতো স্পন্দিত হতে থাকে।
খামখেয়ালিপনায় মাতাল করে সাকি
তৃণশয্যায় আমার বাসনাকে বহন করে।'

কল্পিত বিশ্বে মদের ইন্দ্রজাল প্রভাবে নিজের মধ্যে নিজেকে পাহারা দেওয়ার চেষ্টা করা বৃথা।

আবার আত্মনিমগ্ন হওয়া, আবার ফুল ফোটানো। আবার দিগন্তে পাড়ি জমানো। তাঁর মাথার ভেতর জলের ঘূর্ণি। সেই জলে দোল খায় আশ্চর্য রঙের পদ্ম। তাকে ধরা যায় না, মুঠির ফাঁক গলিয়ে আবার জলে আছড়ে পড়ে। মাখামাখি হয়ে যায় জল আর ফুলের সৌরভ।

তিনি ভরদুপুরে রাস্তায় নামেন। গনগনে রোদ চারদিকে। একটা ঘোড়ার শকট নেবেন কি-না ভাবছেন। কিন্তু আশপাশে শকটের চিহ্নমাত্র নেই।

রোদে ঘেমে যাচ্ছেন তিনি। ডান হাতের তালু দিয়ে কপালের ঘাম মোছেন। এই মুহূর্তে নগরীর বারবনিতাদের কেউ কেউ তাঁকে দেখলে হাসাহাসি করবে। বলবে, দেখো দেখো, একজন কবিকে কেমন কুৎসিত দেখাচ্ছে। হাঃ, আমার সৌন্দর্যের প্রশংসা শুনতেই আমি ভালোবাসি। আমার চেয়ে রূপবান

পুরুষ আর কে আছে এই নগরীতে!

তিনি নিজের টকটকে গায়ের রং নিয়ে সচেতন হয়ে রাস্তার পাশের গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ান। ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগে। ঠাণ্ডা পরশে তাঁর মন প্রফুল্ল হয়ে যায়। তিনি সেই বয়সী জ্ঞানী মানুষটির কথা ভাবেন। তাঁর যৌবনে যিনি তাঁকে বলেছিলেন, ধর্মের নিয়মকানুন আমাকে আনন্দ দেয় না। আমি পাপ-পুণ্যে পূর্ণ। জীবনকে আনন্দময় করে তুলতে বাধা অনুভব করি না।

হ্যাঁ, আমিও। তিনি আনন্দে গাছের নিচু ডাল ধরে নাড়া দেন। পাপ-পুণ্য আমার কাছেও সমান। আমিও বাধা অনুভব করি না। আমি খাদ্য ও পানীয় নিয়ে খুশির জীবন চাই। শুধু মনে রাখতে চাই যে, আমার পা আটকে যেতে পারে এমন কিছুতে আমি বসবো না। আমি মিছরির ওপরের মাছি হবো।

তিনি দেখতে পান, রাস্তার বিপরীত দিক থেকে শেখ মেহেদী আসছে। তিনিও এদিক থেকে এগিয়ে যান। দুই বন্ধু পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেন।

আমি তোমার কাছে যাচ্ছিলাম মির্জা। তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?

তেমন কোথাও না। ভাবলাম, বারবনিতা দুরকিজানের অভ্যর্থনা কক্ষে গিয়ে আড্ডা দিয়ে আসি।

হ্যাঁ, তোমার জন্য ওদের ঘরের দরজা উন্মুক্ত। ওরা তোমার রূপের প্রশংসা করে। ওরা তোমার কবিতাও ভালোবাসে। তুমি ওদের প্রিয় পাত্র মির্জা।

হা হা করে হাসেন তিনি। হাসতে হাসতে নিজের কবিতা আবৃত্তি করে উত্তর দেন—

'প্রেম যে ধ্বংসের আয়োজন করেছে তার জন্য আমি লজ্জিত,
একটি গৃহের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছাড়া
আমার বাড়িতে আর কিছু নেই।'

আহ, মির্জা আমরা তোমাকে বুঝি। তোমার কবিতা তোমার মনের কথা বলে দেয়।

গালিব তখন আবার নিজের পঙ্‌ক্তি আওড়ান—

'আমরা জীবনের অন্ধকার কক্ষে
পায়ে বেড়ি দেওয়া অবস্থায় আছি,
স্বাধীনতার অর্থ
গ্রানাইট পাথরের ধমনিতে স্ফুলিঙ্গ প্রবেশ করানো।'

ঠিক বলেছ।

তিনি মেহেদীর দু'হাত জড়িয়ে ধরে বলেন, স্বাধীনতা পাওয়া খুব কঠিন। আপসই কখনো কখনো বড় হয়ে ওঠে। আমার স্ত্রী আমাকে বোঝে না।

AMARBOI.COM

বুঝবে কী করে, তোমাকে বোঝা কি সহজ। তুমি তো সাধারণ স্বামী নও মির্জা। চলো, তোমার বাড়ি যাই।

চলো। কিন্তু আমি একটু সমস্যায় আছি।

সমস্যা? কী সমস্যা।

পাওনাদাররা আমার বাড়িতে হানা দিচ্ছে। আমাকে টাকার খোঁজ করতে হচ্ছে। সে জন্য আমি বাড়ি থেকে বের হয়েছি। কোথায় খুঁজব ভাবছি।

দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। শেখ মেহেদী বুঝতে পারে না, মির্জা আসাদকে কী উপদেশ দেওয়া যায়। বাড়ির কাছাকাছি এলে গালিব মাথা নেড়ে বলেন, এক জায়গায় একটা চেষ্টা করতে পারি।

কোথায়?

ঘরে চলো, বলছি।

নিজের ছোট কুঠুরিতে তিনি জীবনসমস্যার পথ খোলার চিন্তা করতে স্বস্তি পান। নিজ বাড়ি ছাড়া কোন জায়গায় তিনি সমস্যার সমাধান খুঁজবেন? দুরকিজানের গৃহ তো তার আনন্দের জায়গা। উমরাও বেগমের ভাষায়, পাপের জায়গা। আর তাঁর চিন্তায় পাপ-পূণ্যই জীবন।

কী চিন্তা করছো আসাদ?

চিন্তাই মানুষের জীবন। যে চিন্তা করে না, সে জীবনের অর্থ বোঝে না।

এ মুহূর্তে তোমার নতুন চিন্তা কি?

তিনি কবিতার ভাষায় বলেন,

'ঈশ্বর এক—এটাই আমাদের বিশ্বাস।
সমস্ত শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান আমরা বর্জন করতে পারি,
সমস্ত ধর্মই যখন অদৃশ্য হয়ে যায়
তখনই বিশ্বাস পবিত্র হয়ে ওঠে!'

শেখ মেহেদী হাততালি দিয়ে বলে, বাহবা, বাহবা। দারুণ বলেছ, দোস্ত।

তুমি আমার সঙ্গে একমত?

হ্যাঁ, একমত। শেখ মেহেদী শেষের পঙ্‌ক্তিটি আওড়ে বলে, সমস্ত ধর্মই যখন অদৃশ্য হয়ে যায়, তখনই বিশ্বাস পবিত্র হয়ে ওঠে। তখন মানুষই সত্য থাকে, নাকি?

হ্যাঁ, তা-ই। মানুষের সত্য থাকাটা জীবনের সবচেয়ে বড় কথা।

শেখ মেহেদী গালিবকে আলিঙ্গন করে। তখন মধ্য দুপুর। তখনো রাস্তাঘাট শূন্য। দু-চারজন মানুষ এদিক-ওদিক যাচ্ছে। দুই বন্ধু হাত ধরে রাস্তা পার হয়। ওদের দীর্ঘ ছায়া রাস্তার ওপরে বিছিয়ে থাকে।

গালিব শেখ মেহেদীর হাত টেনে ধরে বলে, দেখো, আমরা ছায়াহীন মানুষ নই।

আমরা তা হতেই পারি না।

দুজনে হো হো করে হাসে। উড়ে যায় রাস্তার শূন্যতা। যেন রাস্তাটা বাদ্যযন্ত্রের মতো বাজছে। টুংটাং ধ্বনিতে প্রলম্বিত হচ্ছে দীর্ঘ স্বর। মনে হয়, বুকের ভেতর আন্দোলিত হচ্ছে।

দুজনে কুঠুরির সামনে এসে দাঁড়ায়। দরজায় কড়া নাড়ে। ভেতর থেকে উমরাওর কণ্ঠ, কে ওখানে?

আমি, আমি দিল্লির কবি।

দরজা খুলে যায়। উমরাও মেহেদীকে দেখে লজ্জায় সরে যান। দরজার আড়াল থেকে বলেন, সারা বিকেল কি লুডো খেলা হবে দুজনের?

দু'জন নয় বিবি। আমার অন্য বন্ধুরাও আসবে। আর তুমি তো জানো, আমরা লুডো খেলি না। নসিব পরীক্ষার খেলা খেলি। আজ আমি ঠিকই জিতব। আমার নসিব সহায় হবে।

তবে তা-ই করেন।

কাপড়ের খসখস শব্দ করে চলে যান উমরা বেগম। গালিব টেবিলের ওপর রাখা সুরাইয়ের ঢাকনা সরিয়ে গ্লাসে পানি ঢালেন। ঢকঢক করে পুরো গ্লাস শেষ করেন। আর এক গ্লাস ঢেলে মেহেদীকে দেন। তারপর নিজের আলখাল্লা খুলে ঝুলিয়ে রাখেন। এতক্ষণে তাঁর মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

শেখ মেহেদী মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করে, শুনলাম তুমি চিফ সেক্রেটারি টমাস থমসনের সঙ্গে দেখা করনি?

গালিব ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, দেখা করিনি তা নয়। তাঁর সঙ্গে দেখা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

কেন হয়নি এই খবরটি শেখ মেহেদীর জানা নেই। ও জানে যে দিল্লি কলেজে একজন ফারসি শিক্ষকের খুব দরকার ছিল। আর ফারসি পড়ানোর জন্য তিনজন প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিলেন। একজন গলিব নিজে। অন্য দু'জন কবি মোমিন খান ও মৌলবী ইমাম বখশ। মেহেদী খানিকটা বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, কেন দেখা করা সম্ভব হয়নি। টমাস থমসন তোমার পূর্ব পরিচিত। তিনি তোমাকে ভালো জানেন। তাছাড়া দিল্লি কলেজে অধ্যাপনা করলে ফারসি পণ্ডিত হিসেবে তোমার খ্যাতি হতো। তাছাড়া নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা হতো। অর্থ কষ্ট দূর হতো।

মেহেদী আরও কিছু বলতে গেলে তিনি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি

অনেক লম্বা বক্তৃতা করছো বন্ধু। আসলে কি জানো, সেদিন আমাকে একটি সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। আমাকে খুব দ্রুত ভাবতে হয়েছিল যে কোনটি আগে– আত্মসম্মান না অর্থকষ্ট। আমি ভেবে দেখলাম আত্মসম্মান আগে। ভুলে যেওনা বন্ধু যে আমি কবি। কবিতা লিখে খ্যাতি হয়েছে।

সেদিন কি হয়েছিল?

একদিন থমসন তার অফিসে আমাকে ডাকলো। তুমিতো জানো দোস্ত যে সরকারি অফিসে আমি কুর্সী-নসীন। রেওয়াজ অনুযায়ী তারা এসে আমাকে গেট থেকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে নিয়ে যায়। আমি যথারীতি পালকিতে করে থমসনের অফিসে গেলাম। গেটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম, কিন্তু ভেতর থেকে কেউ এলো না। এর আগে যখন গিয়েছিলাম তখন থমসন এসে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। এবার থমসন এলো না। আমি দাঁড়িয়ে আছি তো আছি। এদিকে থমসন আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাকে না দেখে অনেকক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে বলল, মির্জা আসাদুল্লাহ খাঁ সাহেব আপনি ভেতরে আসছেন না কেন? আজকে আপনার ইন্টারভিউর দিন।

আমি বললাম, স্যার, আমাকে কেউ অভ্যর্থনা করে না নিয়ে গেলে আমি কেমন করে ঘরে যাবো?

তিনি বললেন, আমি জানি আপনি সরকারি দরবারে কুর্সী-নসীন। কিন্তু আজকেতো আপনি মেহমান হয়ে দরবারে আসেননি। চাকরিপ্রার্থী হয়ে এসেছেন। আজকে দরবারের নিয়ম আপনার জন্য পালিত হবে না।

আমি অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বললাম, একজন কুর্সী-নসীন হয়ে যে সম্মান আমি পাই তা আমি সব অবস্থাতেই প্রাপ্য বলে মনে করি।

থমসন সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আমি পারবো না। আমাকে মাফ করবেন।

ঠিক আছে, তাহলে আমি ফিরে যাচ্ছি। আত্মসম্মানই বজায় থাকুক।

আমি পালকিতে উঠে ফিরে আসি।

মেহেদী খানিকটুকু নরম সুরেই বলে, যার মাথার ওপর এমন ঋণের বোঝা, তাঁর কি অভিজাত পদমর্যাদার গরিমা সাজে!

খামোশ, মেহেদী।

গালিব চোখ গরম করেন।

গালিব বুঝতে পারেন, শেখ মেহেদী হয়তো আরো কিছু ঝাড়বে। তিনি নিজেও নিজের ক্রোধ সামলাতে পারেন না। ভাবেন, মেহেদীর বাড়াবাড়ি আছে। ও এমনই। বন্ধু হলে হবে কী, ছেড়ে কথা বলে না। তারপরও তাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হয় না। মেহেদী বারবারই তাকে একটি কথা বলে শাসায়,

অভিজাতের পমদর্যাদা নিয়েও তোমার দিন এনে দিনে খেতে হয় দোস্ত। ঠিক আছে আমি যাচ্ছি।

মেহেদী বেরিয়ে যায়।

তাঁর মেজাজ খারাপ হতে থাকে। তিনি চেঁচিয়ে বলেন—

'আমার হৃদয়ে জীবনের অনির্বাণ বাসনার দাগ,
নির্বাপিত মোমবাতির মতোই কোথাও
স্থান পাবার যোগ্য নই।'

দুটো পঙ্‌ক্তি বার বার আওড়াতে আওড়াতে তিনি ভেঙে পড়েন। তাঁর ভীষণ কষ্ট হয়। চেঁচিয়ে বলেন, পানি। কে আছ, আমাকে পানি দাও।

সেদিন তিনি বাড়িতে ফিরে আড্ডা দেওয়ার কুঠুরিতে ঢুকে পড়েছিলেন। উমরাও বেগমের মুখোমুখি হতে চাননি। জানেন, উমরাও বেগমও মেহেদীর মতো তাঁকে কথা শোনাবে। সে কথা বিষের মতো ছড়াতে থাকবে তাঁর শরীরে। সেই বিষ স্পর্শ করবে তাঁর কবিতার জগৎ। ওহ, কী নিঃসঙ্গতা! চারপাশে কত মানুষ, বন্ধু, আত্মীয়, পরিচিত, অপরিচিত— কত জন, তবু তাঁর নিঃসঙ্গতা কাটে না। ভীষণ একা হয়ে যান কখনো, চারপাশের মানুষের কোনো কিছুই তাকে ছুঁয়ে দেখে না। তিনি জোরে জোরে বলে যান নিজেরই কবিতার পঙ্‌ক্তি—

'ঘর ধুয়ে দিতে আমার চোখের জল এমনি অবেলায় যে
দরজা এবং দেয়াল থেকে নিঃসঙ্গতা চুইয়ে পড়ছে।'

এই ঘরে আলো-হাওয়া কম। তবু মনে হয়, প্রকৃতি সদয়। আজ বেশ হাওয়া খেলছে এই ঘরে। তাঁর স্বস্তি ফিরতে থাকে।

সেদিন সে সময়ে ঘরে ঢুকেছিলেন উমরাও বেগম। বলেছিলেন, বিফল হয়ে ফিরতে হয়েছে নিশ্চয়ই?

গালিব তার দিকে না তাকিয়ে বলেছিলেন, হ্যাঁ।

টমসনের মতো বিদেশিরা দিল্লির কবিকে সম্মান দেখাতে শেখেনি। বজ্জাত।

তিনি সোজা হয়ে বসে বলেন, আলবৎ ঠিক। মূর্খরা কবির মর্যাদা কী বুঝবে। ঠিক বলেছ বিবি, ঠিক বলেছ।

উমরাও মৃদু হেসে ঘর ছাড়তে গেলে গালিব বলেছিলেন, দাঁড়াও বিবি। তুমি কি আমার পেয়ালায় সুরা ঢেলে দেবে?

উমরাও কঠিন চোখে তাকিয়ে বলেছিলেন, না। কাল্লুকে ডাকেন।

গালিব এমন রূঢ় আচরণে নিশ্চুপ হয়ে ছিলেন। তিনি মন খারাপ করেন

না। এমন তো হরদমই হচ্ছে। এভাবেই তো দিন কাটছে। তিনি নিজেও তো কখনো এমন রূঢ়ই হন। জীবনতো এভাবেই চলছে। যতদিন বাঁচবেন ঘরে এবং বাইরে এভাবেই চালাবেন। কোথাও কোনো আপস করবেন না। যেমন করবেন না সংসারের সঙ্গে, তেমন দরবারের সঙ্গে, তেমন ধর্মের সঙ্গে। কেউ তাঁকে বশে নিতে পারবে না। দেখা যাক কি হয়।

কয়েকদিন পরে এক বিকেলে এক ঠোঙা রুটি আর কাবাব নিয়ে শেখ মেহেদী আসে। গালিব তখন গজল লিখছিলেন। দুরকিজান একটি গজলের কথা বলেছিল। লিখব লিখব করে লেখা হয়নি। মেহেদীকে কুঠুরিতে ঢুকতে দেখে প্রথমে ভ্রূ কুঁচকে তাকান, পরে হেসে বলেন, কাবাব আর রুটি? বেশ তো জুয়ার আড্ডা ভালোই জমবে।

তুমিও তো রুটি-কাবাব খাওয়াতে কসুর করো না। তখনও জুয়ার আড্ডা জমে।

গালিব হেসে বলেন, ঋণ শোধ। বহুত আচ্ছা।

কী লিখছো?

গজল, দুরকিজান চেয়েছে।

তিনি একজন সমজদার মহিলা। চমৎকার গজল গাইতে পারেন।

এ জন্য তাকে আমি পছন্দ করি। তার বাড়িতে আড্ডাটা জমে ভালো। সময় যে কোথায় দিয়ে পার হয়ে যায় তা টেরই পাই না।

হুঁ। শেখ মেহেদী গালিচার ওপর হাত-পা ছাড়িয়ে বসে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে, গালিবের লেখার সময়টুকু পর্যন্ত। টমসনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি তাকে খুব হতাশ করেছে। সেটা এখন পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারছে না। মাঝে মাঝেই বুকের ভেতরে ক্রোধ জাগে। ক্রোধ টমসনকে ঘিরে যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি গালিবকে নিয়ে। লোকটি কবি, কিন্তু কবির আচরণ মানে না। তাঁর মর্যাদাবোধ তাঁকে ভুল পথে নিয়ে যায়, তা নিয়ে তিনি সচেতন নন। পরক্ষণে শেখ মেহেদী নিজেকে বলে, আমি আমার মতো করে গালিবকে দেখছি কেন? কেন এমন করে তাঁকে নিয়ে ভাবছি, গালিব গালিবের মতোই। সে নিজে যা সে তাই-ই।

শেখ মেহেদী লুডোর ওপর চালের গুটি নিয়ে ঠোকাঠুকি করে। এক সময় গালিবের লেখা শেষ হয়। তিনিই খাতাটি যত্ন করে গালিচার নিচে রাখেন। সহজে কেউ বুঝতে পারবে না যে ওখানে গজল লেখা একটি খাতা আছে। তিনি শেখ মেহেদীর কাছে এসে বসতে বসতে বলেন, আজকের দিন বেশ গেলো।

মোটেই বেশ যায়নি।

হ্যাঁ, বেশ গেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন।

মেহেদীও জোর দিয়ে বলে, তুমি তা মনে করতে পারো। আমি করি না।

সে তোমার খুশি।

আমার খুশি নয়। একজন কবির জন্য আমার ভাবনা।

গালিব হা হা করে হাসেন। হাসতেই থাকেন।

অনেক হেসেছো। এবার থামো।

আমি ভীষণ অর্থ সংকটে আছি বলে তুমি আমাকে উপদেশ দিচ্ছ দোস্ত।

হ্যাঁ, দেবোই। আমি তো দেখেছি, তুমি অনেক ফরমায়েশী লেখা লেখো। প্রশস্তির কবিতা লিখতে তোমার আত্মমর্যাদায় বাধে না।

আমি এটাকে আত্মসম্মান হানিকর মনে করি না। কারণ আমার অর্থের দরকার।

মেহেদী উত্তেজিত হয়ে বলে, দিল্লি কলেজে শিক্ষকতা করার ইন্টারভিউতে ডাকা হয়েছিল তোমাকে। তুমি তা অকারণে ভণ্ডুল করে দিয়েছিলে। কি হতো তোমার শিক্ষকতার কাজটির জন্য চেনাজন থমসনের সামনে হাজির হলে? মনে কর সে দিনটির কথা?

গালিব বলেন, আমি তাদের বলেছিলাম কাজটি আমার মর্যাদার জন্য হানিকর।

হ্যাঁ, তুমি তা-ই বলেছিলে। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না যে তুমি তা বুঝে বলেছিলে কি-না।

তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, হ্যাঁ আমি বুঝেই বলেছিলাম। ব্যস, এ নিয়ে আমি আর একটি কথাও বলতে চাই না।

মেহেদী চুপ করে থাকে। গালিব কাবাব-রুটির ঠোঙাটি ছিঁড়ে দুজনের মাঝখানে রেখে বলেন, খাও দোস্ত। আমার বিবি আমাকে আজ কিছু খেতে দেয়নি। হয়তো ঘরে কিছু নেই। মহাজনের কাছ থেকে ঋণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সে কাজটি আমাকেই করতে হয়।

হ্যাঁ, সেটা তোমারই কাজ। কাজটি ঘরের স্ত্রীর নয়। তুমি কি তাঁকে কিছু রুটি আর কাবাব দিয়ে আসবে?

তুমি তো জানো তাঁকে। সে এসব খাবে না। এর চেয়ে শুধু পানি খেয়ে থাকতে পছন্দ করে। খাও বন্ধু। আমার খিদে পেয়েছে।

আবার নীরবতা। তখন এক বোতল সুরা নিয়ে এলেন মুফতী সদরুদ্দিন আজুরদা।

গালিব উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, আমার বন্ধুরা এমনই। আমাকে যেমন

শাসন করে, তেমন ভালোবাসে। একজন এনেছে রুটি-কাবাব, অন্যজন শরাব, দুটোই আমার বেঁচে থাকার জন্য খুবই জরুরি।

সদরুদ্দিন হাসতে হাসতে বলে, শুধু জরুরি নয় বন্ধু। এসবের মধ্যে বেঁচে আছে কবির প্রাণ। আমরা কবিকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই।

বোস বন্ধু, বোস।

গালিব সদরুদ্দিনের হাত ধরে টেনে বসান। সদরুদ্দিন একজন বিচারক। গালিবের কবিতার ভক্ত। এ আড্ডায় আসতে পছন্দ করেন। গালিব তাঁর আনা সুরার বোতল খুলতে খুলতে বলেন, তুমি তো পান করো না। সজ্জন ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের সামনে সুরার পেয়ালা হাতে নিলে আমার শরীরে কাঁপুনি ওঠে।

শেখ মেহেদী বলে, জগতে তোমার কাউকে ভয় নেই দোস্ত। তুমি খুব স্বাধীন মানুষ। আপস করতে শেখইনি।

কী যে বলো না! জগতে ভয় করার মতো কত মানুষই তো আছে। যা হোক, আমি জানি মুফতী সদরুদ্দিন এখন আমার কাছে একটা কবিতা শুনতে চাইবে। ঠিক না?

বিলকুল ঠিক।

সদরুদ্দিন আল্লাখাল্লা গুছিয়ে যুত করে বসেন। মেহেদী কাবাব-রুটি খাওয়া প্লেট দুটো ঘরের কোণে গুছিয়ে রাখে। গালিবের কণ্ঠ আস্তে আস্তে উচ্চকিত হতে থাকে—

'তোমার যদি বিশ্বাস থাকে ঈশ্বর তোমার প্রার্থনা
মঞ্জুর করবেন, তাহলে কিছুই চেয়ো না,
যদি চাও, শুধুমাত্র একটি হৃদয় প্রার্থনা করো—
যার কোনো ভয় নেই, লক্ষ্য নেই, এবং কামনাও নেই।
সমুদ্রের প্রবল আলোড়ন তটের গাম্ভীর্যকে
অতিক্রম করে।
তুমি সেখানে সাকির মতো মদ ঢেলে দাও,
সংযম কিছুই ধরে রাখতে পারে না।'

দু'বন্ধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে, বাহবা, বাহবা।

আজুরদা বেশ কিছুক্ষণ তালি বাজিয়ে বলে, আমার একটি কবিতায় হবে না। আরও দু-একটি শোনাতে হবে। নতুন লেখা না থাকলে ক্ষতি নেই। আগের লেখাই শোনান, না হয়।

গালিব পুরনো খাতা টেনে বের করেন। পাতা ওল্টাতে থাকেন। একটি পৃষ্ঠায় থেমে বলেন পেয়েছি। এটাই পড়বো। তিনি শুরু করেন :

'শরীর যখন জ্বলে গেছে আর হৃদয় পুড়েছে সঙ্গে,
তবুও তো তুমি ভস্ম ঘাঁটছ, কী খুঁজছ ওইখানে?

শিরায় শিরায় রক্ত আমার বয়েই চলেছে, তবু
দুই চোখ দিয়ে না-ই যদি পড়ে, কীভাবে রক্ত বলি?

ওই যে রূপসী, যার কথা ভেবে অমরা আমার প্রিয়
কস্তুরী ঘ্রাণ সুরায় কী কাজ সে যদি না থাকে কাছে!

মধুকলসটি দেখলে দু-চার চুমুক দেবই, তবে
বোতল পেয়ালা পানপাত্রের দরকার কিছু আছে?

বলার শক্তি একটুও কিছু বাকি আর নেই আমার
থাকতই যদি, কোন আশা নিয়ে বলি আকাঙ্ক্ষা কী?'

গালিব একের পর এক তাঁর গজল পড়তে থাকেন। দু'জন মুগ্ধ শ্রোতা অনবরত মারহাবা ধ্বনি উচ্চারণ করে নিজেদের আনন্দ প্রকাশ করেন। সময় কেটে যায়। দিল্লির আকাশে জমে ওঠে সময়ের ঘুড়ি– নাটাই থেকে খুলে আসে কবিতার সুতো। সে সুতোয় জড়িয়ে থাকে কবির কণ্ঠস্বর। কবির সামনে সময় নেই– তা ঘুড়ির মতো উড়ে যায় অনন্ত আকাশে। আর এই কবিতার জন্য তাঁর প্রতি অনুরক্ত শহরের গুণী মানুষেরা।

গালিব একে একে বেশ কয়েকটি কবিতা পড়েন, যেন তিনি ঘোরের ভেতরে প্রবেশ করেছেন এবং এটাই তাঁর প্রার্থনার ভাষা। সদরুদ্দিন আজুরদা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। মুগ্ধ তন্ময়তায় বলেন, এ জন্য তোমার জন্য আমার এত ভালোবাসা দোস্ত। মনে হয় আমার সবকিছুর বিনিময়ে তোমাকে ঘিরে রাখি। খোদাতালা তোমাকে অনেক বছর বাঁচিয়ে রাখুন।

দুরকিজানের অভ্যর্থনা কক্ষে আড্ডা জমে উঠেছে। নগরীর দামী তাওয়ায়েফ সে। যে কারোর এখানে প্রবেশাধিকার নাই। যারা সম্ভ্রান্ত তারাই আসেন। গালিবের অভাব, আর্থিক সংকট সত্ত্বেও দুরকিজানের দরজা তাঁর জন্য উন্মুক্ত। কখনো দুরকিজান লোক পাঠিয়ে তাঁকে যেতে বলেন গজল শোনার জন্য। নিজেও চমৎকার গায়। তার কণ্ঠ মাতিয়ে তোলে অতিথিদের। রাত ভোর হয়ে যায় এক একটি আসর দিয়ে।

কতদিন দেখা গেছে অতিথিরা চলে গেছে। থেকে গেছেন শুধু কবি। দুরকিজানের ইচ্ছায়। সে এক আশ্চর্য সময়ের ভেতর দিয়ে যাত্রা। বিছানায় ফুল

ছড়ানো থাকে। চারদিকে আগরবাতি জ্বলে। ফুল ও আগরবাতির সৌরভ লেগে থাকে দুরকিজানের শরীরে। কবি তখন অস্ফুট কণ্ঠে বলতে থাকেন—

'আমার পাপের মধ্যে পবিত্র জীবন যাপনের দাবি
শতবার মৃত্যুলাভ করেছে।'

দুরকিজান তাঁকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলে, কার সঙ্গে কথা বলছেন কবি?

সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে।

সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে! আপনার তো সৃষ্টিকর্তা নাই। তাহলে তার সঙ্গে আবার কথা কেন?

সে আমি কাউকে বোঝাতে পারি না ডোমনি। তাহলে শোন কবিতা—

'ঈশ্বরের করুণা সর্বাত্মকভাবে আলিঙ্গন করে।
যদিও আমি ধর্মহীন এবং
আমাকে পাপের সীমা নেই তবুও আমি
ক্ষমা পাই।'

এতো খোদাতালার কাছে আত্মসমর্পণের কথা। কবি, আপনি অনেক বড় নেকবান বান্দা। আপনি যেভাবে খোদাকে স্মরণ করেন, আর কেউ এভাবে পারে বলে আমার মনে হয় না কবি।

তোমার মতো এমন করে আমার কবিতা কেউ ভালোবাসে না দিল্লি দামী গায়িকা। তোমাকে সেলাম।

বাসে, বাসে। অনেক লোক আপনার কবিতা ভালো বাসে। আপনি দিল্লির অভিজাত মহলে একজন নামকরা লোক। আপনার মতো আর কে আছে!

গালিব প্রবল প্রশান্তিতে ডুবে গিয়ে বলেন, আমার জীবন ধন্য ডোমনি। তোমার এই বিলাসী ঘর, বিছানায় আমি স্বপ্নের মধ্যে ডুবে যাই। আর তোমার প্রশস্তি বাক্য শুনলে আমার কবিতা লেখা সার্থক হয়ে ওঠে।

আমি আপনার একটা কবিতা বলি?

বলো, বলো হে আমার প্রিয়তমা।

দুরকিজান মৃদুকণ্ঠে বলতে থাকেন—

'জীবনের প্রতিটি উপাঙ্গেই প্রেম ঈর্ষাপূর্ণ,
মজনুর ছবি আঁকো,
তার প্রবল ছদ্মবেশহীন উত্তেজনা যেন
নগ্ন হয়ে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে।'

গালিব উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেন, বাহ্ বাহ্। আমার গোলাপ। আমার দিনের আলো তুমি। তুমিই আমাকে বাঁচিয়ে রাখো পাপে ও পুণ্যে।

দুরকিজান গালিবের বুকে মাথা রাখেন। কেটে যায় ভোরের প্রহর। এভাবে কত রাত পার হয়।

এমন রাত কাটিয়ে নগরের আকাশে ঘুড়ির মতো উড়ে বেড়ান তিনি। বুঝতে পারেন না নিজের এমন ঘুড়ি হয়ে যাওয়ার অর্থ। শুধু বুঝতে চান স্বর্গমর্ত্যের সীমানা কেমন! ওহ, জীবনের এমন সুন্দর সময় আর হয় না। একটি কবিতার জন্মের মতো। তিনি পাখির মতো উড়তে উড়তে নিজের বাড়িতে ফেরেন— যেখানে অভাব আছে, মহাজনের তাড়া আছে, কোতোয়ালের ভয়ে লুকিয়ে থাকার অন্ধকার আছে এবং ঘুমোবার বিছানা আছে। তাঁকে দরজা খুলে দেয় কেউ— তাঁকে ঘরে ঢুকতে সাহায্য করে কেউ। তাঁর সামনে রুটি আর কাবাবের প্লেট এগিয়ে দেয় কেউ। তিনি গালিচার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে শূন্য ছাদে মাকড়সার হেঁটে যাওয়া দেখেন। ভাবেন, জীবন এমনই জটিল স্নিগ্ধ এবং কুৎসিত। জীবন এমনই বড়— ঘর এবং আকাশ। জীবন এমনই গভীর মদ এবং সমুদ্র। তাঁর মনে হলো তাঁর ঘুম পাচ্ছে। তাঁর চোখ বুজে আসছে। ঘরে আলো নেই। হাওয়া নেই। শীত বা গ্রীষ্ম অনুভূত হচ্ছে না। তিনি তলিয়ে যেতে থাকেন— তিনি বুঝতে পারেন তাঁর অঙ্গজুড়ে প্রবল ভালোলাগা। ভালোলাগার তীব্র স্রোত তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। স্বপ্ন দেখেন। তাঁর মনে হয় তিনি নিজের ভবিষ্যতের সময় নিয়ে কোনো বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছেন। না, তা বোধহয় ঠিক নয়। তিনি কাউকে চিঠি লিখছেন। শুধু ভেতর থেকে উঠে আসছে কিছু কথা, যে কথা তাঁর ভবিষ্যতের দিনগুলোর জন্য তুলে রাখা হয়েছে। সে কথাগুলো তিনি স্বপ্নের মধ্যে আওড়াতে থাকেন, আমার মনে হয় স্রষ্টার অনুরাগীদের মধ্যে হাজারে একজনও আমার মতো উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর জন্য, সম্পর্কের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের জন্য ত্যাগ ও উদারতা লাভ করতে পারেনি। আমার শারীরিক শক্তি ফুরিয়েছে। একটি লাঠিও ধরতে পারি না। একটি কম্বল, টিনের কৌটা বা দড়ি নিয়ে হেঁটে সিরাজ, মিসর বা নফজে যাবার সাধ্য নেই। সারা দুনিয়ার শাসক হওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। আমি যদি সবার জন্য নিজেকে যোগ্য করতে না পারি তবে যে নগরে আমি বাস করি, দেখতে চাই সে নগরের একটি লোকও খাদ্য ও পোশাক ছাড়া নেই।

তিনি অনুভব করেন তাঁর স্বপ্নের পৃষ্ঠাগুলো সাদা হয়ে গেছে। ওখানে আর আঁচড় কাটা যাচ্ছে না। তিনি তাঁর কুঠুরি থেকে বেরিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়েছেন। রাত। নগরী অন্ধকারে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে। যেন নগরী ভীষণ একা। কোথাও কেউ নেই যে তাঁর নিঃসঙ্গতা ভরিয়ে দেবে। তিনি মনে মনে বলেন, আমি

এমনই নগরী চাই, যে আমার সবটকু গ্রহণ করবে। বলবে, নিঃসঙ্গতার চেয়ে বড় শক্তি আর কী! বুকের ভেতর থেকে উঠে আসে শব্দরাজি।

রচিত হতে থাকে কবিতা—

'আমি চূড়ান্ত নিঃসঙ্গতার মধ্যে বাঁচতে চাই
কারো সঙ্গে বাক্যালাপ নয়,
কাউকেও চিন্তার অংশীদার করতেই চাই না
ছাদ এবং দেয়ালশূন্য বসতি, অথবা
প্রতিবেশীরা ভাগ্য এবং তস্করের জন্য
পাহারা বসাবে, আমি অশক্ত এবং অসুস্থ হলে
কারো যত্ন চাই না, এবং আমার প্রয়াণ ঘটলে
কারো শোক প্রকাশের প্রয়োজন নেই।'

ঘুম ভাঙলে দেখতে পান উমরাও বেগম দাঁড়িয়ে আছেন।

তিনি প্রথমে তাঁর পায়ের অংশ দেখেন, পরে উর্ধ্বাঙ্গ। তাঁর চেহারায় বিরক্তির ছাপ। ভ্রূ কুঁচকে আছে। হাতে তসবি। তাঁকে চোখ খুলতে দেখে উমরাও বলেন, কী ব্যাপার গালিচার ওপর ঘুমিয়ে আছেন?

মৃত্যু তো এভাবেই শুতে বলে।

বারবণিতার ঘর থেকে ফিরলে মৃত্যু কাছে আসার তো কথা নয়। সেটা তো আপনার স্বর্গ।

যার ধর্ম নেই, তার আবার স্বর্গ কী বিবি!

তিনি হাসতে হাসতে উঠে বসেন। উমরাওকে যেতে দেখে বলেন, আমার পেয়ালাগুলো ধুয়ে দেবে বিবি?

না। ওসব আমি ছুঁই না। যা আপনি জানেন তা নিয়ে আবার অনুরোধ করেন কেন? কাল্লুতো আছে আপনার কাজ করার জন্য।

তাই তো! ঠিক বলেছো। তুমি কি কিছু বলতে এসেছিলে?

না, শুধু দেখতে এসেছিলাম।

মরে গেছি কি-না দেখতে এসেছিলে?

অতোটা বোকা আমি নই। সাতটি সন্তানের মৃত্যু দেখেছি। মৃত্যু আমার খুব চেনা।

উমরাও বেগম চলে যান। গালিব চুপ করে বসে থাকেন। মনে হয় কে যেন ডাকছে।

গালিব, গালিব দরজা খোল।

কোন দরজা খুলবো? সব দরজা তো খোলা।

তখনও উচ্চারিত হতে থাকে— গালিব, গালিব দরজা খোল।

চারদিক থেকে শব্দ আসে। চারদিক চৌচির হতে থাকে। তিনি কুঠুরির জানালা দিয়ে আকাশ দেখতে পান না। দেখেন আকাশ ঘরে। কতদিন তোমাকে নিজের মতো করে দেখবো বলে রাস্তায় হেঁটেছি। তুমি তো আমাকে ধরা দাওনি আকাশ— আজ তুমি আমার ঘরে কেন? তুমি কি ভেবেছো আমাকে শিশিরে ভরে দেবে? আমার শরীরে মুক্তার মতো লেগে থাকবে শিশির? বলবে, দুঃখ ভুলে যাও? না, বন্ধু এমন কথা আমাকে বলো না। আমি ফুলের প্রেমে বন্দি পাখি। আমি তো ওড়ার ক্ষমতা হারাইনি। আমি হারাতে পারি না। কারণ আমি জানি মদিরাতেই আমার জীবন। পানপাত্র আঁকড়ে ধরলে আমার কররেখা হৃদয়তন্ত্রীর মতো স্পন্দিত হতে থাকে। তুমি আমার কতটুকু নিতে চাও আকাশ? সবটুকু! না, তুমি আমার কিছুই নিতে পারবে না। আমি আমার সবটুকু নিবেদন করেছি সৌন্দর্যের কাছে। আকাশ, তুমি যদি আমার প্রেমিকা হও তাহলে অত দূরে দাঁড়িয়ে থেকো না, গোলাপ কুঁড়ির মতো তোমার ওষ্ঠাধর এগিয়ে নিয়ে এসো। আমি প্রবল চুম্বনে ভরিয়ে দেই।

গালিব, গালিব দরজা খোল।

আমার তো সব দরজাই খোলা। আমার সৌন্দর্য তুমি ঘরে এসো। আমি তোমার অপেক্ষাতেই আছি। তুমি আমার হৃদয় খুঁড়ো না, সেখানে আগুন চাপা দেয়া আছে। যন্ত্রণা পেতে পেতে আমার হৃদয়ে আগুন জমেছে।

আমি বসন্ত গালিব!

ওহ্, আমার প্রেমিকা! তুমি আমাকে মদের নির্যাস থেকে মদিরতা পেতে দাও। তুমি আমার তৃণভূমির শ্যামলিমা প্রিয়তমা বসন্ত। তুমি আমাকে কোমল ঠাণ্ডা বাতাসের কথা বলতে দাও।

তুমি আমাকে তুলে নাও হৃদয়ে—তুলে নাও শরীরে। যত খুশি ভালোবাসো—ভালোবাসায় ভেসে যাও, আমি তোমারই আছি কবি। আমি তোমার বসন্ত দিন। নগরীর পাতাঝরা দিনের সময় এখন। আহ, প্রিয়তমা বসন্ত, তুমি আছো বলে আমার বেঁচে থাকা। তোমার জন্য আমার নতুন পত্রপল্লব দেখা। পাখির গান শোনা। প্রিয়তমা বসন্ত, তোমার দক্ষিণা বাতাসে আমার বুকভরে শ্বাস নিতে দাও। আমার জন্য কোনো শাসনের বেড়ি তুমি হাতে উঠিও না, প্রিয়তমা।

গালিব, গালিব দরজা খোল।

আমার তো সব দরজা খোলা। তুমি কি দেখতে পাও না?

আমি তো দেখছি তোমার সব দরজা বন্ধ গালিব। আমি তোমার প্রিয়তমা

রাস্তা। দিনের বেলায় তুমি আর ছুটে বের হতে পার না। নগরীর রাস্তাগুলো তো তোমার অপেক্ষায় আছে।

চুপ করে থাকেন তিনি। শুনতে পান অনবরত বয়ে যাওয়া শব্দতরঙ্গ। তরঙ্গ ছুটে এসে কল্লোলিত হয় তাঁর কুঠরির মধ্যে। তিনি অপলক তাকিয়ে থাকেন। বুঝতে পারেন তিনি কত অসহায়। এই নগরীতে তিনি এখন বড় বেশি বিপন্ন বোধ করছেন।

মদের দেনার জন্য মহাজনরা তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করেছে। দেনা তো তিনি করবেনই। কারণ মদ ছাড়া তিনি চলতে পারেন না। মদ তাঁর জীবনধারণ। মদ তাঁর কবিতা। আর মদ কেনার জন্য যথেষ্ট টাকা নেই বলে তাঁকে ঋণ করতে হয়। মহাজনরা তো নালিশ করবেই। কারণ তিনি ওদের টাকা শোধ করতে পারেন না। এই সরল হিসাবটি তিনি খুব সরলভাবেই বোঝেন। বলেন, আমি তো মদপানের প্রশংসা করি না। মদপানের মহত্ত্ব প্রচার করি না। আমি জানি আমি পাপী। কারণ আমি উদভ্রান্তের মতো মদ পান করি। বেহিসাবী মানুষ। এমন আচরণ ঠিক নয় বলেই মনে করি। তারপরও আমি মদ ছাড়া বাঁচতে চাই না।

তকীয়ুল্লাহ তীব্র ভাষায় বলেন, এভাবে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না তুমি। পাপী হওয়ার মতো ধিক্কারের মানুষ হয়ে লাভ কী? এটা সম্মানের নয়। তুমি মদ্যপান পরিহার করো।

তিনি সরল হাসিতে বন্ধুর ভর্ৎসনা উড়িয়ে দেন। সরলভাবে নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলেন, মদপানকে তো আমি দোষের মনে করছি না। বন্ধু, আমার অপরাধ কোথায়?

তকীয়ুল্লাহ বিরক্তি নিয়ে চেঁচিয়ে বলেন, তুমি কি জানো না মাতালের প্রার্থনা শোনা হয় না?

হা হা করে হাসেন তিনি। হাসতে হাসতে বলেন— বন্ধু, পেয়ালাভরা মদ মজুদ থাকলে প্রার্থনা করার প্রয়োজন হবে কেন?

বন্ধু চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকে। ভাবে, এ লোককে মদ ছেড়ে দেয়ার কথা বলা বৃথা।

তিনি বলেন, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও বন্ধু।

মদ যার পাপ এবং জীবন, তার প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায় না।

গালিব বলেন, আমার বন্ধুরা আমার কাছে লাজওয়াব থাকবে কেন? তারাই তো আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। তাদের ছাড়া তো আমার বেহিসাবী অপচয় পূর্ণ হয় না।

গালিব এখন আদালতে। সদরুদ্দিন আজুরদা বিচারক। মদের দেনার জন্য মহাজনদের নালিশের বিরুদ্ধে তিনি বিচারকের প্রশ্নের জবাব দিলেন কবিতায়—

'আমি ঋণ করে মদ্যপান করি, কিন্তু এটাও জানি
আমার বেহিসাবী খরচের জন্য যে দারিদ্র্য
তাতে আমার ধ্বংস ডেকে আনবে।'

মাননীয় বিচারক আপনি আমার বিচার করুন।

মহাজন উদ্বিগ্ন। কারণ তিনি বিচারকের ঠোঁটে মৃদু হাসি দেখছেন। তিনি কি এই অভিজাত কবিকে প্রশ্রয় দেবেন? নাকি বিচারের রায় তাঁর পক্ষে আসবে? মহাজন ভালো করেই জানেন যে বিচারক কবির বন্ধু। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় গালিবের দম বন্ধ হওয়ার জোগাড়। বন্ধু বলেই তো আদালতে এমন কবিতার ভাষা। বন্ধু না হলে তিনি কি কবিতা বলতে পারতেন? উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় তাঁর সময় শেষ হওয়ার আগেই বিচারক অভিযোগকারীর পক্ষে রায় দিলেন।

সদরুদ্দীন আজুরদা আসামিকে বললেন, আপনি দু'দিনের মধ্যে ঋণদাতার ঋণ পরিশোধ করবেন। বিচারের রায় কার্যকর না হলে পরবর্তী বিচারের দিন ধার্য করা হবে।

গালিব শূন্য দৃষ্টিতে বিচারক বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অন্যদিকে মহাজন খুশি হয়ে গদগদ স্বরে বলে, হুজুর নায্য বিচার পেয়েছি। হুজুর ন্যায়বান মানুষ। হুজুর শুকরিয়া।

আদালত শেষে আজুরদা গালিবকে বলেন, আপনি আজ সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে আসবেন।

মহাজন সালাম দিয়ে বিচারকক্ষ ছেড়ে যায়। গালিবও বাড়ি ফিরে আসেন।

সন্ধ্যায় তিনিও হাজির হন সদরুদ্দিন আজুরদার বাড়িতে।

আজুরদা মৃদু হেসে বলে, এসো। আমি তোমার অপেক্ষায় আছি। বিচারকের আসনে যখন বসি তখন আমাকে ন্যায় বিচারই করতে হয়।

গালিব চেয়ারে বসতে বসতে বলেন, আমি তোমার সঙ্গে একমত। বিচারকের আসনে বসে বন্ধুর মুখের দিকে তাকাতে হয় না। সেই মুখ তখন আসামীর।

আজুরদা হা হা করে হেসে ওঠেন। বলেন, তুমি একজন সমঝদার লোক। তোমার রসিকতা দিল্লির গুণী মানুষের আসরে আলোচনার বিষয়। সবাই বেশ মজা পায়। সেদিন নাকি তোমার বন্ধু তোমার কাছে জানতে চেয়েছিল, রথ

শব্দটি পুরুষ না স্ত্রীলিঙ্গ? তুমি মজার উত্তর দিয়েছ।

হ্যাঁ, আমাদের বন্ধু হাকির যখন প্রশ্নটি করল আমি সহজ উত্তর দিয়ে দিলাম। বললাম, দোস্ত শব্দটা কি তা ভেবে দেখুন। মনে করবেন রথের আরোহী কে। তিনি যদি নারী হন তাহলে সেই রথ হবে স্ত্রীলিঙ্গ। আর আরোহী যদি পুরুষ হন তবে সেই রথ হবে পুংলিঙ্গ।

আজুরদা হেসে বলেন, শব্দের ব্যাকরণ যিনি জানতে চেয়েছিলেন তিনি কোনো উত্তর পাননি। কিন্তু রসিকতা হিসেবে দারুণ। আমরা তোমার স্মার্ট উত্তর শুনে মুগ্ধ।

গালিব ঘাড় নেড়ে বলেন, আমি তোমাদের বন্ধুত্ব উপভোগ করি। এই শহরে আমার বন্ধুরা আছে বলেই আমার দিনগুলো মিইয়ে থাকে না। আমি প্রাণ পাই।

আজুরদা হাত বাড়িয়ে গালিবের দু'হাত জড়িয়ে ধরে বলেন, আজ কি কবিতা পড়া হবে, নাকি তাওয়াফদের কোথাও আসর আছে।

মৃদু হেসে ঘাড় নেড়ে বললেন, আসর আছে।

আজুরদা একটি ছোট প্যাকেট তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, এই টাকা দিয়ে কালই ঋণ শোধ করবে। মহাজন যেন দ্বিতীয়বার আদালতে আসার সুযোগ না পায়।

এ ওয়াদা আমি তোমাকে করতে পারবো না বন্ধু। কারণ আমার খরচের কোনো হিসাব নাই। যেদিন হিসাব করবো সেদিন কবি গালিবের মৃত্যু হবে।

ঠিক আছে, এসব কথা আর হবে না। আমরা তোমার পাশে থাকব।

শুকরিয়া। তারপর টাকার প্যাকেটটা দু'হাতের মধ্যে রেখে আবৃত্তি করেন :

'রূপনগরের আদালতে দরজা খুলেছে,
ফৌজদারির বাজার আবার চাঙ্গা হয়েছে।
বিশ্বজুড়ে হাঁকিয়ে আছে এমন অন্ধকার—
পুঞ্জ চুলের সেরেস্তা যে ফলায় অধিকার।
হৃদয়কণা এখন যে এক সওয়াল করে ফের,
কান্না থাকে ফরিয়াদের সঙ্গে মিশে ঢের।
সাক্ষী তলব হয় যে আবার প্রেমপিরিতির মাঝে
হুকুমদারি নইলে চোখের বর্ষা নামে না যে।
মনের সঙ্গে চোখের পাতায় মামলা ছিল জমা—
পেশ হলো যে আজকে আবার সেসব মোকদ্দমা।

গালিব, জেনো, নই অকারণ আত্মভোলা, যার
এমন কিছু আছে— খানিক আড়াল দরকার।'

আজুরদা মুগ্ধ হয়ে অভিভূত কণ্ঠে বলেন, মারহাবা। মাশাল্লাহ।

আনন্দে তাঁর চোখ চিকচিক করে ওঠে। তিনি গালিবকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, বেঁচে থাক বন্ধু। তোমার কবিতা আমার হৃদয়ে অমৃত সমান।

গালিব বিদায় জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। ভেবেছিলেন দুরকিজানের বাড়ির আসরে যাবেন। এমনই কথা ছিল। কিন্তু খানিকটুকু যেতেই পালকির বেহারাদের বাড়িতে যেতে বললেন। ভাবলেন, মহাজনের ঋণ শোধ করার টাকা যদি দুরকিজানের গানের আসরে খরচ হয়ে যায় তাহলে আজুরদার কাছে আর মুখ দেখাতে পারবেন না। বন্ধুর ভালোবাসার অপমানও করা হবে।

গালিব ঘনঘন মাথা নাড়েন। কখনো অস্থিরতা তাঁকে নিরাশাবাদী করে তোলে। কখনো তিনি বিষণ্ন হয়ে যান। নিজের আচরণের বিরুদ্ধে নিজেই নিষ্ঠুর রায় দেন। কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। আসলে নিয়ন্ত্রণ করতে চানও না। তিনি জানেন, নিজের ইচ্ছাকে কষ্ট দিয়ে কবিতা হয় না। আত্মাকে লাগামহীন হওয়ার সুখ দিতে হয়। সেটাই কবির দায়।

আজকে তিনি আর নিজের ইচ্ছার কাছে পরাজিত হলেন না। বাড়িতেই ফিরলেন। পরদিন মহাজনের ঋণ শোধ করে দিলেন।

দিন তো এক রকম যায় না। কিছুদিন নিশ্চিত কাটানোর পরে আবার শুরু হলো ঋণ করা। যে ভাতা পান তার দ্বিগুণের বেশি খরচ করেন। অর্থ নেই বলে ঋণ জমে বোঝা হয়ে যায়। পরিশোধ করা কঠিন। আবার মহাজনরা তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেন। কয়েক মাসের মধ্যে মহাজনরা তাঁর বিরুদ্ধে আদালত থেকে ডিক্রি পেয়েছে। এখন ঋণের জন্য তাগাদা নেই। গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। দিনের বেলায় সম্মানিত ঋণগ্রস্তদের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করার নিয়ম নেই। কিন্তু রাস্তায় পেলে গ্রেফতার করা হবে এবং আদালতের অফিসারদের জানাতে হবে।

গালিব ঘরে থাকতে শুরু করলেন। রাতের বেলা বের হয়ে নিজের পছন্দমতো জায়গায় যেতেন। তিনি কুঠরিতে চিৎ হয়ে শুয়ে বলতে থাকেন, প্রিয়তমা রাস্তা, আমি এখন ঘরে অন্তরীণ। তোমার শরীরে আমার স্পর্শের জন্য আমিও দিনের আলোর অপেক্ষায় থাকি। কিন্তু দরজা আমার খোলা হয় না। প্রিয়তমা রাস্তা, আমি জানি আমার অপেক্ষার দিন ফুরোবে। কোতোয়াল এসে ধরে নিয়ে যাবে আমাকে। আমি মুক্তির অপেক্ষায় জীবনের প্রহর গুনবো শুধু।

তুমি আমার পাশে থেকো প্রিয়তমা। তিনি নিজেরই লেখা নিজেকে শোনাতে থাকেন—

'ভোরের আগে মোমবাতির কম্পিত শিখায়
আমার স্পন্দিত অনুশোচনা, আমারই অসফলপ্রসূ জীবন।
হতাশাই যথেষ্ট মদ,
সাকি আমাকে কী দেয়, গ্রাহ্য করি না,
মাতাল আকাঙ্ক্ষা নদী পেরিয়ে যায়,
তৃষ্ণা প্রশমিত হয় না।'

কবিতা শেষ করে তিনি নিশ্চুপ বসে থাকেন ঘরে। আর একটি কবিতা লেখার কথা ভাবেন। কাগজপত্র গোছান। দোয়াত-কলম সামনে রাখেন। বুঝতে পারেন লেখার চেষ্টা করছেন, কিন্তু মাথায় কিছু আসছে না। তিনি বিষণ্ন হয়ে বসে থাকেন। কোমরের কাপড়ের বেল্টটি নাড়াচাড়া করেন। চিন্তা গোছানোর সময় জামার বেল্টটি তাঁর একটি আশ্রয় হয়। তিনি বেল্টের সঙ্গে খুনসুটি করে পুরোপুরি কবিতার কল্পনায় ঢুকতে পারেন।

সে সময়ে উৎফুল্লচিত্তে ঘরে ঢোকেন তকীয়ুল্লাহ। গালিবের নিমগ্ন ভাব দেখে বুঝে যান যে তিনি এখন অন্য জগতে। কিন্তু গালিবের মনোযোগ ছিল না বলে তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকান।

তকীয়ুল্লাহ ভুরু উঁচিতে বলেন, কি করছো দোস্ত?

ভাবনার চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না। তাছাড়া আমার তো কিছু করার নেই। আমার বিরুদ্ধে আদালতের ডিক্রি জারি হয়েছে।

আমি জানি। আমিও ভাবছি যে কতকাল এভাবে চলবে।

তিনি তকীয়ুল্লাহর দিকে তাকান না। চুপ করে বসেই থাকেন।

তোমার কী হয়েছে দোস্ত? তোমাকে খুব বিষণ্ন দেখছি।

গতকাল সন্ধ্যায় মুসকেদীন কোতোয়াল আমাকে শাসিয়ে গেছে।

কেন?

বলেছে, আমি যে বাজি ধরে লুডো খেলি, এটা জুয়া খেলা। তিনি যে কোনোদিন এসে আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবেন।

তকীয়ুল্লাহ মাথা নেড়ে বলেন, ওই কোতোয়াল কি নিজের পাহারা সম্পর্কে খুব কঠোর? নাকি তোমার প্রতি ও বিরূপ?

দুটোই। নিজের কর্তব্য বিষয়ে কঠোর বলে আমার এই জুয়া খেলা ও পছন্দ করে না। তাই আমার প্রতি বিরূপ।

তাহলে তো ভয়ের কথা।

হ্যাঁ, আমারও তা-ই মনে হয়। যে কোনোদিন ওই কোতোয়াল এসে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। ও সুযোগের অপেক্ষায় আছে।

তকীয়ুল্লাহ বিরক্তির সঙ্গে বললেন, তোমাকে নিয়েও পারা যায় না বন্ধু। কথা বলাতেও মাত্রা রাখো না।

গালিব চুপ করেই থাকেন।

কি হয়েছে এমন ঝিম মেরে আছ কেন? এসো চৌরস খেলি।

আবার খেলা? এসব নিয়েইতো ঝামেলায় আছি।

ছাড়ো দোস্ত। বসো। মন ভালো হয়ে যাবে।

সেই ভালো।

দুজনে খেলায় মেতে যায়। এভাবে কয়েকদিন গেলও ভালো। কোনো হাঙ্গামা হলো না। একদিন জমজমাট আসর বসেছে। অনেকে এসেছে। বেশ হইচই-গালগল্প হচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে কোতোয়াল ফয়জুল হাসান তাঁর সিপাহীদের নিয়ে জুয়াড়ীদের আসর ঘিরে ফেলে। হুকুম দেয়, হাতকড়ি লাগাও।

গালিব ফয়জুল হাসানের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন। বলেন, আপনি ভুল করছেন কোতোয়াল সাহেব। আমার বন্ধুরা সবাই শহরের সম্মানিত ব্যক্তি। আমরা নির্দোষ আমোদ-ফুর্তি করছি।

কোতোয়াল কঠোর স্বরে বলে, থানায় চলেন। সেখানেও আমোদ-ফুর্তি করতে পারবেন।

একজন বলেন, আপনি ওনাকে চিনতে পারেননি? উনি মির্জা গালিব। শহরের নামজাদা শায়র। উনি মুশায়রার আসর মাতিয়ে রাখেন।

বাকোয়াস রাখেন। আগে থানায় চলেন। অনেক দিন ধরেই দেখছি এখানে জুয়ার আড্ডা বসে। ধরার চেষ্টায় ছিলাম।

সবার সঙ্গে গালিবও থানায় গেলেন। অন্যরা টাকাপয়সা দিয়ে নিজেদের ছাড়িয়ে নিলেন। গালিব ছাড়া পেলেন না। তাঁকে জেলে ঢোকানো হলো।

মামলা জেলা প্রশাসকের কাছে গেলো। যথারীতি বিচার হলো। তাঁর অপরাধ যে তিনি নিজ বাড়িতে জুয়ার আড্ডা বসান। সুতরাং তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন। ছ'মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও দুশো টাকা জরিমানা করা হলো। জরিমানা না দিতে পারলে ছ'মাস বেশি কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। যদি তিনি পঞ্চাশ টাকা অতিরিক্ত জরিমানা দেন তবে তাঁকে ছ'মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ড দেয়া হবে।

গালিবের গ্রেফতার হওয়ার ঘটনায় দিল্লির গুণীজনেরা ক্ষুব্ধ হলেন।

সামান্য অপরাধের জন্য এমন একজন অভিজাত প্রতিভাবান মানুষকে শাস্তি দিতে হবে এটা উচিত নয় বলে অনেকে মত দিলেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হলো গালিবের মুক্তির জন্য। প্রশাসনের সাফ জবাব, যে বিষয় আদালতের এখতিয়ার সেখানে প্রশাসনের কিছু করার নেই।

ঘটনায় সবচেয়ে মর্মাহত হলেন নওয়াব মুহম্মদ মুস্তফ খাঁ, তিনি শইফতা তখল্লুসে কবিতা লেখেন। তিনি তাঁর মুক্তির দাবিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু শাস্তি এড়াতে পারলেন না। মামলার খরচ দিলেন। জরিমানার টাকা দিলেন। নিজে জেলে যান কবির সঙ্গে দেখা করতে।

গালিবের শত্রুরা তাঁকে পরিহাস করলে বলেন, তাঁর কাব্যপ্রতিভাকে সম্মান করি। তাঁকে আমি ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। তিনি আমাদের সময়ের বড় কবি। তিনি মদ পান করেন, জুয়া খেলেন, ধার্মিক নন, সংযমী নন— এতো সবাই জানে। আমিও জানি। এসবের জন্য আমার কিছু এসে যায় না। এসব কাজের জন্য আমি তাঁকে অশ্রদ্ধা করবো কেন?

শইফতার এমন তীক্ষ্ণ মন্তব্যে অন্যরা চুপ করে যায়। গালিবের চেয়ে বেশ কয়েক বছরের ছোট হওয়া সত্ত্বেও গালিব তাঁর ভীষণ অনুরাগী। জেলখানায় গেলে তাঁর সময় আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

মাঝে মাঝে মন খারাপ হয় এই ভেবে যে আমিনউদ্দিন তাঁর খোঁজ নেননি। অথচ সেই তরুণ বয়স থেকেইতো তাঁর সঙ্গে ভীষণ বন্ধুত্ব ছিল। গ্রেফতার হওয়ার ঘটনায় তিনি নাখোশ হয়েছেন। যাহোক, কি আর করা। ভাবেন, ফজল হক দিল্লিতে নেই। থাকলে ঠিকই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতো। তারপরও তিনি খুশি যে বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই আসেন। গল্পস্বল্প হয়, হাসিঠাট্টায় সময় ভালোই কেটে যায়।

তিনি বন্ধুদের বলেন, আমার কাছে যে অর্থ চাওয়া হয়েছিল সে অর্থই যদি থাকবে, তবে তো ঋণ না করে নিজের টাকায় মদ কিনে খেতে পারতাম। এটা করতে পারলে আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দে থাকতাম।

তাঁর বিনাশ্রম কারাদণ্ড চলেছিল তিন মাস। শুয়ে বসে ঘুমিয়ে তিনি দিব্যি দিন কাটিয়েছেন।

শেখ মেহেদী হাসতে হাসতে বলে, এ তোমার শাস্তি নয় বন্ধু।

তবে কী?

মহাজনরা তোমাকে ধরে যদি মারধর করে, সে জন্য তোমাকে এখানে আটকে রাখা হয়েছে।

হাসতে হাসতে বলেন, নগরবাসী দেখুক দিল্লির একজন নামকরা লোককে

কীভাবে আটকে রাখা হয়েছে। আমার কী, এতে অভিজাত মহলের মর্যাদাই পুড়ছে। আবার বলেন, আমি বলতে গেলে আরামেই আছি। আমার বন্ধুরা আমাকে দেখতে আসে। তাদের বাধা দেয়া হয় না। আমার বিবি আমাকে খাবার পাঠায়।

আর দামী দামী খাবার পাঠায় তোমার প্রেমিকা।

ঠিক। তিনি মাথা নাড়েন। তার মতো উদার হৃদয়ের প্রেমিকা হয় না। সে আমাকে নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসে।

বাহবা, বাহবা। তুমি ভাগ্যবান পুরুষ। তোমার স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা না থাকলেও তিনি তোমার জন্য প্রতিদিন খাবার পাঠাচ্ছেন।

ওহ, মেহেদী থামো। তুমি কি আমাকে হিংসা করছো?

হ্যাঁ, একটু করছি। তুমি তো জানো না যে তোমার মুক্তির জন্য সম্রাট নিজে রেসিডেন্টের কাছে লিখেছেন।

তিনি উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করেন, কোনো খবর আছে?

না। আদালতে মামলাটি স্থগিত আছে বলে কিছু করা যাবে না।

ওহ! তিনি আশাহত হন।

আরো একটি খারাপ খবর আছে দোস্ত!

খারাপ খবর? বলো কী?

আমাদের বন্ধু মির্জা হাতিম আলি বেগের রক্ষিতা চুন্নাজান বেগম মৃত্যুবরণ করেছেন।

তিনি আঁতকে উঠে বলেন, চুন্নাজান! আহা, খুবই ভালো মহিলা ছিলেন। চমৎকার রুচিসম্পন্ন মহিলা ছিলেন। যেমন চমৎকার গান গাইতেন, তেমন বাকপটু ছিলেন। আমার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল। আমরা ঘন্টার পর ঘণ্টা কথা বলেছি। তাঁকে নিয়ে লেখা হাতিম আলির কবিতাগুলো তিনি আমাকে পড়তে দিতেন। হায় চুন্নাজান!

গালিব চোখ মোছেন।

তুমি দেখছি ভীষণ ভেঙে পড়েছো?

হ্যাঁ, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। নগরীর তাওয়াফরা সেরা নারী। তাদের ছাড়া আমরা ফুর্তি করার জায়গা কোথায় পেতাম! তাদের অভ্যর্থনা কক্ষগুলো আমরা আড্ডা, কবিতা পাঠ, সঙ্গীতচর্চার জন্য ব্যবহার করি।

ব্যস থাম। তোমার এসব কথা শুনতে আমার ভালো লাগছে না।

নবাব হাতিম আলি খানের রক্ষিতা ছিলেন মুঘলজান। আমি তাঁর কাছে হাতিম আলির প্রশংসা শুনেছি। তাঁর সাংস্কৃতিক রুচি ছিল অসাধারণ।

AMARBOI.COM

আমি যাচ্ছি দোস্ত। তুমি তোমার স্মৃতিচারণ নিয়ে মশগুল থাকো। এখানে তোমার কাজ নেই। কারাগারই স্মৃতিচারণের জন্য উত্তম জায়গা।

তোমার হলো কি মেহেদী?

আমার কিছু হয়নি। একটু পরে সাদউল্লাহ আসবে তোমাকে সঙ্গ দিতে। ওর সঙ্গে আমার বাজারে দেখা হয়েছে।

তকীমীরও আসবে। কাল ও আমাকে বলে গেছে, এক বোতল সুরা ও আমাকে উপহার দেবে।

মনের সুখে পান করো। আসলে তোমাকে তো শাস্তি দেয়া হয়নি। আনন্দ উপভোগের সময় দেয়া হয়েছে। খুশনুর, মুঘলজান, বাহারজানকে আসতে দিলে তোমার আসর জমজমাট হয়ে যেতো।

গালিব হাসতে হাসতে বলে, আমার জন্য সেই প্রার্থনাই করো বন্ধু।

শেখ মেহেদী পেছন ফিরে তাকায় না। বারবণিতাদের আসরে যাওয়ার সুযোগ ওর হয়নি। ও তো গালিবকে ঈর্ষা করবেই। ঈর্ষায় ওর বুক পোড়ে। ও তখন গালিবের কবিতাই বলতে বলতে পথ হাঁটে—

'একটি গান গায়কের কণ্ঠে আশ্রয় নেয়,
পরমানন্দের জন্য মদের কোনো প্রয়োজন নেই,
চূড়ান্ত পাপী হও এবং তোমার মাথা
পুণ্যের প্রাচুর্যে অবনত হোক।'

আহ্ গালিব, তুমিই পারো পাপকে পুণ্যে পরিণত করতে। আহ্ গালিব, তুমিই সেই পাপী যে পারো পুণ্যের প্রাচুর্যে ডুবে থাকতে। তোমার মতো এতো ক্ষমতা আর কার বা আছে? তুমি কুঠুরিতে ঢুকে থাকতে ভালোবাসো। সমাজ দেখো না। অনাচার দেখো না। তোমার কোনো সামাজিক দায় নেই গালিব। এমনই চোখ বোজা মানুষ তুমি।

গালিব তখন কয়েদিদের আড্ডায় তুমুল জমিয়েছে। হাসতে হাসতে পাশে বসে থাকা অন্য কয়েদিকে বলে— বুঝলে হে, মানুষ যখন একলা থাকে তখন সে চিন্তার সমুদ্র হয়। আমাকে বলো তো, তুমি কেন এখানে এসেছো?

চুরি করেছিলাম। চুরি করা ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না।

এই যে তুমি উপায় ছিল না বললে, এটাই তোমার চিন্তা।

কয়েদি ভুরু কুঁচকে বলে, পেট ভরে রুটি খেতে না পারলে চিন্তা দিয়ে কী করবো? এই চিন্তা আর বেশ্যাবাড়িতে যাওয়া এক কথা।

কী বললে? গালিব চমকে তাকান।

কয়েদি একই ভঙ্গিতে বলে, আমি তো এমনই চিন্তা করি।

তিনি চুপ করে যান। কথা বাড়ান না। তাঁর খুব মন খারাপ হয়ে যায়। তখন তিনি মনে মনে হাতিম আলির জন্য একটি লোকগাথা রচনা করতে থাকেন— বন্ধু শোক করো না। মৃত্যু আমাদের শোকার্ত করে। করবেই তো। প্রেম যে অনিঃশেষ। তুমি মনে করো লায়লী-মজনুর কথা। মজনু বেঁচে থাকতেই লায়লী মারা যান, তোমার প্রেমিকাও তোমার জীবিত অবস্থায় মারা যায়। একদিক থেকে তুমি মজনুকে ছাড়িয়ে গেছ। লায়লী তার নিজের বাড়িতে মারা গিয়েছিলেন আর তোমার প্রেমিকা তোমার বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেছেন। তুমি নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান বন্ধু। তবে কি জানো মুঘলরা কিন্তু ভয়াবহ। যাদের ভালোবাসার জন্য আমরা মরতে চাই তাদেরই আমরা মেরে ফেলি। আমি জন্ম থেকেই মুঘল, আমার জীবিত অবস্থায় একটি ডোমনির মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী। সে হৃদয়ের ওপর প্রবল আঘাত হেনেছে। আমাকে শোকে বিহ্বল করেছে। খোদাতালা তোমার এবং আমার প্রতি ক্ষমাশীল হোন। এ মৃত্যুর জন্য আমাদের হৃদয়ে রক্তপাত হয়েছে। ওই বন্ধু, আমরা যারা ভালোবাসতাম মৃত্যু তাদের পৃথক করে দিয়েছে। কখনোই ভুলতে পারি না সে মৃত্যুকে। মৃত্যুই আমাদের প্রেম। প্রেমই ঈশ্বর।

রচিত হয় কবিতা— আমি সেই অবস্থা থেকে মুক্তি কামনা করি, যখন আমি প্রেমিকার চিন্তায় ডুবে থাকি দিন এবং রাত— সব সময়।

ভাবনার শেষে তিনি আকস্মিকভাবে হেসে ওঠেন।

কয়েদি অবাক হয়ে বলে, হাসছেন যে?

প্রেম। প্রেমের জন্য হাসছি। তোমার প্রেমিকা আছে বন্ধু?

প্রেমিকা? না তো। আমার ঘরে বিবি আছে। আমাকে খুব ভালোবাসে।

বিবি, বিবি—

তিনি পরেরটুকু শেষ করেন না। তিনি তো বিবির ভালোবাসায় সন্তুষ্ট থাকেননি। তিনি লোকটির মতো বিবির ভালোবাসায় জীবন কাটাননি; বরং বিবাহিত জীবন তাঁর কাছে শৃঙ্খলের মতো মনে হয়েছে। বন্দি জীবনের আক্ষেপ তাঁকে মরমে মেরেছে। তিনি অন্যমনস্ক হয়ে শৈশবে ফেলে আসা যমুনা নদীর কথা ভাবেন। তাঁর জন্মস্থান আগ্রার কথা ভাবেন। আবার ফিরে আসেন জেলের চার দেয়ালের ভেতরে। কত নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলো— একদিন ভুলেই তো যাবেন এসব মানুষের মুখ। পরক্ষণে অন্যমনস্কতা ঝেড়ে ফেলে ভাবেন, আমার চোখ থেকে হৃদয় পর্যন্ত প্রদীপ্ত। প্রেমিক ও প্রেমিকার মিলন আলোর উৎসব। এভাবেই আমার শেষ। আমার বেঁচে থাকা।

তিন মাসের মধ্যে তিনি কারামুক্ত হন। বন্ধুরা তাঁকে নিতে এসেছে। কিন্তু

তাঁর হৃদয়ে আনন্দ নেই। এভাবে জীবনের আলোছায়ায় তাঁর বিস্তার।

শেখ মেহেদি বলে কি হয়েছে দোস্ত? তুমি উৎফুল্ল নও কেন? জীবনের শেষটুকু দেখার জন্য বর্তমান যথেষ্ট নয়।

তুমি কি আবার বাজি ধরে লুডু খেলবে?

খেলব।

কোতোয়াল বলবে, ওটা জুয়া খেলা।

আমিও জানি ওটা জুয়া খেলা।

কোতোয়াল আবার এসে তোমার কুঠুরিতে হানা দেবে।

গালিব হেসে বলেন, আবার আমাকে ধরে নিয়ে যাবে এই তো। যাবে। ধরতে দাও বন্ধু।

তিনি এখন ঘোড়ার শকটে। খোলা শকটে বাতাসে তাঁর চুল উড়ছে। তাঁর সুন্দর চেহারা রৌদ্র তাপে স্নিগ্ধ। তার মগজের কোষে খেলে বেড়ায় রৌদ্র-হাওয়া। তিনি বুনে চলেন ভাবনা, গভীর থেকে গভীরতর হয় আকাশের নীল— আমার জন্য তুমি ভয় পাচ্ছ, কেঁপেও উঠছ, উদাসীন থাকার অভ্যাস তোমার কোথায় গেল? তুমি যদি না চেয়ে থাক যে হৃদয়ে দুঃখের ঝড় বয়ে যাক, তাহলে তুমি আমার দুঃখের অংশী হতে চাইলে কেন? তুমি কেন ভেবেছিলে যে আমার দুঃখের সঙ্গী হবে যখন আমার প্রতি অনুকম্পা তোমার নিজের সঙ্গী হয়ে দাঁড়াবে? তুমি বিশ্বস্ততার শপথ করো, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই শপথে বিশ্বাসী থাক। জীবনই যেখানে নশ্বর, সেখানে এ শপথ সত্য হবে কি করে। আমাকে লজ্জা দেওয়ার ভয়ে তুমি নিজেকে মাটির পর্দার আড়ালে রেখেছ। প্রেমে গোপন মর্যাদা এর চেয়ে বেশি কীভাবে রক্ষা হতে পারে। তোমার গোলাপ ছড়ানো গৌরব এবং সৌষ্ঠবের অবসান ঘটেছে। এখন তুমি ফুল দিয়ে ধুলো আঁকো— ধুলোকে ভরিয়ে দাও ফুলের পাপড়ি দিয়ে। এখন আমার কাছে জীবনের জলবায়ু কারাগারের মতো, তুমি এই জলবায়ু সইতে পারলে না। যে হাত সৌন্দর্যের চাবুক ঘোরাত, তা এখন অক্ষম। প্রেমের রহস্যময় দীপ্তি ধুলোয় লুটিয়েছে, আহা পৃথিবী থেকে বন্ধুত্ব হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। চোখ যেখানে নক্ষত্র গুনতে অভ্যস্ত সেখানে বর্ষার অন্ধকার রাত কীভাবে কাটবে? কোনো ভালোবাসার কথা শোনে না, চোখ সৌন্দর্যের দৃশ্য দেখে না, কীভাবে একা একটি হৃদয় এ বঞ্চনা সহ্য করতে পারে। নিয়তি কি চেয়েছিল দিল্লিতে আমি এই অপমান সহ্য করব? আহা, আহা!

তকিয়ুল্লাহ মৃদুকণ্ঠে বলে, কী হয়েছে? তোমার চোখ ভিজে যাচ্ছে?

নিয়তি কি চেয়েছিল দিল্লিতে আমি এই অপমান সহ্য করব?

বন্ধু তোমার কবিতা দিয়ে বলি, বাতাসে মদ আছে, শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়াই পান করা।

এভাবে কি অপমান ধোয়া যায়?

যায় না। তকিয়ুল্লাহ হাত ঝাঁকুনি দেয়। তুমিই তো বলো, যদি আমি শপথ করি যে মদ স্পর্শ করব না, সাকি কেন পানপাত্র পূর্ণ করার মধুর কর্তব্যের কথা ভুলে যাবে?

হাসেন তিনি। বলেন, ঠিকই তো বলি। সাকির কর্তব্য তো সাকিকে মনে রাখতে হবে। আমার শপথে সাকির কি এসে-যায় বন্ধু!

দিল্লির রাস্তায় ঘোড়ার খুরের খটখট শব্দ হয়। রাস্তার দু'পাশ দিয়ে চলাচল করে মানুষ। বাতাসে ধুলো উড়ে। মেঘের আড়ালে সূর্য ঢেকে পড়লে ম্লান হয়ে আসে রোদের ছায়া। কোথাও কোনো পাখি নেই কেন? তার তো সবচেয়ে প্রিয় পাখি কাক। কাকই বা কোথায় গেল? কাকেদের প্রিয় শহর দিল্লি, এটা আমার বিশ্বাস।

শেখ মেহেদি তাঁর গায়ে ঠেলা দিয়ে বলে, ধ্যান ভাঙ বন্ধু। আমরা এসে গেছি।

তিনি এখন তাঁর প্রিয় কুঠুরিতে।

অনুভব করেন বন্ধ কুঠুরি গুমোট। বন্ধুরা ঘরের জানালা খুলে দিচ্ছে। এই তিন মাস এই ঘরে হাওয়া খেলেনি। এখানে জুয়া খেলা হয়নি। মদের আসর বসেনি। বন্ধুদের আড্ডায় তর্ক ওঠেনি। গজল গাওয়া হয়নি। কবিতা পাঠ হয়নি।

ওহ, মাংসের ঘ্রাণ আসছে। উমরাও বেগম তাঁর প্রিয় খাবার মাংস আর রুটির আয়োজন করেছে। ভালোই জমবে দুপুরের খাবার। শুধু দরকার এক বোতল সুরা। সেটা তো উমরাও বেগমের কাছে আসা করা ধৃষ্টতা। তাঁর বিবি হয়ে উমরাও বেগম শুধুই পাপের ভাগি হয়েছে। সে এই পাপে আর জড়াতে চায় না। আহা, বেচারী! দুঃখভরা জীবন টানতে টানতে টানতে...।

গালিব আর ভাবতে পারলেন না। কারণ উমরাও বেগমের সঙ্গে মিলে জীবন কাটেনি, কেটেছে অমিল আর কলহের জীবন। হ্যাঁ, এমনই নিয়তি। এই শহরের মতো ধুলো আর কংক্রিটে ভরা। রুক্ষ আর প্রখর।

তখন দরজার বাইরে টাঙা থামার শব্দ হয়। টাঙাওয়ালার কণ্ঠস্বর শোনা যায়। বাড়ির কারো সঙ্গে কথা বলছে বোঝা যায়। নিশ্চয়ই লোকটি শহরের কোনো পরিচিত টাঙাওয়ালা, তিনি ভাবলেন। দরজায় টুক টুক শব্দ হয়। দরজা

AMARBOI.COM

খোলে তকিয়ুল্লাহ। টাঙাওয়ালা বাঁকা হয়ে কুঠুরিতে ঢুকে বলে, আপনার জন্য এই সুরার বোতল উপহার পাঠিয়েছেন মুফতি হুজুর।

বোতলটি নিতে নিতে তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেন, আজুরদা, ওহ আজুরদা। ও আমার এত ভালো বন্ধু যে আমার জীবন ধন্য। তুমি ওকে আমার শুকরিয়া জানাবে ভাই।

বেরিয়ে যায় টাঙাওয়ালা।

তিনি বন্ধুদের হাত ধরে বলেন, বোস। এক পেয়ালা হয়ে যাক।

আজ না, আরেকদিন। তোমার সঙ্গে তো বেগম সাহেবার দেখা হয়নি। আমরা আজ আসি দোস্ত।

দু'জনে বেরিয়ে গেলে তিনি খানিকক্ষণ বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। মনে হয় তিনটি মাস এই ঘর থেকে হারিয়ে গেছে। নিজেকে কেমন অচেনা লাগছে এই ঘরে। উমরাও বেগম ঘরে ঢোকেন। হাতে মাংস-রুটির প্লেট।

তুমি কেমন আছ বিবি?

উমরাও বেগম মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন, ভালো থাকব না কেন?

সে তো ঠিকই। ভালো থাকবে না কেন। ভালো না থাকার তো কোনো কারণ ঘটেনি।

তাহলে জিজ্ঞেস করলেন যে?

অভ্যেস। অভ্যেসের বশে। জানো বিবি, অস্তিত্ব নিজেকে অদ্ভুতভাবে বিক্রি করে, প্রতিবারই বাজারে হৃদয়ের দাম কমে যায় এবং তিক্ত হাসির উদ্রেক হয়।

এসব শের আমি বুঝি না।

কিন্তু এটা তো বোঝ যে আমি তোমার তিক্ত হাসি উদ্রেক করার মতো একটা প্রশ্ন করেছি?

উমরাও বেগম নিশ্চুপ তাকিয়ে থাকেন। তিনি রুটি-মাংসের রেকাবিটা নিতে নিতে বলেন, দাও, আমার খিদে পেয়েছে। আমার পেয়ালা দুটি কোথায়?

সরিয়ে রেখেছিলাম। কাল্লু এনে দেবে।

পুরো এক দুপুর মদ-রুটি মাংস খেয়ে তিনি নিজের ঘরে ঘুমাতে যান। ভাবেন পৃথিবী আশ্চর্য সুন্দর। দিল্লি শহরের বাইরে শুধু রুক্ষ প্রান্তরই নেই, একটি সমুদ্রও আছে। সেটা সবাই দেখতে পায় না। দেখতে পায় শুধু কবি।

তিনি গভীর ঘুমে তলিয়ে যান।

রমজান মাস। ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা সংযমের মাস হিসেবে খুব তমিজের সঙ্গে পালন করে। শহরের মহল্লায় মহল্লায় ইফতারের আয়োজন। মসজিদে তারাবির

জমায়েত। তিনি ভাবেন, মাসটা এলে নিজেকে বেশ ঝরঝরে লাগে। শহরের এসব ব্যাপারে তিনি নিজেকে জড়ান না, কিন্তু শহরের বদলে যাওয়া চেহারা তাকে আনন্দই দেয়। তিনি কুঠুরিতে বসে বাজি ধরে লুডু খেলে সময় কাটান। বন্ধুদের কেউ কেউ আসে। সবাই না।

শুক্রবার দিন এমন খেলার আসরে এসে ঢোকেন মুফতি সদরুদ্দীন। এ মাসেও গালিব এসবের মধ্যে ডুবে থাকবেন, এতটা তিনি ভাবেননি।

ভেতর ঢুকে তিনি থমকে দাঁড়ান।

ভ্রূ কুঁচকে বলেন, আমি হাদিসে পড়েছি রমজান মাসে শয়তানকে বন্ধ করে রাখা হয়।

গালিব হেসে বলেন, বসো বন্ধু, বসো।

সদরুদ্দীন জায়গা থেকে না নড়েই বলেন, হাদিসে ঠিক কথা লেখা হয়েছে কি-না এ নিয়ে আমার মনে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে।

আমার বন্ধু, হাদিস একদম খাঁটি। এ নিয়ে প্রশ্ন করা ঠিক হবে না, তুমি বুঝে নাও যে শয়তানকে এ ঘরেই বন্ধ করে রাখা হয়েছে। দেখতেই তো পাচ্ছ যে শয়তান তার কর্ম করছে।

বন্ধুরা তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তিনি হাসতে হাসতে লুডুর ছকের ওপর ঝুঁকে থাকেন একটু সময়। তারপর মুফতির হাত ধরে টেনে বলেন, বসো বন্ধু। একটি কথা বলি। বলো না যে শয়তানের আবার কথা কি শুনব।

না, না বলো।

তিন মাস জেলে থাকার কারণে আমার ভাতা বন্ধ করে দিয়েছে নওয়াব...। না, থাক নামটা আর বলছি না। বাড়ি এসে দেখি ঘরে টাকা-পয়সা নেই। আটা-ময়দার টান পড়েছে। ঘি কেনার টাকা নেই। গতকালই পোশাকের আলমারিটা বিক্রি করে দিলাম। কিছু টাকা হাতে এলো। বিবির হাতে দিলাম। বুঝলে বন্ধু লোকে রুটি খেয়ে বেঁচে থাকে, আমি পোশাক খেয়ে বাঁচি।

আবার হাসি।

মুফতি মৃদু হেসে বলেন, এতকিছুর পরও তোমার পরিহাসপ্রিয়তার কমতি নেই।

বাঁচা তো এমনই বন্ধু। জীবনকে তিক্ত করে বাঁচতে চাই না আমি। তারপর মুখে মুখে শের রচনা করে বলেন,

'প্রণয়পাত্রীকে দেখার স্বাদু আনন্দ আমার নেই।
এমনকি তার স্মৃতিও ঝাপসা হয়ে গেছে।
আমি এমন একটি বাড়ি, যা এমন আগুনে

পুড়ে গেছে যে সবই ভস্মীভূত।'

এতো তোমার হতাশার কথা।

হতাশাও জীবন।

মুফতি গালিবের হাত ধরে বললেন, আজ যাই। আগামী দিন দেখা হবে। কিংবা অন্য কোনো দিন।

গালিব গভীরভাবে হাত চেপে ধরে কবিতার ভাষায় বলেন,

'সব সম্পর্ক ছিন্ন করো না বন্ধু;

আর যদি কিছু না থাকে তো শত্রুতাই থাক।'

শত্রুতা নয়, বন্ধুত্বই থাকবে বন্ধু।

চলে যান মুফতি সদরুদ্দীন।

গালিব আবার খেলায় মত্ত হয়ে যান।

তবে রমজান মাসে মদ্যপান ও জুয়া খেলা বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয় তাঁকে।

আবার ঘনায় রাত। আসে দিন। আবার সূর্য ওঠে। রোদ বাড়ে। রুক্ষ প্রান্তরে চৌচির হতে থাকে মাটি। তিনি বুঝতে পারেন ঋণ আর অনটনে চৌচির হয়ে যাচ্ছে জীবন-মাটি। তিনি রামপুরের নবাবের কাছে তাঁকে বরাদ্দ মাসিক ভাতা বাড়ানোর জন্য আবেদন করছেন। কুঠুরির স্বল্প আলোয় লিখছেন আবেদনপত্র। আগেও লিখেছেন। কতবারই তো লিখলেন। কিন্তু লাভ হয়নি। রামপুরের নবাব যা দিতেন তার বেশি একটি টাকাও বরাদ্দ হলো না।

লিখতে লিখতে কলম থেমে যায়। নিশ্চুপ বসে থাকেন। বেলা কত বেড়েছে, কিন্তু উমরাও বেগম তখন পর্যন্ত কিছু খেতে দেননি তাঁকে। খিদের যন্ত্রণায় কষ্ট হচ্ছে তাঁর। ঘরে একফোঁটা মদও নেই।

এক টুকরো রুটির সঙ্গে কবিতার অনুভব বড়ই বেদনার— তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মনে পড়ল কবি জওকের মুখে শোনা শেরটির কথা— অত্যন্ত প্রিয় সে শের, কোনো এক মুশায়রার শুনেছিলেন— 'এখন তো অস্থির হয়ে বলি মরে যাব। মরেও যদি শান্তি না পাই তবে কোথায় যাব।' কি আশ্চর্য, কঠিন কথা, এমন করে উর্দু কবিতায় আর কে বলতে পেরেছে। তিনি উঠে পায়চারী করেন। ভাবেন, সাহিত্য যখন চটকদার শব্দে ভেসে যাচ্ছিল, কবিতায় অলঙ্কারের বাড়াবাড়ি, মেকি আবেগের উচ্ছ্বাস তখন এমন একটি শের উপহার দিয়েছিল কবি জওক। কেউ কেউ এমন আগুনের ফুলকি। তারা তো ইতিহাসের পাতায় টিকে যাবেন। তিনি পায়চারী করতে করতে চেঁচিয়ে বলেন, 'হে ঈশ্বর কাল আমাকে মুছে ফেলছে কেন? পৃথিবীর পৃষ্ঠার ওপর আমি বাড়তি হরফ তো

নই।' হা-হা-হা-হা হাসিতে ভরে যায় ঘরের সবটুকু বাতাস, মিশে যায় হাসির ধ্বনি।

উমরাও বেগম দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন, কি হয়েছে আপনার?

তিনি ফিরে দাঁড়ান যেন ডোমনি এসে দাঁড়িয়েছে মৃত্যুর পরপার থেকে।

উমরাও আবার বলেন, কি হয়েছে? হাসছেন কেন?

তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, আমার শ্বশুরকে মনে করছি।

হঠাৎ আমার আব্বাকে স্মরণ কেন?

তিনি বেঁচে থাকলে আজ আমাকে শুধু এক টুকরো রুটি খেয়ে—

ব্যাস, খামোশ। আব্বাজানই আপনাকে দিল্লিতে এনেছেন।

হ্যাঁ, এ জন্যই আজ আমি কবি গালিব, এটা তুমি ভেবো না। গালিব হয়ে জন্ম নিয়ে আমি সময়ের বড় কবিই হতাম। এই সময়ে আমার চেয়ে বড় কবি দিল্লিতে আর কেউ নেই।

অহঙ্কার ভালো নয়। খোদাও সইবে না।

চলে যান উমরাও বেগম।

অহঙ্কার? অহঙ্কার তো আমার মাথার মুকুট। 'বাসনার নিত্যনব রঙের দর্শক আমি; আমার বাসনা কোনোদিন পূর্ণ হবে কিনা, অবান্তর সে কথা।' তখন তিনি আল্লাহকে স্মরণ করে বলেন, তুমি তো সব দিতে পারো। তাহলে আমি চাইব না কেন? আমি সব চাইব। আমার সব চাই। আমার প্রার্থনাকে তুমি সেই সাহস আর শক্তি দাও।

ঘরে হাওয়া বয়ে যায় না। দরজা বন্ধ। বাইরে ভীষণ সময়। এই পোড়-খাওয়া নগরীতে একদিন প্রেমের বারুদ জ্বলে উঠেছিল। ডোমনি তাঁর প্রেমে পড়েছিল। সেই নারী হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, তুমি এত সুন্দর কেন? দেখে তৃষ্ণা মেটে না।

আমি তখন যুবক। নারীর স্তুতি বাক্যে দিশেহারা। পর্দাপ্রথার জন্য নারীদের দেখা যেত না রাস্তায়। প্রেম করার সুযোগ ছিল না। বারবনিতারা ভরে রেখেছিল শহরের নাচঘরগুলো। আমাকে প্রেম নিবেদন করেছিল ডোমনি— অপূর্ব সুন্দর। মায়াকাড়া সবটুকু আবেদন নিয়ে সে আমাকে পূর্ণ করে দিয়েছিল। হায় খোদা, তারপরও আমি তাঁকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে যাই। ও অন্যসব প্রেমিককে ছেড়ে আমার কাছে এসেছিল। বলেছিল, তুমি ছাড়া আমার দুনিয়ায় আর কেউ থাকবে না। ডোমনি ওর প্রতিশ্রুতি রেখেছিল। আমি রাখিনি। রাখতে পারিনি। আমার নেশা জমে উঠেছিল। পকেট সচ্ছল ছিল। তাই রূপে-গুণে-

গানে-নৃত্যে সেরা বনিতাকে পাওয়া আমার লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। আমি তাদের কাউকে পাওয়ার জন্য তাদের মাহফিলে যাতায়াত শুরু করি। আমার বিশ্বাসঘাতকতায় অকালে মারা যায় ডোমনি। আমি এভাবে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করি। সত্য স্বীকার করতে আমি দ্বিধান্বিত নই। খোদা আমাকে বাসনা পূরণের সাহস দিয়েছেন। আমি তো আমার মতো দুনিয়া দেখবই।

পরিচিত টাঙাওয়ালার কণ্ঠস্বর শুনতে পান। তারপর দরজায় টুকটুক শব্দ। দরজা খুললে বিগলিত হাসি হেসে বলে, সেলাম হুজুর।

এক বোতল সুরা এগিয়ে দিয়ে বলে, আপনার তাওয়ায়েফ।

বুঝেছি কে পাঠিয়েছে। তাকে আমার শুকরিয়া জানিও।

তিনি দ্রুত দরজা বন্ধ করেন। শহরের হট্টগোল প্রতিদিন বাড়ছে। দরজা খুলে রাখতেও ভয় পান তিনি। বোতলে চুমু দিয়ে বলেন, বারবনিতার রূপের গরব এই শহরকে তাদের কাছে নিয়ে যায়। তারা কখনো প্রেমিকের গৃহে প্রবেশ করে না। তাদের নাচঘরে সান্ধ্য মজলিসের আড্ডা জমে। শহরের অভিজাতরা সেখানে ভিড় জমায়। যারা ঘনিষ্ঠ প্রেমিক তারা অন্য সময়েও সেসব গৃহে থাকতে পারেন। তিনিও পেরেছেন। তার জন্য কারো কারো টান ছিল। তার অপরূপ কান্তি তাকে এমন সুযোগ করে দিয়েছে। তিনি মদের পেয়ালার জন্য ভেতরের ঘরে ঢোকেন।

উমরাও বাঁকা চোখে মদের বোতলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, কে পাঠাল?

আমার বন্ধুরা আমাকে বাঁচিয়ে রাখে।

আমি জানতে চাইছি শহরের কোন নাচনেওয়ালি, গানেওয়ালি—

আহ্ বিবি, দাম্পত্য প্রেম উপভোগ করা আমার ভাগ্যে ছিল না—

সংসারকে যে কারাগার ভাবে তার আবার দাম্পত্য প্রেম ভোগ!

আমি আমার মদের পেয়ালা নিতে এসেছি।

ওই যে ওই কোনায়। আমার বাসনপত্রে যেন হাত না লাগে।

আমি জানি তুমি আমাকে খুবই অশুচি ভাবো।

আমি মদ্যপানকে ঘোরতর গুনাহর কাজ মনে করি।

তিনি যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েও ফিরে দাঁড়ান। বলেন, 'যে পাপ আমি করেছি তার জন্য যদি শাস্তি ধার্য থাকে তবে, হে ঈশ্বর যে পাপ আমার সামর্থ্যের বাইরে ছিল বলে করতে পারিনি অথচ তার জন্য খেদ রয়ে গেছে মনে, তাও তোমার কাছে একটু সাধুবাদ পাক।' তারপর শের পড়ার ঢঙে বলেন, 'আয়ুর

মেয়াদ আর দুঃখের বন্ধন আসলে তো একই। মৃত্যুর আগে মানুষ দুঃখ থেকে ত্রাণ পাবে কেমন করে?' বিবি আমি দুঃখ থেকে ত্রাণ পেতে চাই না।

উমরাও কিছু বলার আগেই তিনি দ্রুত কুঠুরিতে ঢুকে যান। মদের ছিপি খুলতে খুলতে বলেন, 'সুর আছে, ভেসে যাও সুরের স্রোতে; সুরা আছে বলে যাও সব কিছু। রূপসীর প্রেমে পাগল হয়ে যাও, সাধুতা থাক অন্যদের জন্য।' পেয়ালাভরা মদপান করতে করতে কেটে যায় বেলা।

লেখা হয় শের 'চলে যাচ্ছি জীবনের অপূর্ণ বাসনার ক্ষতচিহ্ন বুকে নিয়ে আমি এক নির্বাপিত প্রদীপ, মাহফিলে রাখার যোগ্য নই আমি।'

শূন্য কুঠুরিতে হাওয়ার নাচন নেই— হাওয়া হা-হা ফেরে। শূন্য বারান্দায় দাঁড়িয়ে শহরের ওপর দিয়ে দিগন্তে তাকিয়ে বলেন, পৃথিবীর পৃষ্ঠায় তিনি তো বাড়তি হরফ নন।

AMARBOI.COM

পথের যাত্রায় দিনের সূচনা

আর্থিক অনটনে দিনগুলো আবার ধূসর হয়ে গেলো। শ্বশুর ইলাহি বখশ খান ইন্তেকাল করার ফলে মাথার ওপর থেকে ছায়া সরে গেছে। নওয়াবের কাছ থেকে প্রাপ্য ভাতা ঠিকমতো পাচ্ছেন না। ঠিক করলেন কলকাতায় গিয়ে পেনসন বিষয়ক মামলার সুরাহা করবেন।

টাকা-পয়সা নেই বলে নিজের অভ্যাস বদলে ফেলে একটা পথ বের করবেন সেটা আর হবে না। বরং টাকার সন্ধান করাই হবে উত্তম। তিনি বন্ধ করতে পারবেন না ফরাসি মদ খাওয়া। বন্ধ করতে পারবেন না জুয়া খেলা। আর তাওয়াফদের কাছে তো যাবেনই। তাদের পেছনে অর্থ ব্যয় না করলে নেশা জমে না। স্রোতের মতো বেরিয়ে যায় কড়ি। আঙুলে গুণে হিসাব করা তাঁর স্বভাবে নেই। নিজেকেই শোনালেন শের :

'আমার এই অশান্ত স্বভাবের ওপর
নিজের কোনোই নিয়ন্ত্রণ নেই।
আসলে গলার মুক্তাহারে
জৌলুসের যে তরঙ্গ
তা আমাকে অস্থির করে তোলে।'

পায়চারি করতে করতে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন নওয়াব আহমদ বখশের ওপর। তিনি তাঁর চাচা নসরুল্লাহ বেগের শ্বশুর। তাঁরই ছোট ভাই ইলাহি বখশ খানের

মেয়েকে তিনি বিয়ে করেছেন। তাঁরা তাঁর দিল্লিতে বাস করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশদের দেয়া ভাতার হিসাব করতে বসে তিনি দেখলেন বড় ধরনের গরমিল আছে। ব্রিটিশরা যে টাকা দিয়েছিল তা বরাদ্দ করেছিলেন আহমদ বখশ খান। তিনি গালিবকে তাঁর বরাদ্দ দশ হাজার টাকা না দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর ছোট ভাই ইউসুফকেও বঞ্চিত করেছেন আহমদ বখশ। এই টাকার ভাগীদার হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন খাওয়াজা হাজি নামে একজনকে। এই লোক কোনো দিক থেকেই তাঁর চাচার আত্মীয় নন। আহমদ বখশের এই নোংরা আচরণকে তিনি সংযমের সঙ্গেই মোকাবিলা করেছেন। কারণ তিনি তাঁর মুরুব্বি। এখন পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে সরকারের কাছে কোনো নালিশ করেননি। যে অবিচার তিনি করে যাচ্ছেন সেটা গালিব বিনা প্রতিবাদে মেনে যাচ্ছেন।

কিন্তু কতদিন মানবেন?

দিন গড়ালো। আহমদ বখশ খান আরেকটি কাজ করলেন যেটি গালিবের পক্ষে গেলো না। তিনি তাঁর বড় ছেলে শামসউদ্দিন খানকে অংশীদারী দিয়ে নিজের স্বত্ব ছেড়ে দেন। শামসউদ্দিনের সঙ্গে গালিবের ভালো সম্পর্ক নেই। গালিবের বেশি বন্ধুত্ব শামসউদ্দিনের সৎ ভাই আমিনউদ্দিন আর জিয়াউদ্দিনের সঙ্গে। তাই শামসউদ্দিন গালিবকে তাঁর ভাতার ব্যাপারে ভোগাতে লাগলেন, ন্যায্য পাওনা তো দিলেনই না। অন্যদিকে ইলাহি বখশ মারা গেলে গালিব ওদেরকে প্রতিহত করার জোরটিও অনেকটা হারালেন।

একদিন গালিব আহমদ বখশকে বলেছেন, আমাকে অনুমতি দিন। আমি সরকারের কাছে আর্জি জানাই।

আহমদ বখশ তাঁর সামনে কাঁদলেন। বললেন, আমি মাত্র অসুখ থেকে উঠেছি। আলোয়ারের মোক্তারিও আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে। তুমি শুধু আমার সন্তানের মতোই নও। তুমি আমার চোখের আলো আসাদ। তুমি দেখছো যে আমি আমার নিজের পাওনা থেকেও প্রতারিত হয়েছি। শরীরও ভেঙে পড়েছে। তাছাড়া জেনারেল অখটারলোনির সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক নেই। তুমি ধৈর্য ধর। তোমার পাওনা টাকা পাওয়ার একটা ব্যবস্থা হবে।

কয়েক মাসের মধ্যে মারা গেলেন অখটারলোনি। ক্ষমতায় এলেন চার্লস মেটকাফ। মেটকাফ তখন ভরতপুরের প্রশাসক।

আহমদ বখশ গালিবকে বললেন, আশা করি মেটকাফ আমাদের পক্ষে একটি নতুন সনদ ঘোষণা করবেন। আমি মেটকাফের সঙ্গে দেখা করতে ভরতপুর যাবো। তুমিও যাবে। ঠিক তো?

হ্যাঁ যাবো। গালিব সানন্দে রাজি হলেন।

ভরতপুরে গিয়ে তিনি দেখলেন, তাঁর বঞ্চনার ব্যাপারটি আহমদ বখশ মেটকাফের সামনে তুললেনই না। ভীষণ মন খারাপ হলো। ক্রোধও বাড়লো। ঠিক করলেন বিষয়টি নিয়ে নিজেই তদবির করবেন। সেখানে বসে শুনলেন যে গভর্নর জেনারেল আসছেন। তাকে আনার জন্য কানপুর যাচ্ছেন মেটকাফ। তিনি ঠিক করলেন কানপুরে গিয়ে মেটকাফের সঙ্গে দেখা করবেন। গভর্নর জেনারেলের কাছেও আর্জি পেশ করবেন।

তারপরে কলকাতা যাবেন।

শুরু হলো তাঁর পথের যাত্রা।

ঘোড়ায় চড়ে বসার পরে ভাবলেন, ঘোড়াতো যেতেই থাকবে। ঘোড়ার খুরের শব্দ তিনি দু'কান ভরে শুনবেন। শুনতে শুনতে তাঁর ঢুলুনি আসবে। অনেকদিন অনেক রাত কাটাতে হবে পথে। কখনো সরাইখানায় আশ্রয় নেবেন, কখনো শহরে বন্ধু পেলে তার বাসায় থাকবেন। তারপরও যাত্রা স্বস্তিরই হবে, এই বিশ্বাস নিয়ে তিনি আনন্দ লাভ করার চেষ্টা করলেন।

পথে নদী পড়লে পার হলেন নৌকায়। নদীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সখ্য তাঁর। নদীর পানিতে হাত ভিজিয়ে কপোলে লাগালেন শীতল স্পর্শ। বললেন, তুমি আমার প্রিয়তমা। কিন্তু তারপরও পথের ক্লান্তি তাঁকে ছাড়লো না। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত হয়ে পৌছালেন কানপুরে। বুঝলেন, বিশ্রাম না নিলে শরীর আর চলবে না। বিশ্রাম নেয়ার কথা ভাবলেন। অন্তত সাত-দশ দিনতো থাকতেই হবে। আজমকে বোঁচকা-বুঁচকি খুলতে বললেন। ঘুমুলেন সারা দিন। খানিকটা সতেজ হয়ে ভাবলেন, রাস্তায় যখন বেরিয়ে পড়েছেনই তবে কবিতার শহর লক্ষ্ণৌতে যাবেন না কেন? কানপুর থেকে লক্ষ্ণৌ বেশি দূরে নয়। যদিও কলকাতা যাওয়ার জন্য লক্ষ্ণৌ যেতে হবে না, তারপরও। লক্ষ্ণৌর জন্য খুব টান অনুভব করলেন। লক্ষ্ণৌ অযোধ্যা রাজ্যের রাজধানী। এখানে বাস করে কবিতার গুণীজনেরা। তিনি নিজেকে শোনালেন নিজের শের :

'লক্ষ বাসনা এমন যে বাঁচব না একটিও দেয় যদি ফাঁকি
মিটেছে অনেক সাধ, তবু সবই যেন রয়ে গেল বাকি।'

শেরটি দু-তিনবার নিজেকে শোনানোর পরে নিজেকে বললেন, হ্যাঁ এখনো অনেক সাধ বাকি। বড় বেশি অস্থির লাগে। অপূর্ণতার পূর্ণতার জন্য বুকে হাহাকার। লক্ষ্ণৌতে মীর তকী আছেন, কবি সওদা আছেন। একটা গজল ভেবে উৎফুল্ল হন। পরক্ষণে দিল্লির কথা মনে হয়। তাঁর জন্মের আগে মুঘল শাসকরা আর আগের শাসকদের অবস্থায় ছিলেন না। বারবারই বাইরের আক্রমণে

বিধ্বস্ত হয়েছে দিল্লি। আক্রমণ করেছে পারস্যের নাদির শাহ, আফগানের আহমদ শাহ আবদালী। মারাঠা ও জাঠদের আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে নগরীর সৌন্দর্য এবং মানুষের প্রতিদিনের জীবন। কবি সওদা ও মীর তকী মীরের মতো কবিরা ছেড়ে এসেছেন দিল্লি। ঠাঁই নিয়েছিলেন লক্ষ্ণৌতে। মীর তকীর একটি শের তিনি মনে করলেন :

'আজ উজাড় হয়ে গেলো এ মহানগর
নইলে প্রতি পদক্ষেপেই এখানে বসতি ছিল।'

দিল্লির এমন অবস্থা তাঁর চোখের সামনে দেখতে হলেও তিনি দিল্লি ছাড়বেন না। শহরের কারণে মরে যেতে হলে মরে যাবেন। তারপরও তো ওই শহরের মাটির নিচে থাকবেন। সেটাও তো ছেড়ে যাওয়া হবে না। এই ভেবে স্বস্তি পেলেন। বিছানা থেকে উঠে পানি খেলেন। বুঝলেন শরীর ঠিক নেই। মাথা ঘুরছে। অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সুস্থ হতে হতে সাত দিন পার হয়ে গেলো। ফলে মেটকাফের সঙ্গে দেখা করতে পারলেন না। গভর্নরের কাছেও আর্জি পেশ করা হলো না।

আজম বললো, হুজুর আপনার কাজ তো হলো না?

চিন্তার কিছু নেই কলকাতায় গিয়ে আর্জি পেশ করবো।

আজম ভাবলো, হুজুরের সেটাই করতে হবে।

গালিব কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে কানপুর ছাড়লেন।

সঙ্গে সুরা যা ছিল তা শেষ হয়ে এসেছে। আবার কিনতে হবে। কার কাছ থেকে ধার পাবেন সেই চিন্তা করলেন। যাতায়াতের খরচ যোগাড় করলেন একজনের কাছ থেকে। শর্ত হলো এই যে টাকা পেলেই তিনি শোধ করে দেবেন। দেবেনই তো। নিজেকে বললেন—

'গালিবের গায়ে কালি লাগবে না
কারণ দ্বিচারিতার দোষে সে দুষ্ট নয়
তার তাপ্পি মারা এই আলখাল্লাটি খুবই পরিচ্ছন্ন
কারণ প্রতিদিন ওটি মদ দিয়েই ধোওয়া হয়।'

লক্ষ্ণৌর পথে যেতে যেতে ভাবলেন, লক্ষ্ণৌর গুণীজনের কাছে তাঁর কবিতার খ্যাতি পৌঁছে গেছে। তিনি মীর তকীর কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছিলেন। নিশ্চয়ই দরবারেও তাঁর জায়গা তৈরি হয়েছে। দিল্লি ছেড়ে চলে যাওয়া কবিদের লক্ষ্ণৌর দরবার সম্মান দেখিয়েছিলেন। কবি সওদাকে দরবারি কবির আসন দেয়া হয়েছিল। মীর তকী মীরও রাজার আনুকূল্য পেয়েছিলেন। তাঁর ভাগ্যেও এমন কিছু ঘটতে পারে। নওয়াব আসফাউদ্দৌলা কাব্যপ্রেমিক।

শিল্প-সঙ্গীতপিপাসু মানুষ। তাঁর স্ত্রী শামস-উন্নিসা একজন শায়র। নাম করেছেন। এত যে শহরের জেল্লাই সে শহরে কবি গালিবের সমাদর তো হবেই। তিনি পুলক বোধ করলেন। ঘোড়ার খুরের শব্দ তাঁর কানে সঙ্গীতের মতো বাজতে থাকে। সে ধ্বনি যে কোনো দূরালোক থেকে ভেসে আসছে অলৌকিক মাধুর্য নিয়ে। তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।

লক্ষ্ণৌ শহরে পৌঁছে বুকভরে শ্বাস টানেন। দুদিন বিশ্রাম নিলেন। বেশ ঝরঝরে লাগছে শরীর। ভাবলেন, কবিতার শহর লক্ষ্ণৌতে আসতে পারার আনন্দে উৎফুল্ল মনের সঙ্গে সাড়া দিয়েছে শরীর। আসার পরে বিভিন্ন কবির সঙ্গে দেখা হলো। মুশায়রায় যাওয়ার আমন্ত্রণ পেলেন। কিন্তু মনে মনে খুব আশাহত হলেন এটা জেনে যে দরবারে এখন আর আসফউদ্দৌলা নেই। এখন আছেন নওয়াব গাজিউদ্দিন হায়দার। কবি সওদাকে আসফউদ্দৌলা নিজে দরবারে ডেকে নিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান নওয়াবের নিয়ম ভিন্ন। এখন তার কাছে সাক্ষাতের জন্য মন্ত্রী বা তার সচিবের কাছ থেকে ভেতরে যাওয়ার ছাড়পত্র নিতে হয়। হতাশ হয়ে মন খারাপ করে বসে রইলেন কয়দিন। বুঝলেন কিছু ভুল হয়ে গেছে তাঁর।

ন্যায্য মর্যাদার যে দাবি তিনি পেশ করেছিলেন তা নওয়াবের পছন্দ হয়নি। সেজন্যই বোধহয় সাক্ষাৎকার দেননি। তাছাড়া প্রথামতো নওয়াবের কাসিদা রচনা করেননি। প্রশংসাপত্র না পেয়ে তিনি খুশি হননি। শুধু কবিতা দিলে নওয়াব খুশি হন না। যাহোক, যা করার করেছেন। প্রশস্তিপত্র রচনা করার ক্ষেত্রে তাঁর ভেতরে নানা দ্বিধা কাজ করে। অনেক সময় নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ায় সমঝোতা করতে পারেন না। কবির সম্মান নিচে নামানো কি বড় কবির পক্ষে সম্ভব!

তারপর একদিন মন্ত্রীর সচিবের কাছে গেলেন। কিন্তু কোনো কাজ হলো না। দরবারের আনুকূল্য পেলেন না, পথের খরচও না। শুধু পেলেন মুশায়রার আনন্দ। বিভিন্ন কবির সঙ্গে খোশগল্প করলেন। কাব্যচর্চার জন্য দিল্লির মান বেশি না কি লক্ষ্ণৌ এসব বিতর্কেও অংশ নিলেন। এদিক থেকে ভালোই সময় কেটে গেলো। কিন্তু কবিতায় লিখলেন যে লক্ষ্ণৌতে আসা ব্যর্থ হলো। মাথার ভেতরে পেনসনের চিন্তা। অর্থভাবনায় অশান্ত হয়ে থাকলেন। কিছুদিন পরে রওনা করলেন কলকাতার পথে। এদিকে গড়িয়ে গেছে কয়েক মাস। কলকাতা ঢোকার আগে পথে পড়বে বারানসি। এই শহরের প্রশংসা শুনেছেন অনেকের কাছে, কিন্তু নিজের কখনো আসা হয়নি। ভাবলেন, অর্থ না জুটুক মনের খোরাক তো পাবেন। লক্ষ্ণৌতে তাঁর গজলের খ্যাতি পেয়েছেন। শহরের সঙ্গীত ভীষণ

আনন্দ দিয়েছে। তাওয়াফদের সৌন্দর্যে পিয়াস মিটিয়েছেন। কবির জন্য এটিও অনেক বড় জায়গায়। নিজেকে উৎফুল্ল রাখলেন এসব ভাবনায়।

লক্ষ্ণৌ ছাড়লেন। তাঁকে যেতে হবে বান্দা হয়ে। আবার পথের খরচের জন্য দেনা করলেন তাঁর পরিচিত নওয়াব জুলফিকার আলির কাছ থেকে। ক্রমাগত দেনার বোঝা বাড়ছে। ভাবলেন, বাড়ুক। শোধ হবেই। ঘোড়ায় চড়ে এবং গরুর গাড়ির যাত্রায় পৌছালেন এলাহাবাদ। শহরটি বেশি ভালো লাগলো না। মাসখানেক থেকে তিনি আবার রওনা করলেন। বুঝলেন দীর্ঘ কয়েক মাসে শারীরিক কষ্টে তিনি কাবু হয়ে পড়েছেন। কানপুরে অসুস্থ হয়েছিলেন। সেখানে ভালো হাকিম-বৈদ্য ছিল না। তাই লক্ষ্ণৌতে কয়েক মাস বিশ্রাম নিলেন। তারপরও শরীর যেন চলে না। কষ্ট হয়। এদিকে পথের শ্রম, অন্যদিকে কোনো কাজে সুরাহা না পাওয়ার হতাশা। অপরদিকে ক্রমাগত ঋণ করা।

তারপরও পথের ক্লান্তি পেয়ে বসে, কেন তিনি কলকাতা যাচ্ছেন এই ভাবনায়। মাঝে মাঝে আজম তাঁকে পানি এগিয়ে দিয়ে বলে, হুজুর পানি খান।

পানি? পানি খাবো কেন? গালিব বিরক্ত বোধ করেন।

হুজুর আপনার মুখ শুকিয়ে গেছে।

আচ্ছা দাও। তিনি গ্লাস টেনে নিয়ে একটানে শেষ করেন। ভাবেন, সত্যি তাঁর বুক শুকিয়ে গিয়েছিল। তিনি তৃষ্ণার্ত ছিলেন। তবে ভুলে গেলেন কি করে? কারণ মাথার মধ্যে নওয়াব আহমদ বখশের হঠকারিতার রেখা পড়েছে। বিষয়টি তাঁকে খুব পীড়িত করছে। তাঁর ছেলে শামসউদ্দিন তো তাঁকে সহ্যই করে না।

আজম আবার তাঁকে পানির গ্লাস এগিয়ে দেয় এবং তিনি ঢকঢকিয়ে পানি খান। মনে হয় এক জীবনের তৃষ্ণা জমে আছে তাঁর বুকের ভেতর। এখন দরকার সুরা। কিন্তু নেই। নিজেকে শান্ত করলেন চুমুক চুমুক পানি খেয়ে।

বারানসি পৌছালেন সন্ধ্যার সময়। মন্দিরে মন্দিরে প্রজ্বলিত আলোর শিখা তাঁকে মুগ্ধ করলো। যে ভগ্ন হৃদয় নিয়ে তিনি এতটা পথ এসেছেন সে হৃদয়ের ক্ষতে প্রলেপ পড়লো। তিনি দেখলেন নদীর জলে আলোর ছায়া পড়ে নদী মায়াবী হয়ে উঠেছে। তিনি ঘাটে বসে রইলেন। ভাবলেন লক্ষ্ণৌ থেকে তিনি দরবারের সহযোগিতা পাননি। কিন্তু শহরের সৌন্দর্য তাঁর বাকি অভাব পূরণ করে দিয়েছিল। তিনি নদীর ধারে বসে আবারও বললেন, লক্ষ্ণৌ হিন্দুস্থানের বাগদাদ। কোনো শব্দই লক্ষ্ণৌর সৌন্দর্য বর্ণনা করার উপযোগী নয়। এবার বারানসি দেখার পালা। একটি শহর থেকে অন্যটির কত যে পার্থক্য। দিল্লির বাইরে এসে নতুন নতুন জায়গা দর্শনের অভিজ্ঞতায় তিনি নিজের আবেগ

সামলাতে পারছেন না। বারানসিকে নিয়ে কবিতা লিখে নাম দিলেন 'মন্দিরের বাতি।' এই শহরে এসে বসবাস করার ইচ্ছাও হলো তাঁর একবার। যে তিনজন পরিচারক তাঁর সঙ্গে এসেছে তারাও খুব খুশি। বলে, হুজুর বারানসি কত সুন্দর শহর। একদম আমাদের দিল্লির মতো।

দিল্লির মতো? নাকি দিল্লির চেয়ে বেশি সুন্দর?

তিনজনে একসঙ্গে বলে, দিল্লির চেয়ে বেশি সুন্দর।

গালিব মৃদু হেসে বলেন, তোমরা যে আমাকে খুশি করার জন্য দিল্লির কথা বলেছো তা আমি বুঝতে পেরেছি। তাহলে আমরা থেকে যাই এখানে?

না, না হুজুর। তিনজনে আঁতকে ওঠে। দিল্লি ছেড়ে আসার এগারো মাস হয়ে গেছে হুজুর। আপনি কলকাতা পৌছাতে পৌছাতে বছর পূর্ণ হবে। দিল্লি ফেরার জন্য আমাদের মনে টান লেগেছে।

সওগত এমনভাবে কথাগুলো বলে যে গালিব নিজেও থমকে যান। ভাবেন, অনেকদিন হলো তিনি বাড়ি থেকে বের হয়েছেন। এবার তো ফেরা দরকার। এতদিনে উমরাও বেগমের কথা ভাবলেন।

পরিচারকদের বললেন, আমরা কালকে কলকাতা রওনা দেবো। অনেকদিন হয়ে গেল এই শহরে।

তারপর গোলাপজল মিশিয়ে গ্লাসে সুরা ঢাললেন। আজম শামী কাবাব নিয়ে এলো। এক চুমুক খেয়ে এক লাইন শের আওড়ান। তারপর এক সময় একটির পর একটি বলতে থাকেন—

'কোন পাপী মদপান থেকে
আনন্দ করবার আশা রাখে?
সব সময়তেই আমি সেই
নিসর্গের মধ্যে ডুবে থাকতে চাই।'

আবার বলেন,

'আঘাতের ক্ষরণ বয়ে বেড়ায় হৃদয়
মদ্যপানই সেখানে একমাত্র শুশ্রূষা
তাদের ক্ষেত্রে আইনি বা বে-আইনির কী বিচার।'

গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে বিছানায় এলেন। ঘুমুবার আগে আবৃত্তি করলেন:

'কালকের কথা ভেবে
মদের ব্যাপারে, আজকে যেন
কার্পণ্য করো না—
কারণ স্বর্গীয় সাকীর প্রতি

তা হবে অবমাননাকর।'

শেরটি শেষ করে তুফতাকে লেখা চিঠির কথা স্মরণ করলেন—একবার এক বন্ধু তাঁকে একশো টাকা পাঠিয়েছিলেন। পুরো টাকাটা শেষ করেছিলেন ইংরেজদের মদের দোকানের ধার শোধ করে। হাঃ, গালিব এই তোমার নিয়তি। তাঁর দুচোখে ঘুম জড়িয়ে এলো।

গালিব যখন কলকাতায় পৌছালেন তখন দিল্লি ছাড়ার প্রায় এক বছর হয়ে গেছে। ক্লান্ত হয়ে নতুন শহরে পৌছালেন। ক্লান্তির সঙ্গে আনন্দও ছিল। ভাবলেন এখানে বসে প্রাপ্য ভাতার একটা ফয়সালা হবে। এই শহরে তাঁর কবিখ্যাতি পৌছে গেছে। গুণীজনেরা তাঁকে চেনে। তিনি আনন্দ পেলেন এই ভেবে যে, এখানে মুশায়রার আসর জমাতে পারবেন।

তাঁর জন্য খারাপ খবর এই যে মুর্শিদাবাদে পৌছানোর পরে আহমদ বখশ খানের মৃত্যুর খবর পেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলেন যা কিছু করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। কলকাতায় বাস করার খরচ পাঠিয়ে দিয়েছেন বান্দার নওয়াব। একটি পালকি এবং পালকির বেহারা পাঠিয়ে দিয়েছেন। যানবাহনের সুবিধার কারণে তাঁর যোগাযোগের সুবিধা হলো। তিনি প্রথমে দেখা করলেন সচিব অ্যান্ড্রু স্টারলিং এবং সহসচিব সাইমন ফ্রেজারের সঙ্গে। তাঁর ভাতার বিষয়টি গভর্নর জেনারেল কাউন্সিলের কাছে পেশ করা হলো। নিয়মানুযায়ী বিষয়টি নিস্পত্তি হবে দিল্লির ব্রিটিশ প্রতিনিধির মারফত। প্রশাসনিক ব্যবস্থা গালিবকে তো মানতেই হবে। তিনি নিজে ডাকঘরে গিয়ে মোক্তারনামা ও দরকারি কাগজপত্র দিল্লিতে পাঠিয়ে দিলেন। সেখান থেকে উত্তর আসার অপেক্ষা করতে লাগলেন। আশাবাদী হয়ে থাকলেন। খরচের সুরাহা করার জন্য সওগতকে বললেন, মাসের খরচের জন্য পঞ্চাশ টাকা ঠিক করলাম। এর বেশি খরচ করবে না কিন্তু।

সওগত মাথা নাড়ে, জ্বী হুজুর।

আর শোনো, আমার ঘোড়াটি বিক্রি করে দেবো। ক্রেতা দেখো।

ঘোড়াটি আপনার শখের—

এসব কথা থাক। আগে সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে তো। খেয়েপরে বেঁচে নেই। তারপরে ঘোড়া।

মন খারাপ করে সরে গেলো সওগত। কয়েকদিনের মধ্যে দেড়শো টাকায় বিক্রি হয়ে গেলো ঘোড়াটি।

গালিব তাঁর কাজ পরিচালনা করার জন্য একজন উকিল নিযুক্ত করলেন। মুনশী নাসিরউদ্দিন। তিনি গালিবকে বিভিন্ন মুসাবিদা করে দিতেন। তিনি

গালিবের জন্য একটি মুসাবিদা দাঁড় করালেন। প্রথমে লিখলেন (ক) মরহুম নসরুল্লাহ খানের পরিবারের সদস্যের ভরণপোষণের জন্য বার্ষিক দশ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছিলেন লর্ড লেক ১৮০৬ সালের মে মাসে। এই দশ হাজার টাকা প্রদান না করে পাঁচ হাজার টাকা দেয়া হয়ে আসছে এখন পর্যন্ত। সুতরাং আগের মঞ্জুর করা দশ হাজার টাকা ভাতার ব্যবস্থা করা হোক। (খ) এই টাকাটা দেয়া হয়েছিল মরহুম নসরুল্লাহ বেগ খানের পরিবারের সদস্যদের। কিন্তু পরিবারের সদস্যের বাইরের এক খাওয়াজা হাজিকে এই ভাতার অংশীদার করে দেয়া হয়। এই ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তার দুই পুত্রকে পিতার প্রাপ্য অংশের অংশীদার করা হয়েছে। এটা বন্ধ করা হোক। (গ) মঞ্জুর করা দশ হাজার টাকার পরিবর্তে পাঁচ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে। যে টাকা দেয়া হয়নি তা বকেয়া হিসেবে পরিবারকে প্রদান করা হোক। খাওয়াজা হাজিকে ভুল করে যে টাকা দেয়া হয়েছে সেটাও যেন এই হিসাবে ধরা হয়। এতদিন পর্যন্ত এই টাকা ফিরোজপুর ঝিরকা রাজ্য থেকে দেয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে যেন এই টাকা ব্রিটিশ ট্রেজারি থেকে দেয়া হয়।

মামলার বিরোধীপক্ষ নওয়াব শামসউদ্দিন। গালিবকে তিনি পছন্দ করেন না। মুসাবিদাটি দরখাস্ত হিসেবে পেশ করা হলে শামসউদ্দিন লর্ড লেকের সংশোধিত আদেশটি জমা দিলেন। মুনশী নাসিরুদ্দীন গালিবের অভিযোগপত্র তৈরি করে দিলেন। লিখলেন, সংশোধিত আদেশটি ঠিক নয়, বানোয়াট। এই আদেশামার কোনো নকল দিল্লি বা কলকাতার সরকারি মহাফেজখানায় নেই। ফারসিতে লেখা আদেশপত্রে প্রথা অনুযায়ী লর্ড লেক বা তাঁর সচিবের স্বাক্ষর নেই। তিনি আরো লিখলেন দ্বিতীয় আদেশপত্রটি প্রথম আদেশপত্রটিকে বাতিল করতে পারে না। কারণ প্রথমটি লর্ড লেক স্বাক্ষর করেছেন এবং গভর্নর জেনারেল অনুমোদন করেছেন। এর একটি কপি কলকাতার অফিসে রক্ষিত আছে।

গালিব বেশ স্বস্তি বোধ করেন এই ভেবে যে, এতসব প্রমাণের বিরুদ্ধে শামসউদ্দিনের পেশ করা আদেশটি কার্যকর হবে না। বেশ উৎফুল্ল মনে তিনি বিভিন্ন মুশায়রায় অংশগ্রহণ করেন। কলকাতায় প্রতি রোববার মুশায়রার আসর বসে। জড়ো হন কবিতাপ্রেমিকরা। এখানে এসে তিনি পেয়েছেন ফারসি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র—মিরাত-উল-অখবার। সম্পাদনা করেন রাজা রামমোহন রায়। দিল্লিতে এখন পর্যন্ত সংবাদপত্র ছাপা হয় না। মিরাত-উল-অখবার বা সংবাদপত্র পড়ে তিনি বেশ আনন্দ পাচ্ছেন। নতুন নতুন বিষয়ের সম্পর্কে জানা হচ্ছে। এই সংবাদপত্র পড়ে তিনি নানা কিছুর সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন। সময়

ভালোই কাটছে আর গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন তাঁর পেনসনের বিষয়টি ফয়সালা হওয়ার জন্য। কিছুদিনের মধ্যে ভালো খবর পেলেন তিনি। সরকারের মুখ্য সচিব গালিবের যুক্তিকে গ্রহণযোগ্য মনে করলেন। তিনি গালিবকে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন।

গালিব কলকাতায় বেশি আনন্দ পাচ্ছেন জমজমাট মুশায়রার আসরে। যে আগাম ঋণ পেয়েছেন সে টাকা দিয়ে শরাব পানে টান পড়েনি। খাওয়া-দাওয়া ভালো চলছে। বেশ কেটে যাচ্ছে দিন।

হট্টগোল বাধালেন এক মুশায়রার আসরে। আসরে নিজের ফারসি গজল পড়ার পরে উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে ফারসিনবিশ কয়েকজন কবিতার ভাষা নিয়ে সমালোচনা করলেন। তাঁকে তুলনা করলেন আরেকজন ফারসি ভাষার কবি কতিলের সঙ্গে। কতিলের কাবিতার সঙ্গে তুলনা করে গালিবকে হেয় করে কথা বললেন।

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন গালিব। বললেন, কাতিলকে আমি ফারসি ভাষার কবিদের মধ্যে গণ্যই করি না। তিনি পাত্তা দেয়ার মতো কবিই নন।

যারা আপত্তি জানিয়েছিলেন তাঁরা কাতিলের ভক্ত। তাঁরা ততক্ষণে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। গালিব উত্তেজিত কণ্ঠে আবার বললেন, উনি হলেন ফরিদাবাদের ক্ষত্রী দিলওয়ালি সিং।

তাঁর ভক্তরা উঠে দাঁড়ালেন, ব্যস থামেন।

থামবো কেন? ফারসি ভাষায় আমার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন করার অবকাশ নেই। আমি বহু বছর ফারসি শিক্ষকদের কাছে এই ভাষা শিখেছি। পড়াশোনা করে দক্ষতা অর্জন করেছি।

হইচই বেধে যায় মুশায়রার আসরে। ক্ষত্রী দিলওয়ালি সিং ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম হন। কাতিল নাম গ্রহণ করেন। তিনি শুধু কবি নন, একজন পণ্ডিতও। সেই দিন তিনি সেই আসরে ছিলেন না। উত্তেজনা-হইচইয়ে আসর ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়। গালিবের আক্রমণাত্মক কথাবার্তায় এক সময় কাতিলকে প্যাচার সন্তান বলা হয়ে যায়। যারা তাঁর ভক্ত তাদেরকে বলেন, ভারতীয় খোজা। বাদ-প্রতিবাদ তুঙ্গে ওঠে। ভেঙে যায় আসর।

বাদ-প্রতিবাদ কিছুদিন ধরে চলতে থাকে। গালিবের নাম উচ্চারিত হতে থাকে কলকাতার সুধীসমাজে। তিনি কাতিল-ভক্তদের রাগ কমানোর জন্য চেষ্টা করেন। লিখতে থাকেন শরাব, রসাল ফল, কলকাতার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নারীবিষয়ক কবিতা। তাঁর সময় ভালো-মন্দে কেটে যায়।

শেষ পর্যন্ত পেনসনের যে বিষয়ের সমাধান তিনি আশা করেছিলেন তা

পূরণ হলো না। তিনি সচিব জর্জ সুইনটনের কাছ থেকে জানতে পারলেন যে, ছোটলাট স্যার জন ম্যালকম দ্বিতীয় আদেশপত্রটি গ্রহণ করেননি। ওটি ফেরত পাঠানো হয়েছে। তিনি মতামত দিয়েছেন এই বলে যে, আহমদ বখশ খান একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি ব্রিটিশদের আস্থাভাজনও বটে। তিনি কোনো আদেশপত্র জাল করার মতো হীন কাজ করতে পারেন না। আদেশপত্রটি সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ নেই। অতএব এতদিন ধরে যেটা চলে আসছে সেটিই বহাল থাকবে।

গালিবের মনে হলো তাঁর সামনে সবকিছু ধসে পড়ে গেলো। কলকাতা এক অচেনা শহর। এখানকার যা কিছু তাঁর স্মৃতিতে থাকবে তা শুধুই কবিতা। থাকবে এখানকার খবরের কাগজ। সুধীজন। আর অসাধারণ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। মর্মাহত গালিব ফিরে যাচ্ছেন দিল্লিতে। আর কোনোদিন হয়তো কলকাতায় আসা হবে না। রেখে যাচ্ছেন তাঁর গজল। নিয়ে যাচ্ছেন চল্লিশ হাজার টাকার ঋণের বোঝা। সঙ্গে নেই প্রিয় ঘোড়াটি। যেটার পিঠে চড়ে তিনি অনেক পথ পার হয়েছেন। একই সঙ্গে নেই ঘোড়ার খুরের শব্দ, যে ধ্বনি অনেক সময় তাঁর ক্লান্তি দূর করেছিল। সঙ্গীতের মতো বেজেছিল তাঁর কানে।

বাড়িতে ফিরে এসেও শান্তি নেই। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত গালিবের দিকে তাকিয়ে উমরাও বেগম বললেন, আমি সব শুনেছি। আমার ভাই নওয়াব শামসউদ্দিন মুখিয়ে আছে তোমাকে হেনস্থা করার জন্য। তাঁর কাছ থেকে আমিও টিটকারি শুনেছি।

গালিব শুধু বললেন, আমাকে পানি দাও বিবি। এক গ্লাসে হবে না। সুরাই ভরা পানি চাই।

উমরাও বেগম কিছু বলার আগেই কাল্লু পানি আনতে গেলো। তিনি বারান্দায় রাখা বালতির পানি দিয়ে মুখ-হাত ধুতে শুরু করলেন। খানিকটুকু শীতল হলো শরীর। পানি খেয়ে বিছানায় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঁজে এলো চোখ। তারপরও ভাবলেন, তিনি তো পরাজিতই হয়েছেন। নওয়াব শামসউদ্দিন তাঁর আর কি করবেন? দু-চার কথা শুনাবেন, এই তো? তাতে আর কি এসে যায়। তিনি গভীর ঘুমে তলিয়ে যান।

ঘুম কখন ভাঙে তা তিনি নিজেও বুঝতে পারেন না। কালে সাহেবের বাড়িতে থাকতে মাঝে মাঝে গ্লানি বোধ করেন। কিন্তু না থেকেও উপায় নেই। এই দুঃসময়ে যাবেন কোথায়? তিনি বিছানা ছেড়ে ওঠেন না। কোথাও বের হন না। মাঝে মাঝে চিঠি লেখেন বিভিন্নজনকে। আর বকেয়া পেনসন না পাওয়ার কারণে ব্রিটিশদের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে লিখলেন কবিতা—

আমি বলতে চাই যে কারা এই চাঁদপানা মানুষ।

তো, নারী বললো,

এই সুন্দর পুরুষেরা লন্ডনের রাজশক্তির বলয় থেকে আগত।

আমি বললাম,

তাদের হৃদয় বলে কিছু কি আছে?

তো নারী বললো,

তাদের কিন্তু লৌহদণ্ড আছে।'

লিখে নিজেই দু-একবার পড়লেন। তারপর বললেন, হ্যাঁ এভাবেই ওদেরকে চিত্রিত করা উচিত। ওরা এমনই মানুষ।

একদিন নওয়াব শামসউদ্দিন এলেন। বোনের জন্য কাপড় চোপড়, মণ্ডা-মিঠাই, ফল-মূল নিয়ে এলেন। হা হা হাসিতে বাড়ি মাতালেন। যাওয়ার সময় গালিবকে খোঁচা দিয়ে বললেন, পেনসন বাড়ানোর জন্য অনেক দৌড়ঝাঁপ করলেন কিন্তু পুরনো বরাদ্দ ৬২.৫০ পয়সা থেকে বের হতে পারলেন না মির্জা সাহেব। এখন পাওনাদার সামলান।

গালিব সঙ্গে সঙ্গেই বললেন—

'মৃত্যুর আশায় যে বেঁচে রয়েছে

তার হতাশা দেখবার মতন।'

শামসউদ্দিন কড়া দৃষ্টি ফেলে বেরিয়ে যান। উমরাও বেগম বলেন, আমার ভাই আপনার শের পছন্দ করেননি।

তিনি আমাকে টিটকারি দিতে এসেছেন বিবি। তিনি তো ভালো করেই জানেন যে তাঁর আব্বাজান আমাকে ন্যায্য পাওনা থেকে ঠকিয়েছেন।

উমরাও বেগম উত্তর না দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান। গালিব পায়চারি করেন। ভাবেন, একজন বন্ধু পেলে সময় ঝর্নার মতো গড়িয়ে পড়তো। তার আশাই পূর্ণ হলো।

অল্পক্ষণের মধ্যে তকীয়ুল্লাহ এলেন।

আমি তো তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম বন্ধু।

আমি আপনাকে এক জায়গায় নিয়ে যেতে এসেছি। আমার সঙ্গে যাবেন? পালকি আছে।

কোথায়? গালিব ভুরু কুঁচকে তাকান।

আমার আত্মীয়া তর্ক, কবিতা লেখেন। তাঁর খুব ইচ্ছা আপনাকে কবিতা শোনাবে। আপনি কি দয়া করে আমার সঙ্গে যাবেন?

তর্ক, আপনার আত্মীয়া। ওহ, আমি তো যাবোই। কবি আর কবিতার

কাছে তো আমি যাবোই।

তিনি বেশ দ্রুত পোশাক বদলালেন। তাঁর সবচেয়ে দামি পোশাকটি পরলেন। সুগন্ধী মাখলেন। নিজের যৌবনের দিনগুলো তাঁকে খুব তাড়িত করলো। তকীয়ুল্লাহকে শুনিয়েই বললেন,

'প্রতি বসন্তে সঙ্গিনী নতুন আনো

নতুন বছরে পুরনো দিনপঞ্জী কেন?

তকীয়ুল্লাহ মৃদু হেসে বললেন, তিনি অভিজাত বংশীয়া। পর্দানশীন। বুখারা থেকে এসেছে তাঁর পূর্বপুরুষ।

গালিব গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, আমি জানি আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবে না। কথা হবে তো?

তিনি চিকের আড়াল থেকে দু-চারটে কথা বলতে পারেন।

কবিতা পড়বেন তো?

পড়বেন। তবে এরপর থেকে তাঁর কবিতা তিনি আমাকে দেবেন। আমি আপনাকে দেবো পরিমার্জনার জন্য।

গালিব গম্ভীর হয়ে বললেন, চলো।

বেশিক্ষণ সময় সেই বাড়িতে থাকা গেলো না। কবি তর্ক পর্দার আড়াল থেকে কবিতা পড়লেন। গালিব চোখ বুঁজে শুনলেন। অনন্তকালের বিস্তার ঘটলো তাঁর হৃদয়ে। তিনি বুঝলেন, বড় কষ্ট হচ্ছে নিজেকে সামলাতে। যদি শুধু একবার তাঁকে দেখা যেতো! যদি দেখা যেতো হাতের একটি আঙুল কিংবা পায়ের! মুগ্ধ হয়ে ফিরে এলেন বাড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন :

'দেখো তার কথার ইন্দ্রজাল, সে যা বললো

আমার মনে হলো এও তো আমার হৃদয়ে ছিলো।'

কতক্ষণ ধরে লিখলেন, কাটলেন। কোমরে বাঁধা আলখাল্লার ফিতায় গিট্টু দিলেন অনেক। কবিতা লেখার সময় যখন কিছু ভাবেন তখন এভাবেই গিট্টু দিতে থাকেন। উমরাও বেগম ঘরে ঢুকলে খেয়াল করলেন না। উমরাও বেগম ডাকলে বললেন, বিরক্ত করো না। খাবেন না? না, আজ খাবো না। কি হয়েছে আপনার? গালিব চোখ গরম করে তাকালেন, যেন স্ত্রীর অপরাধের মাত্রার সীমা নেই।

সেদিন থেকে গালিব নতুন ঘোরে প্রবেশ করলেন। রাত-দিনের জাহান্নামে ফুল ফোটালেন। নিজেকেই শোনালেন, বড় অল্প বয়সে তিনি বিধবা হয়েছেন। ওহ, বিধবা!

এভাবে তাঁর নতুন যাত্রার বাঁক বদল হলো।

একদিন কবি মোমিনের একটি শের শুনে তিনি প্রবলভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বললেন, তোমার এই শেরটি আমাকে দিও দাও বন্ধু। এর বদলে আমি তোমাকে আমার পুরো দিওয়ান দিয়ে দেবো।

মোমিনের দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়। বলেন, সত্যি? এত ভালো লেগেছে তোমার?

বন্ধু এই ভালোলাগা প্রকাশ করার ভাষা আমার নেই। তারপর তিনি মোমিনের শের আবৃত্তি করতে থাকেন :

'তুম মেরে পাস হোতে হো গোয়া
যব কোঈ দুসরা নহী হোতা।
মনে হয় যেন আমার পাশে থাকো তুমি
যখন আর কেউ থাকবে না।'

কিশোর বয়স থেকেই দুজনের বন্ধুত্ব। কবি মোমিনের পরিবার ইউনানী পেশার সঙ্গে যুক্ত। তিনিও পেশায় হাকিম। চিকিৎসার কারণে কোনো কোনো পর্দানশীনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। ভালো লাগার মুগ্ধতায় তাঁদের নিয়ে কবিতা লিখেছেন। এই প্রথম মোমিনের মিষ্টি প্রেমের কবিতায় এমন উচ্ছ্বসিত গালিব।

মোমিন মৃদু হেসে বলেন, বন্ধু কবে পাবো দিওয়ান?
পাবে, পাবে। আর একটি প্রেমের শের শুনি।
মোমিন একটু থেমে চোখ বুঁজে বলেন,
'কাঁদবেন আপনি প্রহরে প্রহরে আমার মতো
হৃদয় যদি বাঁধা পড়ে কোথাও, আমারই মতো।'
গালিব তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেন, আহ শান্তি!
মন এমন উচাটন হয়েছে কেন বন্ধু?
গালিব মৃদু হেসে কবিতায় উত্তর দিলেন :
'অকারণে আত্মহারা হইনি গালিব;
কিছু তো আছে গোপন, নইলে এত ঢাকাঢাকি কিসের ॥'

দুবন্ধু অনেকক্ষণ পরস্পরের হাত জড়িয়ে ধরে রাখলেন। কিন্তু গালিবের বুকের ভেতরে কবি মোমিনের কবিতার শিহরণ—হৃদয় যদি বাঁধা পড়ে কোথাও, আমারই মতো।

দিন আপন নিয়মে গড়ায়।

একদিন উমরাও বেগমের প্রবল ইচ্ছায় তাঁর বোনের ছেলে জাইনুলকে দত্তক নিলেন। জাইনুলের কবিতা লেখার ঝোঁক আছে। আরিফ ছদ্মনামে

লেখেন। গালিব তাকে স্নেহ করেন। ভালো কবিতা লেখার জন্য গালিবের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। গালিব আরিফের সঙ্গ উপভোগ করেন। মিঁয়া কালে সাহেবের বাড়িতে এখনো আছেন। ভাবছেন, এরপর বাড়ি ভাড়া করে অন্য কোথাও উঠে যাবেন। একজনের আতিথ্য বেশিদিন গ্রহণ করা উচিত নয়। এখানে আসার পরে একজন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কালে সাহেব জেলখানা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে তাঁকে তাঁর এই বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। যিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন তিনি তাঁকে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। গালিব তাঁকে বলেছিলেন, কে বলেছে আমি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছি। প্রথমে ছিলাম গোরাদের জেলখানায়, এখন আছি মিঁয়া কালের জেলখানায়।

কালে সাহেব তাঁর পাশেই বসে হাসছিলেন। বলেছিলেন, আপনার এই রসিকতা আমরা খুব উপভোগ করি মির্জা সাহেব। আপনি বিচক্ষণ বুদ্ধিমান মেধাবী লোক।

গালিব এর উত্তরে নিজের শের বললেন :

'অর্থ বুঝবার যোগ্যতা যদি না-ও হয় কোনোদিন,
তবু রূপের বর্ণবৈচিত্র্য দেখার শক্তিটুকু বেঁচে থাকে ॥'

জাইনুল খুবই উৎসাহিত কবি। বিভিন্ন মুশায়রায় অংশ নিতে ভালোবাসে। একদিন মাহবকে নিয়ে এসে গালিবকে মুশায়রায় যেতে বলেন। গালিবের মন ভালো নেই। নতুন গজল লেখা নেই। কিন্তু তরুণ কবিরা নাছোড়বান্দা। বললেন, মনে যে গজল আছে সেটা আবৃত্তি করলেই হবে। আপনাকে যেতেই হবে। আমাদের সঙ্গে হাতি আছে। আপনি হাতিতে করেই যাবেন।

ওদের জোরাজুরিতে যেতে হলো তাঁকে। সেই আসরে পেলেন কবি আজুরদাকে। তাঁর মন প্রফুল্ল হয়ে গেলো। আজুরদাকে তিনি খুবই পছন্দ করেন। আজুরদা মৃদু হেসে বলেন, কেমন আছ মির্জা?

গালিব নিম্নকণ্ঠে বলেন, সেদিন তোমাকে বলেছিলাম আমার আবার নবজন্ম হবে।

আজুরদা তাঁর হাত শক্ত করে ধরে বললেন, নবজন্ম হয়েছি কি?

মনে তো করি হয়েছে। নতুনভাবে জেগে উঠেছি। আজ সারা দিন খুব বিষণ্ন ছিলাম। তোমাকে দেখে বিষণ্নতা উধাও হয়ে গেছে।

তোমার কথায় বুঝতে পারছি স্মৃতি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। সেদিন আমি আদালতে বিচারকের আসনে। তোমাকে বলেছিলাম আত্মপক্ষ সমর্থনে তোমার কোনো বক্তব্য আছে? তুমি বলেছিলে—

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে গালিব বলেন—

'ধার করে মদ্যপান করেছি এ কথা যেমন সত্য
তেমন এত আরেক সত্য যে
আমার ব্যয় বাহুল্যের জন্যই
আজকের দারিদ্র্য থেকেই
আমার আবার নবজন্ম হবে।'

দুজনে মৃদু হাসলেন। অল্পক্ষণে মুশায়রার আসর জমে উঠলে তাঁরা মজে গেলেন কবিতায়। উবে গেলো দুঃখবোধ। অভাবের চিন্তা। দিনযাপনের গ্লানি।

সময় ভালোই কাটে। পেনসন ঠিকমতো পাচ্ছেন। আরিফ তাঁর সময়কে ভরিয়ে রাখেন। তিনি আরিফকে বলেন, তুমি আমার ঘরে মোমবাতির শিখা।

উমরাও বেগম আনন্দে আপ্লুত হয়ে বলেন, ও আমার বোনের ছেলে। আমার সন্তানের মতো। ও তো আমাদের ঘরের প্রদীপের শিখা হবেই।

একদিন ও বড় কবি হবে বিবি। ও চমৎকার লেখে।

আপনি ওকে দোয়া করেন। উমরাও বেগম স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন আরিফের দিকে। এভাবে পরিবারে বাড়তি আনন্দে তিনিও ভীষণ আনন্দিত। কিন্তু থমকে দাঁড়ালো তাঁর সময়, যেদিন খুন হলেন দিল্লির রেসিডেন্ট উইলিয়াম ফ্রেজার। কিষাণগড়ের রাজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করে ফিরে আসার সময় তিনি নিহত হন। ফ্রেজার গালিবের বন্ধু। তিনি খুব দুঃখ পেলেন। কয়েকদিন পরে ধরা পড়লো ফ্রেজারের হত্যাকারী করিম খান। করিম তার স্বীকারোক্তিতে বললো যে, সে নওয়াব শামসউদ্দিনের ভাড়াটে খুনি হিসেবে ফ্রেজারকে হত্যা করেছে।

গালিব প্রবল মানসিক চাপে পড়লেন। উমরাও বেগমের কান্না ফুরোয় না। বারবার তাঁকে প্রশ্ন করেন, আপনি কি জানেন এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে?

আমি? আমি কি জানবো?

আমার ভাই তো আপনার শত্রু। আপনি কি কোনো চক্রান্ত করেছেন?

ওহ, বিবি, তুমি এসব কি বলছো?

আমি বলবো কেন? আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সবাই বলছে। ফ্রেজার আমিন ও জিয়া ভাইয়ের পক্ষে ছিলেন, সেজন্য শামসউদ্দিন ভাই—

থামো বিবি, থামো।

গালিব মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকেন। এ কি হলো? ধীরে ধীরে তিনি দেখতে পেলেন দিল্লির লোকেরা বলাবলি করছে যে শামসউদ্দিন চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। লোকে তাকে দুষছে। আদালতের রায়ে শামসউদ্দিনের

ফাঁসির আদেশ হলো। রায় কার্যকর করতে সময় লাগলো না। ২২ মার্চ খুন হলেন ফ্রেজার, ২৬ আগস্ট ফাঁসিতে ঝোলানো হলো শামসউদ্দিনকে।

তোলপাড় হয়ে গেলো শহর। গালিব নিজেকে ঘরে আটকালেন। ঘরকুনো হয়ে গেলেন তিনি। ঘরের বাইরে একটি শহর আছে সে কথা মনেই আনলেন না। একদিন উমরাও বেগম জানালেন, শামসউদ্দিন ভাইয়ের জমিদারি ইংরেজরা বাজেয়াপ্ত করেছে।

গালিব কথা বললেন না। তাঁর দিকে তাকালেন না। নির্বাক বসে রইলেন। তিনি জানেন, চারপাশের লোকেরা বলছে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে গালিবও একজন। শামসউদ্দিনের লোকেরা তাঁর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে গালাগাল করে। অভিশাপ দেয়। তাঁদের ঘৃণার কথা চিৎকার করে বলে। তিনি চুপচাপ বসে থাকেন। নইলে বন্ধুদের চিঠি লিখেন। কিংবা গজল লেখায় মনোনিবেশ করেন। একা একা চৌসর খেলেন।

আবার দিন গড়ায়। মাস কেটে যায়। বছরও যায়।

উমরাও বেগম জাইনুলের বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন। বিয়ের পরে জাইনুল স্ত্রীসহ তাঁদের সঙ্গে থাকছেন। বাড়িতে নতুন অতিথি। আবার আনন্দের জোয়ার চারদিকে। গালিব বুকের ভেতর শক্তি অনুভব করেন। বাইরে বের হওয়ার তাগিদ অনুভব করেন। রমজান মাস শুরু হয়েছে। জামা মসজিদে মুসল্লিদের ভিড় বাড়ে। তিনি একদিন একা একা চৌসর খেলছিলেন সে সময় বন্ধু আজুরদা এসে ঢোকেন। অবাক বিস্ময়ে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ান। গালিব তাকিয়ে বলেন, এসো।

আজুরদা দুপা এগিয়ে মুখোমুখি বসে বলেন, হাদিসে পড়েছি মির্জা যে পবিত্র রমজান মাসে শয়তানকে আটকে রাখা হয়, কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে যে ঠিক পড়েছি কি না—

গালিব উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, ঠিকই পড়েছ বন্ধু, শয়তানকে যে ঘরে আটকে রাখা হয় সেটা তো এই ঘরই।

আজুরদা হাসতে হাসতে বলেন, আপনার রসিকতা অতুলনীয়। মুহূর্তের মধ্যে বলে ফেলতে পার। পার কি করে?

এটা তো আমারও প্রশ্ন। পারি কি করে?

আজুরদা মাথা নেড়ে অন্য প্রসঙ্গে গেলেন। বললেন, তোমার উর্দু দিওয়ান তো খুব জনপ্রিয় হয়েছে। লোকের মুখে তারিফ শুনছি। কতগুলো শের আছে?

এগারশো শের দিয়েছি। বন্ধু ফজল হক আমাকে সাহায্য করেছেন বইটি সংকলনের ব্যাপারে। তিনি না হলে দিওয়ান এত গোছানো হতো? শেরগুলো

বাছাইয়ের কাজও তিনি করে দিয়েছেন।

আজুরদা নিশ্বাস ফেলে বলেন, আমরা একজন ভালো বন্ধু হারিয়েছি।

ফজল হক দিল্লিতে থাকেন না, এটা ভাবলে আমার বুক ভেঙে যায়।

অন্যদিকে মোমিন খান মারা গেলেন।

হায় মোমনি খান, হায়! গালিবের চোখ জলে ভরে যায়।

ওর প্রেমের কবিতা আমাদের মুগ্ধ করতো। ভারি মিষ্টি হাত ছিল।

গালিব ভয়ার্ত দৃষ্টিতে আজুরদার দিকে তাকান। বলেন, এই শহরে কবিদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

ভয় নেই বন্ধু। নতুন কবিদের জন্ম হবে।

হ্যাঁ, ইতিহাস এমনই।

গালিব দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দেন। আজুরদা ওঠে দাঁড়ান। বলেন, যাই। মন খারাপ লাগছে। গালিব মাথা নাড়েন। থাকার অনুরোধ করেন না। আবার তিনি একা হয়ে পড়েন। চৌসর খেলাতেও মন বসে না। বন্ধু শইফতার কথা মনে হয়। শইফতা আছে বলে ওর ওখানে আড্ডা হয়। আড্ডার কথা মনে হতেই আলিমর্দানের খালটির কথা মনে হয়। শুকিয়ে যাওয়া খালটিকে নতুন জীবন দিয়েছে চার্লস মেটকাফ। এখন চাঁদনি চকের ভেতর দিয়ে বয়ে যায় পানি। স্রোতের মৃদু শব্দ কানে এসে বাজে। চাঁদনি চকের মধ্য দিয়ে নজফগড় থেকে ফতেপুরী মসজিদ হয়ে লালকেল্লা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে জলের স্রোত। গালিব এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে কুঠুরি থেকে নামেন। জলের ধারে যাবেন। জলের ছায়ায় নিজের ছায়া দেখবেন। খুঁজবেন বন্ধুদের মুখ। যদি দেখা হয় শইফতার সঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন তাঁর প্রেমিকা রামজুর কথা। সবাই জানে রামজুর সঙ্গে তাঁর প্রেমের খবর। এ ব্যাপারে শইফতা খুব সৌখিন। তাঁর বিলাসে কোনো জড়তা নেই। গালিব খালের ধারে এসে দাঁড়ান। তখন আকাশে মেঘের ছায়া। বাতাসে তাপের স্পর্শ নেই। জলের স্নিগ্ধতা আবেশে ভরিয়ে দেয় তাঁকে। তিনি ভাবেন যা কিছু ঘাটতি তা তলিয়ে যায় জীবনের পূর্ণ অনুভবের কাছে। চাঁদনি চকের জলের স্রোতে হাত ডোবালে মাথায় জেগে ওঠে গজলের পঙ্‌ক্তি।

কয়েক মাস পরে আরিফের স্ত্রী পুত্রসন্তানের জন্ম দিলো। বাড়িতে খুশির হাওয়া বয়ে গেলো। গালিব নিজে মণ্ডা-মিঠাই কিনলেন। তিনি নানা হয়েছেন এই পরিতৃপ্তি তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখে। আরিফের হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন লাগছে? তুমি পিতা হয়েছো।

খুবই খুশি। মনে হচ্ছে যেন একটি নতুন কবিতা লিখেছি।

বাহবা, বাহবা। সাবাস। গালিব উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন। আরিফ লাজুক মুখে সরে যায়।

আকিকা দিয়ে ছেলের নাম রাখা হয় বাকির আলি। গালিব ওকে উঁচু করে তুলে ধরে বলেন, যমুনার তীরে বড় হও। দেখো সূর্যের আলো।

চারদিকে জানান দিয়ে শিশুটি কেঁদে ওঠে।

আবার তাঁর দিন গড়াতে শুরু করে। মুঘল সম্রাট এখন বাহাদুর শাহ জাফর। তিনি নিজে কবি। শিল্পপ্রেমী মানুষ। তাঁর দরবার জমজমাট থাকে। মুশায়রার আসর বসে নিয়মিত। একদিন কালে সাহেব এসে বললেন, আপনার উর্দু দিওয়ান আবার ছাপা হয়েছে। আমি বাদশাহর চিকিৎসক আইসানউল্লাহ খানের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি আপনার ফারসি কবিতার ভক্ত। আপনার দিওয়ান বাদশাহর কাছে পৌছে দেবেন। আরো বলেছেন দরবারে আপনার একটি কাজের ব্যবস্থা করবেন।

গালিব সোজা হয়ে বসেন। নিঃসন্দেহে এটি তাঁর জন্য বড় খবর। পাশাপাশি তিনি এটাও জানেন যে তাঁর উর্দু কবিতার জন্যই তিনি অনেক বেশি জনপ্রিয়। যদিও তিনি ফারসি কবি বেদিলের অনেক বেশি ভক্ত। কালে সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলেন, এখন মনে হচ্ছে কালে সাহেবের হাজতে বন্দি থাকাই আমার জন্য উত্তম জায়গা।

কালে সাহেব দরাজকণ্ঠে বলেন, যিনি হাজত থেকে বাদশাহর দরবারে পৌছাতে পারেন তিনিই উত্তম ব্যক্তি। আমার বিশ্বাস আমি আপনাকে দরবারে পৌছে দিতে পারবো।

গালিব মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন। কালে সাহেব চলে গেলেন। তিনি কাগজ টেনে লিখতে বসলেন। এক মুহূর্ত ভাবলেন। তিনি জানেন দিল্লি শহরের অভিজাতেরা সকলে বড় বড় বাড়ি ও জমির মালিক। তাঁদের ধনের কোনো হিসাব নাই। তাঁদের দুজনের অসংখ্য প্রাসাদ আর জমি এক করলে তার সীমানা একটি শহরের প্রায় সমান হয়ে যায়। ওদের সভাগৃহ বা বসবাসের প্রাসাদ হচ্ছে একেকটি এলাকার কেন্দ্রবিন্দু। তবে এসব অভিজাত পরিবারের মধ্যে কারো কারো ধনদৌলত কমে গিয়ে তারা দরিদ্র হয়ে পড়ছে। গালিবের কলম কাগজের ওপর সচল হয়ে ওঠে। তিনি লিখতে থাকেন, এই শহরে দুজন গালিব আছে। একজন অভিজাত তুর্ক। তাঁর ওঠাবসা বাদশাহর সঙ্গে। অন্যজন অপমানিত, ঋণগ্রস্ত, প্রায় ভিখারি। সেজন্য দিল্লিবাসীর কেউ কেউ নিজেদের নাম উল্লেখ না করে পত্রিকায় লিখেছে, সহস্র তালিমারা জুতা পরে দণ্ডি হাতে হতদরিদ্র গালিব বেরিয়েছে দিল্লি ভ্রমণে। এটুকু লিখে তিনি থামলেন। তাঁর চিন্তা ঘুরপাক খায়

আরো নানা বিষয় নিয়ে। যারা নতুন নওয়াব হয়েছেন তাঁদের কথাও তিনি ভোলেন না। চাঁদনি চক তাঁর প্রিয় জায়গা। এর মাঝ দিয়ে যে খালটি চলে গেছে তার দুপাশে আছে সবুজ গাছ আর তার ছায়া। তিনি কতদিন সেসব গাছের ছায়ায় বসে সময় কাটিয়েছেন। তখন তিনি লিখতে শুরু করলেন কবিতা :

'বেঁচে থাকবার আশ্রয় ও রসদ
কোথা থেকে পাবো।
আরামের কত প্রয়োজনীয় আয়োজন
কোথা থেকে পাবো।
রোজা এবং উপবাসে আমার বিশ্বাস আছে
কিন্তু খসখসে টাঙানো ঠাণ্ডা ঘর
আর বরফশীতল জল
হায়! কোথা থেকে পাবো।'

কবিতাটি লিখে তিনি কুঠুরি থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তাকিয়ে থাকলেন তাঁর প্রিয় দিল্লির দিকে।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর জন্য দরবারে কাজের ব্যবস্থা হলো। ফারসি ভাষায় তাঁকে মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখতে হবে। এর জন্য বছরে ছয়শো টাকা সম্মানী পাবেন।

কাজের দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে দেয়ার জন্য দরবারে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো।

তাঁকে দরবারি পোশাক দেয়া হলো।

রাজকীয় খেতাবেও ভূষিত করা হলো— নজম-উদ-দৌল্লা, দবীর-উল-মুলক-নিজাম জঙ্গ। অর্থাৎ তিনি হলেন সাম্রাজ্যের তারকা, ইতিহাসের রচনাকার, যুদ্ধের নায়ক। তিনি এই সম্মানে অভিভূত হলেন। বাড়ি ফেরার পথে লালকেল্লার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। ফারসি ভাষা তিনি ভালোভাবে জানেন এই নিয়ে তাঁর অহঙ্কার আছে। যদিও তাঁর উর্দু কবিতা অনেক বেশি জনপ্রিয় তারপরও তিনি চান ফারসি ভাষার অন্যতম কবি হিসেবে পরিচিত হতে।

বাড়ি ফিরলে উমরাও বেগম সব শুনে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করলেন। বললেন, আমাদের কষ্টের দিন বোধহয় ফুরালো।

গালিব কিছু বললেন না। তিনি তো জানেন ভবিষ্যৎ কত অনিশ্চিত। কবিতার পাশাপাশি ইতিহাস লিখতে হবে এটাও বুকের ভেতর খোঁচার মতো লাগছে।

উঠে যাওয়ার আগে উমরাও বেগম বললেন, বাদশাহ আপনাকে সম্মান দিয়েছেন সেজন্য আমি খুব খুশি।

আমিও খুশি বিবি।

আমাদের আরেকটি খুশির খবর আছে।

কি, বলো কি?

আমাদের আরিফের আরেকটি বাচ্চা হবে।

মাশাল্লাহ। আল্লাহ মেহেরবান।

পকেট থেকে একমুঠো টাকা বের করে উমরাও বেগমকে দিয়ে বললেন, মণ্ডা-মিঠাই আনাও। প্রতিবেশীদের জানিয়ে দাও যে আমরা আরেকটি শিশুর নানা-নানী হতে যাচ্ছি।

অনেকদিন পরে উমরাও বেগমের বুকের ভেতরে খুশির জোয়ার বয়। ঘরে একটি শিশু বড় হচ্ছে। প্রতিদিন একটি শিশুর বড় হতে দেখাও তাঁর জন্য আল্লাহর রহমত। তিনি নামাজ পড়ে দোয়া করেন।

গালিব মুঘল ইতিহাস লেখার পরিকল্পনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সবকিছু বিচার-বিবেচনা করে তিনি দেখলেন এক খণ্ডে এই বিশাল সময়কে ধরা সম্ভব নয়। তিনি দুই খণ্ডে ইতিহাস রচনার পরিসর ঠিক করলেন। প্রথম খণ্ডে থাকবে তৈমুর লঙ থেকে হুমায়ুন পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে সম্রাট আকবর থেকে বর্তমান বাদশাহ বাহাদুর শাহ পর্যন্ত। প্রথম খণ্ডের নাম রাখবেন 'মিহর-ই-নিমরোজ' অর্থাৎ 'মধ্যদিনের সূর্য'। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম রাখবেন 'মাহ-ই-নিমমাহ' অর্থাৎ 'মধ্য মাসের চাঁদ'। পুরো বইটির নাম হবে 'পরতারি স্তান' অর্থাৎ 'আলোর রাজ্য'।

ইতিহাস লেখার নানা আয়োজন সম্পন্ন করার পরে তিনি একবার খুশি হলেন। আবার মন খারাপ করলেন। তাঁর মনে হলো তিনি তো কবি। কবিতার বাদশাহ। কাব্যের স্রষ্টা। সাম্রাজ্যের বাদশাহর উচিত কবিকে পরিচর্যা করা। আপনি তো জানেন গালিব আগুন। তাঁর গজলে আগুনের শক্তি আছে। সৌন্দর্য আছে।

পর মুহূর্তে দমে যান আবার। তাঁর মনে হয় বাদশাহ থেকে শুরু করে দরবারের অন্যরা তাঁর কবিত্বশক্তির মূল্যায়ন করতে পারছেন না। তিনি এমন এক শক্তিশালী কবি যার জন্য সম্রাট গর্বিত হতে পারেন। কিন্তু না, সেখানেও তিনি কোনো আশার জায়গা দেখতে পান না। তিনি একলা ঘরে চিৎকার করে বলেন :

'দুনিয়ায় আরো অনেক শক্তিশালী কবি আছেন,

কিন্তু গালিবের কলমটাই অন্যরকম।'

নিজের শের বলতে বলতে বারান্দায় আসেন। দুচোখ ভরে দেখেন দিল্লির আকাশ।

তারপরও সব দুঃখবোধ একপাশে রেখে ইতিহাস রচনার কাজ করলেন। ভালোই এগিয়েছে লেখা। আশা করছেন এভাবে কাজ করলে সময় মতো শেষ করতে পারবেন। ছয় মাস পরে পারিশ্রমিকের একটা থোক টাকা পাবেন। সেটা এখনো পাননি। এদিকে আরিফের দ্বিতীয় পুত্রটির জন্ম হয়েছে। নাম রাখা হয়েছে হুসেন আলি।

এক সকালে উমরাও বেগম বললেন, আরিফ অসুস্থ। নাক-মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে।

গালিব থ হয়ে রইলেন। ভগ্নকণ্ঠে বললেন, কাল্লু মিয়াকে পাঠাও। হাকিমকে ডেকে নিয়ে আসুক।

পাঠিয়েছি। এখুনি হয়তো এসে যাবে।

উমরাও বেগম দোপাট্টা দিয়ে মুখের ঘাম মুছে বললেন, ওর বিবিও তিনমাস ধরে জ্বরে ভুগছে। কাশছে। আমি কি করবো বুঝতে পারছি না।

মাথা ঠাণ্ডা করো বিবি।

আমি আপনার কথা ভাবছি। আপনি বাদশাহর দরবারে এত বড় কাজ পেয়েছেন। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজটা তো করতে হবে।

গালিব আবারও ভগ্নকণ্ঠে বলেন, বিবি আমাদের নসীবই এমন। আমাদের নসীবে সুখ নাই।

উমরাও বেগম দোপাট্টায় মুখ ঢাকলেন।

দুজনের সামনে কঠিন দিন ঘনিয়ে এলো। যক্ষ্মায় মারা গেলেন আরিফ। মারা গেলেন তাঁর স্ত্রীও।

স্তব্ধ হয়ে থাকলেন গালিব। উমরাও বেগমের মুখে কথা নেই। সারা দিন দুবাচ্চা সামলাতে ব্যস্ত। বাকিরের বয়স পাঁচ। হুসেনের দুই। এতিম বাচ্চাদের দায় তাঁরা নিলেন। লালকুয়ায় কালে সাহেবের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে তাঁরা বল্লিমাঁরোতে একটি বাড়ি ভাড়া করে উঠে এলেন। দুটি শিশু নিয়ে শুরু হলো নতুন জীবন। একদিন বাকির গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলো, নানা আমার আম্মা-আব্বা কোথায় চলে গেলেন?

ওই আকাশে।

ওই আকাশে কি ওঁদের বাড়ি আছে?

গালিব কথা বললেন না। বাকিরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বাকির বুকের

ভেতর থেকে মাথা তুলে বললো, আব্বা-আম্মা আমাদেরকে নিয়ে গেলেন না কেন? আমরা কি বেশি দুষ্টামি করতাম?

গালিব আকুল হয়ে কাঁদলেন। নিজেকে সামলাতে তাঁর অনেকক্ষণ সময় লাগলো। তিনি কবি আরিফের মধ্যে নিজের যৌবন দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। কি করে ভুলবেন আরিফকে?

বছরখানেকের মধ্যে তাঁর জীবনে বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটলো। ১৮৫৪— তিনি নিজের লেখার খাতায় বড় করে লিখলেন সালটি। এই বছরে প্রকাশিত হলো ইতিহাসের বই 'মিহর-ই-ইমরোজ'। লক্ষ্ণৌর দরবার থেকে তাঁর জন্য বার্ষিক অনুদান মঞ্জুর করা হয়েছে। বাদশাহর সভাকবি মহম্মদ ইব্রাহিম জওক মৃত্যুবরণ করেন। সভাকবি হিসেবে বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরের দরবারে অভিষিক্ত হলেন গালিব।

লালকেল্লার বাইরে দাঁড়িয়ে দিল্লির আকাশ দেখেন। ভাবেন, সূর্য, গ্রহরাজি, চন্দ্র, নক্ষত্র তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। তিনিই তো সেই কবি যাঁকে ছুঁয়ে থাকবে সূর্যের আলো, চাঁদনি রাত। তিনিই তো সেই কবি যাঁর মাথার ওপর নেমে আসবে আকাশ।

লালকেল্লা তুমি যদি একদিন হারিয়ে যাও ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে, থাকবে গালিব। থাকবে গালিবের গজল। সাক্ষী থাকো লালকেল্লা।

তিনি পালকিতে ওঠেন। দেখতে পান বেহারাদের উজ্জ্বল দৃষ্টি চকচক করছে। ওরা বুঝি এক অন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। তিনি ওদের দিকে তাকিয়ে বলেন, আমি সাম্রাজ্যের বাদশাহ নই, কবিতার বাদশাহ। আমাকে মনে রাখবে আমার এই শহর—আমার দিল্লি।

চলতে শুরু করে পালকি। তিনি দুচোখ মেলে তাকিয়ে থাকেন শহরের পথঘাটের দিকে।

AMARBOI.COM

ঘোড়ার খুরের শব্দ

গ্রীষ্মের যে কোনো একটি দিনের মতোই দিনটি শুরু হয়। ঝকঝকে আলো চারদিকে ছড়িয়ে আছে। যেন আলোর পানীয় শুষে নিয়ে শান্ত-স্নিগ্ধতায় শুয়ে আছে শহর। বাতাসে গ্রীষ্মের উত্তাপ। সবে দিনের শুরু বলে গ্রীষ্মের আগুনে-পোড়া গরম তখনও সহনীয়। কাকেরা কর্কশ ধ্বনি ছড়িয়ে শব্দের তরঙ্গ তোলেনি। প্রকৃতি জানে মানুষের এখনই ঘুম ভাঙবে।

তাই আড়িমুড়ি ভেঙে জাগছে শহর। কিন্তু রোদ যত বাড়তে থাকে দিনটি আর প্রতিদিনের গ্রীষ্মের দিন থাকে না। ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই লোকেরা শুনতে পায় শহরজুড়ে প্রবল ঘোড়ার খুরের ধ্বনি।

গালিব বিছানায় বসেই কান খাড়া করে কেন ঘোড়ার খুরের ধ্বনির এত মাতম তা বুঝতে চেষ্টা করেন। শব্দ চারদিক প্রকম্পিত করছে। তাঁকে দরবারে যেতে হবে। কালেক্টর তো দরবারে বসবে। তাঁর জরুরি কাজ আছে। গালিব বালতিতে রাখা পানি দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নেন। তারপর চিৎকার করে ডাকেন, বিবি, বিবি।

উমরাও বেগম সাড়া দেন না। গালিব রাগে দাঁত কিড়মিড় করে বলেন, তাকে কি মরণ ঘুমে পেয়েছে! নাকি অন্য কোথাও চলে গেছে? এই সংসারের পাট চুকিয়ে দিয়েছে? হায় আল্লাহ, মানুষের দিলে রহম দাও। স্ত্রীকে বুঝতে দাও যে একজন কবিকে যত্ন করা ঈশ্বর সাধনার মতো : কবিই তো মানুষের বুকের ভেতর প্রবেশ করতে পারে। তার উপলব্ধিকে অভিভূত করে। কবিই পারে মানুষকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে।

গালিব দেয়ালে ঝোলানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে চুল বিন্যস্ত করতে থাকেন। চিরুনির পরিবর্তে নিজের আঙুলগুলোকে তাঁর চুলের জন্য অনেক বেশি উপযোগী মনে করেন, তবে যতক্ষণ ঘরে থাকেন ততক্ষণ। বাইরে গেলে পরিপাটি করে চুল আঁচড়াতে হয়। তিনি দেখতে পান তাঁর মুখমণ্ডলে পানির ফোঁটা এখানে-ওখানে বিন্দুর মতো ফুটে আছে—ভুরুর কাছে, কিংবা চোখের পাতায়, নয়তো গালে, চিবুকে বা নাকের ডগায়। তিনি উৎফুল্ল হয়ে ভাবেন, তাঁকে বেশ সুদর্শন লাগছে। আজকের দিনটি তাঁর জন্য নিশ্চয়ই আনন্দদায়ক হবে। তিনি আবার বিবি, বিবি বলে ডাকেন, বুঝতে পারেন তাঁর ভীষণ খিদে পেয়েছে। কিন্তু এবারও উমরাও বেগমের সাড়াশব্দ নেই।

শুনতে পান দরজায় করাঘাত। বেশ জোরে। তিনি নিজেই দরজা খোলেন। সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর বন্ধু হাকিম আহসানউল্লা। তিনি গালিবের বন্ধু এবং বাদশাহর চিকিৎসক ও বিশ্বস্ত অনুচর।

গালিব বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করেন, আপনি?

আহসানউল্লা আতঙ্কিত। উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বলেন, বাদশাহ পাঠিয়েছেন আপনাকে খবর জানাতে।

খবর? কী খবর?

খবর খুব খারাপ। বাদশাহ একজন কবিকে নিয়ে শঙ্কিত। বাদশাহর কাছে

একজন কবির জীবন অনেক মূল্যবান।

আহ, খবরটা কী, তা আমাকে বলেন।

ঘোড়ার পিঠে চড়ে মিরাটের সৈন্যরা দিল্লিতে ঢুকে পড়েছে।

সৈনিকরা যমুনা নদী পার হলো কীভাবে?

ওরা নৌকা জোড়া লাগিয়ে সেতু বানিয়েছে। সেই সেতুর ওপর দিয়ে প্রবেশ করেছে শহরে।

নৌকা দিয়ে সেতু বানিয়েছে?

হ্যাঁ, দোস্ত। বাদশাহ তাঁর যে নিভৃত কক্ষে বসে যমুনা নদীর ওপর দিয়ে দৃষ্টি ছড়িয়ে তাকিয়ে থাকেন, যে নদী তার খুব প্রিয়, যে নদীর তরঙ্গ বাদশাহর কবিতায় কুলকুল ধ্বনি তোলে সেই—

আহ্ কী হয়েছে বলেন?

সৈনিকরা দিল্লি শহরে ঝড় তুলেছে। যাকে পাচ্ছে তাকে নিধন করছে। আমি যাই।

গালিব আহসানউল্লার হাত ধরে বলেন, এখন বের হবেন না। আপনি আমার বাড়িতে থাকেন।

না, থাকতে পারব না। বাদশাহকে জানাতে হবে যে কবির কাছে খবর পৌঁছে দিয়েছি। কবি সাবধানে থাকবেন। আপনি যে তার কত প্রিয় কবি আপনি তা জানেন না।

আমি জানি। আমি জানি বাহাদুর শাহ জাফর আমাকে কত ভালোবাসেন। তিনিও আমার একজন প্রিয় কবি। আমরা যখন কবিতার কথা বলি, তখন আমরা একাত্ম হয়ে যাই। কবিই পারে কবির সঙ্গে এভাবে একাত্ম হতে। হাকিম, বাদশাহ সুস্থ আছেন তো?

আছেন। এখন পর্যন্ত তিনি সুস্থই আছেন।

দ্রুতপায়ে বেরিয়ে যান হাকিম আহসানউল্লা। দরজার সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন গালিব। শহরের হট্টগোল, প্রবল উল্লাস, হত্যাযজ্ঞের তীব্রভেদী আর্তনাদ দু'কান ভরে বাজে। গালিব দরজা বন্ধ করে দেন। ফিরে আসেন নিজের লেখার টেবিলে। দু'কনুই টেবিলের ওপর রেখে মাথা চেপে ধরে বসে থাকেন চেয়ারে।

প্রবল উত্তেজনা নিয়ে ঘরে ঢোকেন উমরাও বেগম। আতঙ্কে চোখ বড় হয়ে গেছে। চিৎকার করে বলেন, শহরে এসব কী হচ্ছে?

গালিব ধীরেসুস্থে মাথা তোলেন। স্ত্রীর দিকে তাকান। দেখেন একজন মহিলা কতটা আতঙ্কিত হলে তিনি মুহূর্তে অচেনা হয়ে যান। তাঁর দৃষ্টি বদলে

AMARBOI.COM

যায়, কণ্ঠস্বর একরকম থাকে না। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো থরথর করে কাঁপে, যেন ওগুলোর জোড়া খুলে যাওয়ার সময় হয়েছে। উমরাও বেগম আবার চিৎকার করে বলেন, শহরে এসব কী হচ্ছে? এমন হত্যা-আগুন—

সেপাইরা বিদ্রোহ করেছে বিবি।

বিদ্রোহ?

হ্যাঁ, মহাবিদ্রোহ।

কে ওদের নিরস্ত্র করবে?

ব্রিটিশ প্রভুরা।

উমরাও বেগম দু'হাত ওপরে তুলে বলেন, আল্লাহ মেহেরবান।

গালিব বলেন, আমি তো মদ পান করি, কিন্তু শূকরের মাংস খাই না।

এটা আমার চেয়ে বেশি আর কে জানে। কিন্তু তাহলে আপনি কেমন মুসলমান?

অর্ধেক। অর্ধেক মুসলমান।

হায় আল্লাহ, এমন কথা একজন খাঁটি মুসলমান বলতে পারে না।

আমি তো নিজেকে খাঁটি মুসলমান দাবি করি না বিবি। আমার পাপ আমার কবিতা।

উমরাও বেগম মুখ ঝামটা দিয়ে চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই গালিব তাঁর হাত চেপে ধরে বলতে থাকেন—

'হৃদয়ের আগুন দিয়ে
আমি কবিতার আলো জ্বালিয়েছি
সেই শব্দ চয়নে কেউ একটি আঙুলও
ছোঁয়াতে পারবে না।'

খুব সুন্দর। উমরাও বেগম মৃদু কণ্ঠে বলেন।

তোমার ভালো লেগেছে?

উমরাও বেগম ঘাড় নাড়িয়ে বলেন, হ্যাঁ খুব ভালো লেগেছে। কবিতা নিয়ে আপনার খুব গর্ব, না?

হ্যাঁ, খুব গর্ব, খুব। এই গালিব, এই মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব একজনই জন্মায় বিবি।

উমরাও বেগম মৃদু ধমক দিয়ে বলেন, এভাবে বলতে হয় না। আল্লাহ নাখোশ হবেন।

গালিব বলেন, শহরের রাস্তায় যখন হত্যাযজ্ঞ তখন আমি গলা ফাটিয়ে কবিতা পড়তে পারি। আমিই কবি। কবিতার মানুষ। তুমি আমাকে আজ

সকালে কী খেতে দিবে বিবি? মোগলাই পরোটা তো?

আপনি খেতে চাইলে তাই দেবো। যাচ্ছি তৈরি করতে। কিন্তু দরজা খুলে বের হবেন না। প্রয়োজনে কাল্লুকে ডাকবেন।

পাগল। আমি কবিকে মরতে দিতে পারি না। কবি হত্যা আর আগুনের অপব্যবহার পছন্দ করে না।

উমরাও বেগম বেরিয়ে যান।

গালিব জানালা দিয়ে তাকান। সেপাইরা যাকে পাচ্ছে তাকেই নিধন করছে। বাড়ি বাড়ি আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। নৌকার বানানো সেতু পার হয়ে অশ্বারোহী দল দরিয়াগঞ্জের কাছে রাজঘাটের পথে শহরে ঢুকেছে। সেপাইদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে দিল্লিবাসীর অনেকে এবং বাদশাহর সেপাইদের একটি দল।

দেয়াল টপকে গালিবের বাড়িতে ঢোকে শাহজাদা চিশতী। দরবারে চাকরি করে। কোথা থেকে দৌড়ে এসেছে কে জানে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, চমন লালু ডাক্তার খুন হয়েছেন। পানি খাব ওস্তাদ।

গালিব চিশতীকে পানি দেন। সে পরপর দু'গ্লাস পানি খায়। পানি খেয়ে দম নিয়ে বলে, ডাক্তার চমন লালু যে খ্রিস্টান হয়েছিল সেজন্য তিনিই প্রথম হত্যার বলি হলেন। সেপাইরা ফিরিঙ্গি ও ব্রিটিশ নিধনে মেতেছে।

বাদশাহ কেমন আছেন চিশতী?

সুস্থ আছেন।

গালিব গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, ঘোড়ায় চড়ে আসা সেপাইরা লালকেল্লার কাছে যায়নি?

চিশতী অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলেন, গিয়েছিল, গিয়েছিল। কেল্লায় প্রবেশ করার জন্য ওরা বাদশাহর কাছে অনুমতি চেয়েছিল।

তারপর? বাদশাহ কী করলেন?

আমাকে দম ফেলতে দিন ওস্তাদ। আমি আবার পানি খাব। আমার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

গালিব ঘরের কোনায় রাখা সোরাই থেকে গ্লাসে পানি ঢেলে চিশতীকে দেন। কিছুক্ষণ পায়চারি করেন। তারপর চিশতীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেন, বাদশাহ কী করেছেন আমি তা জানি।

চিশতী পানির গ্লাসটা টেবিলে রাখে। জোরে জোরে শ্বাস টেনে দম নেয়। তারপর মৃদুস্বরে বলে, বাদশাহকে আপনার চাইতে বেশি আর কে চেনে ওস্তাদ? আপনি তাঁর চিন্তার নক্ষত্র চেনেন। আপনি তার বুকের জমিন চেনেন।

হ্যাঁ, চিনি চিনি। তাঁর সবটুকু আমি চিনি। ব্রিটিশরা কীভাবে তাঁর ক্ষমতা

হরণ করেছে এটাও আমি দিব্য চোখে দেখতে পাই। আমি জানি বাদশাহ ওদেরকে লালকেল্লায় ঢোকার অনুমতি দেননি। আমি জানি, সেপাইদের বিদ্রোহে বাদশাহ বিভ্রান্ত হবেন না। আমি ধরে নিতে পারি যে তিনি প্রাসাদ রক্ষীবাহিনীর ব্রিটিশ সেনাপতিকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ওই সেনাপতি ডগলাস ঠিকই ছুটে গেছে তার কাছে।

চিশতী গালিবের দিকে তাকিয়ে থাকে। মাথা নাড়ে। মুখে কিছু বলে না। ভয়ে-আতঙ্কে ওর শরীরের কাঁপুনি তখনও থামেনি। গালিব ওকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে বলেন, তুমি কি আর পানি খাবে?

চিশতী মাথা নেড়ে বলেন, খাব। আমার মনে হচ্ছে যমুনা নদী পুরোটাই এখন আমি খেতে পারব।

ও দু'হাতে মুখ ঢাকতে ঢাকতে বলে, উহ্ কী বীভৎস দৃশ্য! আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না। মৃত্যুই আমার কাম্য।

আহ্, চুপ কর। তোমার কথা শুনতে আমার একটুও ভালো লাগছে না। তুমি তো জান আমি কবি। কবির চোখের সামনে এখন জেগে উঠছে জামা মসজিদের অসাধারণ সুন্দর মিনারগুলো। তুমি তো জান উত্তর ভারতের মসজিদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর দিল্লির জামা মসজিদ। জ্যোৎস্নার আলোয় ওই মসজিদের মিনারের দিকে তাকালে আমার মনে হাজার হাজার গজলের পঙ্‌ক্তি অনবরত পাখা মেলে উড়ে আসত। আমার জীবন ধন্য হয়ে যেত চিশতী। দিল্লি শহরের সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। এই শহরকে ঘিরে গেঁথে তোলা লাল প্রাচীরটি কী চমৎকার! আহা, এই শহরে বাস করে আমার কবিজীবন সার্থক। অসাধারণ সুন্দর লাল প্রাচীরের গায়ে জ্যোৎস্নার আলোছায়া অপরূপ দৃশ্য ফুটিয়ে তুলত। এমন দৃশ্য দেখলে আমার মনে হয় আমি বুঝি শরাব পান করছি। জ্যোৎস্নার শরাব, কবিরাই শুধু এমন শরাব পান করতে পারে। আর কেউ না, আর কেউ না। যমুনা নদীর অপর পাড়ে দাঁড়িয়ে আমি অনেক দিন দেখেছি আকাশের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে থাকা মিনারগুলোর ছায়াচিত্র। নদীর সঙ্গে ছায়া মিশে শহরকে অন্য দৃশ্য এনে দেয়। কবি সেই দৃশ্যের দিকে দু'চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। আহ্, এই শহরের আমিই সেই কবি!

ওস্তাদ, বাইরে এখন হত্যার তাণ্ডব উৎসব চলছে। আপনার প্রিয় শহর, আর জ্যোৎস্না রাতের শহর নেই।

খামোশ, বাজে কথা বলবে না। আমি চোখ বুজলেই আমার প্রিয় শহরের সৌন্দর্য দেখতে পাই। যমুনায় নৌকার ওপর ভেসে থেকে আমি শহরকে দেখি।

কত বৈচিত্র্য, কত মায়া, কত রূপ!

কথা বলতে বলতে গালিবের দৃষ্টি উদাস হয়ে যায়। ছোট কুঠুরিতে পায়চারি করতে করতে হাত ওঠান, হাত নামান। হাতের আঙুলগুলো চুলে ঢোকান। এলোমেলো করে ফেলেন পুরো মাথা। চুলের গুচ্ছ লুটিয়ে পড়ে কপালে। স্নিগ্ধ হাসি লেগে থাকে ঠোঁটে। যেন কোনো দেবদূত, এইমাত্র স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। চিশতী মুগ্ধস্বরে বলে, আপনাকে খুব সুন্দর লাগছে ওস্তাদ।

শরাব পান করার সময় আমাকে আরও অনেক বেশি সুন্দর লাগে। তখন আমি ঈশ্বরের সবচেয়ে প্রিয় সন্তান হই।

ওস্তাদ, বাইরে হত্যাকারীদের হাস্য উল্লাস শোনা যাচ্ছে। ওস্তাদ—

চুপ কর। খারাপ কথা বলবে না। আমি জানি, এই মুহূর্তে বাহাদুর শাহ জাফরও কবিতা লিখছেন। যদিও এখন তিনি খুব খারাপ অবস্থায় আছেন। ব্রিটিশরা তাকে জব্দ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। আমার প্রিয় শহরের অদূরে কাশ্মীরি গেটের কাছে ইংরেজ রেসিডেন্টের বিশাল আবাস।

এটুকু বলেই থেমে যান গালিব। চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন। ঘুরতে ঘুরতে আবৃত্তি করেন নিজের কবিতা—

'হে ঈশ্বর
আর কতদিনের এই অপেক্ষা
আর কতদিন
ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এইসব আকাঙ্ক্ষা
প্রার্থনার সময়
আমার বাহু দুটিকে আরও উচ্চতা দাও।'

মগ্নতার ভেতরে উচ্চারিত তাঁর কণ্ঠস্বরের মাধুর্য ছড়িয়ে যায় ঘরের ভেতরে। চিশতী মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থেকে বলে, ওস্তাদ আপনি কি নগরবাসীর কান্না শুনতে পাচ্ছেন?

পাচ্ছি। পাচ্ছি। আর্তনাদ ওঠে গালিবের কণ্ঠে। বলেন, কান্না তো আমার বুকের ভেতরে— আমি আমার কবিতায় কান্নার ধ্বনির বিস্তার দেখছি। চিশতী তুমি আমার সঙ্গে বলো :

'শ্রদ্ধেয় মানুষের ক্রোধোন্মত্ততা নয়
আবার দ্বিচারী বন্ধুদের মতোও নয়—
আত্মকেন্দ্রিকতাও নয়—
কিন্তু সকলের সঙ্গেই নেচে ওঠো ॥

হতাশ হয়ো না
জ্বলন্ত আগুনে হতাশা খুঁজো না
বা ফুটন্ত ফুলেও খুঁজো না আনন্দ
সিমুনের পাড়ে দাঁড়িয়ে
বা মৃদুমন্দ বাতাসে
উন্মাদের মতো শুধু নেচে ॥'

চিশতী কবিতা বলতে বলতে বেরিয়ে যেতে চায়। দরজার কাছে যেতেই গালিব ওর হাত টেনে ধরে বলেন, যেও না। এই উন্মত্ত শহর এখন বিপজ্জনক।

না, আমি যাব। গালিবের কবিতা বলতে বলতে চলে যাব।

যদি তুমি সন্ত্রাসের মুখোমুখি হও?

হতেই পারি। এই আতঙ্কের শহরে এখন আমি আমার নিজের কথাই কেবল ভাবতে পারছি না।

আহ্, চিশতী পরিস্থিতি বুঝতে হবে।

যারা বিদ্রোহ করেছে সেই সেপাইরা তো পরিস্থিতি বুঝেই শহরের রাস্তায় নেমেছে। আমরা জানি না, ওরা ব্রিটিশ সেনাদের সঙ্গে টিকে থাকতে পারবে কি-না।

গালিব রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলেন, তাতে কিছু এসে যায় না। ওদের বিদ্রোহই সত্য। ওদের বিদ্রোহ আমাদেরকে বুঝতে হবে।

আমি যাই। চিশতী দ্রুতপায়ে চলে যেতে থাকে বিল্লিমাঁরো গলির বাড়ি থেকে। ভগ্নহৃদয় নিয়ে গালিব ফিরে আসেন নিজের টেবিলে। চেয়ার টেনে বসলে কলম, কাগজ, কালির দোয়াত, ছড়িয়ে থাকা কয়েকটি বই তাঁর মনোযোগ কাড়তে পারে না। বিমর্ষ হয়ে বসেই থাকেন। টের পান কাবাবের ঘ্রাণ। খিদে চনমনিয়ে ওঠে। সকালের নাশতা খেতে অনেক দেরি হয়ে গেল। বুঝতে পারেন আজ তাঁর বিবির মন ভালো নেই।

কাল্লু মিয়া দস্তরখানায় নাশতার রেকাবি রাখে। তিনি কাবাবের টুকরো মুখে পোরেন, সঙ্গে রুটির টুকরোও। মুখভর্তি খাবার নিয়ে বলেন, এত দেরি করে খাবার দিলে যে?

শহরের পরিস্থিতি ভালো না তো হুজুর।

শহরের পরিস্থিতির সাথে তোমরা আমার পেটের সুতো বেঁধে দিয়েছো?

তাই তো করতে হবে। এমন অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে তো খাওয়াই জুটবে না। আমাদের যে কী হবে আল্লাহই জানেন। আপনি রাস্তায়

বের হবেন না হুজুর।

হুম, গালিব চোখ বড় করে ওর দিকে তাকিয়ে শব্দ করেন। তারপর মনোযোগ দিয়ে খেতে থাকেন। বুঝতে পারেন চিশতীর সঙ্গে কথা বলার সময় খিদের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। এখন খিদে শুধু পেটে নেই, মাথায়ও উঠেছে। কাল্লু সোরাই থেকে পানি ঢেলে গ্লাসটি গালিবের হাতের কাছে রাখে।

বাড়ির কেউ তো আজকে রাস্তায় নামেনি?

না, হুজুর। সবাই আতঙ্কে জড়সড় হয়ে বসে আছে। বাড়ির বিড়ালটা পর্যন্ত। কবুতরগুলোও।

ও আচ্ছা। তোমার মাইজি কী করছেন?

আপনার জন্য নাশতা বানিয়ে আবার গিয়ে শুয়ে পড়েছেন। আমাদের ভাগ্য ভালো যে আমাদের বিল্লিমাঁরো গলিতে সেপাইরা ঢোকেনি।

তুমি এখন যাও।

কাল্লু চলে যায়। তিনি ধীরেসুস্থে কাবাব-রুটি শেষ করেন। নাশপাতির শরবত খান। হালুয়া যা দিয়েছে সেটিও শেষ করে ফেলেন। সবাই জানে তিনি খেতে ভালোবাসেন। তিনি মনে করেন, কবিতা লেখার পর খাওয়াটাই সবচেয়ে আনন্দদায়ক কাজ। এই আনন্দ অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে ভাগাভাগি করা যায় না।

খাওয়া শেষ করে চুপ করে বসে থাকেন। চেয়ারে হেলিয়ে দেন মাথা। ঘুলঘুলি দিয়ে আলো আসছে, সঙ্গে রোদের ছায়া। বাইরে কাক ডাকছে তীব্র শব্দে। তিনি কাকের ডাক উপভোগ করেন। ভাবেন, কর্কশ ধ্বনিও কখনও প্রবল মধুর। কানের ভেতর দিয়ে বুক পর্যন্ত পৌঁছায়। তখন তিনি ভাবতে থাকেন এই সময়কে নিয়ে একটি বই লিখবেন— পদ্যে নয়, গদ্যে লিখবেন। ভাবতে গিয়ে উত্তেজিত হন। স্মৃতিকথা তিনি লিখেননি। এখনই লেখার সময়। এখনই একটি বিশেষ সময় বয়ে যাচ্ছে তাঁর জীবনে। ষাট বছর বয়স তো হয়ে গেল আর কতদিনইবা বাঁচবেন? মানুষের দিন ফুরিয়ে যেতে খুব সময় লাগে না। গালিব উঁচু গলায় কাল্লুকে ডাকেন। ও এসে রেকাবি-গ্লাস নিয়ে চলে গেলে তাঁর বুকের ভেতরে জীবিকার বিষয়টি খামচে থাকে। ভাবেন, এই বিদ্রোহে তিনি কাকে সমর্থন করবেন? তবে তাঁর ভাতা পাওয়ার প্রসঙ্গে তাঁকে ভেবেচিন্তে এগোতে হবে। তিনি তো ইচ্ছে করলে যা খুশি তা করতে পারেন না। তাহলে রুটি খাবেন কী করে?

নানান কিছু ভাবনায় তিনি উদভ্রান্ত বোধ করেন। আবার পায়চারি করতে থাকেন। কখনও বিছানায় শুয়ে থাকেন। কখনও জানালার কাছে দাঁড়িয়ে কান

পেতে থাকেন। বিল্লিমাঁরো ছাড়িয়ে কতদূর থেকে ভেসে আসছে শব্দ? নাকি শব্দ নিজের বুকের ভেতর গুড়গুড় করছে? তাঁর অস্থিরতা তাঁকে ম্রিয়মাণ করে ফেলে। ভাবেন, বিদ্রোহের মেয়াদ কতদিন হবে? কোন পক্ষ জিতবে? কোন পক্ষ ক্ষমতায় এলে তাঁর প্রশস্তি গাইতে হবে? তিনি নিজেকে স্থির করেন। শান্ত হওয়ার চেষ্টা করেন। বাদশাহর কথা ভাবেন এবং বুঝে নেন যতদিন বিদ্রোহ না থামবে, ততদিন বাদশাহকে বন্দিজীবন কাটাতে হবে।

একদিন গেল। দু'দিন গেল।

গালিব ঠিক করলেন এই রাস্তার ধারে যারা থাকেন তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। বিদ্রোহীদের গতিবিধির খবর নিতে পারেন। তাঁর রাস্তায় থাকেন তাঁরই প্রতিবেশী মেহমুদ খান, মুর্তুজা খান, গোলামুল্লা খান। তাঁরা সবাই পাতিয়ালার দরবারের সঙ্গে যুক্ত। পাতিয়ালার রাজার বৃত্তি ভোগ করেন। বেশ স্বচ্ছন্দেই জীবন কাটান তারা। গালিব নিজ বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবলেন, সৌভাগ্যক্রমে তিনি এই রাস্তার অধিবাসী। মহল্লাটি পাতিয়ালার মহারাজার অধীন। মহারাজা প্রথম থেকেই নিজেকে ব্রিটিশদের সমতুল্য মনে করতেন। তাঁর দাপটই অন্যরকম। সবসময় বলেন, আমার দেশ। আমিই রাজা। আমিই সিদ্ধান্ত নেব। আমার দেশের বিখ্যাত হাকিমদের গায়ে ব্রিটিশরা হাত দিতে পারবে না। পাতিয়ালার দরবার একটি অবস্থান নিয়েছে, এ কথা ভেবেই গালিব নিজের বাড়ির দরজা বন্ধ করে রাস্তায় নামেন। গা ছমছম করে। রক্তের বোটকা গন্ধ আসছে চারদিক থেকে। গালিব চারদিকে তাকান। বাড়িগুলোর দরজা-জানালা বন্ধ। গলিটি নিস্তব্ধ। প্রাণহীন ধ্বংসস্তূপ ম্রিয়মাণ করে রেখেছে শহরকে। হায় আমার দিল্লি, আমার প্রাণ, আমার কবিতা!

মুখোমুখি হন ফাইয়াজের। ও হন্তদন্ত হয়ে ফিরছিল অন্য কোথাও থেকে। গালিবকে দেখে থমকে দাঁড়ায়।

চাচা কোথায় যাচ্ছেন?

এই তো বাবা মেহমুদ খানের বাড়িতে। যাচ্ছি শহরের খোঁজ নিতে।

শহর তো শহর নেই চাচা। শহরটা দোজখ হয়ে গেছে। আপনি কিন্তু বেশিদূর যাবেন না।

না, বেশিদূরে যাব না। তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

ফুপুআম্মার বাড়িতে।

কথা বলে শেষ করার আগেই হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে ফাইয়াজ। গালিব ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, বুঝেছি কিছু একটা ঘটেছে তোমার ফুপুর বাড়িতে।

নেই নেই, কেউ বেঁচে নেই। ফুফাতো বোনটার লাশ দেখিনি। ওকে বোধহয় ধরে নিয়ে গেছে। ওহ্ আল্লাহ—

ফাইয়াজ দ্রুত পায়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়। গালিব কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ওর চলে যাওয়া দেখেন। কেমন অদ্ভুত লাগে ওর চলে যাওয়া দেখতে। তারপর নিজে হাঁটতে শুরু করেন। মেহমুদ খানের বাড়িতে টুকটুক কড়া নাড়েন। ভেতর থেকে ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, কে?

গালিব সপ্রতিভ কণ্ঠে বলেন, মির্জা আসাদুল্লাহ খান।

ওহ কবি এসেছেন, আসুন।

গালিব ঘরে ঢুকলে ভেতরের ঘর থেকে মেহমুদ খান মুখ বাড়ান। দু'পা এগিয়ে এসে বলেন, ভয়ে-আতঙ্কে মুষড়ে থাকি বুঝলেন। দরজা খুলতেও ভয় পাই।

আপনি কি বাদশাহর কিছু জানেন? বাদশাহর খবর জানতে পারিনি কিছু। সিপাহিরা তাঁর সঙ্গে কেমন আচরণ করছে জানি না।

আমি খানিকটা শুনেছি।

গালিব উদগ্রীব কণ্ঠে বলেন, কী শুনেছেন? খারাপ কিছু? বাদশাহ বেঁচে আছেন তো?

মেহমুদ খান ভীতসন্ত্রস্ত কণ্ঠে বলেন, সিপাহিরা ঘোড়ায় চাবুক দাবড়ে লালকেল্লার ভেতরে ঢুকে পড়ে। দেওয়ানি খাসের পাশে যে বাগানটি আছে সেখানে উত্তেজিত যুবকরা জমায়েত হয়। তারা বাদশাহকে বলে, বাদশাহ যেন তাদের দোয়া করেন। যেন তারা এই বিদ্রোহে সফলকাম হতে পারে।

মেহমুদ খান থামলে গালিব আবার উদগ্রীব কণ্ঠে বলেন, বাদশাহ কী বললেন? আমি ধৈর্য রাখতে পারছি না, আমাকে সব বলুন।

বাদশাহ সিপাহিদের বিদ্রোহের ব্যাপারে একদম আগ্রহী ছিলেন না।

বুঝেছি, তারা তাঁর ওপর খড়গ উঁচিয়ে কথা বলেছে। বাদশাহ তাদের আচরণে দুঃখ পেয়েছেন।

কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত নিজের সিদ্ধান্তে স্থির থাকেননি। কারণ তাঁর সামনে আর কোনো রাস্তা খোলা ছিল না।

ঠিকই ধরেছেন। তিনি বিদ্রোহীদের সমর্থন জানিয়েছেন। আর তাই দিল্লিতে বিদ্রোহের পতাকা উড়ল। বাদশাহ সিপাহিদের হাতের পুতুল মাত্র। সিপাহিদের ঘোড়াগুলো বাগানের ঘাস, গাছপাতা চিবিয়ে ছিঁড়েছে। আমি আমার দিব্যচোখে এর সবকিছুই দেখতে পাচ্ছি। যেন বুকের ভেতরের দাবদাহে পুড়ে যাচ্ছে আমার ভেতরটা। আর কোনোদিন বুঝি বাদশাহর দরবারে

AMARBOI.COM

মুশায়রার আসর বসবে না।

গালিব দু'হাতে নিজের চুল টেনে ধরলে মেহমুদ খান মৃদুকণ্ঠে বলেন, শান্ত হন মির্জা।

শান্ত যে হতে পারছি না। লালকেল্লার যে দরবার ছিল আমাদের প্রাণের জায়গা, জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত সংস্কৃতির আকাশ, সে দরবারে এখন অনবরত ধ্বনিত হবে ঘোড়ার খুরের শব্দ আর সিপাহিদের কর্কশ কণ্ঠ। আমি দেখতে পাচ্ছি সামনে মুশায়রার জন্য অন্ধকার। অন্ধকারে কবিতার জন্য রাস্তা খুঁজতে হবে মির্জা গালিবকে।

আহ্, আপনি শান্ত হন মির্জা।

হ্যাঁ, আমাকে তো শান্ত হতেই হবে। আমি এবং আমাদের মতো অভিজাত শ্রেণীর মানুষ এতদিন দু'পক্ষের প্রতি অনুগত থেকে জীবন কাটিয়েছি। আমরা জানতাম ব্রিটিশরা ছিল শাসক আর মোগল সম্রাট ছিলেন ভক্তি-বন্দনার মূর্তি। কিন্তু এই মহাবিদ্রোহ ঘোড়ার পায়ে দলে ফেলেছে সব আবছা ছায়া। এখন আমাদের সামনে আর কোনো অস্পষ্টতা নেই মেহমুদ খান।

ঠিকই বলেছেন, আমাদের এখন পক্ষ নিতে হবে।

গালিব দ্রুত কণ্ঠে বলেন, এখন আমাদের হয় ব্রিটিশদের সমর্থন দিতে হবে, নয় তো বাদশাহকে। এখন দু'পক্ষে তাল মেলানো যাবে না।

আপনাকে শরবত দিতে বলি মির্জা?

হ্যাঁ, আমি এক গ্লাস শরবত খাব। খুব পিপাসা পেয়েছে। আর এবারের গ্রীষ্ম একদম অন্যরকম। কী ভীষণ গরম পড়েছে।

মেহমুদ খান ভেতরে গেলে গালিব দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে শরীর ছেড়ে দেন। যেন কতকাল ধরে হাঁটতে হাঁটতে তিনি ভীষণ ক্লান্ত। সামনের দিনগুলোতে তিনি কতটা পথ হাঁটতে পারবেন চিন্তা করার জন্য চোখ বুঁজে আসে তাঁর। দিল্লিতে বিদ্রোহীদের পতাকা উড়েছে, গালিব মাথা ঝাঁকিয়ে সোজা হয়ে বসেন। বাদশাহর মুখ স্মরণ করেন। কবি বাদশাহ তাঁকে ওস্তাদ বলে মানতেন। কয়েক দশক ধরে গড়ে উঠেছে এই সম্পর্ক। কখনও সম্পর্কে টানাপোড়েন চলেছে। আবার সেটা কেটে গেছে। কিন্তু কখনও সম্পর্কের সূত্র ছিন্ন হয়নি। বাদশাহর ছেলেও ছিল তাঁর সাগরেদ। বাদশাহর মুশায়রার আসরে যোগ দিতে প্রায় প্রতিদিনই তিনি হাজির হতেন সেখানে। তাঁর কাছে লালকেল্লা ছিল কবিতার কেন্দ্রবিন্দু। এই কেল্লা কিলাই-মোলাই নামে খ্যাত ছিল। কী ভীষণ প্রাণের টানের জায়গা। যদিও তিনি জানতেন ক্ষয়ে যাচ্ছে মোগল সাম্রাজ্য— ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে মোগল শাসন। সামনে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে

আছে ব্রিটিশরা। কত বছর ধরে দরবারে যাতায়াত—সাক্ষী হয়ে গেছেন ক্ষয়ে যাওয়া মোগল শাসনের নিয়তির। বুক চেপে আসে। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তিনি আবার দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দেন। কিলাই-মোলাই তো তাঁর জীবনের সবটুকু জুড়ে আছে! কখনও মুশায়রায় অংশগ্রহণ, কখনও ভাতার টাকা নিতে আসা। একটি মনের ক্ষুধা মিটিয়েছে, অন্যটি শরীরের। দুটোই তার বেঁচে থাকার জন্য সমান। দুটোকেই এক পাল্লায় সমানভাবে মাপা যায়।

গালিবের জন্য শরবত আর হালুয়া আসে। নিয়ে আসে মেহমুদ খানের পরিচারক। প্রথমেই তৃষ্ণার্ত বুক ঠাণ্ডা করার জন্য এক চুমুকে শরবত শেষ করেন। তারপর হালুয়ার বাটি টেনে নিয়ে বলেন, তোমার প্রভু কোথায়? আমার বন্ধু মেহমুদ খান?

তিনি একটি কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছেন।

ও, তাহলে আমাকে একাই হালুয়ার বাটি শেষ করতে হবে?

জ্বী হ্যাঁ, জনাব।

হালুয়া খেয়ে আমাকে চলে যেতে হবে?

জ্বী হ্যাঁ, জনাব। আমার মুনিব আমাকে তেমনই বলেছেন।

তিনি আর কী বলেছেন?

বলেছেন যে, আপনার সঙ্গে যেটুকু কথা বলার দরকার তিনি তা বলে শেষ করেছেন।

আবার আসতে বলেছেন কি?

সে আপনার মেহেরবানি। আপনার যখন খুশি তখনই আসতে বলেছেন।

গালিব সানন্দে হালুয়া খেয়ে শেষ করেন। ছেলেটির দিকে তাকিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করেন, তোমার নাম কী?

জায়েদ। পুরো নাম শেখ মোহাম্মদ জায়েদ।

তুমি গজল শুনতে ভালোবাস?

হ্যাঁ, খুব ভালোবাসি। আপনি আমাকে একদিন কিলাই-মোলাইয়ে নিয়ে যাবেন?

ওরে বাব্বা, বাদশাহর দরবারে! তোমার তো সাধের সীমানা নেই।

আমি বাদশাহকে দেখতে চাই।

বাদশাহর সামনে কেউ অকারণে বসে থাকলে তিনি খুব রেগে যান।

আমি তো বসে থাকব না। আমি দেখেই চলে আসব। শুধু এক নজর।

কেন তাঁকে দেখতে চাও?

শুনেছি সিপাহিরা বাদশাহকে হিন্দুস্তানের সম্রাট বানিয়েছেন।

AMARBOI.COM

হ্যাঁ, তা ঠিক। আচ্ছা যাই।

আপনি যে আমাকে কিছু বললেন না?

আরেকদিন বলব। সময় ভালো হোক। এখন তো খুব খারাপ সময় যাচ্ছে।

এখন তো আমাদের সময়। আমাদের মানুষই সম্রাট। ওই লালমুখো ইংরেজ কুত্তাগুলোকে আমি দেখতে পারি না।

আহ্, চুপ কর। এভাবে কথা বলতে হয় না।

সিপাহিরা ওদের কেটে টুকরো করছে খুব ভালো করছে। আমি খুব খুশি।

গালিব ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দ্রুতপায়ে বাড়ি ছাড়েন। রাস্তায় নেমে ভাবেন, ছেলেটির বয়স কত হবে? আঠারো কি উনিশ? তাই হবে। তিনি খানিকটা ভীত হয়ে পড়েন। নিজের বৃত্তির কথা ভেবে চুপসে যান। বৃত্তির টাকা কোনো কারণে বন্ধ হলে তাঁকে ভীষণ কঠিন জীবনযাপন করতে হবে। বউ, নাতিসহ কয়েকজন কাজের লোক—বড় একটা সংসার চালাতে হয় তাঁকে। দ্রুতপায়ে হাঁটতে থাকেন তিনি। বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েন। বাড়িটা পুরনো হয়ে গেছে। সংস্কার প্রয়োজন। সংস্কার! শব্দটা মনে হতেই বুকে তোলপাড় করে ওঠে। মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস তো তাঁর জন্মের পর থেকেই অন্যরকম হতে থাকে। কমে যায় সীমানার আকার, অর্থ, বিত্ত, প্রতিপত্তি, জৌলুশের চেহারায় ক্ষয় ধরে। এ ইতিহাস তো কতভাবেই জানা হয়েছে তাঁর। তিনি দরজায় কড়া নাড়েন। অবসন্নের মতো ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়েন। মনে হয় কত পথ হেঁটে এসে তিনি এখন ভীষণ ক্লান্ত। খুদাবক্স এক গ্লাস পানি দিয়ে বলে, হুজুর খান। আপনার মুখ শুকিয়ে গেছে। তিনি উঠে গ্লাসের পানি শেষ করে আবার শুয়ে পড়েন। অবসাদ তাঁকে পেয়ে বসেছে; কিন্তু মানসিক বোধ খুব সক্রিয়।

হায় খোদা, বলে তিনি বিছানায় উঠে বসেন। চারদিকে তাকালে দেখতে পান খুদাবক্স ঘরের কোণে চুপচাপ বসে আছে। তাঁকে উঠতে দেখে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, কিছু লাগবে হুজুর?

হ্যাঁ, লাগবে।

পানি দেব? শরবত? না—

আস্তে আস্তে। কবির সঙ্গে এত তড়বড়িয়ে কথা বলতে হয় না। আচ্ছা খুদাবক্স, তোমার কি বাদশাহকে দেখতে ইচ্ছে হয়?

না হুজুর না, একদম দেখতে ইচ্ছে হয় না।

গালিব বিস্মিত কণ্ঠে বলেন, ইচ্ছে হয় না কেন?

গরিবের আবার বাদশাহ কী, শাহানশাহ কী? গরিব তো গরিবই।

গালিব ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসেন। ভাবেন, খুদাবক্স তো ঠিকই বলেছে। নাকি ভুল?

হুজুর আর একটা কথা। খুদাবক্স ইতস্তত করে বলে।

বলো, কী কথা।

গরিবের ওপর জুলুম করেই তো বাদশাহর খানদানি গড়ে ওঠে হুজুর। বাদশাহর এত জৌলুশ কোথা থেকে আসে? সব এই গরিব, এই গরিবরা দেয়।

খামোশ খুদাবক্স। তুমি যাও এখান থেকে।

ঘরের কোণায় বসি?

না, এখানেও বসবে না। বের হয়ে যাও।

ছেলেটি চলে যেতেই তাঁর মাথা দপদপ করে। বাদশাহর জৌলুশ থেকেই তো তাঁর বৃত্তির টাকা আসে। এত ধন-দৌলত-বিত্ত না থাকলে দরবারের রাজকবির পেনশন কীভাবে হতো? এ টাকা দিয়েই তো ওই গরিব খুদাবক্সও দিন গুজরান করে। তাহলে তো গরিবের টাকা গরিবের কাছেও ফিরে আসে। ওহ গালিব, গালিব—

গালিব খাটের ওপর বসে জোরে জোরে পা দোলাতে থাকেন। বাদশাহ এখন লালকেল্লার অলিন্দে বসে জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া যমুনা নদীর পানিতে জামা মসজিদের মিনারের ছবি দেখবেন। আর কাঠ-কয়লা দিয়ে দেয়ালের গায়ে লিখবেন কবিতা। তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তি দেয়ালের গায়ে চিত্রকলার মতো ফুটে থাকবে। গালিব, আপনাকে ভালোবাসে সম্রাট। গালিব বিশ্বের তাবৎ কবিকে ভালোবাসে।

বিছানা থেকে নেমে তিনি টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ান। অস্থিরতা পেয়ে বসে তাঁকে। দিল্লির মতো বুকের ভেতরটা ভীষণ অশান্ত। শৈশব থেকে এ অশান্ত হৃদয় নিয়ে বড় হয়েছেন। খুঁজেছেন কত কিছু, পাননি কত কিছু, পেয়েছেন যেটুকু সেটুকু দিয়ে মন ভরেনি। আনন্দ করার জায়গা ক্রমাগত সংকুচিত হয়েছে। ব্রিটিশরা শাসন ক্ষমতা দখল করার পর মুঘল সম্রাট এক ধরনের বন্দিত্ববরণ করেন। তাঁর জন্য বরাদ্দ হয় বছরে সাড়ে এগারো লাখ টাকার তহবিল। কত কৌশল অবলম্বন করে তাঁরা। সম্রাটের উপর নজরদারি করার প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রভুত্ব বজায় রাখার খবরদারি তো ছিলই। তাই তাঁরা বসতি গেড়েছিল কাশ্মীরি গেটের কাছে। ব্রিটিশরা মুঘল সম্রাটের নামে নিজেদের রাজ্যশাসন চালাত। গালিব জানালা দিয়ে বাইরে তাকান। যদি বিদ্রোহীরা পরাজিত হয় তবে ব্রিটিশরা পুরো ক্ষমতায় আসবে। তখন তাঁর

নিজের বৃত্তির টাকা আসবে ব্রিটিশদের কাছ থেকে। তখন কি ব্রিটিশরা দেখতে চাইবে মুঘল সম্রাটের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কতটা ছিল? তার চেয়েও বেশি আনুগত্য কতটা ছিল? গালিবের বুকের ভেতর গুড়গুড় ধ্বনি হয়। ভাবেন, এর একটি উপায় বের করতে হবে। একটি ডায়েরি লিখলে কেমন হয়? প্রতিদিনের ঘটনার বর্ণনা থাকবে তাতে। বর্ণনা করবেন ব্রিটিশরা সিপাহিদের হাতে কতটা নির্যাতিত হয়েছে তাঁর কথা। ভাবতেই তাঁর ষাট বছরের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি কাগজ টেনে বসেন। কিন্তু দিনলিপিটি লেখা শুরু করতে পারেন না। লিখেন একটি কবিতা—

'ওই যে অসীম অনন্ত
যার কোনো শুরু নেই
আমার স্বীকৃতিস্বরূপ নক্ষত্র
সেই আকাশই ছুঁয়েছে
কিন্তু এ পৃথিবীতে আমার কবিতার
খ্যাতি আসবে
মৃত্যুর পরে।'

কবিতাটি লিখে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকেন। বিমর্ষ এবং চিন্তিত দেখায় তাঁকে। কিছুই ভালো লাগে না তাঁর। তিনি বিবি-বিবি বলে চেঁচিয়ে ওঠেন। অল্পক্ষণে উমেরা বেগম তাঁর ঘরে ঢোকেন।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন তাঁর দিকে। গালিব কিছু বলার আগেই উমরাও বেগম বলেন, এমন চেঁচামেচি করে ডাকাডাকি করছেন কেন?

তোমাকে অনেকক্ষণ ধরে বাড়িতে দেখছিলাম না! তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উমরাও বেগম বলেন, শহরে মেয়েদের গয়নাগাটি কেড়ে নিচ্ছে সিপাহিরা। বাড়িতে বাড়িতে লুটপাট হচ্ছে। আপনি কি জানেন কিছু?

গালিব চোখ বুঁজে বলেন, হ্যাঁ শুনেছি। কিন্তু কোনো মেয়ের শরীর থেকে গয়না খুলে নিয়েছে এমন কোনো ঘটনার সাক্ষী আমি হইনি।

এটা মোটেই রসিকতা করার সময় নয়।

আমার কাছে রসিকতা ফুসফুসে বাতাস চলাচলের মতো।

সারাজীবন আপনি তা-ই করলেন। এসব করে জীবনটা উড়িয়ে দিলেন।

মোটেই উড়িয়ে দিইনি। আমার অনেক সঞ্চয়ও আছে।

সঞ্চয়! ফুঃ! মদ-রুটির পরে তো একটি মোহরও থাকে না।

মোহর তো হাতের ময়লা। আমার সঞ্চয় আমার কবিতা। আমার মৃত্যুর পরে লোকে গালিবের নামে জান কোরবানি করবে।

দোপাট্টায় মুখ ঢেকে উমরাও বেগম খুকখুক করে কাশেন। কাশি থামিয়ে একসময় বলেন, আমাকে খুঁজছিলেন কেন?

আমি গয়না লুটপাটের খবর জেনে তোমাকে খোঁজ করেছি এ জন্য যে, তোমার গয়নাগুলো কোথায় রেখেছ?

আপনি যখন আমার গয়নার চিন্তায় ছিলেন তখন আমি সেগুলো নিরাপদ জায়গায় রাখার জন্য পাঠিয়েছি। ইনশাল্লাহ আমার অলঙ্কারের ছোট বাক্সটি নিরাপদেই থাকবে।

কোথায় পাঠিয়েছ শুনি?

পরে জানতে পারবেন। কোনো দুর্ঘটনা না ঘটলে তা ফেরতই পাব। এসব ভেবে দুশ্চিন্তার ধাপ বাড়িয়ে লাভ কি?

কথার ঝাপটা দিয়ে উমরাও বেগম ফিরে দাঁড়ান। দু'পা এগিয়ে আবার ফিরে এসে বলেন, কবিতার সঞ্চয়ের কথা বললেন। তো এই সঞ্চয়ের পরিমাণ কী?

শতাব্দীর পর শতাব্দী সঞ্চিত থাকবে।

তাতে কী হবে?

কবিতায় বেঁচে থাকবে গালিব। আর গালিবের কবিতা মানুষের আত্মার ক্ষুধা মেটাবে।

সিপাহিরা যদি আপনাকে বাঁচিয়ে রাখে তবে তো? নাকি বেঁচে না থাকলেও সঞ্চয় থাকবে?

ষাট বছর বয়স পর্যন্ত যা করেছি সেটাই অনেক। মানুষ এই সঞ্চয় খরচ করে শেষ করতে পারবে না।

ফুঃ! কবিতা! মানুষের আবার আত্মার ক্ষুধা। সিপাহিরা জিততে না পারলে ব্রিটিশরা আসবে। দিল্লি শহর দখল করবে। তখন ওরা আপনাকে মারবে। কারণ আপনি বাদশাহর দরবারে আত্মার খাদ্য বিলি করতে যান। আপনার তো আবার সিন্দুকবোঝাই সে সম্পদ আছে।

হ্যাঁ বিবি, তা ঠিক। ঠিক বলেছ। এই একটি জায়গায় আমি বাদশাহরও বাদশাহ।

উমরাও একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে স্বামীকে দেখেন। কত অল্প বয়স থেকে তিনি এই মানুষটিকে দেখছেন। তাঁর দেখা ফুরালই না। একসময় মনে হয় তিনি এই রকম, অন্য সময় মনে হয় না এ রকম না, তিনি অন্যরকম। তাহলে একজন

AMARBOI.COM

মানুষ কি কবি হলে স্ত্রীর কাছে অচেনা মানুষ হয়ে থাকে?

কী দেখছ বিবি?

আপনাকে।

আমাকে, আমাকে কেন? আমরা তো চল্লিশ বছর ধরে একসঙ্গে আছি।

আপনি তো চল্লিশ বছর ধরে একরকম মানুষ থাকেন নি। আপনার রঙ বদলায়।

গালিব হাসতে হাসতে বলেন, কবি রঙ ভালোবাসেন। বসন্ত, শীত, নদী-গাছ ভালোবাসেন। কবির রঙ তো বদলাবেই। কবিরা এক রঙের হয় না।

হয় না? কবি কি মানুষ না?

প্রাণখোলা বুক ফাটানো হাসি হাসেন তিনি। তারপর হাসি থামিয়ে চোখ বড় করে বলেন, কবি মানুষের চেয়েও বড় অন্যকিছু।

উমরাও বেগম হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন। আশ্চর্য হয়ে অনুভব করেন কবির দু'চোখ আকাশ হয়ে গেছে। মানুষটা তো ভালোই ছিল, শুধু সুরাসক্ত হয়ে সংসারটাকে ছারখার করেছে। সে জন্য উমরাও বেগমের মন বিষিয়ে গেছে। দুই নাতি হুসেন আর বাকির এই নিয়ে তাঁকে নানা প্রশ্ন করে। সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে তাঁর ভালো লাগে না। মন খারাপ করে স্বামীর সামনে থেকে সরে আসেন উমরাও বেগম।

গালিব আবার কাগজ টেনে ঝুঁকে পড়েন টেবিলের ওপর। ডায়েরি লিখবেন ভেবে কয়েকটি বাক্য লেখা শুরু করেন, পুলিশের বড় কর্তাদের মেয়ে ও বউদের বাদ রেখে আর কারও অলঙ্কার লুণ্ঠন করতে দুর্বৃত্ত সিপাহিদের বাঁধছে না। এসব সিপাহি কাপুরুষ ডাকাতের দলে পরিণত হয়েছে। মেয়েদের অলঙ্কার হরণ করে, ঘরবাড়ি লুটপাট করে ওরা ধনী হয়ে উঠছে। আমি আমার বিবিকে যে কথা বলিনি তাহলো ওরা মেয়েদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে। ধর্ষণ করছে। এসব উন্মত্ত মানুষের কাছে নতিস্বীকার করা ছাড়া মেয়েদের আর কিছু করার নেই। হায় আল্লাহ, এই কি আমার প্রিয় দিল্লি? এই কি পূর্ণিমা রাতের শহর? জামা মসজিদ, লালকেল্লার ইজ্জতইবা কোথায় থাকছে? গালিব নিজে খুব বিপন্ন বোধ করছেন। বিপন্ন বোধ তাঁকে মরমে মারছে। গতকালই গুল মহম্মদ তাঁকে এসব কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, অল্পবয়সী যে মেয়েরা আমাদের স্নেহ ও শ্রদ্ধা দিয়ে ভরিয়ে রাখত, এই নতুন ধনীদের শয়তানি ও ষড়যন্ত্রের কাছে আমরা মাথা হেঁট করে ফেলেছি। না, আমরা মাথা হেঁট করে ফেলতে বাধ্য হয়েছি। হায় আল্লাহ! গালিব মাথা ঝাঁকিয়ে আবার চেয়ারে মাথা হেলিয়ে দেন। উঠে পায়চারি করেন, আবার এসে চেয়ারে বসেন। লিখতে

থাকেন কয়েকটি পঙ্‌ক্তি : 'এদের স্বভাব এমন বিষময় যে অহঙ্কারের ঘূর্ণিঝড় মাত্র। কীভাবে গুরুত্বের কেন্দ্রে আসা যায়, শুধু সেই চিন্তাতেই মশগুল থাকত এই নিম্নজাতীয় মানুষগুলো। তারা যেন বুনো জলস্রোতের মধ্যেও ঘাসের পাতার মতো তাদের অহঙ্কারী মাথাটি জাগিয়ে রাখত। পণ্ডিত এবং অভিজাতরা ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হলেন। অথচ এই নিচুমানের মানুষগুলো, যারা কখনও সম্পদ বা সম্মান কিছুই দেখেনি তারাও সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়ে সীমাহীন পর্যায়ে বড়লোক হয়ে গেল। এককালে যার বাপ রাস্তা ঝাঁট দিত সেও নিজেকে এখন এই নব্য বাতাসের শাসক বলে দাবি করছে। যার মাকে একদিন রান্নাঘরে আগুন জ্বালাতেও প্রতিবেশীদের দ্বারস্থ হতে হতো সেও এখন নিজেকে আগুন রাখার সার্বভৌম অধিকারী বলে ঘোষণা করেছে। এসব মানুষ আশা করছে, ভবিষ্যতে এরাই আগুন ও বাতাসকে পরিচালনা করবে।'

গালিব এটুকু লিখে থামলেন। ভাবলেন, যারা এমন একটি বিদ্রোহ ঘটাল তারা কীভাবে এতসব কুকাজে লিপ্ত হলো? অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে এখানেই নিম্ন শ্রেণীর মানুষের পার্থক্য। অভিজাতরা নিমক খেয়ে নিমকহারামি করে না, কিন্তু ছোট জাতের মানুষ সব কাজই করতে পারে। ওদের কোনো কিছুতে বাধে না। গালিবের শরীর রাগে চড়বড় করে। বুক ফুঁসে ওঠে। পরক্ষণে মনে হয় তাঁর বন্ধু হুসেন আলীর পাঁচটি চমৎকার সুন্দরী মেয়ে আছে। কেমন আছে ওরা? চিন্তা করতে গিয়ে ভয়ে কুঁকড়ে যায় গালিবের বুক। তারপর দ্রুত হাতে জামা টেনে গায়ে দিয়ে বেরিয়ে আসেন রাস্তায়। দ্রুতপায়ে মহল্লা পেরিয়ে আসেন। হুসেন আলীর বাড়ি বেশি দূরে নয়। কিন্তু পথে নেমে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়। রাস্তায় যত্রতত্র মানুষের লাশ পড়ে আছে। বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হয়েছে অনেক ব্রিটিশ নারী। চাঁদনিচকের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে তাঁর ক্রোধ বাড়তে থাকে। যেন দু'হাতে টুকরো করে ছিঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছে নিজেকে, নাকি অন্যদের? নাকি ভেঙে চুরমার করতে ইচ্ছে হচ্ছে লালকেল্লা? ওখানে কি আর কোনোদিন মুশায়রার আসর বসবে? না, কোনোদিন না বোধহয়। কে জানে ভবিষ্যৎ কোন সুতোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। গালিব নিজের বুকে ফুঁ দেন। যা হওয়ার হবে। ভবিষ্যৎ তো পূর্ণিমা রাত নয় যে, তাকে নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ আছে কিংবা একটি দারুণ প্রেমের কবিতা হবে? গালিব দ্রুতপায়ে হুসেন আলীর বাড়িতে এসে পৌছেন।

দরজা হাঁ করে খোলা। ঘরের মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে হুসেন আলী। চোখ খোলা, মুখ হাঁ করা। মুখের চারপাশে মাছি ভন ভন করছে। আশপাশে কোথাও কেউ নেই। হুসেন আলীর মৃতদেহের চারপাশে রক্ত জমাট বেঁধে

আছে। পুরো বাড়িতে আর কোনো লাশ নেই। গালিব দাঁড়াতে পারেন না। দ্রুতপায়ে বেরিয়ে আসেন। বুঝতে পারেন মেয়েগুলোকে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। কোথায়? যমুনার অপর পাড়ে কি? নাকি এই শহরের কোথাও?

গালিব দ্রুতবেগে ছুটতে থাকেন। তাঁকে পালাতে হবে। কারও হাতে ধরা পড়া চলবে না। গালিব পালাচ্ছেন। গালিব, তোমার প্রিয় শহরে তুমি পালিয়ে বাঁচতে চাইছ। প্রিয় শহরে তুমি এখন আগন্তুক মাত্র, নাকি এই শহরে তুমি একজন অনাকাঙ্ক্ষিত মানুষ? গালিব ছুটছে। তছনছ হয়ে যাওয়া শহরের অলিগলি পার হয়ে গালিব নিজের বাড়িতে আসেন। চারদিকে শব্দ তুলে বাড়ির দরজায় কড়া নাড়েন, যেন ঘোড়ার খুরের প্রবল শব্দ ছড়িয়ে দিচ্ছেন চারদিকে। জানালা ফাঁক করে কেউ একজন দেখে নেয় যে দরজায় কে কড়া নাড়ছে। তারপর দ্রুত এসে দরজা খোলে। গালিব ধমক দিয়ে বলেন, এত দেরি হলো কেন দরজা খুলতে?

কড়া নাড়ার শব্দ এত জোরে হয়েছে যে আমরা ভেবেছি বুঝি সিপাহিরা এসেছে বাড়িতে হামলা করতে।

গালিব থমকে দাঁড়িয়ে বলেন, সিপাহিরা?

দেখছেন তো হুজুর, ওরা কেমন লণ্ডভণ্ড করেছে শহর। এই শহরে আমি আর থাকব না। ঠিক করেছি চলে যাব।

চলে যাবে? গালিব বিস্মিত হন।

খুদাবক্স ডুকরে কেঁদে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমি শহরের রাস্তায় এত লাশ আর দেখতে পারছি না। হুজুর, রাস্তায় যে কোনো শব্দ হলেই আমার বুকের মধ্যে আজরাইল ঢুকে যায় বলে মনে হয়। শহরটায় থাকতে আমার ভূতের ভয়ও করে। মনে হয় এক্ষুণি এসে গলা চেপে ধরবে। নিজের পায়ের শব্দ শোনার পরও শহরে মানুষ আছে বলে আমার মনে হয় না। উহ্ আল্লাহ, মৃতদেহ নিয়ে কুকুরগুলো কামড়াকামড়ি করছে। শকুনগুলোকে দেখেছি মৃতের গোশত খেয়ে আর উড়তে পারছে না। আমাদের দেখলে দু'এক পা হেঁটে সরে যায় মাত্র। ডানা ঝাপটায় কোনোরকমে। ওদের গলা পর্যন্ত ভরে আছে পচা গোশতের স্তূপ।

আহ্ খুদাবক্স চুপ কর! আর বলবে না।

খুদাবক্স দু'হাতে চোখ মুছে গ্লাসে পানি ঢেলে গালিবের দিকে এগিয়ে দেয়। গালিব ঢক ঢক করে একটানে পানি খেয়ে গ্লাসটা টেবিলের ওপর রাখতে না রাখতেই উমরাও বেগম এসে ঘরে ঢোকেন। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

গালিব উমরাও বেগমের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেন না।

কী হলো কথা বলছেন না যে?

আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

উমরাও বেগম তাঁর কথায় কান না দিয়ে নিজের মতো ঝঙ্কার দিয়ে বলেন, এই খুনখারাবির শহরে কেউ রাস্তায় বের হয়?

আমি হুসেন আলীর মেয়েদের খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম।

ফুঃ! মেয়ে! এই শহরের মেয়েরা আর মেয়ে নেই। ওরা লুটের মাল হয়েছে।

গালিব দু'হাত উপরে তুলে পায়চারি করে বলেন, আমার দিল্লির এই চেহারা আমি দেখতে চাইনি।

আপনার দেখতে চাওয়া-না চাওয়ায় কার কী এসে যায়? আপনার কাছে অস্ত্র নেই। অস্ত্র না থাকলে কি দুর্বৃত্তরা ভয় পায়?

বিবি, তুমি আমাকে আর এসব কথা বলো না। আমি সহ্য করতে পারছি না। আহা, হুসেন আলীর ফুলের মতো মেয়েরা। এই শহরে ওরা হারিয়ে গেছে। ফুলের মতো পাঁচটি মেয়ে। একগুচ্ছ কুসুম। কুসুমগুচ্ছ ছিল ওরা। ওহ্ হো—

উমরাও বেগম দোপাট্টায় চোখ মোছেন। গালিব নিজেও দু'হাতে চোখের পানি মোছেন। তাঁর শরীর কাঁপে থরথর করে। উমরাও বেগম তাঁকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দেন। বলেন, লেবু দিয়ে এক গ্লাস শরবত আনব?

হ্যাঁ, আন। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। এত পিয়াস যে মনে হয় যমুনা নদী পুরো খেলেও পিয়াস মিটবে না।

উমরাও বেগম স্বামীর মাথায় হাত বুলিয়ে বেরিয়ে যান। গালিব চেয়ারে মাথা ঠেকিয়ে শরীরের ভার ছেড়ে দেন। নিজেকে শুনিয়ে বলেন, দিল্লি শহর যদি খালি হয়ে যায়, যদি একজন মানুষও না থাকে তাহলে আমি আনন্দ করব। এই শহর ছেড়ে শহরবাসীরা চলে গেলে শহর নিয়ে আর কিসের চিন্তা। বাহ, তখন আমি দু'কান ভরে জান্তব উল্লাস শুনব। ভাবব, এসবই শোনার জন্য খোদা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই উল্লাস ধ্বনিই শ্রেষ্ঠ গজলের সুর!

উমরাও বেগম ফিরে আসেন লেবুর শরবত নিয়ে। গ্লাসটা তাঁর সামনে ধরে বলেন, আপনি নিজের সঙ্গে কথা বলছিলেন?

হ্যাঁ বিবি। নিজের সঙ্গেই কথা আমার। যখন বন্ধুরা একে একে দূরে চলে যায় তখন কার সঙ্গে আর কথা বলার থাকে?

ঠিক, তাই তো। কে আর আছে আপনজন। আপনার ভাইয়ের খবর তো

নিতে হয়।

কাল্লু মিয়াকে পাঠিয়ে দেব আমার ভাইয়ের বাসায়।

কাল্লু রাস্তায় বের হতে চায় না। ও ভয় পায়। কালকে আমি ময়দা আনতে পাঠাতে চেয়েছিলাম, ও বের হতে চায়নি। ও আমাকে বলেছে, খরলকাবাজার ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।

থাক, এসব কথা এখন থাক।

আপনি একটু বিশ্রাম করুন। আমি আপনার বিছানা ঠিক করে রেখেছি। যান শুয়ে পড়েন।

গালিব চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন। নিজেও মনে করেন যে তাঁর বিশ্রাম দরকার। তিনি শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আভিজাত্যের অহংবোধ ফুঁসে ওঠে। বারবারই মনে হয় ছোটলোকদের হাতে ব্রিটিশ নারীদের নিধন খুবই মর্মান্তিক। সহনীয় নয়। তাঁর বুকের ক্রোধ পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। শুয়ে থাকতে ভালো লাগে না। উঠে পড়েন। টেবিলে এসে বসেন। আঁকিবুঁকি আঁকেন কাগজে—হিজিবিজি রেখায় ভরে ওঠে কাগজ। তারপর নিহত ব্রিটিশ নারীদের মুখ স্মরণ করে লেখেন, সুন্দর মুখশ্রী, তন্বী নারী, তাদের মুখগুলো ছিল চাঁদের মতো উজ্জ্বল আর শরীরের বাঁকগুলো ছিল রুপোর মতো ঝকমকে। একটু লিখে তিনি আবার সোজা হয়ে বসেন। নিহত নারীদের কথা মনে করে তাঁর মাথা ভার হয়ে আসে। মনে হয় ঘাড় ব্যথা করছে। ঘাড়টা সোজা করে রাখাই কঠিন লাগছে। নিজেকেই বলেন, রাস্তায় পড়ে থাকা নারীদের পরনের স্কার্ট ও নেটকে রক্ষা করার বাধা দেওয়া কি তুমি দেখনি গালিব? দেখনি কি ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে বাধ দেওয়া কোনো সাফল্য? ব্রিটিশ প্রশাসন ছাড়া অন্য কোনো প্রশাসনে ন্যায় রক্ষার দায় কি তুমি দেখতে পেয়েছ গালিব? আমি তো ব্রিটিশদের কথা দিয়েই শুরু করব আমার 'দস্তাম্বু' লেখা। প্রতিদিনের ঘটনা দিয়ে শরু হবে 'দস্তাম্বু'—ওহ্ দস্তাম্বু, দস্তাম্বু—গালিব বিড়বিড় করতে করতে কাগজের পাতা উল্টে যান। দস্তাম্বু তাঁর প্রিয় শব্দ, মানে কুসুমগুচ্ছ। গালিব কুসুমগুচ্ছ নিয়ে ভাবতে গিয়ে মনে করেন একটি একটি করে উড়ে যাচ্ছে পাপড়ি, একটি একটি করে ঝরছে পাপড়ি। কুসুমের মতো দেখতে হারিয়ে যাওয়া মেয়েগুলো আর কোনোদিন ফিরে আসবে না এই শহরে।

তখন তিনি কাগজ টেনে লিখতে থাকেন। ডায়েরির সূচনাটা হয় এভাবে : 'এই বইয়ের পাঠকদের জানা উচিত যে, আমি ব্রিটিশদের নুন ও রুটি খেয়েছি। এবং আমার শৈশবের শুরুতেও পৃথিবী বিজয়ী বীর ব্রিটিশদের টেবিল থেকেই খাদ্য গ্রহণ করেছি।

বছর সাত-আট আগে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠিয়ে মুঘল বাদশাহ আমাকে তৈমুরি রাজবংশের ইতিহাস লিখতে বলেন এবং এ বাবদ বাৎসরিক ছয়শত টাকা পারিশ্রমিক দেবেন, এমন প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে আমি কাজ শুরু করি। ঘটনাচক্রে এ সময়ে বাদশাহর ওস্তাদের মৃত্যু হয়। বাদশাহর রচিত কবিতাগুলো সংশোধন করে দেওয়ার জন্য সেই স্থানে আমাকে নিয়োগ করা হয়।

আমার বয়স হয়েছে, দুর্বল হয়ে পড়েছি, ক্রমেই আমি আমার নিজস্ব কোণের শান্তি ও নিঃসঙ্গতার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছিলাম। তাছাড়া কানে ক্রমেই কম শোনায় তা আমার বন্ধুদের পক্ষে অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। তাদের ভাষা বোঝার চেষ্টা করতাম শুধু ঠোঁট নাড়া দেখে। সপ্তাহে দু'বার বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে বাদশাহর ইচ্ছানুসারে তাঁর সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতাম। যদি তিনি তাঁর কক্ষ ছেড়ে উঠে না আসতেন তো বাড়ি ফিরে আসার আগে, অল্প সময় একটি প্রশস্ত কক্ষে নির্বাচিত শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে কিছুক্ষণ বসে অপেক্ষা করতাম। এ সময় আমার সদ্য শেষ করা লেখাগুলো নিয়ে যেতাম বাদশাহকে পড়ে শোনানোর জন্য। কখনও আবার পাঠিয়ে দিতাম পত্রবাহকদের হাতেও। এই ছিল আমার কাজকারবারের ধরন এবং বাদশাহর সঙ্গে সম্পর্কের ছবিটি। যদিও এই সামান্য সংযোজনটুকুই আমাকে কিছুটা শান্তি ও বিশ্রাম দিয়েছিল, দিয়েছিল দরবারের নানা বিতর্ক থেকে সরে থাকার অবকাশ। তবুও তা কোনোভাবেই আমাকে আর্থিক নিরাপত্তা বা বর্ধিষ্ণুতার আনন্দ কিছুই দিতে পারেনি।'

এটুকু লিখে তিনি থামলেন। বুকের ভেতর ক্ষোভ অনুভব করলেন। এভাবে জীবনের কত বছর কেটে গেল। কতকিছুই তো করতে হলো বেঁচে থাকার তাড়নায়। এখন আর বাকি কী? এখন অপেক্ষা করতে হবে নতুন করে দেখার জন্য। বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে। কবিতার পঙ্‌ক্তি মনে আসে। কাগজে লেখার আগে নিজে নিজে আওড়াতে থাকেন—আমি আমার ক্ষুধার অধীন, তাই রুটির জন্যই তো লেখা।

মাথা সোজা করে আবার উঠে বসেন। সেই রাত্রির কতদিন হয়ে গেল, ভাবলেন চোখ বুজে। হিসাব করে দেখলেন, বাইশ দিন। দিনের আয়ু দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে, ফুরিয়ে যাচ্ছে আরও কী যেন, কী—তা ভাবতে গিয়েও ভাবতে পারলেন না। কাগজের পৃষ্ঠায় ঝুঁকে পড়ল মাথা। লিখতে শুরু করেন, 'সোমবার এক মধ্যাহ্নে অর্থাৎ ১৬তম রমজানের দিন, ১২৭৩ হিজরি পরবর্তী অর্থাৎ ১১ মে, ১৮৫৭ সালে লালকেল্লার দেওয়ালগুলো এমন এক শক্তির দ্বারা

আক্রান্ত হয়ে কেঁপে উঠল যে শহরের আশপাশেও সেই কম্পন প্রতিধ্বনিত হলো। দিল্লির খোলা প্রবেশদ্বার দিয়ে মিরাট থেকে আসা অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী মাছির মতো ভন ভন করে উড়ে এসে উন্মাদের মতো তছনছ করে দিল দিল্লি শহর। যেখানেই তারা ইংরেজদের হাতে পেল, তা সে অফিসার বা অধঃস্তন যাই হোক না কেন, তাদের খুন না করে তারা থামল না। ইংরেজদের ঘরবাড়িগুলোও ধ্বংস করে দিল এই সিপাহিরা। আমার বাড়ির দরজা-জানালা সব ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েও ঘরের মধ্যে থেকে আমি তাদের চিৎকার ও চেঁচামেচির শব্দ শুনেছি। শুনেছি, লালকেল্লার অভিভাবক সেই ব্রিটিশ এজেন্টও খুন হয়েছেন। চারদিকে তখন পদাতিক সৈন্যদের দৌড়ানোর আওয়াজ আর অশ্বারোহীদের ঘোড়ার খুরের খটখট শব্দ।'

ওহ্ কী নৃশংসতা। ওহ্ কী বর্বরতা।

বিড়বিড় করতে গিয়ে তাঁর কলম থেমে যায়। বলেন, নিয়মমতো ব্রিটিশরাই হিন্দুস্থানের একমাত্র শাসক। বিদ্রোহীকারীরা অকৃতজ্ঞ। ব্রিটিশরা যদি বিদ্রোহীকারীদের পরাস্ত করতে পারে তবে সেটাই হবে ন্যায় ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমি তো এমনই চাই। এখন আমার ঘরে সুরা নেই। সুরার তৃষ্ণায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। দিনগুলো যে কেমন কাটছে তা আমি আর কাকে বোঝাব। বোঝার জন্য কেইবা আছে এই শহরে। এমন আতঙ্ক নিয়ে, এমন বর্বরতা সহ্য করে শহরের দিনগুলো দোজখ হয়ে গেছে। দোজখ, দোজখ। দোজখ চারদিকে। আর কে না জানে, সিপাহিরা ঘোড়ায় চড়ে মোগল সম্রাটের প্রাসাদে গিয়েছিল। তাদের মাথায় পাগড়ি তো ছিলই না, পোশাকও নিয়মমাফিক ছিল না। যেনতেন পোশাকে যে রাজদরবারে যাওয়া যায় না, এটা তারা জানত না। অথচ ব্রিটিশ আধিকারিকদের আদব-কায়দাই ছিল ভিন্নরকম। তারা যথাযথ পোশাকে সজ্জিত হয়ে সবসময় রাজদরবারে গিয়েছে। এমনকি তারা দেওয়ানি প্রবেশ দ্বারে ঘোড়া থেকে নেমে হেঁটে প্রাসাদে ঢুকেছে। অভিজাতদের সম্মান জানাতে তারা কখনও কুণ্ঠিত ছিল না। কিন্তু বর্বরদের আচরণই ভিন্ন। তিনি শুনেছেন বাদশাহ ব্রিটিশ আধিকারিকদের কাছে সিপাহিদের আচরণের বিরুদ্ধে নালিশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সিপাহিদের তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যবহার অসহনীয়। তার উপস্থিতিতে তারা যে অশালীন আচরণ করেছেন তা খুবই নিন্দনীয়।

আসলে সিপাহিরা তাদের নতুন পাওয়া ক্ষমতা আর দিল্লি জয়ের খুশিতে এমন সব ভাবভঙ্গি করতে থাকে যে, তার দ্বারা বোঝা যায় তারা অভিজাতদের ন্যায্য সম্মান দেখাতে একদমই ইচ্ছুক নয়। ভাবটা এমন, তারা অভিজাতদের

তোয়াক্কাই করে না। ওরা আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করার একদল মানুষ, যারা শহরটাকে পায়ের নিচে রেখে বিজয়ের আনন্দে গর্বিত। হায় আল্লাহ, এই জীবনে এসব আমাকে দেখতে হচ্ছে। আমি তো আমার কবিতার কাছে নতজানু। আমি আর কারও কাছে নতজানু নই। আমি তো জানি, আমি কোথায় আছি। কী আমার পরিচয়। কবি ও পণ্ডিত ছাড়াও আমার আরও পরিচয় আছে।

জন্মসূত্রে আমি একজন নামী অভিজাত পরিবারের সন্তান। হিন্দুস্তানের অভিজাত সমাজ ছাড়াও সাধারণ মানুষ আমাকে চেনে। রাজা-মহারাজারা আমাকে এক নামে চেনে। আর হাতেগোনা যে ক'জন মানুষকে ব্রিটিশরা অভিজাত বলে স্বীকার করেন, গালিব তাদের একজন। অন্যতমই বলা উচিত। এসব ভাবনাকে আমি বাড়াবাড়ি বলে মনে করি না। সিপাহিরা যে আচরণ করছে তা অভিজাতদের অপমান করার চেয়েও বেশি।

তিনি ফিরে এলেন টেবিলে। লিখলেন, 'এই বিচারহীন-বিবেকহীন পরিস্থিতির কীভাবেইবা বর্ণনা করব। যেসব শ্রমজীবী মানুষ সারাদিন ধরে মাটি কোপাত এখন সেখানেই তারা সোনার টুকরা খুঁজে পেয়েছে। আর বাদবাকি যারা অর্থাৎ যাদের জমায়েতে ফুল ফুটত তারাই ডুবে গেছে হতাশায়।'

কোনোকিছুই ভালো লাগছে না ভেবে চেয়ার থেকে উঠে পড়েন তিনি। বালতির পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে মাথা ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করেন। তারপর বিছানায় এসে শুয়ে পড়েন। মনে হয় অসহ্য গরম তাঁর শরীরের সবটুকু শুষে নিচ্ছে। এ বছরটি তিনি হয়তো পার করতে পারবেন না, এমন একটা ভাবনা তাঁকে মনমরা করে ফেলে। তিনি চিৎ হয়ে শুয়ে বড় বড় শ্বাস টানেন।

কয়েকদিন পরে খবর পান যে, হিন্দন নদীর ধারে ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে সিপাহিদের লড়াই বেধেছে। বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে ব্রিটিশরা। উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকেন গালিব। কয়েকদিন ঘর থেকে বের হন না। শরাব নেই বলে মেজাজ খিঁচড়ে থাকে। খিটিমিটি বাধে স্ত্রীর সঙ্গেও। এমনিতে তো পানাসক্ত-নেশাখোর স্বামীর সঙ্গে মাঝে মধ্যে বিরূপ আচরণ করেন, তাঁকে সহ্যই করতে চান না। কখনও ভালো ব্যবহার করেন, মনেই হয় না যে তাঁর সঙ্গে তিনি কখনও দুর্ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু ইদানীং মেজাজ ঠিক রাখা কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

একদিন সকাল বেলা উমরাও বেগম হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে বললেন, শুনেছেন খবর?

গালিব চোখ বড় করে তাকিয়ে বললেন, কোন খবর?

হিন্দন নদীর ধারে সিপাহিদের সঙ্গে ইংরেজদের যে লড়াই হচ্ছিল সেখানে ইংরেজরা জিতেছে।

জিতেছে? তিনি উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়েন। উমরাও বেগম নিজেও উজ্জ্বল মুখে জোরেজোরে বলেন, হ্যাঁ, ইংরেজরা জিতেছে। আমাদের সুদিন বোধহয় আসবে।

ঠিকই বলেছ বিবি। মানির মান রক্ষা হবে। ওই সিপাহিরা তো অভিজাতের মর্যাদা দিতে জানে না। বাদশাহকেও ওরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। একদিন এই মুঘলরাই তো ইসলামের ধ্বজা উড়িয়ে হিন্দুস্তানে প্রবেশ করেছে। বীরের বেশে প্রবেশ করেছে। ওহ্ খোদা মেহেরবান। বিবি তুমি কি আমাকে কিছু খাওয়াবে?

আপনার জন্য পেস্তাজল আর মিছরি দিয়ে শরবত বানিয়ে আনব?

তুমি কি আমাকে রোজকার মতো সাতটি পেস্তাজল দেবে?

ওই কয়টাই তো আপনার সকালের নাশতার জন্য বরাদ্দ।

আজ এই খুশির দিনে তুমি আমাকে দুটি পেস্তাজল বেশি দিও।

উমরাও বেগম মৃদু হেসে বলেন, আচ্ছা। তবে শহরের যা অবস্থা তাতে আর কতদিন আমরা এসব জিনিস খেতে পারব তা আল্লাহপাকই জানেন।

গালিব চুপ করে থাকেন। তাঁর বুকের ভেতর আনন্দের ঢেউ গড়ায়। সামনে ভালো দিন আসবে। শরাব পিয়ে বুঁদ হয়ে থেকে চাঁদনি রাতে হেঁটে যাবেন যমুনার ধারে। দেখবেন নদীর পানিতে মিনারের ছায়া, দেখবেন অলৌকিক দৃশ্যে পূর্ণ দিল্লির সৌন্দর্য। ওহ দিল্লি, দিল্লি! আমার জীবন।

উমরাও বেগম পেস্তাজল আর শরবত নিয়ে আসেন। গালিব রেকাবি থেকে পেস্তাজল তুলে মুখে দেন। আজ মুখে অরুচি নেই। খেতে ভালোই লাগছে। হাসতে হাসতে বিবিকে জিজ্ঞেস করেন, দুপুরে কী খাব?

গোস্তের সুরুয়া আর তন্দুরি।

ঠিক আছে, তাই হবে। তারপর জোরে জোরে নিজেরই কবিতা বলতে থাকেন :

'রাত-দিন গর্দিশ মেঁ সাত আসমান
হো রহেগা কুছ কুছ ঘাবড়ায়ে ক্যা?
'সাতটি আকাশ রাত-দিন টালমাটাল হয়ে আছে
কিছু না কিছু হবেই। ঘাবড়ানোর কী আছে?'

উমরাও বেগম হাঁ করে স্বামীকে দেখেন। মানুষটা এভাবে জীবন কাটিয়ে দিল। বলা যায়, তাঁর দিনগুলো আকাশের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সেগুলো কোথায় কোথায় গিয়ে পড়ল তার আর খোঁজ রাখল না। হায়, মানুষটা এমনই!

তাঁকে নিয়ে তিনি সুখও পেলেন না, দুঃখও বুঝলেন না। তাঁকে এসব কথা বলা যায় না। বললে তিনি কোনো কবিতার লাইন বলে হাসবেন।

'জীবনের ছুটন্ত ঘোড়া জানি না কোথায় থামবে। হাতে লাগাম নেই, রেকাবেও পা নেই।'— উমরাও বেগম নিজের মনে শেরটি আউড়ে ভাবলেন, এমন মানুষকে বোঝার সাধ্য তাঁর নেই। তাঁর বন্ধুদের কাছে শুনতে পান যে তিনি খুব বড় কবি। থমকে যায় উমরাও বেগমের চিন্তা। বড় কবিই যদি হবেন, তবে এমন জ্বালাপোড়ার জীবন কেন?

তখন গালিব রেকাবির পেস্তাজল শেষ করেন। এক চুমুকে শেষ করেন মিছরির শরবত। স্ত্রীর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, বিবি তোমার কি মনে আছে আমি কবে শায়ের লিখতে শুরু করলাম?

হ্যাঁ, বিলকুল মনে আছে।

মনে আছে? বলতো তখন আমার বয়স কত ছিল?

গালিব এক মুহূর্ত থমকে থেকে বিমর্ষ কণ্ঠে বলেন, এই শহরটা এখন আমার কৈশোর-যৌবনের সময় না। এখন কবিতার কথা বলার সময় না।

উমরাও বেগম মৃদু কণ্ঠে বলেন, তারপরও আপনি কবিতার কথা বললেন।

ঠিকই বলেছ। বিয়ের পরে আমি যখন দিল্লিতে আসি তখন আম্মা আমাকে বলেছিলেন, 'বেটা শায়েরই সব নয়। মানুষ হতে হবে।' আমি আমার আম্মাজানের কথা ধরেই মনে করেছিলাম যে, মানুষ তো আমি হবো। তবে শায়েরের হাত ধরে। শায়েরকে আমি ছাড়ব না। শায়ের লেখা বাদ দিলে সেটা হবে আমার মৃত্যুর সমান। আমার কাছে এমন মৃত্যু কাম্য হতে পারে না।

উমরাও বেগম কিছু বলার আগেই তিনি দু'হাতের মুঠিতে তাঁর ডান হাত নিয়ে বলেন, তুমি অনুমতি দিলে বাবুর্চি আমার জন্য ঘরে একটু সুরা বানাতে পারে। দেবে অনুমতি?

উমরাও বেগম এক ঝটকায় হাত সরিয়ে নিয়ে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। গালিব বিষণ্ন মনে বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে। গলি ফাঁকা। আশপাশের বাড়ির জানালাগুলোও খোলা নেই। কেউ হয়তো উঁকি দিয়ে বাইরে তাকায়, আবার বন্ধ করে দেয়। তিনি গলির মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকেন। পাশের বাড়ি থেকে মোস্তফা জং বেরিয়ে এসে বলেন, আপনাকে জানালার ফাঁক দিয়ে দেখে বের হয়ে এলাম। ভয়ে আতঙ্কে এই বন্দিজীবন কাটাতে আর পারছি না। কবে এর শেষ হবে কে জানে!

গালিব নিস্পৃহ কণ্ঠে বলেন, আপনি ভালো আছেন তো? বাল-বাচ্চারা? বিবি?

আমার পরিবারের কেউই ভালো নেই। অসহ্য গরম। গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েছে বাল-বাচ্চারা। এদিকে হেকিম নেই, ওষুধ নেই। কী করব, কোথায় যাব বুঝতে পারি না।

আর একটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন আলতফ। অন্যান্য বাড়ি থেকে আরও দু'একজন। ছোটখাটো জটলা তৈরি হয়। কিন্তু কেউই প্রাণখুলে কথা বলতে পারেন না। ভয়ে চুপসে আছেন সবাই। তারপরও কেউ কেউ মুখ খুলেন। কুশল বিনিময় করেন।

আপনাকে দেখে এই প্রথম ঘর থেকে বের হয়েছি মির্জা সাহেব।

ভালো আছেন তো?

ভালো? এই শহরে কেইবা ভালো থাকবে!

গালিব তিক্ত কণ্ঠে বলেন, সিপাহিরা দেশপ্রেমিক ঠিকই, কিন্তু লুট করার মতো লোভের উপরে উঠতে পারেনি।

এই আচরণ আমাদের খুব কষ্ট দিচ্ছে।

গালিবের কথায় সায় দেয় আলতফ। ওরা ইংরেজ খোঁজার অছিলায় ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে, তারপর লুটপাট করে বেরিয়ে যায়। অথচ ভাবটা করে যেন যে ঘরে ঢুকেছে, সে ঘরে লুকিয়ে থাকা একজন ইংরেজকে ঠিকই খুঁজে পাবে। আসলে ওরা নির্লজ্জের মতো তালা ভাঙে, জানালা-দরজা খুলে নেয়, ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করে, যা ইচ্ছা তা কেড়ে নিয়ে চলে যায়। আমরা তো এ দেশেরই মানুষ। আমরা তো ওদের শত্রু নই।

এটুকু বলে আলতফ থামেন। এর-ওর মুখের দিকে তাকান। দেখতে পান গালিব ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন। পরক্ষণে মুখ ফিরিয়ে বলেন, আমার মতো অভিজাত পরিবারের মানুষের পক্ষে এসব মেনে নেওয়া কঠিন। আমি ক্ষুব্ধ, মর্মাহত। সিপাহিরা ভীষণ ক্রুদ্ধ এবং স্বৈরাচারী। ওরা নিজেরা বুঝতে পারছে না যে ওরা কী করছে।

ঠিক বলেছেন। আমাদের মহল্লা পাতিয়ালের নবাবের অধীন বলে আমরা এই বর্বরতার মধ্যে পড়িনি।

আর একজন দু'হাত উপরে তুলে আড়িমুড়ি ভাঙার ভঙ্গিতে বলেন, তাও ভালো যে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড কথা বলতে পারছি।

খোদা মেহেরবান। যাই, বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না। ওরা দেখতে পেলে বন্দুক উঁচিয়ে ছুটে আসবে।

একে-দুয়ে যে যার বাড়িতে ঢুকে পড়েন। গালিব একা দাঁড়িয়ে থাকেন। চারদিকে তাকান। ভাবেন, এ মুহূর্তে তাঁর আত্মা মহেশ দাশকে খুঁজছে। সেই

হৃদয়বান অসাধারণ মানুষটি যে তাঁকে শরাব দিয়ে তার বেঁচে থাকার সাধ পূর্ণ করেছিল। তার কথা লিখতে হবে দিনলিপি 'দস্তাম্বু'তে। নিজেকে শুনিয়ে তিনি বললেন, সত্য কথা লুকিয়ে রাখা কোনো স্বাধীনচেতা ব্যক্তির কাজ নয়। যে এটা করে সে ভীরু কাপুরুষ। আমি অবশ্যই এই গোত্রের মানুষ নই। বুক টানটান করে সবকিছু অকপটে স্বীকার করতে পারি। আমি স্বভাবের কাছে নতিস্বীকার করা মানুষ। স্বীকার করবইবা না কেন? যা ভালো লাগবে তাকে কাছে টানব। আত্মার ক্ষুধা মেটাব। আমি ধর্ম থেকে মুক্ত মানুষ। এজন্য লোকে আমার বদনাম করে। তাতে কিছু এসে যায় না। যার যা খুশি বলুক। বলে যদি ওরা শান্তি পায় তো পাক। শান্তি আমারও খুব প্রিয় শব্দ। তারপরও আমি দুর্নামের ভয় থেকে মুক্ত। আমাকে স্পর্শ করে কার সাধ্য! পরক্ষণে আবার বিষাদাক্রান্ত হন তিনি। ঘুরে-ফিরে মহেশের কথা মনে হচ্ছে। এখন ও কোথায় আছে তিনি তা জানেন না। মহেশের দুটি ফুলের মতো মেয়ে আছে। আহ্, ওরা এখন কোথায়? তাঁর মনে হয় রাস্তার ওপর বসে চিৎকার করে কাঁদতে। তাঁর তো অনেক বছরের অভ্যাস রাতে ঘুমানোর আগে ফরাসি মদ পান করা। নইলে তাঁর ঘুম আসত না। কিন্তু ফরাসি মদ সবসময় কোথায় পাওয়া যাবে! অত অর্থই বা কই? মহেশ দাশ দিলদরিয়া যুবক। ফরাসি মদের মতো দেখতে হিন্দুস্তানি শরাব তাঁর জন্য নিয়ে এসেছিল। সেই শরাবের গন্ধও ভালো ছিল। তখন সেটা মহেশ তাঁকে না দিলে কী যে কষ্ট হতো ভাবতেই এখন বুক কেঁপে ওঠে। তখন তিনি গলির মধ্যে পায়চারি করতে করতে তাঁর নিজের লেখা প্রিয় রুবাইটি আওড়াতে থাকেন—

'বহুদিন থেকে আমার ইচ্ছা ছিল যে আসল শরাব পাই
দু'এক পেয়ালা আমার ঠোঁট পর্যন্ত পৌঁছে যেন যায়
জ্ঞানী মহেশ দাশ আমাকে এই অমৃত জুগিয়ে যায়
যাকে আপন তরে খুঁজতে সিকান্দর বেরিয়েছিল হায়।'

ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ফজলে, হুজুর ঘরে চলুন। আপনার খানা তৈরি হয়েছে।

খানা? খকখক করে কাশেন তিনি।

ফজলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ভাবে, হুজুরের এমন কাশি আগে ছিল না। এখন তো শীতকাল নয় যে তাঁর ঠাণ্ডা লেগেছে। এই ঘোর গ্রীষ্মে হুজুর এমন করে কাশছেন কেন? ফজলে চিন্তিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কাশি থামলে ফজলে জিজ্ঞেস করে, হুজুরের শরীর ঠিক আছে তো?

শরীর? শরীরের ভেতরে পচা মাংসের গন্ধ ঢুকে যমুনা নদী হয়েছে।

ওখানে এখন শেয়াল-শকুনের আস্তানা তৈরি হয়েছে। আমি তো জানি না আমার বন্ধুরা কেমন আছে?

হুজুর ঘরে চলুন।

এই শহরে এখন আমার আত্মার জন্য কোনো পানীয় নেই। আমি পাগলের মতো আমার যুবক বন্ধু মহেশ দাশের জন্য অপেক্ষা করছি। ও কি একদিন আমার দরজায় দাঁড়িয়ে ঠুকঠুক শব্দ করবে? দরজা খুললে বলবে, কবি আমি এসেছি। আর আমি দেখতে পাব ওর হাতে আছে হিন্দুস্তানি শরাবের বোতল।

হুজুর, খোদার ইচ্ছায় এমন ঘটনা ঘটতেও পারে। সেটা আজ রাতেও হতে পারে।

আজ রাতে? গালিবের দু'চোখ বড় হয়ে যায়।

খোদা মেহেরবান হুজুর।

কিন্তু আমি তো খোদার বিশ্বাসী বান্দা নই। আমি তো নিজের কথা শুধু ভেবেছি, তাকে দিনে পাঁচবার স্মরণ করিনি। তিনি কেন আমাকে দয়া করবেন? আমি তো পাপী গুনাহগার।

বলতে বলতে ঘরে ঢুকে যান গালিব। দেখতে পান দস্তরখানার ওপর খানা দেওয়া আছে। ফজলেকে বলেন, তেল-গামছা নিয়ে আস। গোসল করব। পানি চাই, অনেক পানি। শরীর যেন জুড়িয়ে যায়।

একটু আগে আপনি কাশছিলেন হুজুর।

ওটা কাশি নয়। ওটা ছিল যন্ত্রণা আর মৃত্যুর শব্দ। কাশির বার্তা হয়ে এসেছে। যা বলেছি তা কর। বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন?

ফজলে সরে পড়ে। তেল-গামছা নিয়ে ও আসার আগেই উমরাও বেগম ঢোকেন।

আপনার নাকি তবিয়ত আচ্ছা নেই?

বিলকুল ঠিক আছে। চাকর-বাকরের কথা শুনতে হয় না। ওরা কবিকে কীভাবে বুঝবে? ওদের সাধ্যইবা কি?

উমরাও বেগম আর কী বলবেন বুঝতে পারেন না। বিষণ্ন বোধ করেন। ফজলে তেল-গামছা নিয়ে এলে গালিব নিজেকে জাজিমের ওপর ছেড়ে দেন। ফজলে পুরো শরীরে তেল মাখিয়ে দিলে তিনি স্নানঘরে ঢোকেন। ফজলে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। ও শুনতে পায় পানি পড়ার শব্দ। তিনি ইচ্ছেমতো ভিজছেন। আর চিৎকার করে গজল গাইছেন। মানুষটার জন্য ভীষণ মায়া হয় ফজলের। ও ভেবেছিল, এই শহর থেকে চলে যাবে, কিন্তু এখন ভাবে এই মানুষটাকে রেখে ও কোথাও যাবে না। মানুষটাকে আরও বেশি করে যত্ন করবে। তাঁর জন্য

শরাব খুঁজতে বের হবে। নিজের জান হাতে নিয়েই ও কাজটি করবে। ও নিজে নিজে কসম কাটে।

সেই বিকেলেই দরজায় টুকটুক শব্দ হয়। শব্দ শুনে কান খাড়া করেন গালিব। মহেশ দাশ কি? ও এলেই এমন শব্দ করে। খোদা মেহেরবান, গুনাহগার বান্দাকে দয়া করেছেন। নিশ্চয় মহেশ দাশই হবে। কেউ একজন এসে দরজা খোলে।

দরজায় দাঁড়িয়ে মহেশ দাশ মৃদুকণ্ঠে বলে, হজরত!

গালিব দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরেন মহেশকে। বলেন, তুমি কি আমাকে বাঁচাতে এসেছ বন্ধু।

কবিকে তো বাঁচিয়ে রাখতে হবেই। কবিই তো পৃথিবীর মানুষের আত্মার ক্ষুধা মেটায়।

মহেশ জামার ভেতর থেকে হিন্দুস্তানি শরাবের বোতল বের করে। গালিব বোতল দু'হাতে ধরে চুমু খান। তারপর কাছে দাঁড়িয়ে থাকা কাল্লুকে বলেন, জলদি পেয়ালা আনো। দু'জনে শতরঞ্জির ওপর বসেন। বোতলটাকে দু'হাতে ধরে রেখেই বলেন, এই গদর, গদর শুরু হওয়ার পর থেকেই আমি দরজা বন্ধ করি। মাঝে মাঝে হাঁফ ছাড়ার জন্য একটু-আধটু বের হই। কিন্তু এই বিদ্রোহের ঝামেলা আমার সহ্য হয় না। বাইরে বের হতে ইচ্ছে করে না। পাতিয়ালার মহারাজা হাকিম মহম্মদ খাঁয়ের নিরাপত্তার জন্য পাহারা বসিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিবেশী হওয়ার ফলে আমরাও, এই গলির মানুষেরা, নিরাপত্তা পাই। তাই বিজয়ী সিপাহিদের লুটপাটের হাত থেকে রেহাই পাই আমরা। বুঝলে বন্ধু, নেক বান্দাদের খোদাতালা এমন কিছু দয়া দেখান, গুনাহগাররা তা অনেক সময় বুঝতে পারে না।

মহেশ দাশ মৃদু হেসে বলে, হজরত, নির্জন ঘরে বসে গদরের ঘটনা লিখতে শুরু করেছেন কি? এখন তো আপনার বন্ধুদের আড্ডা নেই।

হ্যাঁ, আমি লিখছি। আমাকে তো লিখতেই হবে। তবে কথা কি জানো, লেখায় সবসময় মন বসে না। আমার বাড়ি থেকে অল্প দূরে আমার ভাই থাকে। তুমি তো জানো সে পাগল মানুষ। একজন বয়স্ক দাসী, আর একজন দারোয়ান তার সঙ্গী। এখন পর্যন্ত তার খবর ঠিকমতো পাইনি। বন্ধু, তুমি তো জানো আমার ভাইটি আমার ছোট। আমি তাকে খুব ভালোবাসি। আমি যখন দিল্লিতে বাস করতে আসি তখন তাকেও নিয়ে আসি। আমরা দু'ভাই ছাড়া আমাদের আর কোনো ভাই নেই। ত্রিশ বছর বয়সে ভাইটি পাগল হয়ে যায়।

এই সময় পেয়ালা নিয়ে আসে কাল্লু মিয়া। তিনি খুব যত্ন করে শরাব

ঢালেন। খুশিতে চকচকে দৃষ্টি নিয়ে মহেশের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলেন, বন্ধু শুকরিয়া।

শুকরিয়া জানাতে হবে না হজরত। আমি তো জানি আমার মতো আপনার অগণিত বন্ধু শুধু দিল্লিতে নয়, সারা হিন্দুস্তানে আছে। আপনার বন্ধুরা আপনাকে খুব ভালোবাসে।

গালিব মৃদু হেসে বলেন, আমার নিন্দুকও অনেক। তারা আমাকে কাফের বলে, মাতাল বলে, ধর্মভ্রষ্ট বলে।

তাতে আপনার কিছু এসে যায় না। আপনি মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব। আপনি হিন্দুস্তানের রত্ন। উর্দু ভাষায় আপনার মতো কবি কমই আছে।

গালিব দ্রুত মদপান করেন। মহেশের কথার উত্তর দেন না।

তারপর পেয়ালা নামিয়ে রেখে বলেন, বুঝলে বন্ধু, শরাব ছাড়া আমার হাতের কলম চলে না। শরাব হলো ধোঁয়াহীন আগুন। আমি ওই আগুনকে বলি, কোথায় তুমি? গদরের পর থেকে আমার এমনই মনে হচ্ছে। আমি আগুন খুঁজছি, ওই তরল গলায় ঢাললে তা আমার শরীরের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে যায়। আগুনের হলকা ছোটে। মন নেচে ওঠে। মাথা বিলকুল সাফ হয়ে যায়। আমার শের আগুনের ফুলকি হয়ে ওঠে। তাই শরাব ছাড়া আমি কিছু বুঝতে পারি না। আমি মাতাল হতেই তো ভালোবাসি বন্ধু। তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ। তুমি শরাব পান কর না। আমি তোমাকে শরাব পান করতে বলিনি।

হজরত, আমি এখন যাব।

হ্যাঁ, যাও। দেশপ্রেমিক সিপাহিদের হাতে তুমি নাজেহাল হবে না আমি এই আশা কি করতে পারি?

করতে পারেন। কারণ আমি ওদের লোক। ওদেরকে সমর্থন করি।

সাবাস, সাবাস বন্ধু। মনে রেখো এই অধমের কথা।

আমি নিজে আসতে না পারলে আপনাকে বোতল পাঠিয়ে দেব।

শুকরিয়া, শুকরিয়া বন্ধু।

তিনি নিমগ্নচিত্তে শরাব পান করেন। বাড়ির ভেতর থেকে কয়েকটি শামি কাবাব আসে। রাতের জন্য এই তাঁর বরাদ্দ। তিনি খুশিমনে রেকাবি টেনে নেন। আজকের রাত যমুনায় পূর্ণিমা দেখার মতো রাত। গদর শুরু হওয়ার পর থেকে তিনি তো একটি রাতও ঠিকমতো ঘুমুতে পারেননি। আজ ঘুমুবেন। এক ঘুমে রাত পার হয়ে যাবে।

কিছুদিন পর থেকেই নানা ঘটনা ঘটতে থাকল। বদলির যুদ্ধে জিতল ব্রিটিশরা।

এই বিজয় সিপাহিদের হতোদ্যম করতে পারেনি। তাদের মনের জোরে প্রভাব ফেলেনি। দিল্লিতে তারা বিজয়ের আনন্দে নানা কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করে যাচ্ছিল। ঘুণাক্ষরেও কেউ ভাবেনি যে, দুটি যুদ্ধে ব্রিটিশরা জিতলেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশরা ওদের সামনে টিকে থাকতে পারবে। ওরা ঠিকই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এ দেশ থেকে ওদের পাততাড়ি গুটাতেই হবে।

অন্যদিকে আরাবল্লী পর্বতের পাদদেশে ব্রিটিশদের অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। সংখ্যায় তারা কমে গিয়েছিল। রসদের জোগানও কমে গিয়েছিল। অতিরিক্ত সৈনিকের যে দরকার ছিল তারও ব্যবস্থা ছিল না। নানা কারণে সিপাহিদের বিজয়ের উৎসব ধরে রাখার অবস্থা ছিল বলে মনে করা হচ্ছিল। দিল্লির অধিবাসীরা অনেকে একত্র হয়ে নানা পরিকল্পনায় মেতে উঠেছিল। সেই প্রাণবন্ত সময়টি অনেককে আশাবাদী হয়ে ওঠার জায়গা তৈরি করে দিয়েছিল।

গ্রীষ্মের দাবদাহ মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে পেটের অসুখ ও ম্যালেরিয়া জ্বর। একে-দুয়ে অনেকে মারা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে উমরাও বেগম সামনে এসে দাঁড়ান। গালিব লেখার খাতা থেকে চোখ তুলে বলেন, কিছু বলবে বিবি?

চারদিকে মানুষের খুব অসুখ হচ্ছে।

মানুষ বেঁচে থাকলে তার তো অসুখ হবেই। অসুখ হওয়া শরীরের স্বাভাবিক নিয়ম। কেউ এই নিয়মের বাইরে থাকতে পারবে না।

আপনি বিষয়টিকে খুব সোজা করে দেখছেন।

গালিব হেসে উঠে বলেন, শুধু সোজা নয়, বিষয়টি আমার শরাবের মতো তরলও।

ব্রিটিশরা আরেকটি যুদ্ধে জিতেছে।

তাতে সিপাহিদের প্রাণশক্তির দেয়ালে আঘাত লাগেনি। অনেক নতুন নেতা হয়েছে। আমাদের আরও অনেক কিছু দেখতে হবে।

আমার মনে হচ্ছে আপনার তবিয়ত ঠিক নেই।

বিলকুল ঠিক আছে। হুসেন ও বাকির কী করছে?

জানি না। ওরা ভালোই আছে। জ্বর হয়নি।

তোমার মন খারাপ বিবি?

খারাপ তো হবেই। সাতটি সন্তানের জন্ম দিয়েছি। একটিও বেঁচে নেই। যিনি তাদের দিয়েছিলেন, তিনিই আবার নিয়ে গেছেন। বান্দার কী করার আছে।

আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি না, সুরা পান করি বলে তুমি আমাকে

দোষারোপ করো। কিন্তু তুমি পাঁচবার নামাজ পড়েও খোদাতায়ালার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছ। আমি কখনও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করি না। আমি আমার মতো করে খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

উমরাও বেগম মুখ ঝামটা দিয়ে বের হয়ে যান। গালিব মৃদু হাসেন। এভাবেই তো জীবন কাটিয়ে দিলেন। এভাবেই তো জীবনের আনন্দ-বেদনার দিন গুনে চলেছেন। এমন কে আছে যে, দিনযাপনের খতিয়ানে অনবরত ফুল ফোটাবে, গন্ধ ছড়াবে? আরিফের দুই সন্তান নিয়ে তাঁর খুব ভালো দিন কাটছে। শিশুরাই জগতের শ্রেষ্ঠ ধন। তাই বলে নিজের সন্তান না থাকার কারণে খোদাতালার কাছে তাঁর কোনো অভিযোগ নেই। জগৎপিতা দিয়েছিলেন, আবার নিয়ে গেছেন, সবই তাঁর ইচ্ছা।

ক'দিন পর তাঁর সাগরেদ হালি আসেন। ছোট্ট কুঠুরির দরজা দিয়ে মাথা নিচু করে ঢুকে শতরঞ্জির ওপরে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়েন। গালিব নিজে একা একা দাবার ঘুঁটি চালছিলেন। এটি তাঁর প্রিয় খেলা। হালির দিকে না তাকিয়েই বললেন, কী খবর হালি? সিপাহিদের খবর কী?

হালি গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, ব্রিটিশদের সঙ্গে দুটি যুদ্ধে হারলেও সিপাহিদের মনোবল অটুট আছে। তারা নিজেদের দারুণভাবে সংগঠিত করেছে। আরাবল্লী পর্বত বরাবর আক্রমণ চালিয়েছে।

গালিব মুখ না তুলেই বলেন, সাবাস। বাদশাহর খবর কী?

বাদশাহ ঠিকই আছেন। সিপাহিরা এমনই অনুমান করেছিল যে, বাদশাহ তাদের নেতৃত্ব দিতে ভুল করবেন না। বাদশাহর বড় ছেলে মির্জা মোগলকে প্রধান সেনাপতি করা হয়েছে। মন্ত্রী করা হয়েছে তার ছোট ছেলে জোয়ান বখতকে। কোতোয়ালকে বলা হয়েছে তার নিজের যে কাজ তা দেখাশোনা করতে।

বাহ, তুমি তো বেশ অনেক খবর রাখ দেখি।

গালিব চোখ তুলে তাকান। সকৌতুকে হালিকে দেখেন।

হালি গালিবের দৃষ্টি উপেক্ষা করে বলেন, সব খবরই রাখতে হবে। পিছিয়ে থাকার মানে নেই। আমি বুঝতে পারছি বিদ্রোহের পরে প্রশাসন সামলাতে না পারলে, যদি ব্রিটিশরা সিপাহিদের দমন করতে পারে, তাহলে মুসলমানদের কেটে শেষ করবে। এখন যেমন ইংরেজদের খতম করা হয়েছে, ঠিক তেমন।

তোমার কথা শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে হালি। আমি আতঙ্ক বোধ করছি।

এ শহরে আমরা যদি বেঁচে থাকি তাহলে আমাদের এই নিয়তির শিকার হতে হবে। হয় মৃত্যু, না হয় বেঁচে থাকা।

তার জন্য আমাদের কি কিছু করার আছে?

যে দেশপ্রেমিক সে সিপাহিদের সমর্থন করবে, যে নয় সে ব্রিটিশদের।

গালিব ভ্রূ কুঁচকে হালিকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, আমি তোমার কথা বুঝেছি। তুমি আমাকে প্রশাসনের পরিকল্পনার কথা বলো।

বাদশাহ প্রশাসনের মূল কাঠামোকে ঠিক রেখেছেন। পদের নামগুলো ফারসিতে বদলানো হয়েছে। আবার কিছু কিছু পুরনো প্রতিষ্ঠান, যেমন ধরুন সদর-উল-সদর, অর্থাৎ মুসলিম আইনের প্রধান ব্যাখ্যাকর্তাকে নতুন করে সাজানো হয়েছে। আর যেটা নতুন করে প্রতিষ্ঠা করা হলো, তা হলো সামরিক দরবার।

সামরিক দরবার! গালিব চমকে তাকান। চোখ বড় করে বলেন, বিষয়টি আমাকে বুঝিয়ে বলো।

এর প্রধান কাজ পৌর ও সামরিক বিষয়গুলো দেখাশোনা করা। মোট দশজন সভ্য আছে।

বুঝেছি। গালিব গম্ভীর কণ্ঠে বলেন। আরও বলেন, ক্ষমতার বদল হচ্ছে। তাই সাংগঠনিক স্তরে সামরিক প্রশাসনের আদল আনা হয়েছে।

হালি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, বাহবা, বাহবা। আপনি তো বুঝবেনই ওস্তাদ। আপনি বাদশাহর ওস্তাদ। দরবারে প্রতিদিন যাতায়াত করতেন। আপনার পক্ষে এসব বোঝা সহজ।

তুমি কি আমার সঙ্গে দাবা খেলবে?

না, আমি এখন যাব। আপনি যে মহীশূরের শাহজাদাকে নিজের বই পাঠালেন তার কোনো জবাব পেয়েছেন?

ও হ্যাঁ, তোমাকে বলতে ভুলেই গিয়েছি। তিনি প্রাপ্তি সংবাদ জানিয়েছেন এবং বইয়ের দাম জিজ্ঞেস করেছেন।

হালি ঔৎসুক্য নিয়ে বলে, তাহলে তো ভালোই। আপনি যে বই পাঠিয়েছেন তিনি তাঁর মূল্য পরিশোধ করবেন বলে দামের কথা জিজ্ঞেস করেছেন।

আমারও তাই মনে হয়েছে। সেজন্য আমি একটি জবাব লিখেছি। তুমি শুনবে? চিঠিটা পড়ব?

হ্যাঁ, শুনব। তাহলে আমি আরেকটুক্ষণ বসি।

গালিব চিঠিটা বের করে পড়তে শুরু করেন : আমি বুঝতে পারছি না যে

AMARBOI.COM

আপনি বইয়ের মূল্য কেন জানতে চেয়েছেন। মনে রাখবেন, আমি গরিব ঠিকই, কিন্তু ক্ষুদ্র আত্মার লোক নই। আমি কবি। কিন্তু ব্যবসায়ী নই। আমি বইয়ের ব্যবসা করি না। আমি পুরস্কার চাই, কিন্তু দাম চাই না। স্বাধীনচেতারা শাহজাদার নিকট যা পাঠায় তা নজরানা, আর শাহজাদা স্বাধীনচেতাদের যা পাঠান তা প্রসাদ। এটা ব্যবসা নয়, এতে হুজ্জতি বা ঝগড়ার কোনো অবকাশ নেই। আমি যে বই পাঠিয়েছি সেটা উপহার, পরে যা কিছুই পাঠাব তা নজরানা হিসেবে গণ্য করবেন।

পড়া শেষ হলে হালি বলে, ঠিক আছে, খুব ভালো। এটা স্বাধীনচেতা কবিরই চিঠি। আপনি চিঠিটা পাঠাতে পারবেন না। আমি আরেকদিন আসব। সেদিন আমাকে দেবেন। আমি ডাকঘরে নিয়ে যাব।

বহুত শুকরিয়া হালি। তুমি আমার যোগ্য সাগরেদ।

হালি ছোট কুঠুরি থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান। গালিব দাবার ছক নিয়ে আবার বসেন। শুনতে পান সিঁড়িতে দুপদাপ শব্দ। বুঝতে পারেন দুই নাতি উঠে আসছে। তাঁর মনে হয় ওদের চোখ জোড়া যেন ঝকঝকে বিশাল আকাশ। হুসেন ও বাকির দরজায় দাঁড়িয়ে একসঙ্গে ডাকে, নানাজান।

আসো, আসো।

দু'জনে দৌড়ে এসে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তোমরা কী করছ মানিক আমার?

আমরা আপনার জন্য বাদাম শীরা নিয়ে এসেছি। খাবেন?

এখন খাব না। তোমরা খাও।

আমরা একটু রাস্তায় যাব?

রাস্তায়? কেন?

আমরা মার্বেল খেলব।

তোমরা বাড়ির পেছনে খেল।

নানাজান, ওখানে তো কয়দিন ধরে খেলছি। আমাদের এক জায়গায় খেলতে আর ভালো লাগছে না।

ও আচ্ছা, তাই তো। তোমাদের একটি নতুন জায়গা দরকার। ঠিক আছে, চলো আমার সঙ্গে। তোমরা দু'জনে খেলবে আর আমি দাঁড়িয়ে থাকব তোমাদের জন্য।

চলেন, চলেন। দুই শিশু আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে।

নানাজান আপনিও আমাদের সঙ্গে খেলবেন কিন্তু।

ওরা গালিবের দুই হাত ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামে। দরজা

খুলে ওদেরকে নিয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়ান তিনি।

আপনি কখনও মার্বেল খেলেছেন নানাজান?

তোমাদের বয়সে তো অনেক খেলেছি। মার্বেল খেলতে আমার খুব ভালো লাগত।

আপনার মার্বেল ছিল?

হ্যাঁ, অনেক মার্বেল ছিল। অনেক রঙ-বেরঙের মার্বেল ছিল।

আপনার বন্ধু ছিল?

অনেক বন্ধু ছিল। বন্ধুরা ছাড়া কি খেলা চলে। যাও যাও, খেলতে যাও তোমরা।

দুজনে লাফিয়ে রাস্তায় নেমে যায়। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন গালিব। অল্পক্ষণে তিনি বুঝতে পারেন, ওরা খেলায় মগ্ন হয়ে গেছে, ওদের আর নানার কথা মনে নেই। গালিব নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকেন। বুকের ভেতর প্রবল শূন্যতা হা-হা করে। যেন পুরো শহরটা বুকের ভেতর লুটিয়ে পড়েছে। একটু পর তার কানে আসে কান্নার ধ্বনি। তিনি কান খাড়া করেন। কে কাঁদে? উমরাও বেগমের মতো মনে হচ্ছে যেন! তিনি ঘাড় ঘোরাতেই দেখতে পান ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে আছেন উমরাও বেগম। তিনি দু'পা পিছন ফিরে এসে জিজ্ঞেস করেন, কী হয়েছে? কাঁদছ কেন?

উমরাও বেগম চোখ মুছে বলেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

সর্বনাশ, সর্বনাশ হবে কেন? আমাদের বাড়ি তো কেউ লুট করেনি। তাছাড়া তোমার অলঙ্কারগুলো তো নিরাপদ জায়গায় রাখা হয়েছে। মিঁয়াকালে বাদশাহর ধর্মগুরু এবং ফকির হিসেবে সম্মানিত ব্যক্তি।

আপনি তো আপনার মতো কথা বলে যাচ্ছেন। সর্বনাশের কি কোনো চেহারা আছে?

আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

গহনাগুলো লুট হয়ে গেছে।

লুট হয়ে গেছে?

গালিব স্তম্ভিত হয়ে যান। বলেন, মনে আছে তোমার যে, আমি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তাঁর বাড়িতে অনেকদিন ছিলাম।

আমি তো ভেবেছিলাম, আমার দামি গহনাগুলো একজন ধার্মিক মানুষের জিম্মায় থাকলেই নিরাপদ থাকবে। কালে সাহেব সৎ। তিনি বাদশাহর নেক নজরে আছেন। তার গায়ে কেউ হাত দেবে না। তাছাড়া তিনি গহনাগুলো গোপন কুঠুরিতে রেখেছিলেন। মাটির দেয়াল দিয়ে কুঠুরির দরজা বন্ধ করা

AMARBOI.COM

ছিল। কথা বলতে বলতে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেন উমরাও বেগম।

কেঁদো না বিবি, কেঁদো না। যা আমাদের ভাগ্যে ছিল না তা নিয়ে বিলাপ করে লাভ কী? মনে করো যেন গহনাগুলো নিজেদের বাড়ি থেকেই লুট হয়ে গেছে।

উমরাও বেগম চোখ মুছে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নাতিদের ডাকেন। ঘরে আসতে বলেন। ওরা নানিজান বলে দৌড়ে আসে।

নানিজান আপনি আমাদের ডাকছেন কেন? আমরা আর কিছুক্ষণ খেলব। নানিজান আপনিও আসেন। আমাদের সঙ্গে খেলবেন।

না, মানিকরা আর খেলতে হবে না। তোমাদের গায়ে ধুলাবালি লেগেছে। তোমরা আসো, আমি তোমাদের গোসল করিয়ে দেব। দেখবে শরীর ঠাণ্ডা হবে। তখন তোমাদের খিদে পাবে।

ওদের মুখ শুকিয়ে যায়। খেলার আনন্দ শেষ হয়ে যাওয়ার কষ্টে ওরা কেঁদে ফেলে। কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির ভেতরে ঢোকে। গালিব বিড়বিড় করে বলেন, শিশুদের চোখের পানি দেখা গুনাহর কাজ। আমিতো তেমন গুনাহগার হতে চাই না।

হুসেন আর বাকিরের বাবা ছিল তার খুবই ঘনিষ্ঠ। একদিকে তিনি ছিলেন আত্মীয়, অন্যদিকে ছিলেন মধুরভাষী, চিন্তাশীল। গুছিয়ে কথা বলতেন। তাঁর সঙ্গে কথা বললে হৃদয় জুড়িয়ে যেত। কতদিন তাঁর সঙ্গে কেটেছে। কত সময় ধরে যে দু'জনে কথা বলে কাটিয়েছেন। যে সময়টুকু তাঁর সঙ্গে কাটাতেন সে সময়টুকু তাঁর মৃত্যুর পর ধুধু মরুভূমি হয়ে গেল—যেন পানিহীন, বৃক্ষহীন সময়। মেঘহীন, বসন্তের বাতাসহীন সময়। কখনও কোনো বন্ধুর মৃত্যু হলে তিনি দেখেছেন খানিকটুকু সময় এমন বেদনায় তলিয়ে গেছে শূন্যতার গর্ভে। হায় গালিব, তোমার অজস্র গজল তোমার ক্রন্দন মুছিয়ে দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত নয়।

তিনি নিজের লেখার জায়গায় এসে বসেন। দোয়াতে কলম ডুবিয়ে চুপ করে বসে থাকেন। জাইনুল আবেদীনের মৃত্যুর পর তিনি শোকগাথার আকারে একটি গজল লিখেছিলেন। কেমন করে দিন চলে গেল। তার দুই সন্তান এখন তাঁর ঘরে দৌড়ে বেড়ায়, খেলা করে। জীবনের কী বিচিত্র রহস্য। খোদাতালা সন্তানহীন মানুষকে সন্তান থেকে প্রাপ্ত সুখে ভরে দেন। তারা আছে বলেই তো তিনি জীবনের অন্য সুখ অনুভব করেন। বসন্তের বাতাস বুকে টেনে নিয়ে বলতে পারেন :

'মিহরবাঁ হো কে বুলা লো মুঝে চাহো জিস বক্ত হো

মৈঁ গরা বক্ত নহি হুঁ সির আ না সকুঁ।

দয়া করে যখন খুশি আমাকে ডেকে নাও।

আমি বিগত সময় নই যে, আবার আসতে পারব না।'

লিখতে লিখতে মাথা ঝুঁকে যায় কাগজের ওপর। লেখা শেষ হলে ঘরের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে বলতে থাকেন নিজের রচিত শের। যখন খুশি তখন আমাকে ডাকলে আমি ঠিকই হাজির হব। গালিব কখনও অতীতকাল হবে না। কখনও না। গালিব বর্তমানের। গালিব মুছে দেবে অতীতকে। গালিব, তোমার শেরই তো বর্তমানের সাক্ষী। কার সাধ্যি আছে তোমাকে অতীতের গর্ভে ছুঁড়ে ফেলবে? গালিব তোমার শরীরে ভরে আছে বসন্তের বাতাস। তোমার জীবন থেকে বসন্তের বাতাস কখনও দূরে যাবে না।

দু'হাতে দরজা-জানালা খুলে দেন তিনি। নিজেকেই বলেন, গালিবের কোনো বন্দি জীবন নেই।

AMARBOI.COM

মৃত্যুর মুশায়রা

কাগজের ওপর কাটাকুটি করতে করতে গালিব একটি ঘোরের মধ্যে ঢুকলেন।

বারবার লিখলেন, আমি যে শহরে বাস করি তার নাম দিল্লি। যে মহল্লায় আমার ঘর তার নাম বিল্লিমাঁরাও। দুটো বাক্য যতবারই লিখলেন ততবারই কাটলেন। কাটতে কাটতে কাগজের পৃষ্ঠা ভরে গেলো। কালি লেপ্টে গিয়ে হিজিবিজি রেখায় গোলকধাঁধার মতো দেখতে হলো পৃষ্ঠা। তিনি ভাবলেন, এই শহরে ঢুকলে আর বের হওয়া যায় না। অলিগলি, পথঘাট, খোলা মাঠ, গাছপালা, ঘরবাড়ি ঘরবাড়ি, ঘরবাড়ি— ঘরবাড়ির ঠিকানা হয়ে যায় বিল্লিমাঁরাও। তার আশেপাশে লালকেল্লা থাকে। লালকেল্লায় মুঘল সম্রাটরা থাকে। মুঘল সাম্রাজ্যের ঠিকানা হয় সে কেল্লা। সাম্রাজ্যের সম্রাট একজন কবি। কবি! এই শহরে গালিবইতো একা কবি— আকাশ সমান উঁচু মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। গালিবইতো এই শহরের মুশায়রার সবচেয়ে বড় কণ্ঠ— তাঁর মতো আর কে আছে?

তাঁর ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। তিনি কলমের নিবটা দোয়াতে চুবিয়ে রেখে উঠে পড়েন। শুরু করেন পায়চারি। দিল্লি এখন মৃত নগরী। সিপাহীরা পরাজিত হয়েছে। দিল্লি দখল করেছে ব্রিটিশরা। ওই ব্রিটিশ, ব্রিটিশরাজ— গালিবের কণ্ঠে দ্বিধা। কদিন ধরে শহরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ধ্বংসযজ্ঞ। গালিব

থমকে দাঁড়ান। যেন পা জোড়া আটকে গেছে মেঝেতে। তিনি আর নড়তে পারছেন না। চারদিক থেকে ভেসে আসছে মানুষের আর্তনাদ। তিনি আবার ফিরে আসেন টেবিলে। আঁকিবুকি কাটা কাগজটা দুমড়ে মুচড়ে টেবিলের এক কোণে রেখে দেন। নতুন একটি কাগজ টেনে বের করে দোয়াতে চুবানো কলমটা দ্রুত হাতে উঠিয়ে নিয়ে লিখতে থাকেন :

'দুঃখের রাগরাগিনীর মূল্যও বুঝতে শেখো, হৃদয় আমার;
অস্তিত্বের এই বিচিত্রবীণাটি একদিন নিঃশব্দ হয়ে যাবে।'

গজলটি লিখে গালে হাত দিয়ে বসে রইলেন। খুব কষ্ট হচ্ছে। বারবারই মনে হয় বুকের ধুকপুক শব্দটি যে কোনো মুহূর্তে থেমে যেতে পারে। হয়তো তখন গালিব নামের এই কবিকে চিনবে না দিল্লিবাসী। হয়তো বাতাসের মর্মর ধ্বনিতে উড়ে যাবে মুশায়রায় উচ্চারিত গালিবের কণ্ঠ। আর কি হবে? আর কি হতে পারে? গালিবের হাতে ধরা কলমটি নেমে আসে কাগজের উপরে। লিখতে শুরু করেন আরেকটি গজল :

'আমার এ গানের তিক্ততা ক্ষমার চোখে দেখো, গালিব,
হৃদয়ের ব্যথা আজ পূর্বের সকল মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।'

আবার কলমের মাথা বন্ধ হয়ে যায়। কলমটাকে রেখে দেন দোয়াতের পাশে। এক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখে ভাবেন, নিবের গায়ে লেগে থাকা কালিটুকু শুকিয়ে যেতে কতক্ষণ লাগবে? হয়তো বেশি সময় না, হয়তো বেশি— কে জানে। গ্রীষ্ম শেষ হয়ে গেলে এখনও বাতাস উষ্ণ এবং শুষ্ক। শরীরে তার স্পর্শ তেমনভাবে আরামদায়ক নয়।

তখন উমরাও বেগম দ্রুতপায়ে ঘরে ঢুকে স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেন, সব কি শেষ হয়ে গেল?

গালিব তাঁর দিকে তাকালেন না এবং কোনো উত্তরও দিলেন না। মুখ ঘুরিয়ে নিবিষ্ট মনে নিজের লেখা গজলের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ভাবলেন, কোনো কিছু যেন মাথায় এসে যাচ্ছে। কলমটা কি হাতে নেবেন?

উমরাও বেগম কণ্ঠস্বর খানিকটা উঁচু করে বলেন, কথা বলছেন না যে?

স্ত্রীর দিকে মুখ না ফিরিয়েই গালিব বলেন, ইচ্ছে হয় না কথা বলতে। কথা আমি লিখতেই জানি।

উমরাও বেগম কণ্ঠস্বর ঝাঁঝিয়ে বলেন, আপনি কথা বলতেও জানেন। আপনার মুখে রসিকতার ফুলকি ছোটে। বন্ধুদের সঙ্গে আপনি তা বলতেই থাকেন। আপনি এখন আমাকে রাগিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু।

গালিব এবার মুখ ফেরান। মৃদু হেসে বলেন, বেগমতো রাগবেই।

খোদাতালা তাঁকে রাগের শক্তি দিয়েছেন।

হ্যাঁ, রাগের শক্তিতো দেবেনই। কারণ আপনি আমাকে রাগিয়ে দেয়ার মতো রসিকতা করতেও ভালোবাসেন।

কোনটা বলতো? আমিতো মনে করতে পারছি না।

ঠিক, ঠিক ভুলে গেছেন?

বিলকুল ভুলে গেছি বেগম।

এটাও রসিকতা।

খোদার কসম, এটা রসিকতা না। তুমি বল বেগম? তাড়াতাড়ি বল। আমাদের ঘরের বাইরে দিল্লির মহল্লা, রাস্তাগুলো পুড়ছে।

ওহ, খোদা।

উমরাও বেগম দোপাট্টা দিয়ে মুখ ঢাকেন। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়ান। গালিব পেছন থেকে তাঁর হাত ধরে বলেন, বললে না আমার রসিকতার কথা।

উমরাও বেগম দু'চোখে আগুন ঝরান। তারপর তপ্ত কণ্ঠে বলেন, দিল্লির মতো আমার কলজেটাও পুড়ছে।

ওহ, বেগম। আসল কথাটা বলো।

আপনি একবার ওমরাও সিংয়ের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছিলেন।

গালিব মাথা নাড়িয়ে বলেন, আমার শিষ্য ওমরাও সিং?

হ্যাঁ, হ্যাঁ তিনি। উমরাও বেগমের কণ্ঠে ঈষৎ ব্যঙ্গ।

ওর দ্বিতীয় পত্নীর মৃত্যুর পরে আমি একটি চিঠি পেয়েছিলাম।

মনে আছে, ও চিঠিতে কি লিখেছিল?

তা আছে বৈকি। ও লিখেছিল, আমাকে এখন তৃতীয় পত্নী গ্রহণ করতে হবে। নইলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কে দেখাশোনা করবে।

মনে আছে আপনি কি লিখেছিলেন?

গালিব গড়গড়িয়ে বলেন, লিখেছিলাম, ওমরাও সিং তোমার জন্য আমার মায়া হচ্ছে, আর নিজের জন্য হিংসে হচ্ছে। তুমি দুবার বেড়িকাটার সুযোগ পেলে, আর আমি একান্ন বছর ধরে ফাঁসির দড়ি পরে আছি। দড়িটা ছেঁড়েও না, আমার প্রাণও বের হয় না। আমিতো গলায় ফাঁস আটকানো মানুষ।

আমি আপনার গলায় ফাঁস?

তা, নয়তো কি? আমিতো সত্যি স্বীকার করতে ভালোবাসি। বিবি তুমিতো চেনো আমাকে।

তারপরও আপনি আমার সঙ্গে ঘর করলেন? আপনি কবি। শের লেখেন।

কিন্তু স্ত্রীর কলজের আগুন দেখতে পান না। আপনি কেমন কবি? নিষ্ঠুর রসিকতা করে মজা পান।

উমরাও বেগম শব্দ করে কেঁদে ওঠেন। তারপর দ্রুতপায়ে চলে যান। গালিব নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকেন। জোরে জোরে আওড়াতে থাকেন নিজের লেখা প্রিয় শের—

'এ যে মানুষের হৃদয়, ইটপাথর নয়, ব্যথায় ভরে যাবে না কেন?
আমি হাজারবার কাঁদবো, কেউ আমাকে কাঁদায় কেন?'

দু'বার শের আউড়ে তিনি জানালার ঘুলঘুলি দিয়ে রাস্তা দেখার চেষ্টা করেন। দরজা বন্ধ। এই দুঃসময়ে দরজা খুলে রাখার সাহস নেই। ব্রিটিশ সৈন্যরা উন্মাদের মতো আচরণ করছে। জানালার ঘুলঘুলি দিয়ে খানিকটুকু বাতাস আসছে। তাতে গরমের উষ্ণ প্রবাহ কমছে না। ঘরও ঠাণ্ডা হচ্ছে না। তিনি হাঁ করে বাতাস টানলেন। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেন, এ বাতাস দিল্লি শহরের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া স্বাভাবিক বাতাস নয়। এ বাতাসে মানুষের আর্তনাদ মিশে আছে। দীর্ঘশ্বাস ও রক্তের গন্ধ নিয়ে বইছে। হঠাৎ বুকের ভেতরে প্রবল কাঁপুনি অনুভব করেন। ভয় আর আতঙ্কে তিনি দিশেহারা বোধ করলে চিৎকার করে স্ত্রীকে ডাকেন। উমরাও বেগম ততক্ষণে কিছুটা শান্ত হয়েছেন। মানুষটি এমনই— সেই বালিকা বয়স থেকে তাঁকে দেখছেন। দেখে শেষ করাতো হয়েইছে, তবে আর নতুন করে দুঃখ কি। তিনি হৃদয়ের জ্বালা প্রশমিত করার চেষ্টা করেন। এমন সময় শুনতে পান স্বামীর ডাক। বুঝতে পারেন যে তাঁর নিজের ভেতরে কোনো প্রশ্ন জেগেছে। তিনি সেই প্রশ্নের উত্তর তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন। উমরাও বেগম ধীর পায়ে স্বামীর ঘরে আসেন। বলেন, কি হয়েছে? আমাকে কেন দরকার হয়েছে আপনার?

বিবি আমি বেঁচে আছি কেন? বলতে পারো আমার বেঁচে থাকার কি দরকার?

উমরাও বেগম এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে বলেন, কারণ আপনি 'দস্তাম্বু' লেখা শেষ করেন নি।

গালিব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলেন, হ্যাঁ, আমার একটি বড় কাজ বাকি আছে। এটা আমি লিখে শেষ করবো। কিন্তু বিবি তারপরও বলো, আমি বেঁচে আছি কেন?

উমরাও বেগম চুপ করেই থাকেন। কারণ এরপর আর কোনো উত্তর তাঁর জানা নেই। মানুষ কেন বেঁচে থাকে একথার উত্তর তিনি নিজের মতো করে কিছু বলতে পারেন। কিন্তু তাঁর স্বামী কেন বেঁচে আছে এ উত্তর তিনি নিজের

মতো করেও বলতে পারবেন না। জোর গলায় বলতে পারবেন না যে তুমি আমার জন্য বেঁচে আছো। আমাদের ভালোবাসার সংসার আছে। ভালোবাসার সংসার রেখে কেউ মরে যেতে চায় না। গালিব বিরক্তির সঙ্গে বলেন, বেগম তুমি কথা বলছো না কেন?

আমার মনে হয় আপনি 'দস্তাম্বু' লিখতে বসলে আপনার মন থেকে খারাপ চিন্তা চলে যাবে।

গালিব উষ্মার সঙ্গে বলেন, এটা মোটেই খারাপ চিন্তা নয়। এটা দার্শনিক চিন্তা। একজন কবির চিন্তা। এত বছর ধরে ঘর করে একজন কবিকে তুমি বুঝতেই পারলে না।

আপনার জন্য আমি মিসতার শরবত পাঠাচ্ছি। খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করুন। এমন মরণের শহরে ঘরে বন্দী হয়ে থাকলে কবিতো পাগল হয়েই যাবে। কবির কি দোষ!

মরণের শহর! দিল্লি, আমার প্রিয় দিল্লি এখন মরণের শহর!

গালিব বিড়বিড় করেন। উমরাও বেগম তাঁর সামনে থেকে চলে গেছেন। নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ ঘর। কোথাও একটি টিকটিকির শব্দও নেই। আরশোলা দেখা যাচ্ছে না। পিঁপড়েও না। মানুষের মতো কি ওরাও শহর থেকে পালিয়েছে? কই কাকের ডাকও তো ভেসে আসছে না? তিনি টেবিলে এসে বসেন। 'দস্তাম্বু' যে খাতায় লিখছিলেন সেটা টেনে নিয়ে বসেন। সাদা পৃষ্ঠার ওপর কালির আঁচড় পড়তে থাকে; মহররম মাসের ২৬ তারিখ। ১৮ই সেপ্টেম্বর। শুক্রবার। মধ্যাহ্ন বিজয়ীরা লালকেল্লাসহ পুরো শহরটি দখল করে ফেলে। সিপাহী বিদ্রোহের অবসান ঘটে গেল। দিল্লির পথে পথে মানুষেরা আতঙ্কে ছুটোছুটি করছে। গ্রেফতারি ও হত্যার আতঙ্ক চারদিকে। চাঁদনি চকের সীমানার পরেই খুনজখমের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। রাস্তাগুলো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে দখল হয়ে আছে। ভয়াবহতার পরিমাণ বলে শেষ করা যায় না। ব্রিটিশদের মতো ক্রুদ্ধ সিংহ শহরে ঢুকেছে। অসহায় মানুষদের নির্বিচারে মেরে ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। প্রতিটি বিজয়ের পরে এ ধরনের নৃশংসতার প্রকাশ বুঝি এভাবেই ঘটে থাকে। তারপরও বলতে হয় এই ঘটনায় শহরে বাসকারী অসহায় মানুষদের বুক দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে গেল এবং গণহত্যা দেখে তারা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকল। বিজয়ীরা যাকেই সামনে পেয়েছে তাকেই কচুকাটা করেছে। অভিজাত মানুষেরা নিজেদের সম্মান বাঁচানোর জন্য ঘরের দরজা আটকে বসে আছে। অন্যভাবে বলতে হয় তাঁরা নিজেরাই নিজেদেরকে বন্দি করে রেখেছে। অভিজাতরাতো রাস্তায় হাঁটতে পারে না। তাঁরা পালকিতে চড়ে। এসব ভাবনা ভাবতেও বিরক্ত

লাগছে। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন। কিন্তু ভাবনা তাঁকে পেয়ে বসে। তিনি প্রসঙ্গক্রমে নিজের কথাই ভাবেন। কারণ তাঁকে ভাবতে হয়। সিপাহী বিদ্রোহ এবং ব্রিটিশদের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে নিজের অবস্থানের কথা চিন্তা করে আবার টেবিলে বসেন। কাগজ টেনে লিখতে থাকেন, দরিদ্র, কিন্তু সমাজের অন্য সবার থেকে আলাদা, যারা নিজেদের রুটি রুজির জন্য ব্রিটিশদের ওপর নির্ভরশীল ছিল, তারা বিভিন্ন মহল্লায় বাস করতো। কখনো এক সঙ্গে এক জায়গায় বাস করেনি। তারা এক একজন দ্বীপের মতো মানুষ। অস্ত্র সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। এমনকি কুঠার বা তীরধনুক সম্পর্কেও। তাই বিদ্রোহের সময় তারা সিপাহীদের পায়ের শব্দ পেলেও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তো। যুদ্ধ করতে পারার মতো মানুষই তারা ছিল না। কি যে দুঃসময় বয়ে গেছে তাদের জীবনের উপর দিয়ে। ভাবাই যায় না। তারা জানতো সব ধরনের কষ্ট সহ্য করে ঘরে বসে থাকতে। বন্দি জীবনযাপন করতেই তারা বুঝেছিল। এটাতো সত্যি ছুটে আসা পানির তোড়কে শুধু ঘাসের আঁটি দিয়ে আটকানো যায় না। এদের সবার মতো আমিও একজন অসহায় এবং আঘাত-জর্জর মানুষ।

এটুকু লিখে কলমটা দোয়াতে চুবিয়ে রাখলেন। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। জীবন-জগতের নানা চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। বেশি করে মনে পড়ছে নিজের কবিতার বই 'দীওয়ান' প্রকাশের সময়ের কথা। মানুষ অসহায় হয়ে পড়লে কি স্মৃতি তাঁকে বেশি করে তাড়িত করে? নিজের প্রশ্নের উত্তর তাঁর নিজের কাছেই নেই। তিনি আবার স্ত্রীকে ডাকেন। প্রবল বিরক্তি নিয়ে কাছে এসে দাঁড়ান উমরাও বেগম।

বলেন, কি হয়েছে?

আমার একটি শের তোমাকে শোনাতে চাই বিবি।

উমরাও বেগম মুখ ঝামটা দিয়ে চলে যেতে চাইলে তিনি তাঁর হাত টেনে ধরে বলতে থাকেন—

'জীবনের ঘোড়া ছুটে চলেছে, দেখো কোথায় থামে;
না হাতে আছে লাগাম, না পা আছে রেকাবে।'

আপনার এই শের আমি অনেকবার শুনেছি। বারবার শুনতে বিরক্ত লাগে।

বিবি, তুমি এভাবে বললে?

হ্যাঁ, বললাম। বলবোই। আপনার সঙ্গে ছুটতে ছুটতে আমার জীবনও শেষ। আমিতো মুখ থুবড়ে পড়েই গেছি। আপনি ঠিকই লিখেছেন শের-এ। আপনি লাগাম ধরতে জানেন না। রেকাবেও পা রাখতে জানেন না।

তুমি আজ নিষ্ঠুরের মতো কথা বলছো। বুঝতে পারছি ব্রিটিশদের রোষ

তোমাকে ভর করেছে। দিল্লির বাতাসে তোমার নিঃশ্বাস পূর্ণ হয়ে গেছে।

আজ আমাকে এইসব কথা বলে লাভ নেই। আমার শরীর ভালো নেই। আমাকে আর এভাবে ডাকাডাকি করবেন না। আপনার জন্য শামী কাবাব বানিয়ে রেখে আমি শুয়ে পড়বো।

তোমার অশেষ মেরেহবানী বিবি।

উমরাও বেগম যেতে চাইলে গালিব আবার তাঁর হাত টেনে ধরেন। উমরাও বেগম ভুরু কুঁচকে বলেন, আবার কি?

গালিব গভীর স্বরে বুকের ভেতর থেকে উঠিয়ে আনা শব্দরাজি ছড়িয়ে দিতে থাকেন—

'এদিকে তাকাও, আয়না হাতে অতো তন্ময় কেন?
দেখো, কি গভীর তৃষ্ণা চোখে নিয়ে আমি তোমাকে দেখছি।'

আপনার এই শের বারবণিতাদের জন্য, ঘরের বিবির জন্য নয়।

দিল্লি শহরের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নিষ্ঠুরতা আমি তোমার ভেতরে দেখতে পাচ্ছি। বিবি, তুমি যাও। হায় খোদা, এত যন্ত্রণা কেন আমাকে ভোগ করতে হয়!

গালিব উল্টো দিকে মুখ ঘোরান। উমরাও বেগমের চলে যাওয়া দেখতে চান না। তীব্র বিবমিষায় তাঁর শরীরী কম্পন তাঁকে বিপর্যস্ত করলে তিনি বিছানায় আশ্রয় নেন এবং পরমুহূর্তে সোজা হয়ে বসে বলেন, উমরাও বেগম ঠিক কথাই বলেছে। একবিন্দু মিথ্যে নেই। তিনি আবার শুয়ে পড়েন এবং অল্পক্ষণে তাঁর ঘুম আসে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ঘুম ভাঙে কাল্লু মিয়ার চেঁচামেচিতে।

হুজুর! হুজুর! হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে কাল্লু মিয়া।

তিনি ধড়মড়িয়ে উঠে বসেন। ক্রন্দনরত কাল্লু মিয়াকে দেখেন। কান্নার দমকে তাঁর শরীর কতখানি নড়ছে সেটা বুঝে বিষয়টি অনুমান করার চেষ্টা করেন। তারপরও চুপ করে বসে থাকেন। ঘুমের আমেজ কাটেনি তা নয়, কিন্তু কোলাহলহীন শহরের নিস্তব্ধতা বুকের মধ্যে অনুভব করেন। কাল্লু মিয়ার কান্নায় হেঁচকি উঠছে। এক সময় থামলে তিনি আস্তে করে বলেন, তুমি এক গ্লাস পানি খেয়ে এসো কাল্লু মিয়া। তোমার কলজে শুকিয়ে গেছে।

ঠিক বলেছেন, হুজুর। আমি পানি খেয়ে আসছি।

ও চলে গেলে গালিব চুপচাপ বিছানায় বসে থাকেন। মাথার মধ্যে নানা কিছু চিন্তা। নিজেকেই বলেন, ঘরের কোণায় খুব অসহায় হয়ে পড়ে থাকছি। এখন কলম আমার বন্ধু। যখন দিনলিপি লিখি তখন দুঃখের শব্দ ঝরে কাগজের

ওপর। আর নিজের চোখের পানি ঝরে বুকের ওপরে। কি করবো আমি? ব্রিটিশদের অত্যাচার নৃশংসতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ এই ব্রিটিশদের দেয়া পেনশনে আমিতো আমার পরিবার লালন-পালন করছি। পরিবারটি ছোট নয়। কাল্লুর মতো কয়েকজন আছে। দুই নাতি আছে। আমার স্ত্রী তাদেরকে খুব ভালোবাসে। আমিও ওদেরকে খুব ভালোবাসি। আমার নিজের সন্তানেরা কেউ বেঁচে নেই। মাঝে মাঝে ভাবি, ভালোই হয়েছে যে খোদাতালা ওদেরকে নিয়ে গেছেন। নইলে অভাবের মাঝে ক্ষুধার্ত শিশুদের দিকে তো আমি তাকাতেই পারতাম না। আফসোস করি না। আমার স্ত্রী বলে, আমার কলজে এজন্য কোনো আফসোস নেই। আফসোস থাকবে কেন? আমিতো মনে করি আমার জন্য এটা খোদাতালার মেহেরবানী।

এক মুহূর্তে হুড়োহুড়ি করে ঢুকে পড়ে দুই ভাই।

নানা, মিঠাই খাবো।

মিঠাই? গালিব বিমূঢ় হয়ে যায়।

নানা, মিঠাই, মিঠাই। দুই ভাই লাফাতে লাফাতে বলে, কতদিন মিঠাই খাইনি।

গালিব ওদের কাছে ডেকে আদর করে বলেন, এখনতো মিঠাই পাওয়া যাবে না। দোকানপাট সব বন্ধ।

কেন বন্ধ নানা? চারদিকে এত তুফান কেন? আমাদের গলিটাও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

হ্যাঁ, সে জন্যইতো মিঠাইয়ের জন্য কাউকে পাঠানো যাচ্ছে না।

আচ্ছা নানা, ওরা লোকজনদের মেরে ফেলছে কেন? ওই লালমুখো সাহেবগুলো খুব খারাপ। খুব শয়তান। আজকে যাই। কালকে কিন্তু মিঠাই খাবো। মিঠাই আমাদেরকে দিতেই হবে। কয়েকদিন ধরে নানি আমাদেরকে দুধও দিচ্ছে না।

আর একজন গালিবের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে, আখরোট, নাশপাতিও না।

শহরের অবস্থা ঠিক হোক তোমাদেরকে সবকিছু দেয়া হবে।

দেয়া হবে, দেয়া হবে— বলতে বলতে ওরা ঘরের মধ্যে ঘুরপাক খায়। তারপর একদৌড়ে ঘর ছাড়ে। আনন্দে গালিবের চোখ বুঁজে আসে। দু'চার ফোঁটা পানিও গড়ায় গালের ওপর। মনে পড়ে আগ্রায় তাঁর একটি চমৎকার শৈশব ছিল। ঘুড়ি ওড়ানোর বন্ধু ছিল বংশীধর। ওহ্, কতদিন বংশীধরের সাথে দেখা নেই। বংশীধর দিল্লিতে এলে ওর জন্য লাউ-কুমড়ো, ফলমূল নিয়ে

আসতো। ঝুড়ি বোঝাই করে আনতো। দুজনে মিলে শৈশবের স্মৃতিচারণ করে মেতে উঠতো— কি আনন্দ ছিল! কতটুকুই বা সময়ের জন্য ওরা ফিরে যেতো শৈশবে, কিন্তু মনে হতো দিনগুলো হারিয়ে যায়নি। এই এখন যেমন এই বাচ্চাদের শৈশবে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি ওদের স্মৃতি থেকে হারিয়ে যাবে না।

গালিব বিছানা থেকে নামার জন্য পা ঝুলিয়ে দিলে ফোঁসফোঁস করতে করতে কাল্লু মিয়া ঢোকে।

হুজুর, হুজুর আমার প্রাণের দোস্ত বশির মিয়া নাই।

বশির মিয়া? কোন বশির মিয়া? গালিব ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করেন।

গোস্তের দোকানদার। কসাই বশির মিয়া। গোস্তের সবচেয়ে বড় টুকরোটা ও আপনার জন্য রেখে দিত। ওটা দিয়েইতো শামী কাবাব বানানো হতো। আপনি খেয়ে খুব আনন্দ পান।

গলির রাস্তাতো বন্ধ। তুমি খবর পেলে কি করে?

ও কেমন আছে খোঁজ নেয়ার জন্য আমি লুকিয়ে বের হয়েছিলাম। হুজুর, ও একা নয় ওর সঙ্গে আরও অনেক রাস্তার ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে। হায় আল্লাহ, এ কেমন দিন এলো আমাদের জীবনে! ওই গোরা সৈনিকেরা দিল্লি শহরের একজন মুসলমানকেও বাঁচতে দেবে না।

কাল্লু মিয়ার কান্না থামে না। ঘরের মেঝেতে বসে কাঁদতে থাকে। গালিব অন্যমনস্ক চিন্তায় ওর কান্নার শব্দ শোনেন। যেন শব্দ যমুনা নদীর ওপর দিয়ে অনেকদূরে চলে যাচ্ছে। পৌঁছে যাচ্ছে ওর শৈশবের আগ্রা শহরে— ওখানে উড়ছে ওর শৈশবের ঘুড়ি। সেই ঘুড়ি শব্দ নিয়ে উড়ে যাচ্ছে আকাশে কিংবা অন্য কোথাও। গালিব বিড়বিড় করে বলেন, অন্য কোথাও। অন্য কোথাও। অন্য কোথাও। দেখতে পান কাল্লু মিয়া চোখ মুছতে মুছতে চলে যাচ্ছে। তখন তিনি উঁচু কণ্ঠে ওকে ডাকেন। কাল্লু মিয়া ফিরে এসে দাঁড়ায়। তিনি অন্যমনস্ক হয়ে যান। কি যেন বলতে চেয়েছিলেন ওকে।

হুজুর, আমাকে ডাকলেন কেন?

তুমি কি আমার ভাই ইউসুফ মীর্জার খবর আনতে পারো?

আমার রাস্তায় বের হতে ভয় করে।

ভয়?

হ্যাঁ, হুজুর, ভয়। ভয়। সৈনিকগুলো আমাকেও মেরে ফেলতে পারে, এই ভয়।

আমার ভাইয়ের বাড়ি তো এখান থেকে বেশি দূরে নয়। তাছাড়া আমার ভাই গোস্ত বিক্রি করে না। ও একটা পাগল। ত্রিশ বছর বয়সে ওর পাগলামি

ধরা পড়ে। সেই থেকে, কাল্লু মিয়া সেই থেকে এখন পর্যন্ত ও আর ভালো হয়নি।

আমি এসব জানি হুজুর।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমিতো সবই জানো। তুমিতো আমার পরিবারেরই একজন। কাল্লু মিয়া আমি তোমাদের সবাইকে খুব ভালোবাসি। এতবড় পরিবার টানতে আমার খুব কষ্ট হয়। তারপরও—তারপরও আমি চাই তোমরা সবাই আমার সঙ্গে থাকবে। আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।

কাল্লু মিয়া অকস্মাৎ গালিবের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বলে, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি হুজুর যেভাবে হোক আমি ইউসুফ হুজুরের খবর আপনাকে জানাবো।

সাবধানে যেও।

হ্যাঁ, আমাকেতো সাবধানেই যেতে হবে এবং ফিরে আসতে হবে। নইলে আমি কেমন করে আপনাকে খবর জানাবো। সেলাম, হুজুর।

কাল্লু মিয়া দ্রুতপায়ে বেরিয়ে যায়। গালিবের মনে হয় তাঁর শরীর কাঁপছে। তিনি বেশি কিছু ভাবতে পারছেন না। তাঁর ভাই সারাদিনে কি খেলো, রাত্রে ঘুমুতে পারছে কিনা কে জানে, কোনো খবরই পাচ্ছেন না। একজন মানুষ উন্মাদদশা নিয়ে ষাট বছরের বেশি সময় ধরে বেঁচে আছেন। এই যন্ত্রণার কথা কাকে বলবেন? স্ত্রী আর মেয়েরাই বুঝতে পারে তাঁকে? না, একদমই না। তিনি কাউকে বিরক্ত করেন না, চেঁচামেচি করেন না, নিজের মনে থাকেন। হায় খোদা, কাল্লু মিয়া কি খবর আনবে কে জানে। আমি যদি জাদু জানতাম তাহলে কারো পিঠে পাখা লাগিয়ে উড়িয়ে দিতাম। না জাদু জানলেও কাজ হতো না। ওদেরকে আমি এখানে নিয়ে আসতে পারতাম না। কোনো খাবারও পাঠাতে পারতাম না। ইউসুফ মির্জার কি খাবার পছন্দ তাও আমার জানা নেই। এই শহরে আমরা দু'ভাই বাস করি, কিন্তু একে অপরকে ঠিকভাবে জানি না। আমার কি দুর্ভাগ্য! আমার কষ্ট আমি কাউকে ভাগ করে নিতে পারি না। আমার স্ত্রীর সঙ্গেও আমার দূর দূর ব্যবধান।

গালিব ধীর পায়ে বারান্দায় আসেন। বালতি থেকে চোখে মুখে পানি দিয়ে নিজেকে শীতল করেন। পানির স্পর্শ তাঁকে স্নিগ্ধই করে। তিনি স্বস্তি বোধ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হয় 'দস্তাম্বু'র পৃষ্ঠা ভরাবেন হিন্দুস্থানবাসী এবং ব্রিটিশদের ভূমিকার কথা লিখে। যারা ন্যায় বিচারের কথা বলে এবং অত্যাচারের নিন্দা করে তাদের জানা উচিত যে গদরের সময় হিন্দুস্থানের সিপাহীরা নির্বিচারে হত্যা করেছে। হত্যা করেছে অসহায় নারীদের, এমনকি

দোলনায় খেলতে থাকা শিশুদেরও। সে সঙ্গে ইংরেজদের আচরণও খতিয়ে দেখা যায়। যখন তারা জিতলো, তারাও বদলা নেয়ার লড়াই শুরু করলো, বিরোধিতাকারীদের শাস্তি দিতে শুরু করলো। শহরবাসীরাতো গদরকে সমর্থন করেছিল। তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করতে পারতো ইংরেজরা। কিন্তু করেনি। তারা নারী ও শিশুদের রেহাই দিয়েছে। তারা এটা করেছে এজন্য যে অপরাধী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে। ওরা যদি উন্মত্ত হতো তাহলে এই শহরের কুকুর-বেড়ালকেও বেঁচে থাকতে দিতো না। এখন আমাকে রাণী ভিক্টোরিয়ার নামে কসীদা লিখতে হবে। তাঁর কাছে আমার তিনটি প্রার্থনা আছে। আমরাতো সবাই জানি গ্রিস, ইরান এবং অন্যান্য অনেক দেশে কবি-সাহিত্যিকদের কতভাবে সম্মানিত করা হয়— তাদের দু'হাত মুক্তো দিয়ে ভরে দেওয়া হয়, কখনো কখনো বখশিশ দেওয়া হয়, ইনাম দেওয়া হয়। রাণীর কাছে আমার প্রার্থনা এই যে তিনি নিজে আমাকে একটি খেতাব প্রদান করবেন। তিনি আমাকে দরবারি পোশাক-খিলঅত উপহার দিবেন এবং সামান্য কয়েক টুকরো রুটির ব্যবস্থা করবেন। যদিও আমি জানি আমি তাদের পেনশনভোগী। তারপরও বারবার আমাকে রুটির জন্য আবেদন করতে হয়। এসবই কপালের লিখন। সব মানুষেরই ভাগ্যতো নির্ধারিত থাকে। আর এই বেঁচে থাকার জন্য সামগ্রী দিয়ে দেয়া হয়। এই যে জীবন চলছে, এর মধ্যেই থাকে বিপদ এবং বিপদ থেকে রক্ষা। কারো সাধ্য নেই এর থেকে বাইরে যাওয়া। ছোট বাচ্চারা যেমন সব তামাশাতে মজা পায়, আনন্দ করে, এই বুড়ো বয়সে আমারও উচিত সময়ে যা কিছু ঘটছে সেটাকে খুশি মনে মেনে নেয়া। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এই একমাত্র উপায় সম্বল করে আমার শেষ দিনগুলো কেটে যাক, নিজের জন্য এই আমার প্রার্থনা।

গালিব বারান্দা থেকে ঘরে আসেন। পানি দিয়ে ধোয়া মুখ গামছায় মোছা হয়নি। পানির স্পর্শ লেগে আছে ত্বকে। তিনি দাড়িতে হাত বোলান। তারপর চুল এলোমেলো করেন। মনে মনে ভাবেন, এক পেয়ালা সুরা পেলে সময়টা খুব আনন্দে কাটাতে পারবেন। এই দুঃসময়কে মনোরম করার আর কিইবা উপায় আছে। তিনি নিজের শের আওড়াতে থাকেন—

'নাদা হো যো কহতে হো কে কিয়োঁ জিতে হ্যায় গালিব
কিস্মৎ সে হ্যায় মরণে কী তামান্না কোঈ দিন অন্তর।
অবুঝ লোকেরা বলে গালিব কেন বেঁচে
ভাগ্যে রয়েছে বাঁচার ইচ্ছে কিছুদিন আরও!'

সত্যিতো তাঁকে বাঁচতে হবে আরও। কেন মারা যাবেন? ইংরেজরা দিল্লি

দখল করার পরে বাদশাহ কেমন আছে খোঁজ পাননি। পাবেনই বা কি করে ঘরে তো বন্দি তিনি। মহম্মদ ইব্রাহিম জওকের মৃত্যুর পরে বাদশাহ তাঁকে দরবারের কবির পদে বরণ করেছিলেন। আসলে জওকের মৃত্যুর পরে এই পদের দাবিদার আর কবি ছিলেন না। তিনি খুব খুশি মনে পদটি গ্রহণ করেননি। কারণ তিনি জানতেন তিনি যেমন বাদশাহর কবিতার তেমন প্রশংসা করেন না, বাদশাহও তাঁর কবিতার দারুণ সমজদার নন। তিনি 'শায়র-উল-মূলক' হলেন বটে কিন্তু জওকের মতো 'মালিক-উল-শুয়ারা' অর্থাৎ কবিদের রাজা উপাধি তাঁর পাওয়া হবে না। তাছাড়া পারিশ্রমিকও বাড়েনি। বাদশাহর ওস্তাদ হওয়ায় বাদশাহর কবিতা তাঁকে সংশোধন করতে হতো। মাঝে মাঝে ভাবতেন কাজটি কখনো খুব কঠিন। কারণে অকারণে প্রশংসা করা সহজ কাজ নয়। সে তিনি বাদশাহই হোন বা অন্য কোনো কবিই হোন না কেন। তাতে কিছু এসে যায় না। তাঁর বোঝাটাই সত্য।

তিনি ঘরের মাঝে এসে দাঁড়ান। এখন একজন বন্ধু থাকলে বেশ হতো। এই দারুণ সময়কে তিনি গজলের মধ্যে বেঁধে ফেলতে পারতেন। তাঁর দীর্ঘশ্বাস উড়িয়ে দিতে পারতেন। তিনি ঘরে পায়চারি করতে করতে আবারও ভাবেন, কেমন আছে বাদশাহ? একবার ঈদ উপলক্ষে বাদশাহর সামনে একটি কসীদা পাঠ করেন তিনি। বাদশাহ তাঁর কবিতার প্রশংসা করতেন না। কসীদা শুনে বললেন, 'মির্জা তুম পড়তে বহোৎ খুব হো।' তাঁর আবৃত্তির প্রশংসা করলেন। গালিবতো জানেন মুশায়রায় তিনি যখন পাঠ করেন তখন উপস্থিত সবাই তাঁর পাঠে উচ্ছ্বসিত থাকেন। এ ব্যাপারে তাঁর সুনামের কমতি নেই। কিন্তু বাদশাহ যখন বলেন, তখন বাদশাহ কসীদার প্রশংসা এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই করেন, এটা তিনি বুঝতে পারেন। পরস্পরকে বোঝার মধ্য দিয়ে সম্পর্কের সূত্র তৈরি হয়। কবিইতো বুঝবেন অন্তরের কথা। কবিইতো জানেন কোনটা নকল রঙ, কোনটা তামাশা, কোনটা বুকের ভেতরের খাঁটি রঙ। সেদিন তাঁর খুব মন খারাপ হয়েছিল। ফেরার পথে বন্ধু সইফতার বাড়ি গিয়েছিলেন। ওর সঙ্গে কথা বলে স্বস্তি পেয়েছিলেন। মনের দুঃখ লাঘব হয়েছিলো। সেদিন দু'জনেই একমত হয়েছিলেন যে, খাঁটি পৃষ্ঠপোষক পাওয়া কঠিন। এই মুহূর্তে বন্ধু সইফতা, তুফতা এবং আরও অনেকের কথা মনে হয়। গদরের শুরু থেকেই কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই।

দোস্ত, তোমরা কেমন আছ?

তিনি চেয়ারে বসেন। টেবিলের ওপর কনুই রেখে হাতের তালুতে মুখ রেখে মাথা কাৎ করেন। এটি তাঁর একটি প্রিয় ভঙ্গি। স্মৃতি রোমন্থন কিংবা নানা

কিছু ভাবনার সময় এই ভঙ্গিতে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। গদরের প্রসঙ্গ মনে হতেই ভাবলেন, গদরের ঘটনাটি তো একদিনের নয়। থাক, এ প্রসঙ্গ। তিনি নিজের মাথা ঠাণ্ডা রাখতে চাইলেন। পরে বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন।

ঘরে এলেন উমরাও বেগম।

গালিব ভুরু উঁচিয়ে এক মুহূর্ত তাঁকে দেখলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, কি হয়েছে বিবি?

ইংরেজরা শহরের লোকজনকে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

কে জানালো খবরটা?

খাদিমা। ওরা চলে যাচ্ছে।

কোথায় যাচ্ছে?

শহরের বাইরে কোনো খোলা জায়গায় ওদের পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে।

ওরা কোথায় থাকবে?

খোলা আকাশের নিচে নিশ্চয় না। খাদিমা বলেছে ওরা কোনো ব্যবস্থা করবে। তাঁবু চাইতে পারে কারো কাছে কিংবা মাথার ওপরে অন্য কোনো ছাউনির চিন্তা ওদের আছে। খাদিমা বলেছে ওরা শুধু ভয়ে-আতঙ্কে শহর ছেড়ে যাচ্ছে না। ওরা কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছে।

গালিব গভীর শ্বাস টেনে বললেন, তবু ওরা বেঁচে আছে। ওরা হয়তো একদিন আবার ফিরে আসবে শহরে।

উমরাও বেগম দোপাট্টায় চোখ মোছেন। কাঁদতে কাঁদতে বলেন, ওরাতো শত শত মানুষকে মেরেও ফেলেছে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়েপুড়িয়ে দিয়েছে।

ওহ, বিবি তোমার কষ্ট কলজের মধ্যে গেঁথে রাখো। আমাকে আমার পরিবারের কথা ভাবতে দাও। তুমিতো জানো বিবি এপ্রিল মাস পর্যন্ত আমি দিল্লির কালেক্টরি থেকে পেনশন পেয়েছি। গদরের মাস থেকে পেনশন বন্ধ হয়ে আছে। আমি এখন খুবই দুশ্চিন্তায় আছি। আগে তুমি আর আমি ছিলাম। এখন দুটি এতিম শিশু আমাদের সঙ্গে আছে।

উমরাও বেগম মাথা নেড়ে বলেন, এখন ওদেরকে দুধ মিঠাই কাবাব রুটি ঠিকমতো খাওয়াতে পারছি না।

ভেবে দেখো। আমরা কত দুঃখে আছি। এছাড়া আমাদের সংসারে কতজন আশ্রিত আছেন। পেনশন না পেলে ওদের দেখাশোনাই বা কীভাবে চলবে।

উমরাও বেগম চোখ উজ্জ্বল করে বলেন, ইংরেজরা ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। এবার আপনার পেনশন আবার চালু হবে। ঠিক বলেছি?

গালিব দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলেন, ঠিক কিনা এখনও জানি না। আমিতো বাদশাহর সভাকবি ছিলাম। ওরা আমাকে বিশ্বাস করবে তো?

তিনি তাঁর দু'হাত চুলের ভেতর ঢুকিয়ে মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে বলেন, বিবি আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

যাই, দু'টুকরো শুকনো রুটি নিয়ে আসি।

শুধু শুকনো রুটি?

আরতো কিছু নেই। কোথায় থেকে আসবে?

বলতে বলতে উমরাও বেগম চলে যান। গালিব নিজেকে শক্ত করে ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি তো খবর পেয়েছেন, শহরের যে কোনো যুবক এবং সমর্থ মুসলমানকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওদেরকে হত্যা করা হয়েছে। তা সে অপরাধী বা নিরাপরাধী— যেই হোক না কেন।

তিনি দু'পা হেঁটে আবার ভাবলেন, আমার প্রতি যারা শত্রুতার মনোভাব লালন করে, যারা ব্রিটিশদের বিশেষ বন্ধু তারা আমার বিরুদ্ধে এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে পারে। এটা তারা করতেই পারে আমাকে বিপদে ফেলার জন্য।

তিনি ঘরে পায়চারী করলেন। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকেই বললেন, আমিতো সেই মধ্য দুপুরের কথা ভুলে যাইনি, যেদিন ঘোড়ার খুরের শব্দে কেল্লার দেয়াল ও দরজাগুলো কেঁপে উঠেছিল। মীরাটের উন্মত্ত সিপাইরা ছিল নেমকহারাম এবং ইংরেজদের রক্তের জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল। ওরা রক্তলোলুপ দুর্বৃত্ত। শহরের প্রবেশদ্বারের রক্ষীরা ওদের সঙ্গে জুটে গিয়েছিল। ওরা শহর রক্ষা করার দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়েছিল। প্রভুর প্রতি নিজেদের বিশ্বস্ততার কথা ভুলে গিয়েছিল। আর শহরবাসীর অনেকে তাদের অভ্যর্থনা জানালো। সিপাহীদের সঙ্গে এক হয়ে লুটতরাজ আর হত্যায় লিপ্ত হয়ে গেলো। এখন তার পরিণাম ভোগ করতে হচ্ছে।

দু'টুকরো রুটি নিয়ে ঘরে আসেন উমরাও বেগম। সঙ্গে এক গ্লাস পানি। স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনার ভুরু কুঁচকে আছে কেন? আপনি কি কিছু ভাবছেন?

ভাবছিলাম গদরের কথা। সেদিন সিপাহীরা যে ইংরেজকে সামনে পেয়েছিল তাকে হত্যা করেছিল। বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ওরা থামতে পারেনি।

এসব কথা থাক এখন। আপনি রুটির টুকরো দুটো খেয়ে ফেলুন।

গালিব রুটির টুকরোটা হাতে নিতে নিতে বলেন, যাদেরকে শহরের বাইরে

পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ওদের মধ্যে আমার কোনো বন্ধু থাকলে কি হবে? কেমন করে যোগাযোগ করবো? আমরা যারা শহরের ভেতরে রয়ে গেলাম তারা যদি ওদের খবরাখবর নিতে পারতাম তাহলে খানিকটা দুশ্চিন্তা থেকে দূরে থাকতে পারতাম।

তা ঠিক। উমরাও বেগম দোপাট্টা দিয়ে মুখের ঘাম মোছেন।

এখন আমরা হৃদয় যন্ত্রণায় কাতর।

তারচেয়েও বড় শহরের মানুষেরা ইংরেজদের হত্যাকাণ্ডে আতঙ্কিত।

হ্যাঁ, শহরটা এখন একটা মৃত্যুজমিন। বসন্তের ফুল ফোটা বন্ধ থাকবে, শীতের উত্তরের বাতাস বইবে না। বর্ষার বৃষ্টি ধারা যমুনায় পড়বে না। মৃত্যুজমিন মানুষের শোণিতে—

উমরাও বেগম রুদ্ধকণ্ঠে স্বামীকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, আপনি এভাবে বলবেন না। আমি সহ্য করতে পারছি না।

দ্রুতপায়ে চলে যান। গালিব শুকনো রুটি শেষ করে গ্লাসের পানি খান। মনে হয় বুকটা পুড়ে যাচ্ছে। প্রবল জ্বালা ছড়িয়ে যাচ্ছে মৃত্যুজমিনে বসবাসকারী একজন কবির হৃদয়ে।

পরদিন কাল্লু মিয়া মির্জা ইউসুফের খবর নিয়ে আসে। গালিবের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকে, হুজুর।

গালিব ওর দিকে ঘুরে তাকালে কাল্লু মিয়া দেখতে পায় তাঁর দুচোখ লাল। শরীর বোধহয় জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। কিংবা মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। কাল্লু মিয়া বুঝতে পারে না যে এ সময় কি তাঁকে মির্জা ইউসুফের খবর দেয়া ঠিক হবে কিনা? গালিব ইশারায় কাল্লু মিয়াকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, আমার ভাইয়ের বাড়িতে যেতে পেরেছিলে?

পেরেছিলাম। সেখান থেকেই আমি এই মাত্র এসেছি।

গালিব উদগ্রীব কণ্ঠে বলেন, কেমন আছে আমার ভাই? তুমিতো জানো না যে ও আমার চেয়ে মাত্র দু'বছরের ছোট। আমার খুব আদরের ভাই। বলো ও কেমন আছে?

ভালো আছে হুজুর। তবে—

তবে— তবে কি? থামলে কেন?

তাঁর বিবি ও মেয়েরা অন্যদের সঙ্গে দু'দিন হলো শহর ছেড়ে চলে গেছে।

কে আছে ওর সাথে। মানে ওর দেখাশোনা—

বুড়ো দারোয়ান আছেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আকরামা খুব ভালো লোক, খুব বিশ্বস্ত।

তাঁর পরিচারিকাও আছে।

আহা, বুড়ো নেকজানের মা। ওরা দুজন ছাড়াতো ওর সংসার অচল। বুঝলে কাল্লু মিয়া আমার ভাই দু'জন ভালো লোকের দেখাশোনাতেই আছে। তুমি ওকে সুস্থ দেখেছ তো?

হ্যাঁ, তিনি সুস্থই আছেন। দারোয়ান ভাইয়া বললো খাওয়া-দাওয়ার একটু অসুবিধে হচ্ছে।

সেতো হবেই। সবই নসীব। আমরা এখন দুর্যোগের মধ্যে বাস করছি। তুমি যাও কাল্লু মিয়া। তোমাকে শুকরিয়া যে তুমি জানের ঝুঁকি নিয়ে আমার ভাইয়ের খবর এনেছো। জানোতো ইংরেজরা এই শহরের মুসলমানদের বাঁচিয়ে রাখবে না। ওরা রক্তের বদলা নিচ্ছে।

যত কিছু হোক না কেন আমি আপনার ভাইয়ের খবর আপনাকে এনে দেবো। আমি সময়-সুযোগ বুঝে ওই বাড়িতে যাবো হুজুর।

সাবধানে যাবে।

আপনি ঘাবড়াবেন না হুজুর।

কাল্লু মিয়া চলে গেলে গালিব লিখতে বসলেন। কলমটা দোয়াতে চুবিয়ে লিখলেন,

'এখন অস্ত্রধারী ইংরেজ সেনা স্বেচ্ছাচারী ও স্বাধীন।

আতঙ্কহিম নিশ্চল মানুষ, পথ জনহীন।'

ভাইয়ের স্ত্রী ও মেয়েদের শহর ছেড়ে চলে যাওয়া তাঁকে খুব মর্মাহত করে। তারা তাঁর ভাইকে রেখে চলে গেছে। হায় খোদা! তিনি গভীর আক্ষেপের সঙ্গে আবার লিখলেন :

'নিরানন্দ বাসভূমি আজ কারাগার

চক পরাজিতের রক্তে রঙিন।'

চাঁদনি চক তাঁর প্রিয় জায়গা। সেই জমিন আজ রক্তে ডুবে যাচ্ছে! না, ভাইয়ের স্ত্রী ও মেয়েদের প্রতি তাঁর কোনো ক্ষোভ নেই। ক্ষোভ পুষবেন কেন? তাঁদেরওতো জীবনের ভয় আছে। মানুষতো বাঁচতে চায়। তিনি নিজেও ষাট বছরের বেশি সময় ধরে বেঁচে আছেন। আরও বেঁচে থাকতে চান। তাঁর বেঁচে থাকার তৃষ্ণায় অনন্ত ধারায় পানি সিঞ্চিত হোক। সতেজ থাকবে বয়সের নবীন চারা। পরক্ষণে আবার মন খারাপ হয়ে যায়। দিল্লির বর্তমান সময় তাঁকে তাড়িত করে ফিরছে। নিজেকে সামলে রাখা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আবার লিখলেন :

'নগর মুসলমানের শোণিত-তৃষিত
প্রতিটি ধুলিকণা তৃপ্তিবিহীন।'

শের তিনটি একটি আলাদা কাগজে লিখলেন। শের তিনটি 'দস্তাম্বু'তে রাখবেন না। দিনলিপির অংশ হবে না এগুলো। কারণ 'দস্তাম্বু' বই হয়ে বের হলে ওটা ব্রিটিশদের হাতে পড়তে পারে। তারা তাঁর ক্ষতি করতে পারে। কে জানে। কাগজটি ভাঁজ করে আলাদা রাখলেন। বন্ধুদের চিঠিতে শেরগুলো জুড়ে দিলে যারা লক্ষ্ণৌ বা আগ্রায় বাস করছে তারা বুঝতে পারবে যে দিল্লির অবস্থা কেমন যাচ্ছে। গালিব দু'হাতে চোখের জল মোছেন। বাসগৃহ কারাগার হয়ে গেলে একজন মানুষের বেঁচে থাকা কতটা অর্থহীন হয়ে যায় এটা তারচেয়ে বেশি কে আর বুঝবে! তিনি চেয়ারে মাথা ঠেকিয়ে শূন্য ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

এক পেয়ালা শরবত নিয়ে ঘরে আসে বাকির।

নানা আপনার জন্য শরবত এনেছি।

বাহ, বহুৎ আচ্ছা। আমার মনে হচ্ছে আমি মনে মনে শরবত খেতে চেয়েছিলাম।

সত্যি!

হ্যাঁ, সত্যি। তুমি এখন যাও বাকির।

আপনি কি করবেন?

আমি লিখবো।

আপনি কি লিখবেন?

আমি একটা দিনলিপি লিখছি।

আপনিতো সব সময় লিখেন নানা। আমার জন্য একটা গজল লিখবেন?

তোমার জন্য গজল? উঁহু, পারবো না। তোমার জন্য লেখা খুব কঠিন। আমি লিখতে পারবো না।

থাক, না পারলে লিখতে হবে না। আপনার দিনলিপির নাম কি নানা?

'দস্তাম্বু'।

দস্তাম্বু, দস্তাম্বু! সুন্দর নাম। আচ্ছা আমি যাই।

দৌড়ে চলে যায় বাকির। এই ছোট বাচ্চা 'দস্তাম্বু' মানে কি বুঝলো কিনা কে জানে। ওর বোঝার বয়সই বা কি। গালিব চুমুকে চুমুকে শরবত শেষ করেন। ভাবেন, বিবির মেজাজ ভালো আছে। নইলে নাতিকে দিয়ে শরবত পাঠাতো না। ভালো লাগে তাঁর। তিনি 'দস্তাম্বুর' পৃষ্ঠা খুলে বসেন। লিখতে শুরু করেন :

AMARBOI.COM

১৮ সেপ্টেম্বর

শুক্রবার জুম্মার দিন। ২৬ মহরম। যেসব সিপাহী বিপদগামী হয়েছিল, উন্মত্ত হয়ে এই শহরে প্রবেশ করেছিল, ঝড়ের মতো তাণ্ডবে ঘোড়ার খুরের শব্দে ভরিয়ে দিয়েছিল শহর, তারা এখন পালাতে শুরু করেছে। যেদিন ইংরেজ সেনানায়ক পাহাড়ি এলাকা থেকে নেমে বিজয়ীর বেশে শহরের প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করল সেদিনই শহর ও কেল্লা দখল করে নিল। হত্যা আর গ্রেফতারের খবর এই গলিতে এসে পৌছালো। আতঙ্কে শীতল হয়ে গেল সকলের কলজে।

এটুকু লিখে তিনি আবার কাটলেন। কেটে পৃষ্ঠাটা টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। ভাবলেন, আবার নতুন করে লিখবেন। আসলে যা লিখতে চাইছেন তা হচ্ছে না। এই আতঙ্কিত শহর আমার বুকটা ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। শরীরের চেয়ে আমার বুক অনেক বেশি আহত এবং যন্ত্রণাদগ্ধ। অনেক বেশি পীড়িত। কত বেশি যে পীড়িত তা আমি কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করতে পারবো না।

তিনি একটা কিছু লিখবেন তা ভাবার আগেই দুই নাতি এসে হাজির হয়।

নানা, আপনার লেখা কি শেষ হয়েছে?

নাতো? কেন?

আমরা চাই আপনি আমাদের সঙ্গে গলিতে মার্বেল খেলবেন।

আমার শৈশবে আমি ঘুড়ি উড়াতাম। মার্বেল খেলতাম।

এখন আবার খেলবেন। আপনি তো তেমন বুড়ো হননি নানা।

কে বলেছে বুড়ো হইনি? অনেক বুড়ো হয়েছি। আমি এখন বাদশাহর সভাকবি।

সভাকবি! দুই বাচ্চা পরস্পরের দিকে তাকায়। তারপর বলে, আমরাই খেলবো। আপনার যেতে হবে না। আমরাতো গলিতে খেলতে পারি নানা?

না, না গলিতে খেলতে যেও না।

গলির মুখতো পাথর দিয়ে বন্ধ। কেউ খুলতে পারবে না।

ও হ্যাঁ, তাইতো। গালিব অন্যমনস্ক হয়ে মাথা নাড়েন।

দুই ভাই দৌড়ে বেরিয়ে যায়।

তিনি তাঁর 'দস্তাম্বু'র পৃষ্ঠায় লেখেন :

গলির দরজা বন্ধ

এই গলিতে দশ/বারোটি বাড়ি আছে। গলিটির মুখ একটিই। কানাগলি বলতে হবে। গলির বেশিরভাগ বাড়ির লোকেরা চলে গেছে। নারীরা বাচ্চাদের বুকে আগলে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। তাদের হাতে দু'একটা পটুলিও ছিল। পুরুষরা যা বহন করা যায় তেমন জিনিসপত্রের গাঁটরি নিয়ে চলে গেছে। ওহ,

এমন দৃশ্য আমাকে দেখতে হয়েছে। কদিন ধরে এমন দৃশ্য দেখলাম। আমরা যারা রয়ে গেলাম তারা ঠিক করলাম গলির মুখটা বন্ধ করে দেবো। আমরা সবাই মিলে একটি পাথর দিয়ে গলির মুখ আটকে দিলাম। এই গলিতে কোনো কুয়ো নেই। তারপরও এমন করতে হয়েছে। গলিটির আগে একটি চোখ ছিল, এখন দুটোই গেছে। পুরোই অন্ধ হয়ে গেছে বিল্লিমাঁরোওর এই গলি।

এটুকু লিখে তিনি কলমটা দোয়াতে ঢোকালেন। আরও কিছু লিখবেন বলে ভাবলেন। শহরের চিত্র ভেসে ওঠে। ১৫ সেপ্টেম্বরের পর থেকে শহরের বাড়ির দরজাগুলো বন্ধ। যে যেভাবে পেরেছে পালিয়ে গেছে। নইলে খুন হয়েছে। দোকানগুলো বন্ধ। গম আটা ইত্যাদি কেনার জন্য দোকানদার নাই। কাপড় ধোয়ানোর জন্য ধোপা নাই। চুল কাটানোর জন্য নাপিত নাই। ময়লা সাফ করার জন্য মেথরও নাই। গলির লোকেরা পানির জন্য বাইরেও যেতে পারছে না। গলিটাকে পাথর দিয়ে বন্ধ করে যে অন্ধকার তৈরি করা হয়েছে, সে অন্ধকারে আমার হৃদয়ও পূর্ণ হয়ে আছে।

তখন উমরাও বেগম ঢোকেন। খানিকটুকু উত্তেজিত।

এই অবস্থা আর কতদিন চলবে? যেটুকু দানাপানি মজুদ ছিল তা শেষ হয়ে এসেছে। আর দু'একদিন চলতে পারে।

গালিব নিস্পৃহ কণ্ঠে বলেন, আমার কি করার আছে?

বাইরে বের হয়েতো দেখতে পারেন। কিছু করা যায় কিনা তার চেষ্টাতো করতে পারেন।

বিবি বসো। আমাকে ভাবতে দাও।

পাতিয়ালার মহারাজা গলি রক্ষার জন্য যাদের দাঁড় করিয়েছেন, ওদের সঙ্গে কথা বলুন।

ঠিক আছে, আমি সেটাই করে দেখছি।

উমরাও বেগম ফোঁস করে বললেন, আশ্রিতদের সবাইকে ঠিক মতো খাবার দিতে পারছি না। একটু একটু করে ভাগ করে দিয়েও কুলাচ্ছে না। গত রাত থেকে তিন-চারজন না খেয়ে আছে। দু'চার গ্লাস পানি খেয়ে কাটাবে সে অবস্থাও নাই। আগেতো গলির লোকেরা পানি আনতে পারতো, আটাও পাওয়া যেতো।

জানি, বিবি এসব আমি জানি।

তাহলে এমন বসে আছেন কেন? কেন নড়াচড়া করছেন না?

যাচ্ছি, এখুনি যাচ্ছি।

গালিব চপ্পল পায়ে গলিতে নামেন। পাহারায় যে রক্ষী ছিল তাকে বললেন,

আমি বাইরে যেতে চাই। ভীষণ জরুরি দরকার।

হুজুর, আপনার কি দরকার আমাকে বলবেন?

এই কিছু সওদা করা দরকার।

রক্ষী দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলে, চকের বাজার পর্যন্ত যেতে পারবেন হুজুর।

সেটুকু যেতে পারলেই হবে।

বোধহয় হবে না হুজুর।

কেন?

হত্যা-খুনে বাজারও খুব গরম। আমি আপনাকে না যেতেই বলি হুজুর। রাস্তাও খুব খারাপ। নানা ধরনের বিপদ আছে রাস্তায়। যাবেন না হুজুর।

আচ্ছা থাক। নাইবা গেলাম। কিন্তু পানি ছাড়া তো চলছে না।

আমরা ঠিক করেছি পানি আনার জন্য দরজা খুলে দেবো। যার যার বাড়ি থেকে কোনো পুরুষ মানুষ গিয়ে পানি আনবে। এখনতো শহরে ভিস্তিওয়ালারা নেই যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পানি দিয়ে আসবে।

যার ঘরে যেটুকু পানি মজুত ছিল তাই দিয়ে কদিন চললো। আরতো চলছে না।

হুজুর আপনি বাড়ি যান। আজাদ বা কাল্লু মিয়াকে মটকি বা ঘড়া দিয়ে পাঠিয়ে দিন।

গালিব খানিকটুকু আশ্বস্ত হয়ে ধীরেসুস্থে বাড়ি আসেন। দূর থেকেই দেখতে পান যে উমরাও বেগম দুই নাতির হাত ধরে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। উদগ্রীব চোখের দৃষ্টি। কাছে যেতেই বলেন, কিছু হলো?

পানির সুরাহা হয়েছে। ভৃত্যদের পাঠাও। রক্ষী দরজা খুলে দেবে।

মিঠা পানি পাওয়া যাবেতো?

সেতো আর আমি বলতে পারবো না।

উমরাও বেগম ঝংকার দিয়ে বলে, তাতো পারবেন না। পারবেন কি? পারবেন শুধু—

আহা থামো বিবি। দেখো নাতিরা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে।

উমরাও বেগম মুখ ঘুরিয়ে নাতিদের হাত টেনে চলে যান। একটু পরে দুজন কাজের ছেলে ঘড়া নিয়ে ছুটতে থাকে। গালিব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, আমাদেরকে যিনি প্রতিপালন করেন তিনি আমাদেরকে ভুলবেন না। খোদার প্রতি সে কৃতজ্ঞ থাকে না—শয়তান যাকে ভর করে।

পানি পাওয়ার সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত গালিব অস্থির হয়ে রইলেন। ঘরে-বারান্দায় পায়চারি করতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে দুই নাতি হাতে দুটো গ্লাস

নিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইল। দু'একবার শুধু বললো, পানির জন্য মরে যাচ্ছি। বুক ফেটে যাচ্ছে নানা।

সবুর করো তোমরা। সবুরে মেওয়া ফলে।

ওরা কাতর চোখে নানার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

শেষ পর্যন্ত মটকি ভরা পানি নিয়ে ফিরে এলো দুজনে। আজাদ দরজার সামনে মটকি নামিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বললো, হুজুর আমাদেরকে দূরে যেতে দেয়া হয়নি। মিঠা পানি পাইনি। নোনা পানি নিয়ে আমাদেরকে ফিরে আসতে হয়েছে।

শুকুর আলহামদুলিল্লাহ। তবুতো পাওয়া গিয়েছে। তোমরা পানি পান করো বাচ্চারা।

দু'ভাই এক চুমুক পানি পান করে মুখ কুঁচকায়।

নানা খেতে পারছি না।

উমরাও বেগম পেছনে দাঁড়িয়ে বলে, একটু একটু করে খাও বাচ্চারা।

গালিব চারদিকে তাকিয়ে বললেন, আমাদের তৃষ্ণার আগুন এভাবেই নেভাতে হবে।

তিনি নিজেও একটু একটু করে এক গ্লাস পানি পান করলেন। তাঁর মনে হলো মাথার ওপর থেকে খররোদ সরে গেছে। চারদিকে ছায়া নেমেছে। আজ তিনি দেয়ালের ওপর একটি চড়ুই পাখি বসে থাকতে দেখেন। মাথার ভেতরে একটি শের তৈরি হয়—

'গোলাপের কলিগুলি পাপড়ি মেলেছে বিদায় জানাবার জন্য;
হে বুলবুল, চলো এবার, চলে যাচ্ছে বসন্তের দিন।'

শেরটি তখুনি লিখতে বসলেন না। মাথায় রাখলেন। ভাবলেন, ঘুম পাচ্ছে। জাগরণে স্বপ্নে শেরটি ধরে রাখার জন্যই শুয়ে পড়লেন। অল্পক্ষণে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

কয়েক দিন পরে সুবেদার সীতারাম রাতের অন্ধকারে গালিবের কুঠুরিতে আসে। শতরঞ্জির উপর লুটিয়ে পড়ে বুকভাঙা কান্নায় ফোঁপাতে থাকে। গালিব তাঁর হাত ধরেন মাত্র। বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত, ভাঙা গাল-চোয়াল, কোটরগত চোখ সর্বস্ব সীতারামকে চিনতে তাঁর কষ্ট হয়েছিল।

কেঁদেকেটে অনেকক্ষণ পরে স্থির হয়ে উঠে বসে সীতারাম। তারপরও বারবার ঘাড় কাত হয়ে যায়। গালিব তাঁকে সময় দেন। এক সময় সীতারাম কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলে, আমার পুত্র নাই।

তোমার পুত্র অনন্তি? অনন্তি রামের কথা বলছো?

হ্যাঁ হজরত। ফায়ারিং স্কোয়াডে ওরা আমার অনন্তির মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করেছে।

তুমি পানি খাবে সীতারাম?

না, লাগবে না। এখন আমার আর কিছুই লাগে না। তারপর নিজেই বলে, সেদিন ওরা আমাকে ফায়ারিং স্কোয়াডের ডিউটিতে রেখেছিল। আমার ছেলের প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে ওদের পায়ে ধরেছিলাম আমি।

আমি জানি তুমি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেঙ্গল নেটিভ ইনফেনট্রির সুবেদার। সীতারাম তারপরও মাফ পাওনি?

হ্যাঁ, হজরত, তারপরও। তবে একটা জায়গায় মাফ পাই। ফায়ারিং স্কোয়াডের ডিউটি থেকে আমি রেহাই চেয়েছিলাম। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পরে মেজর সাহেব আমাকে সেই ডিউটি থেকে বাদ দেন। আমি কীভাবে আমার পুত্রের বুকে গুলি চালাতে পারি হজরত, আপনি বলুন?

গালিব মাথা নিচু করে থাকেন, যেন সীতারামকে কোনো কথা বলার সাধ্য তার নেই। আসলেই তো নেই। তাঁর এখন বোবা হয়ে থাকার সময়। মাঝে মাঝে এমন সময়ই তাঁর জীবনে আসে। আবার ধ্বনিত হয় সীতারামের কণ্ঠ, পরদিন আমার ছেলেসহ অনেক সিপাহীকে ফায়ারিং স্কোয়াডে নিয়ে যাওয়া হয়। শুধুমাত্র সন্দেহের বসে তারা এই কাজটি করেছিল। হজরত, আমি ব্রাহ্মণ। সকালে আমার তাঁবুতে বসে মন্ত্র জপ করছিলাম। শুনলাম গুলির শব্দ। ঝাঁকবাঁধা গুলির শব্দ।

সীতারাম দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ে। আবার থামে। বলে, সেই শব্দ আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেল যে আমার ছেলে নেই। আমি একবার শুধু ভাবতে পেরেছিলাম যে আমার চল্লিশ বছরের চাকরির এই পুরস্কার। কেউ নেই তো আমাকে দয়া দেখানোর জন্য। হজরত, ওদের কাছে মৃত্যু এখন একটা উৎসব।

গালিব মাথা তুলে তাকান। পূর্ণ দৃষ্টিতে সীতারামকে দেখেন। সীতারাম বলে, আমাদের সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে হিন্দুস্থানের পক্ষে লড়াই করেছে। ওরা ইংরেজদের মেরেছে প্রতিশোধের আগুন থেকে। আমি আমার চাকরি জীবন থেকে এটা বুঝেছি। ওদের নুন আমি খেয়েছি। তবে এটা বুঝেছি ওরা পশু, পশুর মতো। সেদিন ওরা সিপাহীদের মেরে ফেলে রেখেছিল। চিল, শকুন, শিয়ালের খাবার বানিয়েছিল। মেজর আমাকে আবার একটু দয়া দেখিয়েছিল। আমি আমার পুত্রের মৃতদেহ

সৎকারের সুযোগ পেয়েছিলাম। ভগবান আমার এই প্রার্থনা পূরণ করেছেন হজরত।

গালিব তাঁর মুখোমুখি বসে হাত জড়িয়ে ধরে রাখেন শুধু। এবারও তিনি কথা বলতে পারেন না। সীতারাম দু'হাতে চোখের জল মুছে বলে, আপনি কি বাদশাহর খবর জানেন হজরত?

না, আমি তো ঘরে বন্দী? কোথা থেকে খবর পাব!

সীতারাম সোজা হয়ে বসে বলে, ইংরেজরা শহরে প্রবেশ করার কয়েকদিন পরেই বাদশাহ বেগম ও যুবরাজদের নিয়ে লালকেল্লা ছেড়ে সম্রাট হুমায়ুনের সমাধিতে আশ্রয় নেন। সঙ্গে অনেক সিপাহি ছিল।

গালিব উদগ্রীব কণ্ঠে বলেন, তারপর?

মেজর হডসনকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল বাদশাহকে গ্রেফতার করার জন্য। তবে কাজটি সহজ ছিল না। হডসন নানা কৌশল করে বাদশাহকে আত্মসমর্পণ করার জন্য বাধ্য করেন। এখন তাঁকে লালকেল্লায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। তাঁর বিচার করা হচ্ছে।

যুবরাজরা কেমন আছেন? তাঁদের কেউ কেউ কবিতা লিখতেন।

সীতারাম ভগ্ন কণ্ঠে বলে, বিভিন্ন জনের মুখে মুখে শুনেছি পাষণ্ড হডসন সবাইকে হত্যা করেছে। শুনেছি মুঘলদের শেষ সম্রাটকে ইঁদুরের মতো গর্ত থেকে বের করবার জন্য এবং তাঁর পুত্রদের শেষ করে দেবার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জেনারেল মন্টগোমারী। হজরত, খবর এখন বাতাসের বেগে উড়ে বেড়ায়।

সীতারাম একটুক্ষণ থেমে আবার বলে, হডসন তিনজন যুবরাজকে গ্রেফতার করে গরুর গাড়িতে তুলে দেন। এক সময় তাঁদেরকে জামাকাপড় খুলে ফেলার হুকুম দেন। তারপর নিজে গুলি চালিয়ে তাঁদেরকে হত্যা করেন।

গালিব এবারও মাথা নিচু করে বিধ্বস্ত অবস্থায় বসে থাকেন। তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে। চোখের পানিতে ভেসে যাচ্ছে মুখমণ্ডল। হাত তুলে মোছারও শক্তি তাঁর নেই। সীতারাম তাঁর এই অবস্থা না দেখেই বলতে থাকে, কয়েকজন যুবরাজের লাশ কোতোয়ালীর সামনে একদিন এক রাত ঝুলিয়ে রাখা হয়। আরও কুড়িজন যুবরাজকে ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

সীতারাম এক মুহূর্ত থেমে বলে, আরও শুনেছি যে দু'জন যুবরাজের ছিন্ন মুণ্ড বাদশাহকে হডসনের উপহার হিসেবে পাঠানো হয়েছে।

সীতারাম, আমি আর কিছুই শুনতে চাই না। সীতারাম তুমি থামো।

আমি চলে যাই।

পারবে যেতে?

চেষ্টা করে দেখি।

সীতারাম চলে গেলে গালিব শতরঞ্জির উপর পড়ে থাকলেন। বিভিন্ন জনের ডাকাডাকিতে তিনি সাড়া দিলেন না।

দু'দিন পরে বৃষ্টি নামলো। বর্ষা মৌসুম শুরু হয়েছে। আকাশ কালো করে চারদিক কাঁপানো বৃষ্টি। বাড়ির সবাই বৃষ্টির পানি ধরার জন্য মেতে উঠলো। উঠোনে একটি চাদর টানিয়ে তার নিচে ঘড়া-মটকি রেখে দেয়া হলো। টানা বৃষ্টিতে ভরে গেল পাত্রগুলো। পানি দেখে খুশি সবাই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন উমরাও বেগম। দোপাট্টা দিয়ে ভিজে যাওয়া মুখ মুছতে মুছতে বললেন, বেশ কিছুদিনের জন্য নিশ্চিত হওয়া গেলো।

গালিব মৃদু হেসে বললেন, বেশ অনেকদিন পরে তোমার হাসিমুখ দেখতে পেলাম বিবি।

উমরাও বেগম ভুরু কোঁচকালেন। মুখে কিচ্ছু বললেন না। মাথার ওপর থেকে দোপাট্টা সরিয়ে হাত খোঁপা করে রাখা চুল ছড়িয়ে দিলেন পিঠের ওপর। দীঘল কেশরাশির দিকে তাকিয়ে গালিব বললেন, আমাদের একদিন কৈশোর ছিল।

থাকবেইতো। আমরাতো জন্মেই বুড়িয়ে যাইনি। তার জন্য আপনার দুঃখ হচ্ছে?

হয়ইতো। সৌন্দর্য নষ্ট হলে মানুষের দুঃখ হওয়াই স্বাভাবিক।

বয়সেরও সৌন্দর্য আছে। মানুষের বয়স এক জায়গায় থেমে থাকলে আপনারা কবি হতে পারতেন না।

বাব্বা, বিবি তুমিতো বেশ কথা বলেছো।

যাই, পানি মজুত রাখার ব্যবস্থা করি। আপনি কি আর এক গ্লাস বৃষ্টির পানি খাবেন?

বৃষ্টির পানিতো খোদার মেহেরবানী। আমাকে আরও দু'চার গ্লাস পানি দিও দুপুরের খাবার সময়।

আচ্ছা দেবো। আপনি কি এখন আপনার কৈশোর নিয়ে কসীদা লিখবেন?

ভেবে দেখি। তারপর উমরাও বেগমের হাত টেনে ধরে বলেন :

'কোঈ দিন গর জিন্দাগানী অওর, হ্যায়
আপনে দিল মে হমনে ঠানী অওর হ্যায়।

জীবন যদি আরও কিছুদিন থাকে,

মনে মনে আমি ঠিক করেছি, কিছু অন্যরকম।'

উমরাও বেগম মৃদু হেসে বলেন, তা আমি জানি। আমাকে বিয়ে করে আপনি খুশি নন। আপনি সব সময় অন্য রকমই ভেবেছেন এতগুলো বছর।

গালিব একদৃষ্টে উমরাও বেগমের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ভেবেছিলেন বৃষ্টিস্নাত বর্ষার স্নিগ্ধতায় তাঁর বিবি জীবনের দুঃখ ধুয়ে ফেলবেন। দেখলেন উমরাও বেগমের জীবনে বৃষ্টি শুধুই খাওয়ার পানি।

উমরাও বেগম ভুরু কুঁচকে বলেন, দেখছেন কি? আপনি আমাকে কয়েকদিন পর পর বলেছেন, যখন আমার আব্বাজান মৃত্যুর গভীর নিদ্রায় চলে গেলেন, সেই সঙ্গে আমার ভাগ্যও নিদ্রায় ডুবে গেলো।

হ্যাঁ আমিতো আমার ভাগ্যের কথা বলেছি।

কিন্তু আপনার আব্বাজানের মৃত্যুর পরে আপনার চাচাজানের কোলে ঠাঁই পেয়েছিলেন। সেটাওতো ভাগ্যবানের লক্ষণ।

ঠিকই বলেছো বিবি।

তাহলে স্বীকার করেন যে আপনার ভাগ্য নিদ্রায় তলিয়ে যায়নি।

গালিব এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেলেন। তারপর প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলতে শুরু করলেন, আমার চাচাজান জেনারেল লর্ড লেক বাহাদুরের খুব বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন। তিনি চারশো ঘোড়সওয়ারের সর্দার ছিলেন। আগ্রার কাছে দুটি পরগণার মালিক হয়েছিলেন।

তারপরও আপনি কেন বলেন যে, আপনার ভাগ্য—

আহ বিবি, থামো থামো। তুমিতো জানো আমার চাচাজানের মৃত্যুর পরে ইংরেজ সরকার পরগণা দুটি ফিরিয়ে নিয়েছিল।

উমরাও বেগম এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে বলেন, পরগণার বদলে আপনাকে এবং আপনার ভাইকে পেনশন মঞ্জুর করেছিল ইংরেজ সরকার।

হ্যাঁ, তা করেছিল। আমরা বেশ আরামেই ছিলাম।

আমাদের বিয়ের পরে আমার আব্বাজান আপনাকে দিল্লি নিয়ে এসেছিলেন। আপনি আসাদ নামে কবিতা লিখবেন না গালিব নামে লিখবেন তা আমার আব্বাজান ঠিক করে দিয়েছিলেন। এখন আপনি একজন বড় কবি। বাদশাহর সভাকবি।

বিবি, তুমি একজন বেশ আলেমদার মহিলা। তোমার অনেক বুদ্ধি।

এই বুদ্ধি দিয়ে এখন পানি মজুদ করার ব্যবস্থা করবো। নসীব আপনা আপনা। আপনার চেয়ে আমার নসীবই নিদ্রায় তলিয়ে গেছে। আমার চেয়ে এটা আর কে বেশি জানে।

গালিবকে আর কোনো কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে উমরাও বেগম দ্রুতপায়ে ঘর ছাড়েন। গালিব বড় করে শ্বাস টানেন। উমরাও বেগম তাঁকে অনেক কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলেন। তিনি 'দস্তাম্বু'র খাতা খুলে লিখলেন, 'আমার পাঁচ বছর বয়সে পিতা আবদুল্লাহ বেগ ইন্তেকাল করলেন। আমার নয় বছর বয়সে আমার চাচা নসরুল্লাহ বেগ ইন্তেকাল করলেন। মৃত্যু আমার ভাগ্যকে অন্ধকারে নিয়ে গেলো। নইলে আমার আরও অন্য কিছু হতে পারতো। আমি জানি না তা কি।'

সেদিন সন্ধ্যেবেলা একুশ বার তোপধ্বনি শুনতে পেল শহরের অধিবাসী। গালিব কান খাড়া করে শুনলেন। ভাবলেন কি হলো? একুশ বার কেন? তিনি তো জানেন লেফটেনান্ট গভর্নর এলে সতেরোবার তোপধ্বনি হয়। গভর্নর জেনারেল এলে হয় উনিশ বার। কি হয়েছে তার কোনো খবর পাওয়ার উপায় নেই। তবে কি ওরা বিদ্রোহীদের সঙ্গে আর একটি লড়াইয়ে জিতেছে? সে জন্যই হবে হয়তো। এখনো বিদ্রোহীরা কয়েক জায়গায় লড়াই করছে। বেরিলী, ফররুখাবাদ, লক্ষ্ণৌ— জিততে পারবে না জেনেও লড়াই। মানুষতো এমনই। সহজে পরাজয় স্বীকার করতে চায় না। আস্তে আস্তে সব যুদ্ধেই জিতবে ইংরেজরা। আস্তে আস্তে ওরা— তিনি থামলেন। ভাবলেন, এখনো অবরুদ্ধ এই শহর। আর কতদিন লাগবে তাদের মুক্ত হতে? সে রাতে ঠিকমতো ঘুমুতে পারলেন না তিনি। উঠলেন, পানি খেলেন। শেষ রাতে ঘুম এলো। ঘুম যখন ভাঙলো তখন বেলা বেশ গড়িয়েছে।

বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে উমরাও বেগম ডাকাডাকি করছেন তাঁকে। তাঁর পেছনে কাল্লু মিয়াসহ আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে।

তিনি ধড়মড়িয়ে উঠে বসে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে বিবি?

সর্বনাশ হয়েছে। ইউসুফ ভাই সাহেবের বাড়ি লুট হয়ে গেছে। কাল্লু মিয়া তার খবর জানতে গিয়েছিল।

জ্বী হুজুর। আমি নিজে দেখে এসেছি। গলির আরও অনেকের বাড়ির সঙ্গে তার বাড়িও লুট হয়েছে।

আমার ভাই কেমন আছে?

তিনি ভালো আছেন। তাঁর বুড়ো দারোয়ান আর বুড়িকে কিছু বলেনি লুটেরারা।

যাক, বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি।

গালিব হিসেব করে বললেন, ইংরেজরা শহর দখলের সতেরো দিন পরে এমন ঘটনা ঘটলো। যাক, আমরা ভাগ্যবান যে আমার ভাইয়ের গায়ে ওরা হাত

দেয়নি। কাল্লু মিয়া, ওই বাড়িতে দানাপানি আছে তো?

আছে হুজুর। বুড়ো দারোয়ান দুজন হিন্দুকে আশ্রয় দিয়েছেন। ওই দুজন থাকাতে খানিকটা সুবিধা হয়েছে। ওরা দানাপানি যোগাড়ের চেষ্টা করে। বুড়োর তেমন কষ্ট হয় না। বুড়ো বরং হাফ ছেড়ে বেঁচেছে।

যাক, এটা একটা সুখবর। কি বলো বিবি?

হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।

গালিব পায়ে চপ্পল গলিয়ে খাট থেকে নামেন। বারান্দার দিকে যেতে যেতে বলেন, বুকটা বেশ হালকা লাগছে। খোদা মেহেরবান।

বালতি থেকে পানি নিয়ে মুখে ছিটানোর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, লুটপাট করলো কে? সিপাহীরা বিদ্রোহ করলে শহরের ঘরবাড়ি লুটপাট হয়, ইংরেজরা বিজয়ী হলেও লুটপাট হয়। তাহলে লুটপাটের হোতা দিল্লিবাসীরা। হাঃ! নিজেদের লোকই নিজেদের শত্রু। দুঃসময়ে তারা নিজেরা বন্ধুর আচরণ করে না। সে জন্যই চারদিকে এত জ্বালা-যন্ত্রণা। তিনি আবার ঘরে ফিরে আসেন। মুখ জুড়ে, হাতে, গলায় ফোঁটা ফোঁটা পানি লেগে থাকে। কপাল থেকে একটি সরু ধারা গালের ওপর গড়িয়ে আসে। তিনি হাত দিয়ে পানি মুছতে মুছতে বলেন, বেশ আরাম লাগছে। ভালোই তো আছি।

পরদিন দুপুরবেলা। আকাশে মেঘ আছে, তবে বৃষ্টি নেই। ভ্যাপসা গরম অস্বস্তিকর। গালিব নিজেই হাতপাখা নিয়ে নিজেকে বাতাস দিচ্ছেন। কিছু লিখবেন বলে ভাবছেন, অন্তত 'দস্তাম্বু'র পৃষ্ঠা ভরাবেন বলে চিন্তা করছেন। তখুনি হন্তদন্ত হয়ে ঘরে আসে আজাদ।

হুজুর। হুজুর।

হাঁফাচ্ছো কেন? কি হয়েছে?

কয়েকজন গোরা সৈন্য দেয়ালের ওপর উঠে পড়েছে। মনে হয় ওরা আমাদের বাড়ির দিকে আসছে।

গোরা সৈন্য গলিতে? গালিব উৎকণ্ঠিত হন। দ্রুতকণ্ঠ বলেন, এই গলি পাহারা দেয় মহারাজা নরেন্দ্র সিংয়ের রক্ষীরা। তারা কি করছে? তারা ওদেরকে বাধা দিতে পারছে না?

না, হুজুর পারেনি। অন্য বাড়িতেও ওরা ঢোকেনি। এতক্ষণে বোধহয় আমাদের দরজায় এসে পড়েছে। যাই দেখি।

গালিব কলম হাতে নিয়ে কাগজের ওপর মাথা নুইয়ে বসে রইলেন। বুকটা ভয়ে কাঁপছে। ওরা তো জানে যে তিনি বাদশাহর সভাকবি। বাদশাহর কবিতা

পরিমার্জনা করে দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো। তবে কি?

তখন দরজায় বুটের শব্দ হয়। অর্থাৎ ওরা পৌঁছে গেছে। বাড়ির মালামাল কি লুট হয়ে যাবে? তিনি দ্রুত নানাকিছু ভাবলেন। তাঁর টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালো একজন। বাকিরা দরজার কাছে কিংবা ঘরের অন্য জায়গায় দাঁড়ালো। কেউ কোনো জিনিসপত্রে হাত দিলো না। টেবিলের সামনে যে দাঁড়িয়েছিল সে ভদ্র ভাষাতেই বললো, আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, কোথায়?

কর্নেল ব্রাউনের অফিসে।

আমিতো পালকি ছাড়া কোথাও যাই না। পালকির বেহারারা শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

কর্নেল ব্রাউনের অফিস আপনার গলি থেকে খুবই কাছে। হেঁটে যেতে কোনো অসুবিধা হবে না। আপনি উঠুন।

আমি কয়েকজনকে সঙ্গে নিতে চাই।

যাকে খুশি নিতে পারেন।

আমাকে পোশাক বদলাতে হবে।

আমরা বাইরে দাঁড়াচ্ছি। আপনি তাড়াতাড়ি পোশাক বদল করে আসুন।

গালিব বুঝলেন যে ওরা তাঁকে নিয়েই যাবে। তাঁকে যেতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝলেন যে, ওরা তাঁর মর্যাদা রেখেছে। আদব-কায়দার সঙ্গে ব্যবহার করছে। তিনি কাপড় বদলানোর জন্য নিজের ঘরে যেতে যেতে উমরাও বেগমকে বললেন, বাচ্চাদের কাপড় বদলে দাও। ওরা আমার সঙ্গে যাবে। কাল্লু, আজাদ, হাফিজ, তৌফিক যাবে।

অল্প সময়ের মধ্যে তারা বাইরে এলে দেখতে পান কয়েকজন প্রতিবেশী উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, ওস্তাদ, এরা আপনাকে কোথায় নিয়ে যাবে?

কর্নেল ব্রাউনের অফিসে।

তাঁর অফিস কাছেই। আমরা চিনি। দাঁড়িয়ে থাকা চারজন এক সঙ্গে বললেন, আমরাও আপনার সঙ্গে যাব।

আমার সঙ্গে যাবেন?

বাহ্, আমাদেরতো দেখতে হবে যে ওরা আপনাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

গোরা সৈন্যরা তাগাদা দিলে সবাই মিলে হাঁটতে শুরু করে। প্রতিবেশী তৌফিক নেওয়াজ বলে, চাঁদনি চকেই সাহেবের অফিস। ব্যবসায়ী কুতুব-উদ-দিনের বাড়ি সেটা।

আপনাদের শুকরিয়া জানাই যে আপনারা আমার সঙ্গে যাচ্ছেন।

মাশহুদ বয়সী ভদ্রলোক। চকে তার ব্যবসা আছে। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলেন, ওস্তাদ আপনি আমাদের মাথার তাজ। আমরা বেঁচে থাকতে আপনাকে গোরা সৈন্যরা নিয়ে যাবে তা কি হয়? দরকার হলে দিল্লি শহরবাসী আপনার কাছে এসে দাঁড়াবে।

গালিব প্রতিবেশীদের আন্তরিকতায় খুবই মুগ্ধ হন। তাঁর বুকটা বড় হয়ে যায় এই ভেবে যে ওরা তাঁকে খুব ভালোবাসে। তাঁর নাতিরা লাফাতে লাফাতে হাঁটছে। কখনও দৌড় দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। যেন ওরা এতদিন বন্দি পাখি ছিল। আজ ছাড়া পেয়েছে। ডানা মেলতে পারছে। ওরা উড়ে গিয়ে ছুঁয়ে আসবে আসমানের নীল। কিন্তু তাঁর চিন্তা বাচ্চাদের মধ্যে থেমে থাকে না। মনে হয় কয়কজন প্রতিবেশীর ভালোবাসাই সামান্য কথা নয়। তাঁর শত্রুরও শেষ নেই। তখন মনে মনে আওড়ালেন নিজের শের :

'আমি আছি গালিব, আর অবসাদের প্রত্যাশা আছে।

দুনিয়ার লোকের ভালোবাসার রকম দেখে হৃদয় পুড়ে গেছে।'

তাঁরা পৌঁছে গেলেন চকে। যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে তাঁকে কর্নেল ব্রাউনের সামনে নিয়ে যাওয়া হলো। প্রতিবেশীরাও তাঁর সঙ্গে ব্রাউনের কক্ষে ঢুকলেন। ব্রাউন ভাঙা ভাঙা উর্দু এবং ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন।

আমি শুনেছি আপনি কবি। আপনার পুরো নামটা বলবেন কি?

মির্জা মহম্মদ আসাদুল্লাহ খান গালিব। আমি গালিব নামে—

প্রতিবেশী নেওয়াজ খান আগ বাড়িয়ে বলেন, তিনি এই নামে কবিতা লিখে খ্যাত। সবাই তাঁকে চেনে।

আপনি?

আমি তাঁর প্রতিবেশী। ব্যবসা করি।

বহুৎ আচ্ছা। একটু জোরের সঙ্গেই বললেন ব্রাউন। গালিবের মনে হলো মেকী কণ্ঠস্বরে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে গেলো। তারপরও ব্রাউন যথেষ্ট সৌজন্য দেখাচ্ছেন। গালিব তাঁর প্রথামাফিক পোশাক পরেছেন। যেসব পোশাক তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কোথাও যেতে হলে পরেন। মাথায় পরেছেন বিশেষ ধরনের টুপি কুল্লাহ পপাখ। গায়ে আলখাল্লা। কোমরে রঙিন বন্ধনী। ব্রাউন তাঁর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, আপনি মুসলমান?

গালিব নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, আধা।

ব্রাউন বিস্মিত হয়ে বললেন, এর মানে কি?

গালিব মৃদু হেসে বলেন, মদ খাই। কিন্তু শুয়োর খাই না।

কথা শুনে ব্রাউন হাসেন।

গালিব তাঁকে রানী ভিক্টোরিয়ার কাছ থেকে পাওয়া উত্তরপত্র দেখান। ব্রাউন বলেন, ইংরেজদের বিজয়ের পরে আপনি পাহাড়ে এলেন না কেন?

গালিব মৃদু হেসে বলেন, অসুবিধায় ছিলাম। আমি চারজন বেহারার অফিসার ছিলাম। ওরা আমাকে রেখে পালিয়ে গেছে। আমি তো পালকি ছাড়া চলতে পারি না। কি করে যেতাম বলেন?

ব্রাউন মাথা নাড়েন। বলেন, আপনাদের সঙ্গে কথা বলে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমরাতো শান্তি চাই। শান্তি ছাড়া জীবন ঠিক মতো চলে না।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা সত্যি, তা সত্যি। আমি আপনাকে শান্তির শের শোনাতে পারি?

অবশ্যই পারেন, অবশ্যই পারেন। বলুন।

গালিব কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করেন। তারপর দাড়িতে হাত বুলিয়ে আবৃত্তি করেন :

'আজাদহ্ রু হু অওর মেরা মসলক হ্যায় সলহ-এ-কুল।
হরগিজ কভি কিসীসে অদাবত নহী মুঝে।
উদার মনে শান্তি চাই সবার সাথে
বন্ধুতা চাই, শত্রুতায় কাজ নেই আমার।'

উপস্থিত সবাই প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। ব্রাউন হ্যান্ডশেক করে বললেন, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমার খুব ভালো লাগছে। থ্যাঙ্কু মি. গালিব।

গালিব সবাইকে নিয়ে খুশি মনে বেরিয়ে এলেন। বাইরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, যাক বাঁচা গেলো। ভেবেছিলাম না জানি কি হয়।

নেওয়াজ খানও একই কথা বললেন, আমরাও ভয় পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম আপনি বাদশাহর সভাকবি ছিলেন, না জানি ওরা আপনাকে কি করে!

খোদা মেহেরবান! গালিব স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ছাড়েন।

সবাই মিলে বাড়ির পথে এগোতে থাকে। এখন আর সঙ্গে গোরা সৈন্যরা নেই। প্রতিবেশীদের একজন নিচু স্বরে বলে, ব্রিটিশরা লোকজনকে হত্যা করে, তাড়িয়ে দিয়ে খুনের দরিয়া বইয়ে দিয়েছে।

আহ্ থামুন।

আমার জীবনে আমি শহরে খুনের দরিয়া বইতে দেখিনি।

আহ্ থামুন। আপনার কথা শুনলে বাচ্চারা ভয় পাবে। আগে বাড়ি চলুন।

কাসিম গলিতে ঢোকার পরে বিল্লিমাঁরোতে পৌছালে বুঝবো যে বাড়িতে এসেছি। তার আগে পর্যন্ত নয়।

গালিবের ক্ষুব্ধ কণ্ঠ বাতাসে ভেসে যায়। কেউ আর কথা বলে না।

কয়েক কদম এগোনোর পরেই চাঁদনি চকের দিক থেকে হৈ-হল্লা ভেসে আসে। গালিব দলবল নিয়ে মসজিদ চকের কাছে থমকে দাঁড়ান। একজন প্রতিবেশী তাঁর হাত টেনে ধরে বলে, দাঁড়াবেন না। বাড়ি চলুন। নিশ্চয় কোথাও কেউ খুন হয়েছে। আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না।

গালিবের মনে হয় পায়ের পাতা ভারি হয়ে গেছে। পা টেনে ওঠানো যাচ্ছে না। কাল্লু এসে হাত ধরে, হুজুর আমার ঘাড়ে হাত দেন।

গালিব ওর ঘাড়ে হাত রেখে দম নেন। ওর ঘাড়ে ভর দিয়ে খানিকটুকু হেঁটে আসেন। চাঁদনি চক এলাকা ছাড়ার কয়েক কদম পরেই সবাই দেখতে পায় যে একজন ছুটতে ছুটতে আসছে। গালিবের সামনে এসে দাঁড়িয়ে প্রবলভাবে দম ফেলে বলে, আদাব মির্জা সাহেব। আপনার জন্য একটি দুঃসংবাদ এনেছি।

দুঃসংবাদ? কি হয়েছে?

সবাই তাকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। লোকটি ঘড়ঘড়ে গলায় বলে, মীর সাহেব খবরটা আপনাকে জানাতে বলেছেন।

কি হয়েছে বলুন? গালিবের কণ্ঠে উদ্বেগ।

আজ খুব ভোরে কাশ্মিরী গেটের কাছে নওয়াব শামসুদ্দীনকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে।

ইন্নালিল্লাহ—

গালিব এটুকু বলতেই লোকটি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে, খোদার দোহাই লাগে আপনি বাড়ি যান। ঘর থেকে বের হবেন না। চারদিকে মৃত্যু আর মৃত্যু। যাই। খোদা হাফেজ।

লোকটি দৌড়ে চলে যায়। গালিব উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকান। স্খলিত কণ্ঠে বলেন, মৃত্যু, মৃত্যুর মুশায়রা চলছে শহর জুড়ে। কান পাত, কান পাত সবাই। শোন মুশায়রার বিলাপ।

কাল্লু অনুভব করে হুজুর তার শরীরের ভার ওর ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি খুব ধীরে ধীরে পা ফেলে বাড়ির দিকে এগুচ্ছেন। পেছনে বাকিরা। শুধু বাচ্চা দুটো দৌড়ে চলে যাচ্ছে আগে আগে। গালিব চারদিকে তাকান। দেখতে পান শহরের হতশ্রী অবস্থা। প্রায় জনমানব শূন্য এলাকা। কাশ্মিরী গেট থেকে চাঁদনিচকের মাঝের এলাকাটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা। যাকে পেয়েছে

AMARBOI.COM

তাকেই খুন করেছে তারা। বুকের ভেতরে বিলাপের ধ্বনি ওঠে। তিনি এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করেন। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলেন, এখন আমি নিজেই হেঁটে যেতে পারবো। তোমার সাহায্য আর দরকার হবে না কাল্লু মিয়া।

ওর হাত ছেড়ে দিয়ে তিনি প্রতিবেশীদের দিকে তাকান। বলেন, ব্রাউন আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছেন, না?

হ্যাঁ, তা করেছেন। তবে ওদেরকে বিশ্বাস নেই।

কেনইবা আপনাকে ওর অফিসে ডেকে নিয়ে গেলো তা বুঝতে পারলাম না।

তাইতো, তেমন কিছু জিজ্ঞেস করেনি ওস্তাদকে।

গালিব মাথা নেড়ে বলেন, ঠিক বলেছেন আপনারা। তবে আমি ওদের পেনসন খাই সে জন্যও ডাকতে পারে।

হতে পারে।

বিদ্রোহের সময় থেকে পেনসন পাওয়া বন্ধ হয়ে আছে। সেটা আবার কবে পাবো কে জানে।

সবাই গলি বিল্লিমাঁরোতে পৌছে যায়। তখন সূর্য মধ্য গগন ছেড়ে খানিকটুকু পশ্চিমে সরেছে। তিনি দেখতে পান উমরাও বেগম তাঁর জন্য এক গ্লাস পানি নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে প্রদীপ হাতে দাঁড়িয়ে থাকা একজন নারীর মতো মনে হচ্ছে, যে নারীকে কখনো দেখা হয়নি, অথচ এমন একজন অপেক্ষমান নারীর তৃষ্ণা আছে বুকের মধ্যে। তিনি ঘরে ঢুকে উমরাও বেগমের হাত থেকে পানির গ্লাসটা গ্রহণ করেন। চুমুক দিয়ে বলেন, শুকরিয়া বিবি।

আপনি এখন কি করবেন?

গোসলের পানি দিতে বলো।

আপনি কি খুব ক্লান্ত?

হ্যাঁ, খুব ক্লান্ত।

আপনাকে কেমন জানি লাগছে।

কেমন?

মনে হচ্ছে এই শহরে আপনি বুঝি নতুন এসেছেন। শহরটা আপনি চেনেন না।

ঠিকই বলেছো বিবি। শহরটা আমি চিনতে পারছি না। এত নষ্ট—এত রক্ত-মৃত্যু, মৃত্যু বিবি, মৃত্যুর মুশায়রা চলছে।

কি বলছেন মৃত্যুর মুশায়রা? পাগল হয়ে গেলেন নাকি? আমি পানি দিতে বলছি। আপনি গোসল করুন। মাথা ঠাণ্ডা হবে।

উমরাও বেগম চলে গেলেও গালিব দাঁড়িয়ে থাকেন। মনে হয় যে মহিলা তাঁর সামনে থেকে চলে গেলেন তাঁকে তিনি চেনেন না। কোনোদিন দেখেননি। আশ্চর্য, কতকাল হলো যে তিনি এই বাড়িতে আছেন? হাজার বছর? নাকি তারও বেশি? দিল্লি শহর কবে গড়ে উঠেছিল? কীভাবে? যমুনা নদীর গর্ভ থেকে কি দিল্লির জন্ম হয়েছিল? আহ্, যমুনা নদী! যমুনা নদীর পাড়ে তাঁর জন্ম, শৈশব কেটেছে সেখানে, কত ঘুড়ি উড়িয়েছেন। নদী, শৈশব-ভাবনা, আকাশ জুড়ে ঘুড়ি এবং ঘুড়ির সুতো তাঁর মন ভালো করে দেয়। তিনি স্বস্তি বোধ করেন।

কাল্লু মিয়া এসে দাঁড়ায়। বলে, হুজুর গোসলের পানি দিয়েছি।

ওই নোনা পানি?

এছাড়া আর তো পানি নেই হুজুর। অনেক খুঁজে একটু খাবার পানি জোগাড় করতে পেরেছি আমরা তিন জনে মিলে।

গালিব চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। কাল্লু মিয়ার চলে যাওয়া দেখেন। কিন্তু খানিকটুকু যেতেই তিনি ওকে ডাকেন। কাল্লু মিয়া কাছে এসে দাঁড়ালে বলেন, আমরা কত কাল এই বাড়িতে আছি কাল্লু মিয়া?

কতকাল? ও আঙুলে গুণে সময় হিসেব করতে থাকে। তারপর মাথা চুলকে বলে, আমি মনে করতে পারছি না হুজুর।

গালিব ওর দিকে তাকিয়ে বলেন, বোধহয় এক হাজার বছরের বেশি হয়ে গেছে।

কাল্লুর চোখ কপালে ওঠে। চোখ বন্ধ করে বলে, এক হাজার বছর!

হ্যাঁ, শোন কাল্লু তুমি কি ছোটবেলায় ঘুড়ি ওড়াতে?

না, হুজুর। আমি কখনো ঘুড়ি উড়াইনি। মার্বেলও খেলিনি। কারণ ওগুলো কেনার টাকা আমাদের ছিল না। বাবা-মায়ের কাছে আবদার করে লাভ হতো না।

তাহলে তোমরা—

আমরা হুজুর লুকোচুরি খেলতাম। দৌড়াদৌড়ি করতাম। পুকুরে সাঁতার কাটতাম। পাখির ডিম খুঁজতাম। গরিব মানুষের যেটুকু খেলাধুলা বরাদ্দ ছিল আমরা তাই খেলতাম।

আফসোস! মানুষের যদি শৈশবে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন না থাকে তাহলে মানুষের অনেক কিছু হারিয়ে যায়। মানুষ সেসব জিনিস খুঁজতে থাকে জীবনভর। কিন্তু বুঝতে পারে না যে সে কি খুঁজছে।

ঠিক হুজুর। আমার মাঝে মাঝে এমনই লাগে। তখন আমি কাঁদি। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে যাই। ঘুমে খুব সুন্দর স্বপ্ন দেখি।

কি স্বপ্ন দেখো কাল্লু মিয়া?

এই তো দু'দিন আগে দেখেছি আমি খুব ছোট। বাবা-মায়ের সঙ্গে যমুনা নদীতে বড় একটা বজরায় চড়ে কোথাও যাচ্ছি। খুব সুন্দর বজরা। আমার নিজেকে বাদশাহর মতো মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমি হাওয়ায় ভেসে যেতে পারি।

বাহ্, কাল্লু মিয়া বাহ্। তোমার স্বপ্নে তুমি তোমার শৈশব ফিরে পাও। খোদাতালা মানুষকে এভাবে তার হারানো জিনিস ফিরিয়ে দেন।

কাল্লু মিয়া গদগদ স্বরে কিছু একটা বলে গালিব তা বুঝতে পারেন না। বুঝতে চানও না। বুকের ভেতর যমুনা নদী বইতে শুরু করেছে। তিনি দ্রুত হেঁটে পানির কাছে আসেন। পানিতে মাথা ভেজান। তারপর পুরো শরীর। যেন তাঁর শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে যমুনা, গড়াচ্ছে যমুনার জল, আর তিনি এক আশ্চর্য বালক— জল এবং নদীর অনুভব নিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছেন।

পরদিন তাঁর ঘুম ভাঙার কিছুক্ষণের মধ্যেই মির্জা ইউসুফের দারোয়ান তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুর খবর নিয়ে এলো। তাঁর ঘরের মেঝেতে বসে লোকটি কিছুক্ষণ কাঁদলো। তাঁর বয়সী শরীর অনেকক্ষণ ধরে আন্দোলিত হলো। তিনি ওকে দেখে নিজেকে সামলাচ্ছিলেন। তাঁর চেয়ে মাত্র দু'বছরের ছোট ইউসুফ। কত স্মৃতি আছে ওকে নিয়ে। তাঁর বুক ভেঙে যাচ্ছে। কেঁদেকেটে স্থির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছিল ইউসুফের?

পাঁচ দিন ধরে জ্বরে বেঁহুশ ছিল। তারপর মাঝরাতে শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন। এই পাঁচ দিনে আমি আপনাকে খবর দিতে আসতে পারিনি। কেমন করে আসবো? তাঁকে ছেড়েতো কোথাও যাইনি। পানি আনতেও না। একফোঁটা ওষুধও দিতে পারিনি।

বুড়ো দারোয়ান আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। তিনি তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, এখন আমরা কি করবো? পানি, রুমাল, মুর্দা ফরাস, কবর খোঁড়ার লোক, ইট, চুন কোথা থেকে পাবো কে জানে। পালকির ব্যবস্থা নেই। আমিই বা তার বাড়িতে কি করে যাবো? কোন কবরস্থানে নিয়ে যাবো যেখানে লোক পাওয়া যাবে? বাজার বন্ধ। ভালো বা খারাপ যাই হোক না কেন কাফনের কাপড়ইতো পাওয়া যাবে না। কবর খোঁড়ার জন্য লোকই বা কোথায়? হিন্দু হলে নদীর ধারে নিয়ে দাহ করা যেতো। তাছাড়া শহরের যা অবস্থা, দু-তিনজন

মুসলমানকে এক সঙ্গে হাঁটতে দেয়া হয় না। মুর্দার কফিন নিয়েই কি যেতে দেয়া হবে? একমাত্র উপায় শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়া।

আজাদ এসে বুড়োকে নাস্তা খাওয়াতে ডেকে নিয়ে যায়। মির্জার ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে শুনে একে দুয়ে প্রতিবেশীরা আসতে থাকে। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন গালিব। চোখের পানিতে ভেসে যায় গাল, দাড়ি। একজন বলে, আপনার দুঃখে আমরাও কাতর। এখনতো একটা কিছু আপনাকেই করতে হবে। আর তো কেউ নেই। আমরা ঠিক করেছি আপনার সাহায্যে কিছু করবো।

গালিব গলা পরিষ্কার করে বলেন, কি করা যায়?

পাতিয়ালার সেপাইরা তো গলিতে রয়েছে। মহারাজাকে বলে ওদের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

হ্যাঁ, সেটা হতে পারে।

গালিব মাথা নাড়েন। দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

তাহলে আমরা কথা বলার জন্য তার কাছে যাই?

যান। অপেক্ষা করা চলবে না। যা কিছু করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।

প্রতিবেশীরা চলে গেলে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে আসেন উমরাও বেগম। বলেন, ইউসুফ ভাইয়ের বিবি-বাচ্চাদেরকে কি খবর দেয়া হবে?

ওরা কোথায় আছে আমি তো জানি না।

দারোয়ান জানতে পারে। উমরাও বেগম দ্বিধার সঙ্গে বলেন।

গালিব চুপ করে থেকে বলেন, দারোয়ানকে এখন পাঠানো ঠিক হবে না। আগে দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে।

কাফনের কাপড়—উমরাও বেগম কথা শেষ করেন না।

কাফনের কাপড় কেনার জন্য দোকান খোলা নাই। তোমার ঘরের পরিষ্কার দু'তিনটি বিছানার চাদর বের করো।

বিছানার চাদর দিয়ে—

উমরাও বেগম ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন।

গালিব মাথা নিচু করে চোখের পানি মোছেন। উমরাও বেগম ঘর থেকে বেরিয়ে যান। নিজের ঘরের সিন্দুক থেকে দুই তিনটি চাদর বের করেন।

প্রতিবেশীরা সিপাহীদের নিয়ে ফিরে আসে। গালিব তৈরি হয়ে নেন। বাড়ির কাজের লোকেরাও সঙ্গে যায়। ওদের হাতে দাফনের কাপড় বিছানার চাদর। কোথাও আতর-লোবান নাই। সিপাহীদের সামনে রেখে তারা কয়েকজন মানুষ হেঁটে ইউসুফ মির্জার বাড়িতে আসেন। মুর্দাকে গোসল করানো হয়। চাদর জড়িয়ে বাড়ির কাছের মসজিদে নিয়ে এসে সেখানে কবর দেয়া

হয়। অবসন্ন গালিব ফিরে আসেন বাড়িতে। মনে হয় কান্নার শক্তিও ফুরিয়ে গেছে।

উমরাও বেগম এক গ্লাস লেবুর শরবত নিয়ে আসেন। তিনি শূন্য দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকান। গ্লাস হাতে নেন না।

খান। শরবত খেলে শরীর ঠাণ্ডা লাগবে।

তিনি মাথা নেড়ে বলেন, শরবত খাবো না। গোসল করবো।

গোসল! উমরাও বেগম বিব্রত বোধ করেন। গালিব বুঝতে পারেন যে বোধহয় পানি নেই।

গোসল করব শুনে অবাক হয়েছো বিবি। বুঝতে পারছি যে বোধহয় পানি নেই। আমার সৌভাগ্য যে আমি আমার ভাইকে শেষ গোসল দিতে পেরেছি। ওই বাড়িতে একজন মুর্দার গোসলের পানি ছিল।

চোখের জল মুছে গালিব নিজের শের বলতে থাকেন জোরে জোরে :

'তুম কৌনসে যে অ্যায়সে খরে দাদ ব সিতদ কে
করতা মূলক অলমওত তকাজা কোঈ দিন অওর।
এত তাড়া ছিল মৃত্যুর?
না হয় যেতে কিছুদিন পরে আরও।'

কাঁদতে কাঁদতে তিনি বিছানায় শুয়ে পড়েন। উমরাও বেগমকে বলেন, বিবি আমার ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও। কেউ যেন না আসে।

উমরাও বেগম টেবিলের ওপর শরবতের গ্লাস রেখে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে যান। শুনতে পান খাঁচায় আটকে রাখা তোতা পাখিটা ঠোঁট দিয়ে টুক টুক শব্দ করছে। ওটার জন্যও দানাপানি ঠিকমতো জোটে না। তিনি খাঁচাটার সামনে এসে দাঁড়ান। আঙুল ঢুকিয়ে ডানার পালকে মৃদু পরশ দেন। তোতা বিরক্ত হয়। আঙুলে ঠোকর দেয়ার চেষ্টা করে। তিনি আঙুল বের করে নেন। আবার ঢোকান। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে খেলা করতে করতে তাঁর মনে পড়ে তাঁর স্বামীর একটি কৌতুকের কথা। তখন তাঁরা বল্লিমাঁরোতে আসেননি। লালকুয়ায় কালে সাহেবের বাড়িতে থাকতেন। সেবার খুব শীত পড়েছিল। তোতা পাখিটি ঠাণ্ডা সইতে পারতো না। বেশিরভাগ সময় ঘাড় কাত করে নিজের পালকে ঠোঁট গুঁজে রাখতো। যেন নিজের পালক থেকে ঠোঁটে গরম ছড়িয়ে দিতে চাইতো। উমরাও বেগমের মনে হতো পাখিও নিজের শরীরকে উষ্ণ রাখার কৌশল বের করে। সব প্রাণীরই নিজস্ব কৌশল আছে। তিনি একদিন স্বামীকে বলেছিলেন, দেখেন আমাদের তোতা পাখির কাণ্ড। শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কেমন ঠোঁট গুঁজে বসে আছে।

গালিব হাসতে হাসতে পাখির খাঁচা নাড়া দিয়ে বলেন, ওহ মিয়া তোমারতো বউ-বাচ্চা নাই। তাহলে এমন ঘাড় গুঁজে বসে আছ কেন? তোমার কিসের এত চিন্তা?

উমরাও বেগম হাঁ করে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন। তিনি মুখ ফিরিয়ে বলেছিলেন, হাঁ করে দেখছো কি বিবি?

আপনিতো তোতাকে নিয়ে নয়, আমাকে নিয়ে কৌতুক করলেন। আপনি আমাকে নিয়ে এমন শক্ত কৌতুক করতে পছন্দ করেন।

আমিতো এমনই। তুমিতো আমাকে অনেককাল ধরে চেনো বিবি।

উমরাও বেগম গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, হ্যাঁ চিনি। মনে আছে একবার আপনি আমাকে ভূত বলেছিলেন।

গালিব চোখ কপালে তুলে বলেন, বলেছিলাম নাকি? মনে করতে পারছি না তো।

মনে করিয়ে দেবো?

দাও। গালিব ঘাড় নেড়ে বলেন।

মনে আছে একবার আপনি বাড়ি বদল করার জন্য বাড়ি দেখছিলেন।

গালিব কথা না বলে মাথা ঝাঁকান।

উমরাও বেগম বলতে থাকেন, আপনি আগে নিজে একটি বাড়ি দেখে আসেন। বৈঠকখানাটি আপনার পছন্দ হয়নি। কিন্তু বাড়ির ভেতরের ঘর আপনাকে দেখতে দেওয়া হয়নি। তাই আপনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন। মনে আছে?

গালিব মুখ বুঁজে ঘাড় নাড়েন।

আমি বাড়ি দেখতে গেলাম। লোকে আমাকে নানা কথা বললো। আমি পছন্দ-অপছন্দ কোনোটাই করতে পারলাম না। আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পছন্দ হয়েছে বিবি? আমি বলেছিলাম, লোকে বলছে ওই বাড়িতে নাকি ভূত থাকে। আপনি কি বলেছিলেন মনে আছে?

গালিব চুপ করে থাকেন। হাঁ বা না সূচক ঘাড়ও নাড়ান না।

উমরাও বেগম গম্ভীর হয়ে বলেন, আপনি বলেছিলেন দুনিয়াতে তোমার চেয়েও বড় ভূত আছে নাকি? মনে আছে?

গালিব এবারও চুপ করে থাকেন।

উমরাও বেগম ঝাঁঝালো গলায় বলেন, আমার কথা শেষ হয়েছে। আপনি এবার আপনার কথা বলতে পারেন।

এতক্ষণ জোর করে নিজের দম আটকে রাখা গালিব আচমকা হাসিতে

AMARBOI.COM

ভেঙে পড়েন। নিজের লেখা কতআ আউড়ে বলেন, লোকে প্রেমের ব্যাপারে ভয় পায়। কিন্তু আমি তো জানি খাওয়া-পরার খোঁজ করার চেয়ে বড় বিপদ আর কিছু নাই। একইভাবে বলতে হয় যে মহাজনের তাগাদার চেয়েও বড় চিন্তা আর কিছু নাই।

উমরাও বেগমের চোখে পানি আসে। মানুষটা পেনসন উড়িয়ে দিয়ে দিন চালালো। মনের সুখে মদ খেলো। আর দেনা করে মদ খেয়ে কতআ লিখলো। হায় কবি, মহাজনের চিন্তায় অস্থির।

এখন এই দুর্যোগের সময় একমাত্র ভাইটি মরে গেলো। কে থাকলো আর। নিজের সাতটি সন্তানের জন্ম হলো। একটিও বাঁচলো না। উমরাও বেগমের চোখ দিয়ে পানি গড়ালো। দোপাট্টা দিয়ে পানি মুছে গালিবের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। সামান্য ফাঁক করে তাকিয়ে দেখলেন মানুষটি নিঃসাড় ঘুমাচ্ছে।

দিন গেলো, রাত গেলো।

গালিবের ঘুম ভাঙলো পরদিন সকালে।

মনে হলো চারদিকে নতুন দিন। নতুন সূর্য।

দুপুরের খাবার খেয়ে লিখতে বসলেন। ইউসুফ ছাড়া কার কথাই বা এখন তাঁর মনে আছে। লিখেন— খুবই আপসোসের কথা যে ষাট বছরের মধ্যে মাত্র ত্রিশ বছর ও মানসিকভাবে সুস্থ ছিল। শৈশব থেকে ত্রিশ বছর। দুনিয়াটা চিনে বড় হতে হতেই ও আবার চেনা দুনিয়াটাকে ভুলে গেলো। কবরে ওর জন্য কোনো বালিশ নাই। ওখানে ও মাটি ছাড়া আর কিছুই পায়নি। মাটিইতো সবার জন্য শেষ বিছানা। খোদাতালা ওকে যেন দয়া করেন। জীবিত অবস্থায় ওর অনেক কষ্ট ছিল। আরাম কি তা জানতো না। আজ, এখন যেন কোনো ফেরেশতা ওকে বেহেশতে নিয়ে যায়। ওর জন্য আর কোনো প্রার্থনার ভাষা আমি জানি না।

এটুকু লিখে কলমটা দোয়াতে চুবিয়ে রাখলেন। ভাবলেন, আর কি লিখবেন? মাথায় তো কিছু আসছে না? তারপর কলমটা নিয়ে আবার কাগজের টুকরোয় লিখলেন, ১৯ অক্টোবর। অনেকক্ষণ ধরে তারিখটা লিখলেন আর কাটলেন। কালো কালিতে কাগজের পৃষ্ঠা ভরে গেলো। বড় বড় করে লিখলেন এই দিনটিকে সপ্তাহের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেয়া উচিত। ওহ, এই সপ্তাহে একটি দিন না থাকলে কি এসে যায়। কার কি ক্ষতি হয়। পুরো মাস থেকে একটি দিন বাদ গেলে কি খুব গরমিল হয়ে যাবে? তিনি কলমটা রেখে দিয়ে দোয়াতের মুখ বন্ধ করলেন। তারপর মৃদু হেসে নিজেকে বললেন, এত কাটাকুটির পরেও ওই তারিখটি কালো কালিতে তাঁর স্মৃতির খাতায় লেখা

থাকবে। তার আগে তার ছোট ভাইটির চলে যাওয়া তো নিষ্ঠুর সত্য। তিনি চেয়ারের উপর পা উঠিয়ে মাথা হেলিয়ে দিয়ে নিশ্চুপ বসে থাকেন। বুকের ভেতর কেমন একটা ধুকপুক ধ্বনি হচ্ছে। বেশ লাগছে সেই শব্দ উপভোগ করতে। কতক্ষণ যে একইভাবে বসে থাকেন নিজেও জানেন না। নিজেই বলেন, তোমার হৃদয়কে যদি দূরে রাখো তাহলে শোক করো কেন? তোমার হৃদয়কে যদি হারিয়ে ফেলো তাহলে বেদনার অনুভব থাকবে কেন? তোমার হৃদয় যদি তোমার সঙ্গে না থাকে তাহলে শুধু জিহ্বা দিয়ে বিলাপ করার দরকার কি? গালিব তুমি তোমার শরীরের সবটুকু সন্ধান করো। দেখো সব জায়গা ঠিক আছে কিনা। গালিব হৃদয়কে কঠিন করতে নেই। কঠিন হৃদয় মানুষকে কষ্ট দেয়। যে বুকভরে কাঁদতে পারে সে হৃদয়ই প্রকৃত হৃদয়। তার অনুভবে প্রেম থাকে, দরদ থাকে। তাঁর চোখ দিয়ে পানি গড়ায়। তিনি সে পানি মুছতে চান না। ভিজে থাকে মুখের সবটুকু। তাহলে যমুনা নদীর অনুভব তাঁর শরীরে কম্পন তুলবে। তিনি নিজের লেখা শের নিজেকেই শোনান :

'নেশা করে সুখ পেতে চায় কোন মুখপোড়া,
আমি চাই কেবল রাতদিন নিজেকে একটুখানি ভুলে থাকতে।'

পিপাসা, বুকের ভেতর সহস্র ধারার পিপাসা। কতদিন তিনি সুরা পান করেননি। আহ্, বুকের চৌচির প্রান্তর সুরার বৃষ্টি চায়। সুরা, সুরা। কতবারতো প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে দেনা করে মদ পান করবেন না। কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখতে পারলেন কৈ? প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা খুবই কঠিন। আবারও নিজেকে শোনালেন নিজের শের :

'মদ স্পর্শ করবে না বলে শপথ করেছো, গালিব;
তোমার শপথের উপর কিন্তু একটুও ভরসা করা যায় না।'

সোজা হয়ে বসে দুহাতে চোখের পানি মোছেন। ভিজে যাওয়া দাড়িতে হাত বোলান। তারপরে উঠে পায়চারি করেন। ফিরে এসে আবার টেবিলে বসেন। তুফতার কথা মনে হয়। গদরের পরে তুফতার সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি। ওকে একটি চিঠি লেখা দরকার। গদরের পরে তুফতা শহর ছেড়ে চলে গেছে। তিনি কাগজ টেনে নিলেন। দোয়াতের ছিপি খুলে কলমটা ডোবালেন কালো কালিতে। ভাবলেন চিঠির সম্বোধন, ভালো-মন্দ জিজ্ঞাসা পরে করবেন, আগে শহরের অবস্থাটা লিখে ফেলা দরকার। শুরু করলেন এভাবে, আমি তোমাকে একটি শব্দও বাড়িয়ে লিখছি না— জেনে রাখো যে শহরের ধনী-গরিব নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ শহর ছেড়ে চলে গেছে। অভিজাত পরিবারের সঙ্গে তাদের অনুগ্রহে বেঁচে থাকা মানুষেরাসহ দোকানি-কারিগর এমন কেউই বাদ

নেই। তোমাকে কতটা লিখব বুঝতে পারছি না। কারণ খুঁটিনাটি সব লিখতে ভয় পাচ্ছি। লালকেল্লার কর্মচারীদের অবস্থা খুব খারাপ। তাদের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করা হচ্ছে। ওরা সারাক্ষণ কঠোর জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যে আছে। অনেককে কারাবাসে পাঠানো হয়েছে। তুফতা, তুমিতো জানো আমি এক গরিব কবি। গত দশ-বারো বছর ধরে দরবারে 'তারিখি' লেখা ও বাদশাহর কবিতার পরিমার্জনা করা ছিল আমার কাজ। তুমি এ কাজকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারো। বলা যায় এটা দরবারি কাজ, আর নয়তো বলা যায় এটা দিনমজুরের পেনশন। তুমি যেভাবে বুঝতে চাও বুঝে নিতে পারো। তুমি ভালো করেই জানো যে সিপাহীদের বিদ্রোহে আমার কোনো ভূমিকা ছিল না। আমি আমার কাজকে কবিতার মধ্যেই আটকে রেখেছিলাম। অন্য কোনো কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করিনি। আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে আমি নির্দোষ। তাই আমি শহর ছেড়ে পালাইনি। বলো, আমার শহর থেকে বিনাদোষে আমি পালাবো কেন? ব্রিটিশ শাসকরা দরবারের কাগজে কিংবা নিজেদের গুপ্তচরদের কাছে আমার বিরুদ্ধে কিছুই পায়নি। পেলে আমাকে হেস্তনেস্ত করে ছাড়তো। জিজ্ঞাসাবাদ করে নাজেহাল করতো। আমি তো জানি ওরা শহরের অনেক সম্মানিত ব্যক্তিদের ছাড়ে নি। আমিতো ওদের কাছে কেউকেটা কেউ না। বেশির ভাগ সময় আমি বাড়িতেই থাকি। বাইরে কমই বের হই। তাছাড়া আমার কাছে দেখা করতে কে আসবে? শহরে আছেই বা কে? কতদিন তোমাদের মতো বন্ধুদের মুখ দেখি না। যারা লুকিয়ে ছাপিয়ে আছে তারা রাস্তায় বের হতে ভয় পায়। ঘরের পরে ঘর মানুষহীন। একটুও বিস্মিত হবে না একথা জেনে যে প্রতিদিন অপরাধীদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে। প্রতিদিন কোনো না কোনোভাবে মৃত্যু ঘটছে। এই শহরে মৃত্যু এখন রুটি আর আচার খাওয়ার মতো সাধারণ ঘটনা। ১১ মে সামরিক শাসন চালু হয়েছিল। এখন পর্যন্ত তা বহাল আছে। কতদিন এই অবস্থা চলবে কেউ জানে না। কি হয় তা দেখার জন্য আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। ব্যবস্থাটা এমন যে পারমিট ছাড়া কেউ শহরে আসতে বা বের হতে পারছে না। তুমি শহর ছেড়ে বাইরে চলে গেছো, ভালোই করেছো। কোনো অবস্থাতেই ফিরে আসার কথা ভেবো না। মুসলমানদের শহরে ফিরে আসার অনুমতি দেয়া হয় কিনা তা দেখার জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

এটুকু লিখে তাঁর আর লিখতে ইচ্ছে হলো না। কাগজটা একটা ছোট পাথরের টুকরো দিয়ে চাপা দিয়ে রাখলেন। উঠে পায়চারি করলেন। কাল্লু মিয়া কয়েকটা আখরোট নিয়ে এলো। তিনি খুশি হয়ে রেকাবিটা হাতে নিয়ে

শতরঞ্জির ওপর বসলেন। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে পা ছড়িয়ে দিলেন।

হুজুর। কাল্লু মিয়ার বিনীত কণ্ঠ।

কি বলবে, বলো।

তিনি মনোযোগ দিয়ে আখরোট খাচ্ছেন। বেশ লাগছে ফলটা চিবুতে। বেশ অনেকদিন পরে বাড়িতে আখরোট এসেছে। কোথা থেকে জোগাড় হয়েছে তিনি তা জানতে চাইলেন না। ভাবলেন, জিজ্ঞেস করে লাভ কি, ফল জুটেছে এটাই বড় কথা। বেশি কিছু জানার দরকার নেই।

হুজুর। কাল্লু মিয়ার অনুচ্চ কণ্ঠ।

তুমি আমাকে কিছু বলছো না কেন কাল্লু মিয়া?

সাহেবের অফিসে আপনাকে তলব করতে পারে?

তলব করবে? কে বলেছে?

মহারাজার রক্ষীরা। গোরা সেপাইরা। ওদের কাছে জেনে গেছে যে আপনি বাড়িতে আছেন কিনা।

কেন তলব করবে বলেছে কিছু?

না, সেসব কিছু বলেনি। না, মানে আমি ঠিক জানি না। রক্ষীদের কাছে বললে বলতেও পারে।

যাও, ওদের কাছ থেকে জেনে আসো।

কাল্লু মিয়া চলে গেলে তিনি চোখ বুজে ভাবেন, কি হতে পারে? নতুন ফন্দি কি আঁটা হচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে? তবে এটাও ঠিক যে এখন পর্যন্ত ব্রিটিশরা তাঁর গায়ে হাত দেয়নি। নানা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা কোনো খারাপ দিকে মোড় নেয়নি। তাঁকে শহর ছাড়তে হয়নি, নির্বাসন দণ্ড পেতে হয়নি, তাঁকে ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো হয়নি। খোদাতালার অশেষ মেহেরবানী। গালিব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভাবেন যে, ওদের মৃত্যুর মুশায়রাতো এখনো চলছে। কবে এই আসর ভাঙবে কে জানে। তাঁর আখরোট খাওয়া শেষ হয়েছে। এক গ্লাস পানি পেলে ভালো লাগতো। কাউকে ডাকাডাকি না করে তিনি কাল্লুর ফেরার অপেক্ষা করেন।

অল্পক্ষণে কাল্লু ফিরে আসে। চোখমুখ শুকনো। গালিব ওর চেহারা দেখে বুঝলেন যে কোনো ভালো খবর নেই। বরং খবর শুনে ও ভয় পেয়ে গেছে।

হুজুর। কাল্লুর ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর।

গালিব পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলেন, খবরটা কতটা খারাপ তা আমাকে বুঝতে দাও কাল্লু মিয়া।

ওরা একটু পরেই আসবে।

AMARBOI.COM

কেন জানতে পেরেছ?

বাদশাহর সিক্কায় আপনার কবিতা—

বুঝেছি আর বলতে হবে না। তুমি আমার জন্য এক গ্লাস পানি নিয়ে এসো।

কাল্লু মিয়া পানি আনলে তিনি খেয়ে শেষ করতে পারেননি, তখন দু'জন গোরা সৈন্য এসে বাড়ির উঠোনে ঢোকে। তিনি কাপড় বদলে বের হয়ে যান। উমরাও বেগম নিজের ঘরে ছিলেন। তিনি কিছুই জানতে পারেন না। কাল্লু মিয়া সঙ্গে যায়।

সাহেব তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, বিদ্রোহের সময় বাদশাহর নামে যে শীলমোহর খোদাই করা হয়েছিল সে কথাগুলো কি আপনি লিখেছিলেন?

তিনি এক মুহূর্ত ভাবেন, চিন্তার ভান করেন। তারপর বলেন, বাদশাহ নিজে কবি। দরবারে অনেক কবি আসতেন। শাহজাদাদের কয়েকজন কবি। এতজনের মধ্যে একজন কবিকে সন্দেহ করা কি যুক্তিযুক্ত?

আপনি কি বলতে চাইছেন?

এই অর্থে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

সাহেব তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। তিনি নির্ভয়ে বলেন, আহসানউল্লাহ খানের মতো দরবারের কর্মকর্তাও এই কথাই বলবেন। কারণ এত কবির মধ্যে একজনের কবিতা বোঝা কঠিন।

সাহেব বুঝতে পারেন যে চট করে এই কবির যুক্তি খণ্ডন করা যাবে না। কারণ তার কাছে তেমন কোনো প্রমাণও নেই। এটি প্রমাণ করার জন্য দরবারে তেমন কোনো নথি খুঁজেও পাওয়া যায়নি।

গালিব তখন বিগলিত হেসে বলেন, আমি যদি ওই কথাগুলো লিখেই থাকি তবে নিরূপায় হয়ে লিখেছি। এই বিচারে আমি নির্দোষ।

সাহেব মাথা ঝাঁকালেন। কি কারণে ঝাঁকালেন তা বোঝা গেলো না। তিনি আরও গদগদ কণ্ঠে বললেন, বিদ্রোহের পরে ব্রিটিশরা তো অনেক সিপাহীকে ক্ষমা করেছে। এটি যদি তারা করতে পারে তবে দুটো লাইন লেখার জন্য একজন কবিকে কি ক্ষমা করা যায় না?

সাহেব একটুক্ষণ চুপ থেকে মাথা নেড়ে বললেন, আচ্ছা আপনি আসুন।

ফেরার পথে তাঁর বারবারই মনে হলো কাগজে-পত্রে কোনো প্রমাণ না থাকলেও বিষয়টিতো সত্য। বিদ্রোহের পরে বাদশাহ আবার পূর্ণ ক্ষমতায় ফিরে এসেছিলেন। উৎসব পালন করা হয়েছিল। উৎসব উপলক্ষে সিক্কাটি চালু করা হয়েছিল। সিক্কার ওপর খোদিত লেখাগুলো তাঁরই রচনা। তিনি সাহেবের

সামনে নানা কিছু বলে পার হয়ে এলেন। এই কৌশল গ্রহণ করার দরকার ছিল। কিন্তু বিষয়টি জানে অনেকে। মুন্সি জীবনলাল তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি যে রোজনামচা লিখছেন সেখানে এই ঘটনাটির উল্লেখ করবেন। যদিও বিষয়টি এখনো ব্রিটিশরা জানে না। এটাতো মিথ্যে নয় যে রাজদরবারের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তিনি আরও ভাবলেন, নথিপত্রে এর প্রমাণ না থাকার কথা নয়। তবে এমন হতে পারে ব্রিটিশরা শহরের পুরো দখল নেয়ার আগে দরবারের নথিপত্র নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। সবই খোদাতালার মেহেরবানী, কাল্লু মিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ফেরার সময় তিনি এভাবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ইংরেজদের পরাজিত করায় তিনি বাদশাহর স্তুতি করে কাসিদা পাঠ করেছিলেন। বাদশাহ তাঁকে 'খিল্লাত' দিয়েছিলেন, সম্মানিত করেছিলেন। মাত্র মাস দুই আগের কথা, তখনো তিনি একটি কাসিদা লিখে বাদশাহকে সম্মান জানিয়েছিলেন। যাহোক, যা করেছেন তা তিনি ঠিকই করেছেন, একথা ভেবেই তিনি নিজের ভেতরে শক্তি অনুভব করলেন। তাঁর হাঁটার গতি বেড়ে গেলো। তিনি জোরে জোরেই বললেন,

'বার্জারি আফতাব ও নুকরা-ই-মাহ
সিক্কা জডদার-জাঁহা-বাহাদুর-শাহ
সূর্যের সোনা ও চন্দ্রের রূপোর মতোই
বাহাদুর শাহ-ও এই মুদ্রায় তাঁর চিহ্নটি রেখেছেন।'

কাল্লু মিয়া তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলে, হুজুর!

কাল্লু মিয়া দু'হাজার ইংরেজ সৈন্যের বিশাল বাহিনী একদিন দিল্লি শহরে ঢুকে পড়লো। কেঁপে উঠলো শহরটা। তুমি আমার কাছে আসো কাল্লু মিয়া আমি তোমার ঘাড়ে হাত রাখি।

হুজুর।

কাল্লু মিয়া।

হুজুর।

বাদশাহর এখন বিচার চলছে।

ওরা কি বাদশাকে মেরে ফেলবে হুজুর?

আমাকে হাঁটতে দাও। আমি এই পথে বসে পড়তে চাই না।

হুজুর।

কাল্লু মিয়া বাদশাহর নামে প্রচলিত মুদ্রায় আমিতো লিখেছিলাম যে সূর্যের সোনা এবং চাঁদের রূপোর মতো বাদশাহ।

হুজুর আপনিতো ঠিকই লিখেছিলেন।

গালিব আর কথা বাড়ান না। তিনি খানিকটা জোরে হাঁটার চেষ্টা করেন। কাল্লু মিয়ার ঘাড়ে হাত রেখেই হাঁটেন।

হুজুর।

বলো কি বলবে?

বিচারে কি বাদশাহর ফাঁসি হবে?

খামোশ! চুপ করে থাকো।

গালিব চিৎকার করে কথা বললে তাঁর শরীর কেঁপে ওঠে।

কাল্লু মিয়া দ্রুতকণ্ঠে বলেন, আমাকে মাফ করবেন হুজুর।

তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফেরেন।

দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন উমরাও বেগম।

কোথায় গিয়েছিলেন?

গালিব পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢোকেন। অবসন্ন কণ্ঠে বলেন, পানি।

কাল্লু মিয়া ছুটে যায় পানি আনার জন্য। তিনি চেয়ারে বসে পড়েন।

উমরাও বেগম আবারো জিজ্ঞেস করেন, নতুন কোনো বিপদ হয়েছে কি?

না, বিপদ হয়নি। কৌশলে বিপদ কাটাতে পেরেছি। খোদা মেহেরবান।

কাল্লু মিয়া পানি নিয়ে এলে তিনি ঢকঢক করে পানি খান। তারপর দম নিয়ে উমরাও বেগমকে ঘটনাটি খুলে বলেন। উমরাও বেগম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিজের কাজে চলে যান। গালিব ভাবলেন একটু বিশ্রাম নিয়ে তুফতাকে চিঠি লিখবেন। লিখবেন কি, তুমি কি আঁচ করতে পারো বন্ধু যে এখানে কি ঘটছে? এখনকার সঙ্গে তুলনা করলে আমার মনে হয় আমাদের একটি আগের জন্ম ছিল। বন্ধুদের সঙ্গে যে ধরনের ঘটনা ঘটে আমরাও সেভাবে দিন কাটিয়েছিলাম। আমরা কবিতা লিখতাম, দীওয়ান সম্পাদনা করতাম। আমাদের বন্ধু ছিলেন মুনশী নবী বখশ। একদিন দেখলাম ও আমাদের পাশে নেই। কোথায় যেন চলে গেছে। বন্ধুত্বের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলে খুব কষ্ট লাগে বন্ধু। কিন্তু কিছুকাল পরে আমাদের আবার যোগাযোগ হলো। আমি কয়দিন আগে মুনশী নবী বখশকে চিঠি লিখেছি। ওর উত্তর পেয়েছি। তোমার চিঠিও পেয়েছি তুফতা। তবে দেখো অবস্থাটা কি— তোমার নাম এখনও মুনসী হরগোপাল, তোমার তখল্লুস তুফতা, যে শহরে আমি এখনও বাস করছি তার নাম দিল্লি, মহল্লার নাম বল্লিমাঁরো, কিন্তু কষ্টের কথা এই যে পুরনো বন্ধুদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কতদিন যে কারো সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। এমন কথা বলতেই হয় যে এই শহরে মুসলমানদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। শহর এখন এমনই পরিত্যক্ত। তুমিতো

জানো আমার বন্ধুর সংখ্যা কত বেশি ছিল। বন্ধুদের মৃত্যুকে আমি কেমন করে সহ্য করি। আমার বন্ধুদের মধ্যে ছিল ব্রিটিশ, হিন্দু, ব্রিটিশদের যেসব মুসলমান সমর্থন দিতো তারা, যারা বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়েছিল সেই মুসলমানরাও। সব ধরনের মানুষের বন্ধুত্ব পেয়ে আমি আনন্দে ছিলাম। আমার কবিতাই ছিল তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের যোগসূত্র। আমার বন্ধুরা অনেকে প্রাণ হারিয়েছে, তারচেয়েও বেশি জনেরা ফতুর হয়ে গেছে। হায় আল্লাহ, এসব মেনে নেওয়াও কঠিন।

তাঁর চোখ দিয়ে পানি গড়াতে থাকে। তিনি চেয়ারে মাথা এলিয়ে দিলে মনে করেন তাঁর ঘুম পাচ্ছে। পরক্ষণে মনে হয় ঘুম নয়, তিনি একটি দৃশ্যের মধ্যে ঢুকে গেছেন। বন্ধুদের মুখগুলো দিল্লির গাছ-পাখি-নদী-আকাশ-ঘরবাড়ির মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। তিনি কারো সঙ্গে কথা বলতে পারছেন না। তাঁর মাথা কেমন করে। তিনি শুয়ে পড়েন এবং তাঁর ঘুম পায়।

পরদিন ঘুম ভাঙলে শুনতে পান প্রতিবেশীর কারো বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। তিনি বিছানা ছাড়তে পারেন না। বুঝতে পারেন কোথাও কোনো মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। তিনি বালিশে মাথা গুঁজে রাখেন। একবার ভাবেন কাউকে ডেকে খবর নেবেন, আবার ভাবেন থাক। কি হবে কষ্টের মধ্যে ঢুকে। সকালটা অন্য রকম হবে, শান্তিতে থাকতে পারবেন, সে শহরতো এখন দিল্লি নয়।

ছুটতে ছুটতে আসে কাল্লু মিয়া। হুজুর, হুজুর।

তিনি মাথা তুলে সোজা হয়ে বসেন। তিনি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই কাল্লু মিয়া জোরে জোরে বলে, হুজুর ফাঁসি, ফাঁসি।

ফাঁসি?

একসঙ্গে পাঁচজনের হুজুর।

কাঁদছে কে?

মোহাম্মদ আলির পরিবার। ওই পরিবারের পাঁচজনকে একসঙ্গে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। জীবন্ত ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে গাছে।

আহ্, চুপ করো কাল্লু মিয়া।

কাল্লু মিয়া মেঝেতে বসে পড়ে। হাঁটুতে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। গালিব ওকে কাঁদতে দেন। নিজে বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ান। ভাবেন খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নিলে তাঁর দম আটকে যাবে না। কিন্তু টের পেলেন যে দম আটকে আছে, ওখানে নিঃশ্বাসের প্রবাহ আছে কি নেই, তা বুঝতে পারছেন না। তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে শোকার্ত পরিবারের কান্নার

শব্দ শোনেন। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি নিজেও মনে রাখতে পারেন না। বাড়ির বাচ্চা দুটো এসে তাঁর হাত ধরে।

নানা, ঘরে চলেন।

নানা আজকে আমরা আপনার সঙ্গে নাস্তা খাবো।

শিশুদের হাত ধরে তিনি ঘরে ঢোকেন। ঘরে ঢুকে শিশুদের মাথায় হাত রাখেন। নিজেকেই বলেন, একদিন ওদেরকে আগ্রায় নিয়ে যাবো। যমুনা নদী দেখাবো। এই বয়সে আমি যমুনা নদীর পাড়ে বড় হয়েছি। আমি এই বুড়ো বয়স পর্যন্ত যমুনা নদীর পাড়েইতো আছি। আগ্রা থেকে দিল্লি। আমার বন্ধু ছিল বংশীধর। আহা, এই শিশুদের তেমন কোনো বন্ধুই হলো না, যাকে ওরা জীবনভর মনে রাখবে।

নানা, নানি আজকে ভালো নাস্তা বানিয়েছেন। নিসতার হালুয়া, তন্দুরি রুটি, কাবাব—

এত কিছু?

হ্যাঁ, নানা, কে যেন অনেক কিছু দিয়ে গেছেন। সে জন্যইতো নানি—

আপনি যে ভালো খাবার খেতে ভালোবাসেন আপনার বন্ধুরা সবাই তা জানে।

হয়েছে, হয়েছে থামো তোমরা।

গালিব ওদের থামিয়ে দিয়ে মেঝেতে বিছানো দস্তরখানার কাছে দাঁড়ান। পরিপাটি করে সাজানো হয়েছে খাবার এবং প্লেট। বেশ সুগন্ধ আসছে। গালিব বারান্দার বালতিতে রাখা পানি দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নেন। ঘরে এসে এক মুহূর্ত ভাবেন, তাঁর ঘুম ছুটেছে ফাঁসির খবর শুনে। একটু আগে কাল্লু মিয়া এখানে বসে কাঁদছিল। একটু আগে তিনি দম ফেলার চেষ্টা করছিলেন। এখন ঘরে পাক খাচ্ছে সুস্বাদু খাবারের ঘ্রাণ। জীবনতো এমনই। ততক্ষণে উমরাও বেগম এসে গেছেন। নাতিদের প্লেটে খাবার তুলে দিচ্ছেন। গালিব জিজ্ঞেস করেন, কে পাঠিয়েছে?

আমিনউদ্দিন ভাই।

আর কিছু পাঠায়নি?

সুরার কথা বলছেন?

হ্যাঁ, তাই। আমার জীবন শুকিয়ে যাচ্ছে। দিনগুলো তো মরুভূমি হয়ে গেছে কবেই। যে এসেছিল সে কিছু বলেনি?

বলেছে।

বলেছে? তাহলে এতক্ষণ ধরে তা বলছো না কেন?

গালিবের কণ্ঠস্বরে অসহিষ্ণুতার আঁচ। চোখও বড় হয়ে গেছে।

এটা বলার মতো কোনো খবর নয় বলে বলছি না।

গালিব খাওয়া বন্ধ করে স্ত্রীর দিকে তাকান। চোখে আগুন। উমরাও বেগম অন্যদিকে তাকিয়ে বলেন, বলেছে দু'একদিনের মধ্যে একটি বোতল পাঠাবে। তবে বিদেশি বোতল না, দেশী।

হোক দেশী, তবুওতো সুরা।

গালিব উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন। বলেন, শুকরিয়া, শুকরিয়া। প্রকৃত বন্ধুত্বই জীবনের আসল সম্পদ।

গালিব খেয়াল করেন না যে তার উচ্ছ্বাস উমরাও বেগমকে কতটা বিমর্ষ করে ফেলেছে। যদিও তিনি জানেন তাঁর স্বামীকে, জানেন তিনি কতটা সুরাসক্ত, তারপরও এমন অনেক আনন্দ মেনে নেয়া কঠিন। তাঁর একটাই অভিযোগ যে তিনি মদ খেয়ে জীবনকে উড়িয়ে দিয়েছেন। যেটুকু মুঠিতে আছে তা খুবই সামান্য। উমরাও বেগম উচ্ছ্বাসের আরও কিছু না দেখার জন্য নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যান। বাচ্চারা খাওয়া শেষ করে উঠে পড়েছে। গালিব তখন তন্দুরি আর গোস্তের টুকরো চিবুতে চিবুতে বলছেন :

'সুরাপাত্রের গায়ে নানা বর্ণের চিত্র ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাও তুমি;
বিস্ময়ে উদভ্রান্ত চোখের আয়নায় আমি তা ধরে রাখি।'

দস্তরখানা ছেড়ে উঠে পড়েন তিনি। চিলুমচিতে পানি ঢেলে হাত ধুয়েছেন। বুকের ভেতর আনন্দের থইথই। একটি বোতল আসবে আগামী এক দুই দিনে কি? নাকি আরও পরে? বুকের পিপাসায় তিনি ব্যাকুলতা বোধ করেন। নিজেকে আশ্বস্ত করতে নিজেকে বলেন,

'গালিব, মদ তো ছেড়েছি, তবু এখনো কৃচিৎ কখনো, পান করি মেঘলা দিনে আর জ্যোৎস্না রাতে।'

তিনি মনের আনন্দ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য 'দস্তাম্বু' লিখতে বসেন। কিন্তু লেখা হয় না। মনোযোগ দিয়ে সুস্থির হয়ে বসার আগেই রাস্তায় ড্রামের শব্দের সঙ্গে কিছু একটা ঘোষণার কথা শুনতে পান। চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজায় দাঁড়ান। দেখতে পান বাড়ির ছেলেরাসহ প্রতিবেশী বাড়ির ছেলেরা গলির মাথায় যাচ্ছে। তিনিও লাঠিটা টেনে নিয়ে ধীরে সুস্থে এগুতে থাকেন।

শুনুন শুনুন, আপনারা শুনুন। ঘোষণাকারীর কণ্ঠ এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর কাছে। তিনি গলির মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে পড়েন। ও কি বলছে তা ঠিকমতো শোনার জন্যই দাঁড়ানো প্রয়োজন। হাঁটলে মনোযোগ হারিয়ে ফেলতে পারেন। শুনতে পান ঘোষণা : আপনারা শুনুন, যে যেখানে আছেন শুনুন,

গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং প্রত্যেক নাগরিককে নিজ নিজ বাড়িতে আজ সন্ধ্যা থেকে প্রদীপ জ্বালাতে নির্দেশ দিয়েছেন। সবাইকে বাড়ির বাইরের অংশ, দোকান, বাজারেও আলোকসজ্জা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি কমিশনার বাহাদুরের বাড়িতেও প্রদীপ জ্বালাতে হবে।

ঘোষণাটি শুনে গালিব গলির মাথায় এসে দেখতে পান টাঙ্গায় বসে থাকা দলটি ড্রাম পেটাতে পেটাতে চলে যাচ্ছে। গলির মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর তিক্ত কণ্ঠ গর্জে ওঠে—

কোথায় আলো জ্বলবে?

একজন চিৎকার করে বলে, কবরে।

ওহ, খোদা। শেষ পর্যন্ত শহরে কি প্রাণ ফিরবে?

না। ঘরবাড়িতো খালি। মানুষ কোথায়? কে আলো জ্বালাবে?

আমরা যারা আছি তারা জ্বালাবো।

যে কয়জন আছি সেই কয়জনকে জ্বালাতে হবে।

শুনলে না, আলো জ্বালানো হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য সৈন্যরা সারা রাত টহল দেবে।

যে বাড়িতে আলো দেখবে না সে বাড়ির সবাইকে ধরে নিয়ে যাবে।

আমি আমার বন্ধুর কবরে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে আসবো।

আমিও।

আমিও।

আমি আমার ভাইয়ের কবরে—

তোমরা থামো। একজন বয়সী ওদেরকে থামিয়ে দিয়ে বলে, তোমরা কবরে আলো জ্বালাতে যেও না। এই শহরে আমরা আর মৃত্যু দেখতে চাই না।

গালিব আবার বাড়ি ফিরতে থাকেন। তিনি ঘোষণাটি শুনেছেন মাত্র। কারো সঙ্গে কোনো কথা বলেননি। যেতে যেতে ভাবলেন, শুধু আলো কি পারবে এই মৃতপ্রায় শহরের প্রাণ ফিরিয়ে আনতে? আকাশে হাজার হাজার তারা জ্বলে শহর তো আলোকিত হয় না। মানুষের মুখে হাসি নেই। মৃত্যুভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ। হায় খোদা, আলো জ্বালানোর নির্দেশ দিয়ে গভর্নর জেনারেল একটা কৌশল নিয়েছেন। এই শহরে প্রদীপ জ্বালাবে বাসিন্দারা। কোথাও উজ্জ্বল আলো জ্বলবে। কোথাও ক্ষীণ আলো। এই শহরে মুঘল বাদশাহ বিচারাধীন আছে। তিনি এখন জেলে বাস করছেন।

গালিব গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বিড়বিড় করে বললেন, বাদশাহ বাহাদুর শাহ

জাফর একজন কবি। কবিকে বিচার করার সাহস হয় ওদের। শুনেছি বাদশাহ এখন কাঠকয়লা দিয়ে দেয়ালের গায়ে কবিতা লিখছেন। আসলে, কবিতা লেখাই তো কবির নিয়তি।

তিনি হাঁফাতে হাঁফাতে নিজের বাড়ির দরজায় এসে থামেন। দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন উমরাও বেগমকে। তখন বিরক্তি নিয়ে বলেছিলেন, আবার বিবি! কতগুলো বছর যে তাঁর সঙ্গে কাটাতে হলো।

কোথায় গিয়েছিলেন? আমি আপনাকে নিয়ে খুব ভয়ে থাকি। পানি খাবেন?

গালিব মৃদু কণ্ঠে বলেন, ভয় কেন?

গোরা সৈন্যরা যদি আপনাকে ধরে নিয়ে যায়। যদি—

যদি বলে থেমে যান উমরাও বেগম।

গালিব তাঁর হাত নাড়িয়ে দিয়ে বলেন, থামলে কেন বিবি? বলতে পারলে না, যদি আমাকে মেরে ফেলে? হয় গুলি করে, না হয় ফাঁসিতে ঝুলিয়ে? হাঃ হাঃ, এটাই এখন এই শহরের নিয়ম।

উমরাও বেগম শুকনো কণ্ঠে বলেন, ওরা ঘোষণায় কি বললো?

বাড়িতে দোকানে বাজারে প্রদীপ জ্বালাতে বলেছে।

প্রদীপ জ্বালাতে হবে?

হ্যাঁ, ওরা দেখাবে যে শহর সচল হয়ে উঠেছে। বিদ্রোহ দমন হয়েছে। দেশ এখন ইংরেজ শাসনের অধীনে।

ওরা আপনার পেনশন ঠিকমতো দেবে তো? যদি দেয় তাহলে আপনি যে কয়টা প্রদীপ জ্বালাতে বলবেন তারচেয়ে একটি বেশি আমি জ্বালাবো।

প্রদীপ বেশি না জ্বালালেও আমি পেনশন পাবো বিবি।

রানীর নামে কসীদা লিখেছিলেন? এখন কি গভর্নরের নামে লিখবেন?

হ্যাঁ, লিখতেতো হবেই। তুমিসহ এই সংসারে আশ্রিতের সংখ্যাতো অনেক। সবার জন্য রুটি তো আমাকেই যোগাতে হয়।

আপনি রুটির খোঁটা দিলেন? আমার দুই নাতিও আপনার আশ্রিত।

গালিব হেসে বললেন, দরজা ছাড়ো। ঘরে ঢুকতে দাও।

উমরাও বেগম দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে থাকলেন। বাকি পথে ঘরে ঢুকলেন গালিব। উমরাও বেগম ভাবতে পারলেন না যে কতদিন এই মানুষটির সঙ্গে তিনি সুখের দিন কাটিয়েছেন। হিসেব মেলে না। তিনি আকাশের দিকে তাকান। ঝকঝক করছে আকাশ। নীল আলো প্রদীপের শিখার মতো। তিনি দোপাট্টায় চোখের জল মুছলেন। সে জল দেখলেন না গালিব।

সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বললো শহরে।

গালিবের বাড়িতেও দুটি মাটির প্রদীপ জ্বালানো হলো। সামান্য তেলে প্রায় নিভু নিভু সলতে জ্বললো কতক্ষণ কে জানে!

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে শুনতে পেলেন গোরা সেনাদের টহলের শব্দ। ওরা শহরে দাপিয়ে বেড়িয়ে দেখছে প্রত্যেক বাড়িতে আলো জ্বালানো হয়েছে কিনা। কাউকে পেলে সঙ্গে সঙ্গে ধরবে। ওদের শরীরে এখন খুনের নেশা। ওরা কারো কবরে আলো জ্বলতে দেখলেও ধরবে। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। মাটির প্রদীপ নিভে যায়নিতো? জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলেন আজাদ শিশি থেকে প্রদীপে তেল ঢালছে। উস্কে দিয়েছে সলতে।

তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ভাবলেন, এ যাত্রায় রক্ষা পাওয়া তাঁর জন্য খুব দরকার ছিল। অল্পক্ষণে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। জানতেও পারলেন না যে কত লোককে ধরেছে ওরা। কতজনকে গাছে ঝুলিয়ে মেরেছে।

এরপর তাঁর কাছে খবর আসতে লাগলো একের পরে এক। খবর এলো রাজপরিবারের একুশ যুবরাজকে একদিনের মধ্যে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে। তাঁদের লাশ গরুর গাড়িতে করে শহরের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। খবর পেলেন যে বাদশাহর পরিচিত অসংখ্য জনকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে। তারপরে তাদেরকে নেংটি পরিয়ে চাঁদনি চকে ফেলে রাখা হয়েছে। সবশেষে খবর পেলেন বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরকে রেঙ্গুনে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে।

টেবিলে বসলে নিচু হয়ে যায় মাথা। কলম চুবিয়ে দেন দোয়াতের কালিতে। সাদা পৃষ্ঠায় ফুটে ওঠে কালির আঁচড়। বেদনার তীব্র দহনে রচিত হয় পঙ্‌ক্তিমালা :

'রক্তের এক সমুদ্র চারপাশে উত্তাল হয়ে উঠেছে
হায়রে! তারা সব কোথায় গেল?
ভবিষ্যতই বলবে
আর কী কী আমাকে এরপরও দেখে যেতে হবে?'

লেখা শেষ হলে মাথা ঠেকে যায় টেবিলে। তিনি ভাবেন, অনন্ত বিশ্রামের সময় বুঝি এখনই।

বয়স বাড়ছে। শরীর ভেঙে যাচ্ছে।

'দস্তাম্বু' লেখা শেষ হয়ে গেছে। এখন ছাপার কাজ শেষ করতে হবে। শহরের অবস্থা এখন পর্যন্ত খুবই খারাপ। কবে ঠিক হবে কে জানে!

তিনি গভীর নিঃশ্বাস ফেলে নিজেকে বললেন, এখন তাঁর প্রিয় দিল্লি শহরে মৃত্যু খুব সস্তা। আর শস্য সবচেয়ে দামী।

মানুষের বেঁচে থাকার সঙ্কট এখন চরমে। এক টাকায় বিক্রি হচ্ছে বত্রিশ পাউন্ড যব। আর এক পাউন্ড ডালের দাম হয়েছে ষোল টাকা। উমরাও বেগম সংসার চালাতে হিমসিম খাচ্ছেন। তারপরও তাঁরা দুজনেই ঠিক করেছেন যে, একজন আশ্রিতকেও চলে যেতে বলবেন না। সবাই মিলে কষ্ট ভাগাভাগি করে নেবেন। দেনা হচ্ছে হোক। পেনসনের ছাড় হলে সব ঠিক করে ফেলবেন। জীবনভর দেনাতো কতই করলেন। শোধও করেছেন। বাকি যে কটা বছর বাঁচবেন, এভাবেই যাক।

গালিব আবারও নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলেন, গত বছরের দুটো ঘটনায় তিনি খুব মুষড়ে পড়েছেন। সিপাহীদের বিদ্রোহ তাঁকে এক ধরনের কষ্ট দিয়েছে। ইংরেজদের ক্ষমতা দখল আর এক ধরনের মানসিক সঙ্কট তৈরি করেছে। ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে পেনশন গ্রহণ করেন ঠিকই, এর দ্বারা বেঁচে আছেন। বড় সংসারের আশ্রিতদের বাঁচিয়ে রেখেছেন।

তারপরও? তারপরও ওদের নিষ্ঠুরতার কোনো ব্যাখ্যা তিনি খুঁজে পান না। বুক ভেঙে গেলে আবার নিঃশ্বাস পড়ে। ভাবেন, একজন কবির নিয়তি তো এমন হতে পারে না। গত কয়েক বছরে এই শহরের কত কিছু দেখতে হয়েছে তাঁকে। বিগত পাঁচ বছরে শহর বারবার আক্রান্ত হলো। একবার হলো সিপাহী বিদ্রোহের দ্বারা, একবার শহর পুনর্দখলকারী ব্রিটিশদের দ্বারা, মহামারী ও দুর্ভিক্ষের দ্বারা, কলেরার আক্রমণে এবং মহামারীর মতো জ্বরের ফলে। কতভাবে যে এলোমেলো হয়ে গেছে শহরবাসীর জীবন।

তিনি নিজের ঘরে একাকী চুপচাপ বসে থেকে ভাবেন, 'গালিব তোমার বাড়ির মেঝে-দেওয়াল সব ছেয়ে যাচ্ছে জংলা লতায়—আমি কী এতই নিঃসঙ্গ এবং হতভাগ্য যে, আজ আমার বাড়িতে এইভাবে অবহেলায় বসন্তের সমাগম ঘটছে।'

তিনি সোজা হয়ে বসেন।

বসন্ত! ওহ, বসন্ত!

তারপর খুব নিঃসঙ্গ কণ্ঠে বলেন :

'কোনো আশাই পূর্ণ হয় না,

কোনো পথই দেখা যায় না কোথাও।।'

উমরাও বেগম এক গ্লাস গরম পানি নিয়ে ঘরে এলেন। এগিয়ে দিয়ে বললেন, খান।

শুধু পানি?

আর কি?

কোনো ব্যবস্থাই কি হয় না?

উমরাও বেগম কথা না বলে অন্যদিকে মুখ ঘোরান।

ঠিক আছে বিবি, দাও। তুমি আমাকে গরম পানি পান করতে বলছো—

কারণ আপনার বুকে কফ জমেছে। এ বছর ঠাণ্ডা খুব বেশি পড়েছে।

গালিব গরম পানিতে চুমুক দিয়ে বলেন, হ্যাঁ ঠাণ্ডা খুব বেশি পড়েছে। ঠাণ্ডায় কাবু হয়ে পড়েছি আমি।

কড়াইতে কয়লা জ্বালিয়ে দিতে বলবো?

না, দরকার নাই। বাড়তি খরচ করার সাধ্য কি আর আছে।

উমরাও বেগম খালি গ্লাস হাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। গালিব দেখতে পান বুড়িয়ে গেছে উমরাও বেগম। চেহারায় বলিরেখা। চুল অর্ধেকই সাদা হয়ে গেছে। আগের মতো শারীরিক শক্তি আছে বলেও মনে হয় না। তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনে হয় উমরাও বেগমও খুবই একা। সন্তানহীন এই নারীর লড়াইয়ের সময় শেষ হয়ে গেছে। শুরু হয়েছে তাঁর দিন গোণার পালা।

উমরাও বেগম ক্লান্ত স্বরে নিচু কণ্ঠে বলেন, আপনি কি ভাবছেন?

তাদের কথা ভাবছি যারা ব্রিটিশদের তাড়া খেয়ে সব কিছু ফেলে শহরের বাইরে চলে গেছে।

উমরাও বেগম বিষণ্ন কণ্ঠে বলেন, এই শীতে তাদের না জানি কত কষ্ট হচ্ছে।

ওরা নিজের ইচ্ছায় যায় নি। ওদেরকে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। আহ, বিশাল প্রান্তর—শীতের রাত—হিমঝরা রাতের কনকনে ঠাণ্ডা—কুয়াশা—আমি আর ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারছি না বিবি। ওদের জন্য আমার বুক পাথরের মতো ভারী হয়ে আছে।

ওদের মধ্যে অনেকজন আপনার বন্ধু।

আমার প্রিয় বন্ধু বিবি। ওরা চলে গেছে পরিবার পরিজনসহ। ওরা কবি। ওদের কবিতা দিল্লি শহরে রয়ে গেছে। সইফতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওর

সাগরেদ ছিল অনেকে। যেসব ব্রিটিশকে সেপাইরা মেরে ফেলেছে তাদের অনেকে সইফতার সাগরেদ ছিল। ওরা না থাকলেও গালিব তো রয়ে গেছে। দুঃখ বয়ে বেড়ানোর জন্যই গালিবের বেঁচে থাকা। হায় গালিব, তোমার মতো দুর্ভাগা আর কে!

দুঃখ করবেন না। উমরাও বেগমের শান্ত কণ্ঠ।

গালিব চেয়ারে মাথা হেলিয়ে দেন। মনে হয় চারদিক থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে আসছে। তিনি ওই শব্দ করোটিতে পুরে নিয়ে চলে যাচ্ছেন কোথাও। কোনো এক অলৌকিক যাত্রায়। তিনি কাঁধে কবিতার পুটলি নিয়ে পথে নেমেছেন। কতদূর যেতে পারবেন কে জানে? দেখা হলো বাদশাহর সঙ্গে। দু'হাত বাড়িয়ে গালিবকে আলিঙ্গন করলেন। গালিব তাঁর মানসিক উষ্ণতা উপভোগ করে ভাবলেন, কয়েক বছর আগে বাদশাহ একবার মক্কা শরীফে যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন। তখন গালিব তাঁর গজলে এই শেরটি লিখেছিলেন :

'যিনি যান মক্কায়, তিনি সঙ্গে নেন আমায়
খুশিমনে আমার পুণ্য অর্পণ করি তায়।'

গালিবের মনে হলো তিনি যেন বাদশাহকে জিজ্ঞেস করছেন, কেমন আছেন কবি? বাদশাহ এখন আর বাদশাহ নন। নির্বাসিত একজন। কবিতা ছাড়া আর কোনো সঙ্গী নেই তাঁর। তিনি ব্রিটিশদের অন্যায় কাজগুলো বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছিলেন। না মেনে তাঁর কোনো উপায় ছিল না। রাজ্য শাসন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে কবিতা লেখায় মনোযোগী হয়েছিলেন। কিন্তু এসব করেও শেষ রক্ষা হয়নি। লালকেল্লায় নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে এক ধূসর বিষণ্ন দিনে তাঁকে চলে যেতে হয়েছে। গালিব ভাবলেন যাওয়ার সময় তিনি কি নিজের লেখা শেরটি মনে মনে উচ্চারণ করে দিল্লি শহরের চৌহদ্দী অতিক্রম করেছিলেন? গালিব নিজেই বাদশাহর লেখা শেরটি আবৃত্তি করলেন :

'দরজা আর দেওয়ালগুলোর দিকে অতৃপ্ত নয়নে দেখছি
বিদায় হে দেশবাসী, আমি যে পথ চলছি।'

হায় বাদশাহ, রেঙ্গুনের নির্বাসিত জীবনে ঘরের দেয়াল আপনার কবিতার খাতা। কাঠকয়লা আপনার কলম। কিন্তু বাদশাহ আপনার কোনো দোয়াত নেই। দোয়াতভরা কালি নেই। আপনার কবিতা আর আমাদের পড়া হবে না। আপনি এখন গজলের কোন শেরে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন প্রিয় বাদশাহ? আপনার কি মনে পড়ে একবার দরবারে এমন একটি শের পড়েছিলাম :

'রহস্যময় তোমার কাব্য, অতুলনীয় ভাষা গালিব,
তোমায় দেবদূত ভাবতাম, যদি মদ্যপ না হতে।'

গালিবের শেরটি শুনে বাদশাহ বলেছিলেন, 'না কবি, মদ্যপ না হলেও তোমাকে আমি দেবদূত ভাবতাম।' সেদিন গালিব হাসতে হাসতে বলেছিলেন, বাদশাহ হুজুর, আমি জানি আপনি আমাকে এখনও তেমনটিই ভাবেন, কিন্তু আপনি আমার গজলের প্রশংসা করতে চান না।

ক্লান্ত গালিব বাদশাহর স্মৃতিচারণ করে নিজের মধ্যে শক্তি ফিরে পান। মনে হয় স্মৃতি বুকের দেয়ালে আটকে থেকে মানসিক সঙ্কট কাটানোর জন্য ঔষধি হিসেবে কাজ করে। তিনি ভাবতে থাকেন সেই সময়ের কথা যখন বাদশাহর ওস্তাদ হওয়ার পরে তাঁকে প্রায়ই লালকেল্লায় যেতে হতো। কখনো যেতেন বাদশাহর কবিতার পরিমার্জনা করে। কখনো নিজের লেখা গজল নিয়ে যেতেন। সবসময় দরবারে বসে থাকতে হতো না। তখন কেল্লায় গিয়ে দীওয়ান-এ-আম-এ বসে থাকতেন। বাদশাহ ডেকে পাঠালে তাঁর সঙ্গে দেখা হতো। নইলে দুপুরের দিকে চলে আসতেন। মাঝে মাঝে বাদশাহর অন্য রকম ইচ্ছে হতো। সকাল বেলা দরবার বসতো। বিকেল হলে নদীর ধারে গিয়ে ঘুড়ি ওড়ানো হতো। বাদশাহ গালিবকেও এসব অনুষ্ঠানে থাকার জন্য হুকুম দিতেন। অন্য সভাসদদের মতো তিনিও উপস্থিত থাকতেন। কেটে যেতো সারাদিন। সব সময় এভাবে সারাদিন কাটাতে তাঁর ভালো লাগতো না। তাঁর শরীরের জন্য সেটা শাস্তিস্বরূপ ছিল। এখন দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে যে এমন শাস্তি দেওয়ার লোকটি এখন এই শহরে নেই। মাঝে মাঝে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ছেন। বুক তোলপাড় করে ওঠে। তোলপাড় করে ওঠে শহর—তাঁর চিরচেনা জায়গাগুলো—লালকেল্লা, জামা মসজিদ, চাঁদনি চক, কাশ্মিরী গেট, যমুনা নদী ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

মনে পড়ছে শাহজাদাদের কথা। মনে পড়ছে বাদশাহর উত্তরাধিকারী ফখর-উদ-দিনের কথা। হঠাৎ করে তাঁর মৃত্যু হলে ব্রিটিশরা একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তারা ঠিক করেছিল যে বাদশাহর পরে যিনি তখতে বসবেন তাঁকে আর বাদশাহ বলা হবে না। তিনি শাহজাদা নামে অভিহিত হবেন। সেই ঘোষণায় গালিব নিজেও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছিলেন। ভবিষ্যতে ভাগ্যে কি আছে তা ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না। ব্রিটিশ সরকার আরও বলেছিল যে, বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরের মৃত্যু হলে তাঁরা আর কেল্লায় থাকতে পারবেন না। তাদেরকে শহরের বাইরে গিয়ে বাস করতে হবে। তাদেরকে কুতুব এলাকায় থাকার নির্দেশ দেয়া হবে। দুঃখ গভীর হয়ে চেপে থাকে এটা

ভেবে যে ফখর-উদ-দিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্ণৌর নওয়াবী আমল শেষ হয়ে গেছে। লক্ষ্ণৌ তাঁর পছন্দের শহর। যখনই ওই শহরে গিয়েছেন প্রবল টান অনুভব করেছেন।

ঘুরে ফিরে তাঁর স্মৃতি আবার শাহী পরিবারে এসে দাঁড়ালো। ব্রিটিশ সরকার শাহজাদাদের কাউকে বাদশা বলতে চায়নি। ওদের চোখে তারা শুধুই প্রিন্স ছিল। তাঁদের অনেককে গুলি করে মারা হয়েছে। অনেককে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে। জল্লাদের ফাঁসির দড়িতে তাঁদের আত্মা হিমশীতল হয়ে জমে গিয়েছিল। কেউ কেউ এখনো বন্দিশিবিরে আটকে আছে। কেউ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। শাহী পরিবার ছেড়ে বেরিয়ে গেছে সাধারণ মানুষের বেশে। কোথায় তারা কেউ জানে না। ঘুমিয়ে আছে হয়তো গাছতলায়, নয়তো কোনো জীর্ণ কুটিরে বসে শুকনো রুটি চিবুচ্ছে। পানি পেয়েছে কি পায়নি কে জানে! বৃদ্ধ, দুর্বল, অসহায় বাদশাহ কেমন ছিলেন তাঁর প্রাসাদে? কেমন কেটেছিল তাঁর শেষ দিনগুলো?

পরক্ষণে নিজেকে শান্ত করার জন্য বলেন, না, আমি আর বাদশাহর কথা ভাববো না। তিনি দূরে আছেন দূরেই থাকুন। কিন্তু বাদশাহকে ছাড়তে পারলেন না। তাঁর প্রায়ই মনে হতো তিনি যত না বাদশাহর ওস্তাদ, তারচেয়ে বেশি সভাসদ। বাদশাহর নিজের এবং তাঁর দরবারের মনোরঞ্জন করাই ছিল বুঝি প্রধান কাজ। তিনিতো অনায়াসে ওদের মনের ইচ্ছা পূরণ করেছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে বুক ভেঙে যেতো। কষ্ট পেতেন। ভাবতেন, এটাতো কবির কাজ নয়। একবার বাদশাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মির্জা তুমি কয়টি রোজা রেখেছো? তিনি বলেছিলেন, 'এক নহী রক্‌খা।' তিনি ভাবলেন সেদিন তিনি কৌশলে বাদশাহর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। এর অর্থ তো দুই রকমই হতে পারে। ধরা যেতে পারে যে একটাও রাখিনি। কিংবা সবগুলো রেখেছি, শুধু একদিন রাখা হয়নি। সেদিন এটাকে রসিকতা ভেবে সবাই হেসেছিলেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন কেউ করেনি। কত যে মজার কত কিছু ঘটে যায়। কত সামাল দিতে হয়। ভেবে নিজে হাসলেন। একবার রমজান মাসে একজন সুন্নী মৌলভী দেখা করতে এসেছিলেন। সূর্য তখনো ডোবেনি। সন্ধ্যার কাছাকাছি সময় ছিল। তিনি আজাদকে বলেছিলেন, তার জন্য এক গ্লাস পানি নিয়ে আসতে। মৌলভী অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল, আপনি রোজা রাখেননি জনাব? তিনি তাকে বলেছিলেন, আমি তো ভাই সুন্নী মুসলমান। দিনের চার প্রহর বাকি থাকতেই রোজা খুলে ফেলি।

মৌলভী সাহেব হাঁ করে তাকিয়েছিলেন। এখন এই স্মৃতিচারণের সময় তাঁর বেশ আমোদ লাগছে। মানুষকে হাসিয়ে তিনি মজা পেয়েছেন। আবার

যারা তাঁর কৌতুক শুনেছেন তারা সেগুলো মনে রেখেছেন। মুখে মুখে প্রচার হয়ে গেছে কৌতুকগুলো। চেয়ার থেকে মাথা তুলে ভাবলেন 'দস্তাম্বু'র পৃষ্ঠায় চোখ বোলাবেন। দিনলিপির পাতা ভরে আছে তাঁর অনুভবে, কষ্টের কথায়—শহরের ঘটনায়। এটি ছাপা হলে বোঝা যাবে পাঠকেরা কীভাবে এর মর্যাদা করছে।

তিনি সোজা হয়ে বসে 'দস্তাম্বু' লেখা খাতাটি টেনে পাতা উল্টাতে না উল্টাতে আলতফ আসে। হাতে দেশীয় মদের বোতল।

গালিব কয়েক কদম এগিয়ে আলতফকে জড়িয়ে ধরে বলেন, সাগরেদ তুমি! তুমি দেবদূত হয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছ।

আলতফ হাসিমুখে বলেন, ছাড়েন, ছাড়েন। আগে বোতলটা আপনার হাতে উঠিয়ে দেই। তবেই আমার আত্মা শান্তি পাবে ওস্তাদজী। আমিতো জানি আপনি কত নিরানন্দেই আপনার দিনগুলো কাটাচ্ছেন।

আমার অবস্থা তোমার চেয়ে বেশি আর কে জানে! সাগরেদইতো ওস্তাদকে বোঝে।

গালিব বোতলটা হাতে নিয়ে কাল্লু মিয়াকে হাঁক দিয়ে ডাকেন। পেয়ালা আনতে বলেন। আলতফ শতরঞ্জির ওপর বসেন। সঙ্গে গালিবও। বোতলের ছিপিটা খুলতে খুলতে গালিব বলেন, তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি ছোট। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার জমে ভালো।

আমি তো আপনার সাগরেদ ওস্তাদজী। যাঁর কবিতার জন্য শিষ্যত্ব হয়, তিনি আমার মাথার উপরের মানুষ। আমার বুকের ভিতরের মানুষ।

গালিব আলতফের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকেন। ভাবেন, শিষ্যের ভালোবাসা পাওয়া বিরল ভাগ্যের ব্যাপার। তারপর হাসতে হাসতে বলেন, মনে আছে একদিন তোমাকে আমি শামী কাবাব খেতে বলিনি?

আলতফ হেসে বলেন, পরেরটুকু আমি বলি?

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, বলো। তোমার কাছ থেকে শুনতে আমার এখন ভালোই লাগবে। কারণ তোমার আনা সুরা পানের সঙ্গেই তোমার কথা শুনবো।

আলতফ হেসে বলেন, বহুৎ শুকরিয়া। একদিন আমি সন্ধ্যা হওয়ার আগেই আপনার বাড়িতে এসেছিলাম। তখনো সূর্য ডোবেনি। আপনি রাতের খাবার খাচ্ছিলেন।

খাবার বলতে তেমন কিছু ছিল না। শুধু শামী কাবাব। গালিব কৌতুকের স্বরে বলেন।

আমি আপনার সামনে বসে আমার রুমাল দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছিলাম।

গালিব এক চুমুক মদপান করে হাত তুলে বলেন, থামো, থামো।

থামবো কেন? আলতফ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে, আপনি বলেছিলেন, তুমি শুধু শুধু কষ্ট করছো। এই কাবাব থেকে এক টুকরোও তোমাকে দেবো না।

সেদিন তুমি আমাকে কিছু বলনি আলতফ।

আমিতো জানতাম যে কাবাব আপনার খুব প্রিয় খাবার। আর সেদিন কাবাব পরিমাণে খুব বেশিও ছিল না।

আমিতো জানি এ জন্যই তুমি আমার খুব প্রিয় সাগরেদ।

আপনি আমাকে সেদিন আর একটি গল্প বলেছিলেন।

কেন বলেছিলাম জানো?

আপনি নিজে আমাকে শামী কাবাবের টুকরো যে দেননি—

গালিব তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়ে তাড়াতাড়ি বলেন, হ্যাঁ ঠিকই ধরেছো যে আমি নিজের না দেয়ার সাফাই গেয়েছিলাম।

আলতফ হা হা করে হেসে ওঠেন।

গালিব তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, তুমি এখন মনের আনন্দে ঘটনাটি স্মরণ করে বলতে পারো। আমরা দুজনেই না হয় হাসি।

আলতফ কিছু বলার আগেই কাল্লু মিয়া তাঁর জন্য আখরোট আর শরবত নিয়ে আসে। আলতফ শরবতের গ্লাসটি হাতে নিয়ে এক চুমুক পান করে বলেন, আপনি সেদিন নওয়াব আবদুল অহদ খাঁর কথা বলছিলেন। বলেছিলেন তিনি খেতে বসলে তাঁর দস্তরখানায় তাঁর কাছের মানুষ ও দোস্তদের জন্য নানা রকম খাবার রাখা হতো। যেটা অন্যদের দেয়ার জন্য থাকতো। শুধুমাত্র তাঁর জন্য যা রান্না হতো তিনি ওটা ছাড়া অন্য কিছু খেতেন না। শুধু সেই খাবারটিই তাঁর সামনে রাখা হতো। একদিন তাঁর জন্য জাফরান দেয়া পোলাও রান্না হয়েছিল। সেদিন সে সময়ে তাঁর একজন পর্ষদ সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। সেদিন মেহমানদের জন্য অন্য খাবার রাখা ছিল না। পর্ষদও তাঁর সামনে আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাই তিনি কাজের ছেলেটিকে একটি রেকাবি আনার জন্য ডাক দিলেন। ছেলেটির আসতে দেরি হচ্ছিল। এদিকে নবাব খেয়েই যাচ্ছেন, আর ছেলেটিকে ডাকছেন। তখন উপস্থিত পর্ষদ নওয়াবের সামনে রুমাল নাড়াতে নাড়াতে বলেন, হুজুর অন্য রেকাবি চেয়ে আর কি করবেন? আপনার পোলাওর রেকাবিতো খালি হয়ে যাচ্ছে?

নওয়াব তাঁর এমন সরাসরি কথায় হেসে ওঠেন এবং রেকাবিতে যেটুকু

অবশিষ্ট ছিল সেটুকুই তাঁর দিকে এগিয়ে দেন।

গালিব হাসতে হাসতে আলতফের দিকে নিজের অর্ধেক খাওয়া পেয়ালা এগিয়ে দিলে বলেন, খাবে নাকি এক চুমুক?

না। আলতফ ঘনঘন মাথা নেড়ে বলেন।

তাহলে বোতলের বাকিটুকু রাতে খাবো। এখন না হয় থাক।

শুধু রাতে কেন, দু'দিন ধরে খাবেন। এখন রেখে দিন। যথেষ্ট হয়েছে।

ঠিকই বলেছো।

গালিব বোতলের গায়ে চুমু দিয়ে সরিয়ে রাখেন। কাল্লু মিয়াকে ডাকেন। মদের বোতল রাখার জন্য তাঁর একটি কাঠের বাক্স আছে। সেই বাক্সের চাবি থাকে কাল্লু মিয়ার কাছে। এক ডাকেই কাল্লু মিয়া কাছে এসে দাঁড়ায়।

বোতলটাকে তালাবদ্ধ করো কাল্লু মিয়া। আর এই গোলাপ জলের বোতল দুটো সরিয়ে ফেলো।

কাল্লু মিয়া আপনার খুব ভালো সেবক।

তোমরা সবাই তা জানো। ওকে আমি একদিনই বলে দিয়েছি যে আমার নেশা হলে যদি বেশি পান করতে চাই, তাহলে একদমই আমার কথা শুনবে না। বাক্সের চাবি আমাকে দেবেও না। ও কথা রেখেছে। একদিনও কথার বরখেলাপ করেনি। তাই না কাল্লু মিয়া?

কাল্লু মিয়া লাজুক হেসে মাথা নত করে।

আলতফ বলেন, সাবাস কাল্লু মিয়া। আমরা জানি তুমি আমাদের ওস্তাদকে খুবই ভালোবাসো। শুনেছি তুমি কখনোই ওস্তাদকে চাবি দাওনি।

কাল্লু মিয়া আবারও ঘাড় কাত করে বলে, জ্বী হুজুর।

আমি যে মদের সঙ্গে দু-তিন ভাগ গোলাপ জল মেশাই এটা ও ভালো জানে। আমার এদিক-ওদিক হলেও কাল্লু মিয়ার হাতের মাপ একদম ঠিক। তাই না কাল্লু মিয়া?

ও আবারও একই ভঙ্গিতে বলে, জ্বী হুজুর। আমি তো জানি গোলাপ জল মদের তেজ কমিয়ে দেয়। কটু ঝাঁঝটাও হালকা করে।

দু'জনে হেসে উঠে বলেন, তুমি কি করে জানলে?

কাল্লু মিয়া উত্তর না দিয়ে ছুটে পালায়।

আলতফ হেসে বলেন, আমি কি আপনার কথা আপনাকে আবার শোনাবো?

কোন কথা?

ওই যে বলেছিলেন, 'খোদা গালিবকে বাঁচিয়ে রাখুন, আসল শরাবে

গোলাপ জল মিশিয়ে খাওয়া তাঁর অভ্যাস।'

গালিব বিষণ্ন কণ্ঠে বলেন, নেশাকে বশে রাখতে চেষ্টা করেছি বলে তো রাখতেও পেরেছি। তারপরও নেশা আমার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে ছাড়লো। আমাকে মাফ করলো না। তোমরাতো জানো আমি বেশ কম মাত্রায় মদ পান করি।

আজ কি আপনার দিল খুশ হয়নি?

হয়েছে, হয়েছে। তুমি আমার বেঁচে থাকার সাধ বাড়িয়ে দিয়েছো।

গালিব আলতফের দু'হাত জড়িয়ে ধরেন।

আমি এখন যাই। আমার একটু কাজ আছে। যেতে হবে। ও হ্যাঁ, নওয়াব জিয়াউদ্দিনের কোনো খবর পেয়েছেন?

না, পাইনি। আমার বিবিতো তাঁর ভাইয়ের খবরের জন্য অস্থির হয়ে আছে।

হবেইতো। তিনি একজন গুণী মানুষ।

গালিব উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেন, আহা, হা, যেমন তাঁর কবিতা, তেমন গদ্য লেখা। কত বিষয়ে যে তাঁর পড়ালেখা আছে, দেখে আমি অবাক হই। আহা, জিয়াউদ্দিন, কি যে ভালো সে আমাকে বাসে। ঠিক আছে, তুমি আজ যাও। কাল আবার এসো। তুমি ওর কথা উঠিয়ে আমার মনটা খারাপ করে দিলে আলতফ।

আমি ওর কথা না উঠালেও আপনি ওর কথা ভাবেন ওস্তাদজী। আমিতো জানি জিয়াউদ্দিন আপনার মনের গভীরে আছে।

গালিব বিষণ্নভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন, তা ঠিক।

আলতফ চলে যান, কিন্তু জিয়াউদ্দিনকে রেখে যান তাঁর মনে। তিনি স্মৃতি টেনে এনে নিশ্চুপ হয়ে যান। তিনি যা কিছু লিখতেন জিয়াউদ্দিন তার নকল রাখতেন। এ ব্যাপারে তাঁর কোনো গাফিলতি ছিল না। অলসতাও করতো না। গালিব দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন। যেন বুকের ভেতরে কষ্টের যমুনা বইছে। জিয়াউদ্দিনের বাড়ি এবং লালকেল্লার গ্রন্থাগারটি লুট হয়ে গেলে তাঁর আজীবনের সম্পদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। গালিবের লেখা সংগ্রহ করে রাখার জন্য তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করেছিলেন। নয়শ পৃষ্ঠা গদ্য এবং পনেরশ থেকে দুই হাজারটি কবিতা চামড়ায় বাঁধাই করে সোনা-রূপার জল দিয়ে তার অলঙ্করণ করিয়েছিলেন। বাদশাহর পুত্র মীর্জা জাফর ছিলেন গালিবের সাগরেদ। হায়, শাহজাদা! গালিব দু'হাতে চোখের পানি মুছলেন। নিজেকেই বললেন, বেঁচে আছ, না মরে গেছ তার কিছুই জানি না। তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হলো

না। তুমিই তো জিয়ার সংগ্রহ থেকে আমার সব লেখার প্রামাণ্য নকল লালকেল্লার গ্রন্থাগারের জন্য সংগ্রহ করেছিলে। আহ, আমার মনে কি শান্তি ছিল। ভেবেছিলাম আমার সব লেখার সংরক্ষণ হলো। কে আর আমাকে মুছে ফেলবে? এ বিষয়ে আমার নিজের চিন্তা করার কিইবা আছে! নিজেতো এতটা জীবনে কোনো লেখাই ঠিকমতো গুছিয়ে রাখলাম না। ভেবেছিলাম জিয়াউদ্দিন যা করেছে তারপরে আমার আর দরকার কি গোছানোর!

তিনি কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বিলাপের মতো করে বললেন, আমার সব ধ্বংস হয়ে গেছে। হায় খোদা, এমনই নসীব আমার।

তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মতো পায়চারী করেন। গদরের পরে এমন একটি খবর পেতে তাঁর বেশি সময় লাগেনি। কিন্তু এতই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন যে শোক প্রকাশের মতো অবস্থা হয়েছিল। এখন কিছুটা সামলে উঠেছেন। কিন্তু বুকের ভেতরের জমাট অগ্নিকুণ্ডতো প্রায়শ অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়। তখন নিজেকে সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। তিনি পায়চারি করতে করতে বলেন, আমার পুরনো কবিতাগুলো আর একবার দেখার জন্য আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে। ওহ, খোদা!

ঘরে ঢুকে থমকে যান উমরাও বেগম।

দু'পা এগিয়ে কাছে গিয়ে বলেন, কি হয়েছে?

আমার কবিতা—

উমরাও বেগম আর্তকণ্ঠে বলেন, ওহ, আমার ভাই।

গালিব বিড়বিড় করে বলেন, জিয়াউদ্দিন কি আর একবার আমার কবিতাগুলো সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা নেবে?

আপনিতো জানেন না যে আমার ভাই বেঁচে আছে কিনা।

গালিব মাথা নেড়ে বলেন, হ্যাঁ তা জানি না। তবে তো তাঁরা শহরের বাইরে চলে গেছে। নিশ্চয়ই ভালো আছে।

আল্লাহ মালুম।

উমরাও বেগম ওড়না দিয়ে চোখ মোছেন। তারপর কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে বলেন, কতদিন পরে খবর পেলাম যে ইংরেজ সৈন্য শহর দখল করার পরে আমার চাচাতো ভাইয়েরা শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ঠিক করলেন।

গালিব তাঁর কথার সূত্র ধরে বলেন, এবং তাঁরা চলে গেলো। আমরা জানতেও পারলাম না।

কারণ তখন শহরের অবস্থা এতই খারপ ছিল যে জানার কোনো উপায় ছিল না। আমরা সবাই ভয়ে-আতঙ্কে ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখেছিলাম।

গালিব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, নসীব! নসীব! এত বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে আছি, এইসব দেখার জন্য কি আমি বেঁচে আছি! হায় খোদা, জানি না আর কতদিন আমার বেঁচে থাকতে হবে!

আপনি শরবত খাবেন?

না, থাক। আমার কিছু ভালো লাগছে না। আমার পুরনো কবিতাগুলো দেখার জন্য আমার বুকের ভেতরটা আইঢাই করছে। বিবি, তোমার কি মনে আছে যে একজন ফকির কোথাও থেকে আমার একটি গজল জোগাড় করে সুন্দর গলায় গেয়ে ভিক্ষা করছিল।

উমরাও বেগম উৎসাহিত কণ্ঠে বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে আছে। কি সুন্দর গলার স্বর ছিল ফকিরের। কত দরদ দিয়ে যে গাইছিল। আমার শুনতে খুব ভালো লাগছিল। আপনি যখন ওকে জিজ্ঞেস করলেন যে এই গজলটি কার লেখা। ও তখন আপনাকে একটি কাগজের টুকরো দেখিয়েছিল।

ওর হাতের কাগজের টুকরো দেখে আমার চোখ পানিতে ভরে গিয়েছিল বিবি।

আমারও চোখও পানিতে ভরে গিয়েছিল। পানি মুছে আমি শেষ করতে পারছিলাম না।

জিয়াউদ্দিনের বাড়ি কিংবা লালকেল্লার লাইব্রেরি থেকে লুট হয়ে যাওয়া আমার বইয়ের কাগজের টুকরোটি ফকির কোনোভাবে পেয়েছিল বিবি।

তাই হবে। আমার ভাই আপনাকে যে কত ভালোবাসে তা তো আমি জানি। এই জীবনে আমার ভাই আপনার জন্য আর কিছু করার কি সুযোগ পাবে! কে জানে!

পাবে। সুযোগ পাবে।

পাবে? উমরাও বেগমের দৃষ্টি প্রসারিত হয়।

আমি মারা গেলে জিয়াউদ্দিন আমার দাফনের ব্যবস্থা করবে।

গালিবের বিষণ্ন কণ্ঠ উমরাও বেগমকে স্পর্শ করে। তিনিও বিষাদমাখা কণ্ঠে বলেন, আমিতো কবিতার কথা বলেছি। আপনি—

গালিব উমরাও বেগমের দু'হাত জড়িয়ে ধরে বলেন, আমার মৃত্যুও আমার কাছে কবিতা বিবি। আমার জন্ম-মৃত্যুও আমার কবিতা। যে ফকির গজল গায় সে আমাকে পিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বাদশাহর যে পুত্র আমার সাগরেদ সে আমাকে কবিতার বেহেশতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমার মনে হয় আমি আমার মায়ের কাছে যাচ্ছি। আমার যে বন্ধু আমার কবিতা আবৃত্তি করে সে আমাকে আমার শ্বশুরের কাছে নিয়ে যায়। শ্বশুর এই দিল্লি শহরের সব

AMARBOI.COM

রাস্তাগুলো আমাকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন। জিয়াউদ্দিন একদিন আমাকে বলেছিল, আমার শ্বশুরের কবরের পাশে আমাকে কবর দেবে।

ওহ, এসব কথা আমি শুনতে পারছি না।

উমরাও বেগম দোপাট্টায় মুখ ঢেকে বেরিয়ে যান। একলা ঘরে দাঁড়িয়ে থাকেন গালিব। কিন্তু এই মুহূর্তে নিজেকে একটুও নিঃসঙ্গ মনে হয় না। মনে হয় চারপাশে হাজার হাজার লোক। তারা করতালিতে মুখর করে তুলেছে চারদিক। তিনি দেখতে পান আকাশ থেকে ফুলের পাপড়ি উড়ে এসে পড়ছে। বাতাসে ফুলের সৌরভ। তিনি ঘুমুতে যাচ্ছেন। শান্তির ঘুম। তাঁর কোনো ভয় নেই। কোনো তৃষ্ণা নেই। কোনো ক্লান্তি নেই। অদ্ভুত প্রশান্ত আলো চারদিকে। তিনি 'দস্তাম্বু' লেখার জন্য টেবিলে গিয়ে বসেন।

পরদিন আলতফ হুসেন হালি আবার আসেন। হাতে ফলের ঠোঙা। ঘরের এক জায়গায় রেখে বলেন, এগুলো বাচ্চাদের জন্য। ওরা ফল খেতে ভালোবাসে। মিঠাইও।

গালিব মাথা নাড়েন। তিনি তখন মদের পাত্রে গোলাপ জল মিশিয়ে শতরঞ্জির উপর পা ছড়িয়ে বসেছেন। আলতফ তাঁর মুখোমুখি বসে বলেন, ভেবেছিলাম জিয়াউদ্দিনের কোনো খবর আপনার জন্য আনতে পারবো। পারলাম না।

গালিব এক চুমুক পান করে বলেন, শুনেছি ওরা যখন শহর ছেড়ে চলে যায় তখন ওদের সঙ্গে ছিল বিবি বাচ্চাসহ আশ্রিতদের বড় দল। তার ওপর ছিল তিনটা হাতি ও চল্লিশটা ঘোড়া। তারা গেলো নিজেদের জমিদারি এলাকা লোহারু পরগণায়। এটুকু বলে গালিব আবার মদের পেয়ালায় চুমুক দিলেন।

আলতফ তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। তখন বাকির আর হুসেন ঘরে ঢোকে। আলতফের কাছে গিয়ে বলে, নানা আপনি বলেছেন আমাদের জন্য—

আলতফ ওদের থামিয়ে দিয়ে বলে, তোমাদের জন্য কি আনব বলেছিলাম?

দুজনেই চেঁচিয়ে বলে, আনার আনবেন বলেছিলেন।

দেখো ওটার মধ্যে কি আছে।

দুজনে ছুটে গিয়ে ঠোঙা খুলে বলে, আনার, আনার। শুকরিয়া নানা, শুকরিয়া।

দু'জনে যেভাবে ছুটে ঘরে ঢুকেছিল ঠিক একই ভঙ্গিতে ঠোঙা হাতে ছুটে বেরিয়ে যায়।

গালিব মদের পেয়ালা উপরে তুলে ধরে বলেন, বাচ্চারা হলো সবচেয়ে বড় আনন্দ। আরিফের ছেলেগুলোকে না পেলে আমি ঘরে বাচ্চা থাকার আনন্দ

বুঝতে পারতাম না। বড় অল্প বয়সে ও মরে গেলো। খুব ভালো কবি ছিল। আমার সাগরেদ আরিফের জন্য বড় কষ্ট হয়। ভাগ্যিস ওর ছেলে দুটোর দায়িত্ব আমার বিবি নিয়েছিল।

ওস্তাদ আপনি আমাকে জিয়াউদ্দিনের কথা বলছিলেন।

আমি তোমাকে আমার কষ্ট আর আনন্দের কথা শোনাচ্ছিলাম। তোমার কি শুনতে ভালো লাগছে না?

আরিফের কবিতার বিষয়ে আমি জানি। ওর বাচ্চাদের কথা আমি জানি। কিন্তু জিয়াউদ্দিনের খবর আমি জানি না। জিয়াউদ্দিন এই সময়ের মানুষ। ইংরেজরা তাঁকে নাজেহাল করছে। আমি তার কথা শুনতে বেশি আগ্রহী।

গালিব গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে পেয়ালায় চুমুক দিলেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কবির মৃত্যুতো শেষ কথা নয়। ভালো কবিকে বাঁচিয়ে রাখে ইতিহাস। গালিবতো সময়ের পৃষ্ঠায় বাড়তি হরফ নয় যে কাল তাকে মুছে ফেলবে।

তিনি আবার এক চুমুক পান করলেন।

আলতফ মৃদু হেসে বলেন, ইতিহাস বিচার করবে গালিবকে, সে সাধ্য কি ইতিহাসের আছে? ইতিহাস গালিবকে মাথায় তুলে রাখবে।

গালিব হা-হা করে হাসতে হাসতে দু'পা ছড়িয়ে দেন সামনে। তারপর আলতফের মাথার ওপর হাত দিয়ে বলেন, তুমিই আমার প্রকৃত সাগরেদ।

আলতফ মৃদুস্বরে বলেন, আমি নওয়াব জিয়াউদ্দিনের কথা শুনবো।

তুমি খুব জেদী মানুষ।

তিনি এক চুমুক পান করে পেয়ালাটা নিচে রাখেন। পা গুটিয়ে বসেন। অন্যদিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন, শুনেছি লোহারু যাওয়ার পথে জিয়াউদ্দিন তাঁর দলবল নিয়ে মেহরৌলি পৌঁছে সেখানে বিশ্রাম করার জন্য দু'দিন থেকে যান। খবর পেয়ে লুটেরা সিপাহিরা সেখানে চলে আসে। ওদের পরনের কাপড় বাদ দিয়ে বাকি সবকিছু লুট করে নিয়ে যায়। গোলমালের আশঙ্কার খবর পেয়ে পথের সাথীরা হাতি তিনটিকে অন্যদিকে সরিয়ে রেখেছিল। বেঁচে গেলো হাতিগুলো। সঙ্গে সঙ্গে খানিকটুকু বেঁচে গেলো জিয়াউদ্দিনের নসীব। হালি এই হাতিগুলোর জন্য তোমার কি কোনো উপমা মনে আসছে?

গালিব আলতফের মুখের দিকে তাকান। আলতফ মাথা নিচু করে এক মুহূর্ত ভাবেন। তারপর নিষ্প্রভ কণ্ঠে বলে, আপনার মনে নিশ্চয় কোনো উপমা আছে। আপনিই বলুন।

গালিব এক নিঃশ্বাসে বললেন, হাতিগুলো থেকে গেলো পুড়ে যাওয়া

শস্যক্ষেত্রে তিনটি অক্ষত ধানের গোলার মতো। লুণ্ঠিত ধনের সামনে তিনটি বিশাল আকার স্তূপ। বিপন্ন মানুষেরা যার দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে।

বাহ্ চমৎকার! এর চেয়ে সুন্দর উপমা আর হয় না।

গালিব এক চুমুকে পেয়ালার বাকি মদটুকু শেষ করলেন।

আলতফ উদগ্রীব কণ্ঠে বলেন, তারপর।

তারপর? তারপর বিপন্ন, বিপর্যস্ত লুণ্ঠিত দলের মানুষেরা আবার পথে নামে। এবার ওরা যাত্রা করে দুজানার দিকে।

গালিব থামলে আলতফ বলেন, আর একটু মদ পান করবেন?

না। তুমিতো জানো আমি পরিমিত খাই। কিন্তু নেশা ছাড়তে পারি না। আমি মদ খাই, আর নেশা আমার শরীর খায়। নেশা একটা ঘুণ পোকা। একটু একটু করে কাটছে আমাকে। এতো কিছু জানার পরও নেশা থেকে আমার মুক্তি নাই হালি।

গালিব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

আলতফ মৃদু হেসে বলেন, নেশাকে আপনি ভালোবাসেন। নওয়াব জিয়াউদ্দিনকেও।

যাঁর সর্বস্ব লুট হয়ে যায় সে একজন অসহায় মানুষ হয়ে পড়ে।

হ্যাঁ, তা সত্যি। এটাও বুঝি যে এই ধকল কাটাতে দীর্ঘ সময় লাগে। ধকলতো মনের ওপর চাপ ফেলে বেশি।

জিয়াউদ্দিন দুজানার পথে রওনা করলো। পথের সীমাহীন দুর্ভোগ শেষে দুজানায় পৌছাল। হুসেন আলি খান দুজানার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। সৎ, অত্যন্ত সৎ। মানুষ তাঁকে খুব মান্য করে। তিনি জিয়াউদ্দিনকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বললেন, আমার ঘর আপনাদের ঘর। জিয়াউদ্দিন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। হুসেন আলী খান বাহাদুরের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হলেন জিয়াউদ্দিন। কারণ তিনি অতিথিদের তেমনই খাতির করলেন যেমন ইরানের বাদশাহ হুমায়ুনকে করেছিলেন।

বাহ, নওয়াব জিয়াউদ্দিন খুবই ভাগ্যবান।

নসীব। নসীব আপনা আপনা। এই পরিবারের দুর্গতির কথা আমি তোমাকে বলতে পারবো না আলতফ।

থাক দুর্গতির কথা বিস্তারিতভাবে বলার দরকার নেই। আমি শুনতে চাই না। আপনারও কষ্ট হবে। তারপরে?

হুসেন আলী খান বাহাদুরের আতিথেয়তায় যখন নওয়াব জিয়াউদ্দিনের

কথা শুনলেন দিল্লির কমিশনার বাহাদুর তখন তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন। পথিমধ্যে তাঁর যে দুর্ভোগ ঘটেছিল সে কথাও তার কানে গিয়েছিল। জিয়াউদ্দিন দিল্লিতে এসে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন। শুনেছি প্রথমে তিনি খুব কড়াভাবে তাঁকে নানা প্রশ্ন করেছেন। জিয়াউদ্দিন প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর খুব বিনয়ের সঙ্গে দিয়েছে। তার বিনয়ে কমিশনার সাহেব নিজেও শান্ত হয়। বিনয়ের উত্তরে ঔদ্ধত্য দেখাতে পারেনি কমিশনার বাহাদুর। ভদ্রতা-বিনয় ব্যক্তির বড় সম্পদ হালি।

আলতফ মাথা নেড়ে বললেন, জানি। বিনয়ই পারে উগ্রতাকে শীতল করতে। তারপর কি হলো?

তারপর কমিশনার সাহেব লালকেল্লার একটি প্রাসাদে তাঁদেরকে বাস করার হুকুম দিল।

হুকুম? নওয়াব জিয়াউদ্দিনকে হুকুম?

দিল্লি শহরের মুসলমানদের তারাতো এখন হুকুমই দেয়। ওরা পারলে একজন মুসলমানকেও বাঁচিয়ে রাখবে না।

জিয়াউদ্দিন কি লালকেল্লায় যাবে?

হুকুম হলেতো যেতেই হবে। শুনেছি বাদশাহর খানসামা যে ঘরে থাকতেন তার পাশের ঘরে জিয়াউদ্দিনের পরিবারের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

জিয়াউদ্দিন কি দুজানা থেকে ফিরে এসেছেন?

এসেছে। ওর পাঠানো লোকের কাছ থেকেই তো আমি এত খবর পেয়েছি। সবচেয়ে দুঃখজনক কি জানো হালি, মেহরৌলিতে জিয়াউদ্দিনের পরিবারের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেলো লুটেরারা। আর দিল্লিতে তার যে বাড়িঘর তাও লুটপাট করে শেষ করে দেয়া হলো। মেহরৌলিতে তারা সব হারিয়ে প্রাণ নিয়ে বেঁচে ছিল। আর দিল্লির যে প্রাসাদ ছিল তার, সেখানকার ইট-কাঠ আর পাথর ছাড়া সব দামি জিনিস লুটেরাদের হাতে গিয়ে উঠলো। কোনো কিছুর চিহ্নমাত্র রইলো না। এখন শুধু নির্দোষদের জন্য দোয়া ছাড়া আমার আর কিছু করার নাই। খোদাতালা যেন তাদেরকে বহাল তবিয়তে রাখেন। তাঁরা যেন নিশ্চিন্তে আয়ু পায়। যেন শান্তির জীবন পায়। যেন জ্ঞান চর্চার জায়গা পায়। যেন মনের আবেগে কবিতা লিখতে পারে। কবির জীবনইতো কবিতার জীবন। আমরাতো এর বেশি কিছু চাই না। কবিতার মতো সম্পদ যার জীবনে থাকে ক্ষুধা নিবৃত্তি ছাড়া আর কিছু তার চাইবার থাকে না।

গালিব আর কথা বলতে পারেন না। তাঁর দু'চোখ পানিতে ভরে যায়। কাঁদতে থাকে আলতফ। কেঁদে তাঁরা নিজেদের বুকের ভার কমান। মুসলমান

মুঘল বাদশাহর দায়ভার নিয়ে দিল্লি শহর অন্য মুসলমানদের জন্য অচেনা শহরে পরিণত হয়েছে। তারপরও গালিব বুকের গুড়গুড় ধ্বনি প্রাণপণ চেষ্টায় দমিয়ে বলেন, দিল্লি আমাদেরও। আমি দিল্লির বোঝা নই যে এই শহর আমাকে বাইরে ঠেলে দেবে।

না, একদমই না।

আলতফ ঘড়ঘড় কণ্ঠে বলেন। তারপর নিজেকে শান্ত করে বলেন, আপনার জন্য আরও খবর আছে।

খবর? আর কোন খবর?

আলতফ স্থির কণ্ঠে বললেন, ঝঝরের হাকিম আবদুর রহমানকে একজন সামান্য অপরাধীর মতো ধরে নিয়ে গেছে গোরা সৈন্যরা। ওরা একজন হাকিমের মান-সম্মানের দিকটাও দেখলো না।

মুসলমান যে।

মুসলমান হলেই সবাইকে এক পাল্লায় ওঠাবে? আলতফের কণ্ঠ ঈষৎ রূঢ়। গালিব চুপ করে থাকলেন।

আলতফ কণ্ঠস্বরের একই ঝাঁঝ নিয়ে বললেন, তারপর কি করেছেন জানেন? দীওয়ান-এ-আমের এক কোণায় তাঁকে থাকার জায়গা দেয়া হয়েছে। তাঁর পুরো জায়গীর ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে।

হায় খোদা! গালিব দু'হাতের তালুতে নিজের কপাল রাখেন। সহসা কোনো কথা বলতে পারেন না।

আলতফ কণ্ঠস্বরে একই ঝাঁঝ নিয়ে বলেন, এই তো গত শুক্রবার ফররুখনগরের হাকিম আহমদ আলী খানকেও একই রকম অবস্থায় ধরে নিয়ে গিয়েছে। কেল্লারই কোথাও থাকতে দিয়েছে শুনেছি। আর লুটেরারা ফররুখনগরের ঘরবাড়ি লুট করে। সব মালামাল ও আসবাব লুটেরাদের দখলে চলে গেছে। এই শহরে ওদের কাছে ইনসাফ বলতে কিছু নেই।

প্রবল মনোকষ্ট নিয়ে গালিব চুপ করে থাকেন। আস্তে করে এক সময় বলেন, আমাকে এসব আর শুনিয়ো না তুমি।

আপনাকে শুনতে হবে। আমি আরও বলবো।

গালিব চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকেন। প্রবল অবসন্নতা তাঁকে পেয়ে বসে।

তাকিয়ে আছেন যে?

তুমি যা বলবে তা আমি শুনবো?

চোখ দিয়ে শুনবেন।

না, আমি কান দিয়েও শুনবো। তুমি বলো।

আলতফের কণ্ঠস্বরের ঝাঁঝ একটুও কমেনি। বলেন, দাদরি ও বাহাদুরগড়ের হাকিম বাহাদুর জঙ্গ খানকেও গ্রেফতার করে আনা হয়েছে। তাঁকে কেল্লার যেখানে ফেলে রাখা হয়েছে তিনি সেখানেই আছেন। পরের শনিবার বল্লভগড়ের হাকিক রাজনাহর সিংকে ধরে আনা হয়েছে। কেল্লায় বন্দি হাকিমদের সংখ্যা বেড়েছে আরও একজন।

গালিব গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠেন। তাঁর অবসন্ন ভাব কেটে যায়। তিনি দীপ্র চোখে আলতফের দিকে তাকিয়ে বলেন, আমি জানি দিল্লি এজেন্সির অধীনে সাতটি জায়গীর আছে।

হ্যাঁ, ঠিক।

নামগুলো বলতো দেখি। আমার আবার সব নাম মনে থাকে না।

জায়গীরগুলো হলো ঝঝর, বাহাদুরগড়, বল্লভগড়, লোহারু, ফররুখনগর, দুজানা ও পতৌদি। এর মধ্যে পাঁচটি জায়গীরের হাকিমকে কেল্লায় বন্দি রাখা হয়েছে।

জানি। আর যে দুজন বাকি আছেন তাঁরা হলেন পতৌদি ও দুজানার হাকিম। হাঃ নসীব। ওরা এখন আতঙ্কিত। ওরা মৃত্যুভয়ে কাতর। নসীব এমনই। কোথায় থেকে কোথায় যে নিয়ে যায়।

আপনি কি এর জন্য আফসোস করেন?

আফসোস! গালিব থমকে থাকেন।

না, বলছিলাম আপনি কি আফসোস করেন, নাকি নসীবকে মেনে নেন?

নসীবকেইতো মেনে নিতে হয়। নসীবকে না মেনে কি উপায় আছে? আমাদের সামনে আরও কত কি দেখতে হবে কে জানে!

তেমন খবরওতো আমাদের পাওয়া হয়ে গেছে।

বলো, শুনি। গালিব আলতফের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

এটাতো লুকোছাপানো কিছু নয় যে শহরের এই হাঙ্গামায় অনেকেই পরিবার নিয়ে শহরের বাইরে চলে গেছেন।

হ্যাঁ, তাতো ঠিকই। কে গেছে এটা গুণে লাভ নেই, কারা আছে তার হিসেবই করো আগে।

কারা আছে সে হিসেব আর কীভাবে পাবো। যারা নেই তাদের হিসেব আগে করি।

করো। শুনি তোমার কথা।

মুজফফর-উদ-দৌলা, সৈয়দউদ্দীন হায়দার খান ও জুলফিকারউদ্দিন

হায়দার খান শহর ছেড়েছেন। দামি জিনিসপত্রে ভরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পথে নেমে গেছেন। ভবঘুরের জীবন বেছে নিয়েছেন। প্রাসাদের মতো বিশাল এদের বাড়িগুলো ছিল পাশাপাশি। এদের জমি মাপলে তা একটি গ্রামের সমান তো হবেই, শহরের সমান না হলেও। ভেবে দেখুন এদের দৌলতের হিসেব কত। সবই লুটেরাদের হাতে ধ্বংস হয়ে গেলো। কবে এরা ফিরবে, কবে আবার সব গড়ে উঠবে, আদৌ উঠবে কিনা কে জানে!

চুপ করো হালি। আমার মাথা ঝিমঝিম করছে। শুনতে মন চাইছে না।

চুপতো করবোই। তার আগে আর একটু বলে নেই। যেদিন ভোরবেলা রাজানাহর সিংকে গ্রেফতার করা হলো সেদিন রাতে দেখা গেলো বাড়িগুলো দাউদাউ জ্বলছে। আগুনের শিখা অনেক দূর থেকে দেখা গেছে। তেমন দামি নয় এমন কিছু জিনিসপত্রতো তখনো ছিল। হলঘরের পর্দা, শামিয়ানা, কার্পেট, শতরঞ্জি এমন আরও অনেক কিছু।

আহ্ চুপ করো আলতফ। ওই বাড়ি পুড়ে যাওয়ার আগুনের শিখাতো আমিও দেখেছি। লকলকে শিখা যেন বাড়িগুলোকে ঘিরে আকাশে নৃত্য করছিল। আর সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিলো। আগুনের উত্তাপ আমি অনুভব করছিলাম। আমার শরীরে আগুনের আঁচ লাগছিল। বাতাসে উড়ে আসা ছাইয়ে আমার চোখ জ্বালা করছিল। যেন পুড়ে যাচ্ছে আমার শরীর। আমার আয়ু। আমার ছেড়ে আসা বয়সের সবটুকু।

শুধু বেঁচে ছিল আপনার কবিতা। তাই না?

বোধহয় তাই। সে সময়ে কি মনে হয়েছিল জানো?

বলুন। নাকি সেই গজল গেয়ে ভিক্ষা করা ফকিরের কণ্ঠস্বরের কথা মনে হয়েছিল আপনার?

না, সেসব কিছু নয়। মনে হয়েছিল নিজের ঘরে বসে প্রতিবেশির ঘরের সঙ্গীত যদি উপহার হিসেবে পাই, তবে আগুন লাগলে তার ছাই প্রতিবেশি উপহার হিসেবে নেবে না কেন? তোমার কি মনে হয়?

আমার মনে হয় নেয়াইতো উচিত।

আমিও তাই ভেবেছিলাম। হুসেন মির্জার পুড়ে যাওয়া বাড়ির ছাই আমার কাছে উপহারই ছিল।

গালিবের ভারী কণ্ঠ থামলে নিস্তব্ধ হয়ে যায় ঘর। যেন কোথাও কেউ নেই। পরের ঘটনাটি দুজনের কেউই আর উচ্চারণ করেন না। দুজনেই দু'হাঁটুর ওপর মাথা ঠেকিয়ে রাখেন। তাঁরা জানেন তাঁদের দু'জনের হৃদয়ে শোকের কোনো বাণী অবশিষ্ট নেই। তাঁরা দু'জনে কাছাকাছি হয়েছেন শোকের মাতমে

স্থির থাকার জন্য।

তাঁরা জানেন ঝঝর, বল্লভগড় ও ফররুখনগরের হাকিমদের ফাঁসি দেয়া হয়েছে। একদিনে নয়, বিভিন্ন দিনে। তারিখগুলোর উল্লেখ তাঁরা করতে পারবেন না। কার কোন কোন বারে ফাঁসি দেয়া হয়েছে সেটা তাঁরা জানেন না। শুধু তাঁরা জানেন এমনভাবে তাঁদের হত্যা করা হয়েছে যে কোনো রক্ত ঝরেনি। কেউ বলতে পারবে না যে তাদের রক্তে ভিজে গেছে মাটি। কেউ বলতে পারবে না যে রক্তের রেখা তৈরি হয়েছিল মাটির উপরে। সেই রক্তের খোঁজে উড়ে এসেছিল নীল মাছি।

তখন গালিব মাথা তুললেন। তাকালেন আলতফের দিকে। আলতফ মাথা তুলে তাকালেন গালিবের দিকে। গালিব নিজের শের আবৃত্তি করলেন—

'এক একটি শোণিত বিন্দুর হিসেব দিতে হলো আমায়,
হৃদয়ের জিম্মা বন্ধুর আঁখি পল্লবের ওপর ছিলো।'

শেরটি শুনে আলতফের চোখ থেকে এক ফোটা পানি গড়িয়ে পড়ে।

তখুনি হাতে ছোট একটি রেকাবি নিয়ে ঘরে ঢোকে বাকির আর হুসেন। দু'জনের চোখে পানি দেখে ওরা থমকে দাঁড়ায়।

একই সঙ্গে বলে, কি হয়েছে আপনাদের?

কিছু তো হয়নি আমাদের।

তাহলে কাঁদছেন কেন?

তোমরা আমাদের জন্য কি এনেছো?

আনার। খাবেন?

হ্যাঁ, খাবো। দাও।

একটা কথা আছে।

কথা আছে? কি কথা?

আপনারা কিন্তু আর কাঁদবেন না। শুধুই আনার খাবেন।

দাও। রেকাবিটা আমার কাছে দাও।

দু'ভাই আলতফের হাতে রেকাবি রেখে চলে যায়। আবার নিস্তব্ধতায় ভরে যায় ঘর। আবার দুজনে হাঁটুর ওপর মাথা রাখেন।

পরদিন 'দস্তাম্বু' লিখতে বসেন গালিব। কলম চোবানো হয় দোয়াতে। সাদা কাগজ ভরে ওঠে কালির রেখায়।

লিখছেন : জানুয়ারি মাসে শহরের চেহারা বদলাতে শুরু করেছে। যারা শহরের বাইরে চলে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে হিন্দুদের শহরে ফিরে আসার

AMARBOI.COM

অনুমতি দিয়েছে ইংরেজ সরকার। যে যেখানে ছিল খবর পেয়ে শহরে ফিরে আসতে শুরু করেছে তারা। মুসলমানরা শহরে ফেরার অনুমতি পায়নি। মুসলমানরা যে বাড়িগুলো ফেলে চলে গিয়েছিল সেসব বাড়িতে ঘাস গজিয়েছে। দেয়াল সবুজ হয়ে গেছে। দরজাগুলো তেমন শ্যাওলাভরা। এই সবুজ রঙ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে মুসলমানদের বাড়িগুলো পরিত্যক্ত। বাড়িতে কোনো বাসিন্দা ফিরে আসেনি।

এটুকু লিখে তিনি থামলেন। চেয়ারে মাথা এলিয়ে খানিকটুকু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। শুনেছেন, দিল্লির হাকিমের এমন ধারণা হয়েছে যে পাতিয়ালের রাজা নরেন্দ্র সিংয়ের আশ্রিত এলাকায় বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান লুকিয়ে আছে। এমন ধারণাও হাকিমের হয়েছে যে মাঝে মাঝে তারা এলাকায় জমায়েত হয়। গালিব এই এলাকার বাসিন্দা। এখন পর্যন্ত তাঁকে তেমন কোনো বড় ধরনের হাঙ্গামায় পড়তে হয়নি। কিন্তু তিনি জানেন না আর কতদিন এভাবে চলবে।

তিনি টেবিল ছেড়ে উঠলেন। উমরাও বেগমকে দরকার। আজকে তাঁকে শামী কাবাব বানাতে বলবেন। গোস্ত কোথায়? জানি না। আসবে কোথা থেকে? জানি না। গালিব নিজেকে সামলাতে পারেন না। অস্থিরতা বোধ করেন।

পরদিন দিল্লির হাকিম কয়েকজন সিপাইকে সঙ্গে নিয়ে গলি বল্লিমারোঁওতে এসে হাজির হয়। সবাইকে ডাকলেন। গালিব যে বাড়িতে থাকেন তার মালিকসহ বেশ কয়েকজন নির্দোষ মুসলমানকে ধরে নিয়ে গেলেন। তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে যে সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাঁরা সিপাহীদের কতটা সহযোগিতা দিয়েছিলেন। বাদশাহকেই বা কি ধরনের সমর্থন জুগিয়েছিলেন। গালিব নিজের ঘরে বসে চুপচাপ আছেন। মনে পড়ছে তফজ্জুল হুসেন খানের কথা। তখন চারদিক থেকে সিপাহীরা এসে জমা হচ্ছিল শহরে। বাদশাহর সমর্থনের কথা প্রচার হয়ে গিয়েছিল। তাই দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন জায়গীরের সেনানায়করা নিজেদের সেনাবাহিনী নিয়ে দিল্লির পথে যাত্রা শুরু করে দিয়েছিল। তফজ্জুল ছিলেন ফররুখাবাদের হাকিম। তিনি বাদশাহকে কখনো দেখেননি। তাঁর সঙ্গে কোনো যোগাযোগও ছিল না। তিনি বিদ্রোহীদের পক্ষে বাদশাহকে অভিবাদন জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। জানিয়েছিলেন যে তিনি বাদশাহর সঙ্গে আছেন।

এখন তফজ্জুল হুসেন খান কোথায়? গালিব প্রবল বিষণ্নকণ্ঠে নিজেকেই শোনালেন, নেই। এই দুনিয়ায় নেই। ইংরেজ সরকার নৃশংসভাবে প্রতিহিংসা নিয়েছে। আজ কি করবে তারা? যাদের ধরে নিয়ে গেলো? তারা নির্দোষ। তারা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি।

পরদিন খবর পেলেন যাদের ধরে নিয়ে গিয়েছেন তাদেরকে হাওয়ালাতে রাখা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের পরে তেমন কিছু না পেলে ছেড়ে দেয়া হবে। গালিব কাল্লু মিয়াকে বললেন, ওদের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধই খুঁজে পাবে না দিল্লির হাকিম।

কাল্লু মিয়া খুশি হয়ে বলে, তাঁদেরকে বহাল তবিয়তে রাখা হয়েছে হুজুর।

তাহলে তাদের সম্মানের দিকে নজর রাখতে ভোলেনি হাকিম। যাক, ভালো কথা।

গালিব কাল্লু মিয়াকে নির্দেশ দিলেন বোতলের শেষ মদটুকু পেয়ালায় ঢেলে গোলাপ জল মেশাতে।

পরদিন ফিরে এলো মেহমুদ খান, মুর্তাজা খান ও হাকিম কালে। তাদের সঙ্গে ফিরে এলো আরও কয়েকজন। এরপর মাত্র তিনজকে ছেড়ে দেয়া হলো। তবে বেশির ভাগই রয়ে গেলো হাওয়ালাতে।

গালিবের মন খারাপ হয়ে থাকে।

উমরাও বেগম বলেন, এত ভাবার কি আছে। যা হওয়ার হবে।

হওয়াটাতো খুব ছোট্ট কিছু না। সেটা রক্তপাতহীন ফাঁসি।

উহ, খোদা। উমরাও বেগম দু'হাত কান চাপা দেন।

উমরাও বেগমের কণ্ঠের অস্ফুট ধ্বনিতে চমকে ওঠেন গালিব। ইদানীং এমন হচ্ছে। সামান্য শব্দও তাঁকে বিচলিত করে।

আপনি এমন চমকে উঠছেন কেন?

আমারতো এমনই হচ্ছে। জানি না কেন।

তবিয়ত ঠিক আছেতো?

না, ঠিক নেই। খারাপ লাগছে।

বুখার হয়েছে?

না।

তাহলে কি?

গালিব রাগতস্বরে চেঁচিয়ে বলেন, জানি না কি। তুমি তোমার ঘরে যাও বিবি।

উমরাও বেগম ক্রুদ্ধ হয়ে দুপদাপ পা ফেলে চলে যান। গালিব মদের পেয়ালা নিয়ে বসেন।

কদিন পরে আটক করে রাখা বাকিদের ছেড়ে দেয়া হয়। ওরা ফিরে এলে হল্লা করে গলির লোকেরা। আনন্দের হল্লা। তাতেও চমকে ওঠেন তিনি। কাল্লু

মিয়া এসে খুশির স্বরে বলে, ওরা সবাই ফিরে এসেছে হুজুর। একজনও আর হাওয়ালাতে আটক নেই।

ওরা আবার আসবে নাতো? ওরাতো আমাকে ধরতেও আসতে পারে?

আপনার মতো মানী লোককে ওরা ধরবে না।

এখন পর্যন্ত ওরা আমাকে কোনো ঝামেলায় ফেলেনি।

ওরা তো জানে আপনি কে? আপনার মতো কবি এই শহরে আর কে আছে?

কাল্লু মিয়া।

জ্বী হুজুর, আমাদের বাড়িওয়ালা এমন কথাই বলেছেন। বলেছেন ওরা আর বল্লিমাঁরোতে আসবে না।

তারপরও আমি সারাদিন দুশ্চিন্তায় থাকি। আমি রাতে ঘুমুতে পারি না।

আজ থেকে আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যান। আজ থেকে আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমুবেন। আমি আপনার ঘরের দরজায় বসে পাহারা দেবো।

ওরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকবে। তুমি কি করবে?

আমার কলিজাটা ওদের পায়ে থেঁতলাতে দেবো।

ওহ, কাল্লু মিয়া!

আপনার মদের বোতল শেষ হয়ে গেছে। আমি হাকিম মুহম্মদ খানের কাছে যাচ্ছি। দেখি আর একটি বোতল জোগাড় করা যায় কিনা!

গালিব পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, হে বুলবুল চলে যাচ্ছে বসন্তের দিন।

শেষ চুমুকের মদটুকু যতক্ষণ গলা বেয়ে নেমে গেলো ততোক্ষণ তিনি তা উপভোগ করলেন। ধ্যানস্থ হয়ে কতক্ষণ বসে রইলেন। বসে থেকে বুকের আনন্দ দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখার চেষ্টা করলেন। অনেকক্ষণ বসে থেকে শতরঞ্জি ছেড়ে উঠে কলম ডোবালেন দোয়াতে। লিখলেন :

'মদ, যা আমি পান করি এবং ধারণ করি,
সিনাই পর্বতশৃঙ্গে যে বাজ পড়ল—
তা আমার উপরেই পড়া উচিত ছিল।'

তিনি মাথা সোজা রাখতে না পেরে শতরঞ্জির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। যেন শুনতে পাচ্ছেন ঘরের ভেতরে নিজেরই কণ্ঠ ধ্বনিত হচ্ছে :

'আমার দৃষ্টি উন্মুক্ত, বাগান মুগ্ধ দৃশ্যময়,
সমস্তই বিফল, আমি একটি শিশির বিন্দু,
সূর্য তাকে স্পর্শ করেছে।'

তাঁর দু'চোখে ঘুম নেমে আসে। প্রবল দুশ্চিন্তা তাঁকে ঘুমের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেয়। কিন্তু তাতেও রক্ষা হয় না। মুহূর্তে ভেঙে যায় ঘুম। আবার আতঙ্ক তাঁকে গ্রাস করে। তিনি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ছাদের দিকে। ভেসে ওঠে লালকেল্লার ছবি। তাঁর কবি জীবন খ্যাতির শিখরে উঠেছিল বাদশাহর মুশায়রার আসরে যোগ দিয়ে। এই কিল্লাই-মোলাইকে ঘিরেইতো তাঁর কবি জীবন কেটে গেলো। তাঁরই চোখের সামনে ভেঙে পড়লো মুঘল শাসন। একটু একটু করে দেখেছেন তাদের ক্ষয়ে যাওয়া অবস্থা। তিনিতো দীর্ঘ বছরের সাক্ষী। বুকের ভেতরে ধস নামে যখন কোনো কিছুর মুছে যাওয়াকে নিজের চোখে দেখতে হয়। বাদশাহর অবস্থাতো তিনি এভাবে বিলীন হয়ে যেতে দেখছিলেন। তবু মেনে নেয়া কঠিন। বাদশাহর এই আকস্মিক পতনের জন্য তিনিতো নিজেকে প্রস্তুত করেননি। তাঁর জীবনের একটি বড় জায়গা, পবিত্র স্থান, কবিতার শব্দরাজির ধ্বনি ছড়িয়ে আছে যেখানে সেই লালকেল্লার এমন নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ দেখার জন্যওতো তিনি তৈরি ছিলেন না। বাদশাহর প্রতি ভয়াবহভাবে রূঢ়, অমানবিক আচরণ করেছে ওরা, শাহজাদাদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে, কালাই-মোলাইয়ের সৌন্দর্যমণ্ডিত দেয়ালগুলোর কারুকাজ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে আর প্রাসাদের কক্ষগুলোর সৌন্দর্যমণ্ডিত বাহারকে পরিণত করা হয়েছে সৈনিকদের ব্যারাকে। জীবন এখন আতঙ্কে ভরপুর। বেঁচে থাকার সাধ সৈনিকের বন্দুকের মাথায় এসে ঠেকেছে।

গালিবের শরীর থরথর করে কেঁপে ওঠে। তিনি উঠে বসেন। যতদিন বাদশাহ ছিলেন ততদিন কবিতার জয়গান ছিল। তাঁরা সেই আনন্দময় সময়ের মানী মানুষ ছিলেন। কিন্তু এখন এই শহরে নিজেকে একজন উদ্বাস্তু মানুষ মনে হয়। মনে হয় তাঁর জন্য কোনো নির্দিষ্ট জায়গা আর কোথাও নেই।

তিনি দু'হাতে মাথা চেপে ধরলেন।

শুনেছেন যেদিন শহরটি ইংরেজদের দখলে চলে যায় সেদিন ব্রিটিশ সেনাপতি জেনারেল উইলসন দিল্লির দেওয়ানি-খাসে নৈশভোজ দিয়েছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে নিজেদের বিজয়ের ঘোষণা দিয়েছিল। তারা আকণ্ঠ স্যাম্পেন পান করে জয়ের উৎসব উদযাপন করেছিল।

ওহ, নসীব!

গালিবের কণ্ঠ থেকে গোঙানির শব্দ বের হয়। তিনি জানেন এরপর থেকে ধীরে ধীরে প্রাসাদ লুট হতে থাকে। হিংসায়, ক্রোধে, দম্ভে উন্মত্ত হয়ে ওরা লুটের কাজটি করেছে। মাতাল সৈনিকেরা হাসতে হাসতে ঝাড়বাতিগুলো ভেঙে ফেলেছে। যে রত্ন পাথর দিয়ে ঘরের মোজাইকে নকশা করা হয়েছিল সেগুলো

বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে তোলা হয়েছে। ঘরের ছাদ যেখানে সোনা দিয়ে খোদাই করা হয়েছিল সেগুলো আঁচড় কেটে, ভেঙে নষ্ট করা হয়েছে। যে মতি মসজিদের শীর্ষ সোনার পাতে মোড়া ছিল সেগুলো উপড়ে তুলে বিক্রি করে সেনাবাহিনীর পেছনে ব্যয় করা হয়েছে। কিছু পুরনো বই, জামাকাপড় এবং ওষুধ মাত্র পড়ে রইল। দেওয়ান-ই-আম পরিণত হলো একটি চিকিৎসা কেন্দ্রে।

গালিব উঠে পায়চারি করলেন কিছুক্ষণ।

টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে দেখলেন বাদশাহর দুটি গজল পরিমার্জনা করার জন্য তাঁর টেবিলে রয়েছে। তিনি পরিমার্জনা করেন নি। কারণ সেগুলো দরবারে নিয়ে যাওয়ার মতো সময় তিনি আর পাননি। তিনি পরে জেনেছিলেন যে লালকেল্লার একটি ছোট কুঠুরিতে বাদশাহকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। সেই কুঠুরির ছাদ খুবই নিচু আর দেয়াল চুনকাম করা মাত্র। দেয়ালের রঙ সাদা হওয়ার কারণে তিনি কাঠকয়লা দিয়ে সেই দেয়ালে কবিতা লিখেছেন। তিনি লালকেল্লায় যাওয়া-আসা করার অনুমতি পেয়েছিলেন এমন লোকদের দেখার বস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন। গালিব শুনেছেন যে তাঁকে উঁকি দিয়ে দেখতে যেতো ব্রিটিশ কমিশনারের স্ত্রীরা। এমনকি নিচের দিকে কর্মরত ব্রিটিশরাও তাঁকে দেখার জন্য দাঁড়িয়ে পড়তো।

কয়দিন আগে একজন এসে গালিবকে কেঁদে কেটে বলে গেলো বাদশার করুণ অবস্থার কথা। হায় খোদা, গালিব জোরে জোরে দম নিলেন। লোকটি বলেছিল, ছোটখাটো জীর্ণ মানুষটি জীর্ণতর হয়ে পড়েছিলেন। সুতি পোশাক পরে সারাদিন একটি নিচু চারপাইয়ের উপর বসে থাকতেন। অযত্ন অবহেলায় পোশাক নোংরা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর শরীরে জড়ানো থাকতো নোংরা লেপ-চাদর। যে কেউ তাঁর ঘরে ঢুকলে তিনি তাঁকে কুর্নিশ করতেন। যে হুক্কাটি থেকে তামাক সেবন করতেন সেটি একপাশে সরিয়ে রাখতেন। আর যাদের কুর্নিশ করতেন তাদের বলতেন আপনাকে দেখে আমি খুশি হয়েছি।

গালিব দু'হাতে চোখের পানি মোছেন। ভাবেন, তিনিতো এই বাদশাহকে দরবারে দেখেছেন। তাঁর সামনে কেউই বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারতো না। তিনি ভীষণ অপছন্দ করতেন। রেগেও যেতেন। মানুষ এভাবেই বদলায়। এভাবেই পরিস্থিতি মানুষকে অন্য মানুষ করে দেয়। গালিব আর একজনের কাছে শুনেছেন যে শেষের দিকে তিনি একদম উদাসীন হয়ে গিয়েছিলেন। কোনো কথা বলতেন না। রাতদিন স্তব্ধ হয়ে থাকতেন। যেন তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করেছিলেন। এই পৃথিবীতে তার সব কাজ ফুরিয়ে গেছে। বেঁচে থাকাটাও তার জন্য আর কোনো কাজ নয়।

তারপর গালিব অন্যজনের কাছ থেকে শুনেছেন যে তিনি নিজের কবিতা আপন মনে বলে যেতেন। কবিতাই তো বলবেন তিনি। কবিতাই তাঁর শেষ নিয়তি। কবির জীবনে পরিষ্কার কাপড় ছিল না, আরামদায়ক শয্যা ছিল না, তামাক সেবনের হুক্কাটি অকেজো হয়ে পড়েছিল, সাদা রঙের সুতি কাপড়ের পোশাকে স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না, কিন্তু চিত্তের সুস্থিরতার জন্য কবিতা ছিল, শুধুই কবিতা। চুনকাম করা সাদা দেয়াল ছিল কবিতার জন্য বিশাল ক্যানভাস। আহ, কবিতাই তো শেষ কথা। কবির জীবনে কবিতা ছাড়া আর কিইবা অবশিষ্ট থাকবে।

গালিব এইসব ভেবে অনেকক্ষণ ধরে বুক উজাড় করে কাঁদলেন। কাঁদার পর মনে হলো তাঁর ভেতরে নতুন করে শক্তি ফিরে আসছে। তিনি হৈ চৈ করে কাল্লু মিয়াকে ডাকলেন।

কাল্লু মিয়া এলো না। অন্য কেউও না। এমন কি বাচ্চা দু'জনও না। শেষ ভরসা উমরাও বেগম। তিনিও এলেন না। গালিব ধরে নিলেন আশেপাশে কেউ নেই। কোথায় গেলো সবাই? শহরটাতো এখন পর্যন্ত কোথাও যাওয়ার অবস্থায় ফিরে আসেনি।

যেদিন জেনারেল উইলসন দেওয়ানি খাসে বসে স্যাম্পেন পান করছিলেন দিল্লি তখন বিরান শহর। ব্রিটিশ সেনাদের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যে যেখানে পেরেছিল পালিয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় কোনো চিন্তা করার সময় ছিল না। সুযোগও ছিল না।

তারা শহরের বাইরে গিয়ে তাঁবু খাটিয়ে কিংবা মাথার ওপর সামান্য কিছুর ব্যবস্থা করে খোলা আকাশের নিচে বাস করতে শুরু করলো। মাথার ওপর রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-বাদল বয়ে গেলো। দুর্দশা চরমে উঠলো। বর্ষা গেল, শরৎ-হেমন্ত গেল—ঋতুতো আসবে, যাবে। পালা পরিক্রমায় ঋতু বদল ঘটবে। শীতকালে তাদের দুর্দশার সীমা রইল না। তারপরও ব্রিটিশরা তাদেরকে শহরে ঢোকার অনুমতি দিল না। কারাগারগুলোতে তিল ধারনের জায়গা ছিল না। শহরে ভৌতিক নিস্তব্ধতা ছমছম করতো। যারা শহর ছেড়ে যায়নি তাদের মধ্যে আমি একজন। আমি মির্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব—আমার ধনদৌলত কিছু নেই, সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে পেনশন বন্ধ—আমার আছে শুধু গজল। এই গজল নিয়েই আমি কবরে যাব। তিনি দ্রুতহাতে 'দস্তাম্বু'র পৃষ্ঠা উল্টান। এই শহরে একা থাকার অনুভবে তিনি লিখেছিলেন, পুরো দিল্লি শহর খুঁজে এক হাজারের বেশি মুসলমান পাওয়া কঠিন। আমিতো তাদেরই একজন। যারা শহর ছেড়ে চলে গেছে তারা এত দূরেই গেছে যে মনে হয় তারা কখনোই

AMARBOI.COM

দিল্লিতে বাস করেনি। গণ্যমান্য যারা, তাদের মধ্যে অনেকে আরাবল্লী পর্বতের ধারে কুঁড়েঘর বানিয়ে কিংবা মাটির নিচে গর্ত করে থাকতে শুরু করেছে। দেখেশুনে মনে হয় তাদের ভাগ্য ঘুমিয়ে পড়েছে। তারা এমনই অন্ধ যে কোনো দিনই আর তাদের চোখ খুলবে না।

'দস্তাম্বু'তে অনেক কিছুই তো লিখেছেন, পাতার পর পাতা উল্টেপাল্টে পড়লেন। কখনো দম নিলেন, কখনো পানি খেলেন। ইদানীং সকালের নাস্তা, দুপুরের বা রাতের রুটি-কাবাব আর তেমনভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। কয়দিন ধরে সকালে মিসরির শরবত আর বাদামের গুঁড়ো খাচ্ছেন। উমরাও বেগমকে বললে তিনি বলেন, এটুকু খেয়েই আল্লার কাছে শোকর গোজারি করেন।

বড় কঠিন কথা বিবি। দিলে চোট লাগে।

স্বামীর কথা শুনে উমরাও বেগম কথা বাড়ান না। তারপর মৃদু স্বরে বলেন, কতদিন ধরে পেনশন বন্ধ ভুলে গেছেন?

ভুলবো কেন? আমিতো মনভোলা কবি নই।

তাহলে অনুযোগ করেন কেন?

অনুযোগ নয় বিবি। দুঃখ। দুঃখের ভাষা আমি খুঁজে ফিরি। জেনে রেখো কবিরও কখনো কখনো শব্দের অভাব হয়। কবি তাঁর ভাষা খুঁজে পান না।

আপনার এতসব কঠিন কথা আমি বুঝি না। আমি যাই। নাতি দুটো কোথায় গেলো দেখি।

উমরাও বেগম চলে গেলে তিনি গালে হাত দিয়ে ভাবেন, তিনি কি কখনো তাঁর বিবির দুঃখের ভাষা শুনেছেন? তাঁর কান্নার শব্দের মানে খুঁজেছেন? তিনি মাথা নেড়ে বলেন, না খুঁজিনি। অত কঠিন কাজ করার কথা আমি ভাবিনি। আমিতো নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত।

এই মুহূর্তে তিনি 'দস্তাম্বু'র পৃষ্ঠায় দেখলেন খান বাহাদুর খাঁয়ের কথা লিখেছেন। তিনি বেরিলীতে সৈন্য জড়ো করেছিলেন। তাদের সর্দার হয়ে বসেছিলেন। বাদশাহকে উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন। একশো আশরাফি, অনেক রকম পণ্যের উপহারসামগ্রী, এমনকি হাতি, ঘোড়াও বাদশাহর জন্য পাঠিয়েছিলেন। এখন খান বাহাদুর খাঁ কেমন আছেন?

গালিব মাথা ঝাঁকালেন। মাঝে মাঝে মাথায় কিছু ভর করেছে মনে হয়। ভারী লাগে তখন। ঝাঁকালে খানিকটুকু স্বস্তি পান। এ অভ্যাসটি ইদানীং বেশি হচ্ছে। ভাবতে ভাবতে মাথাটা চেয়ারে হেলিয়ে দেন। ভাবেন, কতকাল তিনি আর কবিতার সঙ্গে থাকতে পারবেন? এখন বাদশাহ নেই, দরবারও নেই। মুশায়রার আসর নেই। ওহ, না, এভাবে জীবন বেশিদিন চলতে পারে না। তিনি

ভীষণ অবসন্ন বোধ করেন।

আবার তাঁর মাথায় কিল্লায় যাতায়াতের দিনগুলো ভর করে। কিল্লার শেষের দিনগুলোতে তিনি আরাম-আয়েসে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এর একটি কারণ বয়স। প্রৌঢ় হয়ে যাওয়ার ফলে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটা। অন্য কারণ নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়ার ফলে অনিশ্চয়তার অনুভব। একই সঙ্গে কাজ করতো ঠিকমতো শুনতে না পাওয়ার অস্থিরতা। কেউ যখন কথা বলতো তখন তিনি তাঁর ঠোঁটের নড়াচড়ার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। বুঝতে চেষ্টা করতেন যে কি বলা হচ্ছে। বেশিরভাগ সময় বুঝতে না পারার কারণে নিজের ওপর রাগ বাড়তো। তখন আরও দুর্বল মনে হতো নিজেকে। সে সময় সপ্তাহে দু'একবার কেল্লায় যেতেন। যাওয়াটি বাধ্যতামূলক ছিল। না গিয়ে তো দরবারের সম্মান রক্ষা করা যায় না। তাই তাঁকে যেতে হতো। এই যাওয়ার সঙ্গে মাসিক পেনশনের হিসাব জড়িত ছিল। যেদিন বাদশাহ নিজের মহল থেকে বের হতেন সেদিন তাঁর সামনে হাজিরা দিতেন। কাজটি করতে তাঁর ভালো লাগতো। কারণ বাদশাহ কবি ছিলেন। একজন কবি তো আরেকজন কবির সামনে হাজির থাকবেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন। তাঁর কথা শুনবেন। সৌজন্য বিনিময় হবে এবং এই বিনিময়ের মধ্যে কবি দীর্ঘ আয়ুর স্বপ্ন দেখবেন। আহ, কি সুখের দিন ছিল সেগুলো। যেদিন বাদশাহ নিজের মহল থেকে বের হতেন না, সেদিন তাঁর খারাপ লাগতো। অস্থিরতা বোধ করতেন। মনে হতো কবিতার পাতাগুলো উড়ে যাচ্ছে সময়ের ঝড়ে। দেওয়ান-খাস-এ বসে থেকে বাড়ি ফেরার সময় নিজেকে শোকার্ত মানুষের মতো মনে হতো। সে সময় বাদশাহর কবিতার পরিমার্জনা কারো হাতে দিয়ে আসার স্বস্তি পেতেন না। কিন্তু উপায় ছিল না। কাজটি যে করেছেন তা বোঝানোর জন্য কারো না কারো কাছে রেখে আসতে হতো। তারা পাঠাতেন বাদশাহর কাছে। সেদিন কবির সঙ্গে কবির যোগাযোগ হতো না। মনে হতো তিনি আড়াল হয়ে গেলেন কোনো শূন্যে। তারপরও তো খাদ্যের নিশ্চয়তা ছিল জীবনে। কেল্লার সঙ্গে এই সম্পর্ক ছিল বলেইতো সংসার সচল ছিল। নাতিদের ফল-মিঠাই ছিল। নিজের জন্য রুটি-কাবাব ছিল। সবচেয়ে প্রিয় শরাব ছিল। আহ শরাব! না খেলেতো বেঁচে থাকা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতো।

বাড়ি ফেরার পথে আকাশ দেখতেন। চাঁদনি চক, জামা মসজিদ দেখতেন আর ভাবতেন আকাশের ইচ্ছা অন্যরকম। শহরে জোর গুজব চলছে যে সিপাহীদের একটি অংশে এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজকে কেন্দ্র করে ধূমায়িত ক্রোধ জমেছে। ভারতীয় সৈনিকদের প্রতি ব্রিটিশদের আচরণ খুবই বৈষম্যপূর্ণ। এটিও ক্ষোভের আর একটি কারণ ছিল। একজন ভারতীয় সেনা সবচেয়ে যে

উঁচু পদে পৌছতে পারে তাহলো সার্জেন্টের পদ। অন্যদিকে যে কোনো ব্রিটিশসেনা সরাসরি উঁচু পদে যোগ দেয়ার সুযোগ পায়। আরও যে দিকটি দীর্ঘদিন ধরে বিক্ষোভকে ধূমায়িত করেছিল তাহলো ব্রিটিশসেনাদের মেস এবং ভারতীয় সেনাদের থাকার জায়গার মধ্যে ছিল আকাশ-পাতাল তফাৎ। এত বৈষম্য মেনে নেয়া কঠিন।

শেষে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠার জন্য ধর্মকে কাজে লাগানো হলো। এনফিল্ড কার্তুজে গরু ও শুয়োরের চর্বি আছে, যে কার্তুজ দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে হয়, এমন প্রচারণা শুরু হলো। এটুকু ভেবে গালিব আকাশের দিকে তাকালেন। মনে হলো আকাশের ইচ্ছা একটি নতুন বিদ্রোহ জন্ম দেওয়ার। তিনি চারদিকে তাকিয়ে বললেন, আমিতো কবি। আমি আরাম এবং শান্তি চাই। আমি নিশ্চয়তা চাই। আমি অনবরত কবিতার ফুল ফুটে ওঠা দেখতে চাই। এসব কিছু ধ্বংস হোক আমি তা চাই না। যদি এর উল্টো কিছু ঘটে তবে শত্রু ও বন্ধু সবাইকেই আকাশের ধ্বংসমুখী ইচ্ছায় শেষ হয়ে যেতে হবে। এটাই হবে নিয়তির শেষ কথা।

তিনি আরও শুনতে পান যে দিল্লির কট্টর মুসলমানরা সিপাহীদের এই বিক্ষোভে সমর্থন দিচ্ছে। জেহাদের ডাক দেয়ার কথা ভাবছে। তাঁর বুক দুরদুর করে। এমন কিছু ঘটার আশঙ্কায় থাকেন। এবং শেষ পর্যন্ত তাই ঘটে। ১০ মে কার্তুজ ব্যবহার করতে অস্বীকার করে মীরাটের সিপাহীরা। তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হয়। ফলে সেনানিবাসে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে।

ব্রিটিশ সেনা ও অনেক অফিসারকে হত্যা করে সিপাহীরা দিল্লির পথে যাত্রা করলো। দিল্লিতে যে সৈনিকরা ছিল তারা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিল।

শহর দখল করল বিদ্রোহীরা।

ইংরেজ অফিসার ও তাদের পরিবারের সদস্যদের হত্যা করে সিপাহীদের হত্যা করার প্রতিশোধ নিল।

এরপর ওরা লালকেল্লায় গেল।

ওখানে ছিল ব্রিটিশের পেনসন লাভ করা নামমাত্র সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর। তাঁকে তারা বাধ্য করলো হিন্দুস্থানের শাসক হিসেবে দায়িত্ব নিতে।

বিদ্রোহীদের একটি আবেদনে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হলেন বাদশাহ।

দিল্লির উলেমারা জেহাদের ঘোষণা দিলেন। দিল্লির কয়েকজন অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে নিয়ে একটি সরকার গঠিত হলো। বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফর স্বাধীনতার প্রতীক হলেন। নতুন করে ফিরিয়ে আনা স্বাধীনতা। এতকিছু ভাবনার পরে তিনি নিজেকেই বললেন, ইতিহাসের একটি ঘটনার সাক্ষী হয়ে

রইলেন গালিব। কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করার সাধ্য তাঁর নেই। নিজে নিজে ক্রুদ্ধ হতে পারেন। ঘটনার বিশ্লেষণ করতে পারেন। বুকের কথা বুকের ভেতর রাখতে হবে তাঁকে। কারণ ব্রিটিশের পেনসনের কাছে জিম্মি তাঁর জীবিকা। হায় গালিব! হায় কবি! হায় কবিতা!

পরদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন পণ্ডিত মতিলাল। গালিব তাঁকে দেখে খুশি হন।

কেমন আছেন পণ্ডিতজী?

এটাতো ভালো থাকার সময় নয় মির্জা সাহেব।

ঠিক বলেছেন।

গদরের পর থেকে তো আপনি দরবারে অংশ নেয়ার অনুমতি পাননি।

সত্যি কথা। পেনশনও বন্ধ।

খুব কষ্ট হচ্ছে?

গালিব বিষণ্নভাবে মাথা নাড়েন। তারপর দ্রুত মাথা নেড়ে বলেন, নিজের অভাবের কথা এত বলা ঠিক নয়।

শুনেছিলাম আপনার বিবির গয়নাগুলো লুট হয়ে গিয়েছে কালে সাহেবের বাড়ি থেকে।

ঠিকই শুনেছিলেন। এখন আমার বাড়িতে বিছানা আর পরার কাপড়চোপড় ছাড়া আর কিছু নেই। দামী জিনিসপত্র যা ছিল সেগুলোও আমার বিবি কালে সাহেবের হেফাজতে দিয়েছিল।

থাক আফসোস করবেন না।

আফসোস করব না? গালিব খানিকটা উত্তেজিত হন। বলেন, আফসোস করার বাকি কিছু নেই পণ্ডিতজী। শুনুন এতটা বছর ধরে একদিনও যদি শরাব পান করে না থাকি তাহলে আমি কাফের। আর একবারও যদি নামাজ আদায় না করেছি তাহলে আমি অপরাধী। বুঝুন এবার, এরপরও সরকার আমাকে বিদ্রোহী মুসলমানদের মধ্যে ফেলেছে। বলুন এর কি কোনো উত্তর পাওয়া যাবে?

পণ্ডিত মতিলাল বলেন, বোধহয় না। আমি অন্তত তাই বুঝি।

পণ্ডিতজী আপনি পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্টের মীর মুনসী—

থাক, থাক। এসব কথা আর বলবেন না। আপনি তো শুনেছেন যে বোম্বের গভর্নর লর্ড এলফিনস্টোন ইংরেজ সৈনিকদের বর্বরোচিত আচরণকে অপরাধ বলে মন্তব্য করেছেন।

AMARBOI.COM

হ্যাঁ, আমি একথা শুনেছি। তবে এটাও সত্যি যারা বিজয়ী হয় তারা কখনোই পরাজিতদের দয়া দেখায় না। ইতিহাস এমন কথাই বলে। ব্রিটিশসেনাদের নির্মমতা নাদির শাহকেও হার মানিয়েছে।

ঠিক বলেছেন। ওরা বাদশাহর বিচার করেছে ওদের আদালতে। শাহাজাদাদের বেশির ভাগেরই কোনো বিচার হয়নি। তাঁদের জন্য একটাই শাস্তি ছিল। মৃত্যু। ব্রিটিশ অফিসার হডসন ওদের নির্যাতন করে মেরে ফেলার দায়িত্ব নিয়েছে।

হডসন অনেককে এক সঙ্গে ফাঁসি দিয়েছে। ওহ নিষ্ঠুরতা।

গালিব অস্ফুট আর্তনাদ করে।

মতিলাল ভাঙা কণ্ঠে বলে, সামনে আরও কত কি দেখতে হবে জানি না।

গালিবের কণ্ঠে আগের মতোই আর্তনাদ, আমরাই বাঁচবো কিনা জানি না।

হ্যাঁ, আমরাও। মতিলালের ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠে ঘরের নিস্তব্ধতা প্রগাঢ় হয়। যেন এই ঘরের কেউ কোনোদিন নিঃশ্বাস ফেলেনি। এখানে জীবন নামক কোনো শব্দ ধ্বনিত হয় না।

কাল্লু মিয়া এক গ্লাস মিসরির শরবত নিয়ে আসে। সঙ্গে দুটো আখরোট।

গালিব নিস্তেজ কণ্ঠে বলে, আপনাকে আপ্যায়নের জন্য আমার এটুকুই সম্বল মাত্র।

শুকরিয়া, মির্জাজী।

মতিলাল পণ্ডিত এক চুমুকে শরবত শেষ করেন। বোঝা যায় যে তিনি খুব পিপাসার্ত। গালিব দু'চোখ মেলে পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে থাকেন। বলেন, আপনার খুব পিপাসা পেয়েছিল পণ্ডিতজী। আমাদের সবার বুকের মধ্যে ভীষণ পিপাসা। আমরা হা-হুতাশ করে দিন কাটাচ্ছি।

মতিলাল পিরিচের ওপর ঠক করে গ্লাস রাখেন। গালিব নিশ্চুপ বসে থাকেন। বয়সী মানুষের ক্লান্তি তাঁকে পেয়ে বসে। গ্লাস রেখে রুমাল বের করে মুখ মোছেন মতিলাল। গলা উঁচু করে বলেন, ব্রিটিশরা নিজেদের সভ্য জাতি বলে মনে করে। কিন্তু যে নির্মমতা দেখাচ্ছে ওরা তাতে সভ্য শব্দের মানে খোঁজা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

গালিব নিশ্চুপ বসে থাকেন। মনে হয় তাঁর শরীরজুড়ে ব্যথা হচ্ছে। কানে তো অনেকদিন ধরে কম শোনেন, এখন যেন কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না। পুরো বধির হয়ে গেলেন বুঝি।

মতিলাল বলে যাচ্ছেন, ব্রিটিশরা শহর থেকে বের করে দিয়েছে অসংখ্য মানুষকে। তার কোনো হিসেবে নেই। 'কানপুর ডিনারের' নামে করা হয়েছে

নৃশংস কর্মকাণ্ড। মুমূর্ষু সিপাহীদের মুখে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে নিষিদ্ধ গরু ও শূকরের মাংস। বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে কাজটি করা হয়েছে। আরও শুনবেন ওস্তাদজী?

গালিব এখনো নিশ্চুপ। ঘাড় নেড়েও প্রকাশ করেন না যে তিনি শুনবেন।

মতিলাল বলতে থাকেন, ব্রিটিশ সেনারা কলকাতা থেকে দিল্লি আসছিল। তাদের সেনাপতি বারানসী ও এলাহাবাদের শহরগুলোকে ছারখার করে দিয়েছে। বিদ্রোহী সিপাহী ও শহরের বাসিন্দাদের অকাতরে নিধন করেছে। তার নিষ্ঠুরতায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন লর্ড ক্যানিং। সেই সেনাপতির জায়গায় নিয়োগ দিয়েছেন হ্যাভলককে। তিনিও সভ্য ব্রিটিশদের একজন যিনি হত্যাকাণ্ডে অত্যন্ত পারদর্শী।

গালিব মতিলালের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কানপুর শহরের নানা সাহেবকে আমি চিনি। তিনি মারাঠা রাজবংশের উত্তরাধিকারী।

এটুকু বলে চুপ করে গেলেন গালিব। অন্য দিকে মুখ ফেরালেন।

মতিলাল তাঁর কথার জের টেনে বললেন, নানা সাহেব বিদ্রোহীদের নেতা। তাঁর দেহরক্ষীর নাম তাঁতিয়া তোপী। তাঁর সচিব পণ্ডিত আজিমউল্লাহ।

এটুকু বলার জন্য গালিব আবার সরাসরি মতিলালের চোখে চোখ রাখলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আজিমউল্লাহ পণ্ডিত মানুষ।

মতিলাল আবার তাঁর কথার সূত্র ধরে বললেন, তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ মেধাবী লোক। বেশ কয়েকবার ইউরোপ ঘুরে এসেছেন।

কেমন আছেন তাঁরা?

গালিব এবার সরাসরি মতিলালের দিকে তাকান না। অন্য দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটি করেন।

মতিলাল সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলেন, হ্যাভলক সেনাপতির পদ পেয়ে আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। কানপুরে সিপাহীদের খাদ্যের অভাব দেখা দিল। পাশাপাশি ছিল আরও নানা রকম সমস্যা। এই সুযোগে সিপাহীদের সঙ্গে যুদ্ধবাধায় হ্যাভলক। তারপরও তাকে দু'বার যুদ্ধ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত দখল করে কানপুর।

জানতে চেয়েছিলাম যে কেমন আছেন নানা সাহেব আর আজিমউল্লাহ?

শুনেছি তাঁরা পালিয়ে গেছেন।

পালিয়ে গেছেন? কোথায়?

ব্রিটিশের চোখে ধুলা দিয়ে তাঁরা নেপালে চলে গেছেন।

ওহ, এটি একটি সুসংবাদ। খোদাতালা তাদের রক্ষা করুন।

নানা সাহেবের দেহরক্ষী তাঁতিয়া তোপী গোয়ালিয়র থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে যত সম্ভব দ্রুতগতিতে কানপুরে পৌছান। সেখানে গিয়ে ব্রিটিশ সেনাপতি উইন্ডহ্যামকে পরাজিত করে আবার কানপুর দখল করে নেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি। সেনাপতি ক্যাম্বেল খবর পেয়ে কানপুরে আসেন। তাঁতিয়া তোপীকে পরাজিত করে কানপুর দখল করে।

শুনেছি ক্যাম্বেল লক্ষ্ণৌতে আছে?

এই বিষয়টি পুরোপুরি জানি না। শুধু এটুকু জানি যে তিনি লক্ষ্ণৌ দখল করতে পারেননি। সিপাহীরা দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ্ণৌ অবরোধ করে রেখেছে। ব্রিটিশ ক্যান্টনমেন্টের সৈনিকরা রেসিডেন্সিতে আশ্রয় নিয়েছে। হ্যাভলক তাদেরকে উদ্ধার করতে গিয়েছিল। কিন্তু সিপাহীরা তাকেও অবরুদ্ধ করে রাখে। সেনাপতি ক্যাম্বেল গোলান্দাজ বাহিনীর সহায়তায় অবরোধ ভেঙে ফেলছে। কিন্তু লক্ষ্ণৌ দখল করতে পারেনি।

এটুকু বলে মতিলাল থামলেন। যেন তার দম নেয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু গালিব তাকে অবসর দিলেন না। দ্রুত জিজ্ঞেস করলেন পন্ডিতজী আপনি কি জানেন আহমদউল্লাহর খবর?

তাঁর নেতৃত্বে ওয়াজেদ আলি শাহর নাবালক ছেলেকে তখতে বসানো হয়েছে। তারা এখনো শক্ত অবস্থানে আছে। শাসন ব্যবস্থা এখনো ভেঙে পড়েনি। তবে আমার মনে হয় কানপুর তো দখল করেছে ব্রিটিশরা। এবার বোধহয় লক্ষ্ণৌর ওপর বড় ধরনের আক্রমণ হবে।

সামনে অনেক যুদ্ধ পণ্ডিতজী। আমরা এই কালের সাক্ষী হয়ে রইলাম।

দুজনে আবার স্তব্ধ হয়ে যান। আবার স্তব্ধ সময়ের নিঃশব্দ স্রোত বয়ে যায় তাঁদের উপর দিয়ে। তাঁরা মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলেন।

কাল্লু মিয়া প্রবেশ করে। বলে, হুজুর, আমার মায়ের পেট ব্যথা করছে। দাওয়াই লাগবে।

মতিলাল নিজের পকেট থেকে পয়সা বের করে কাল্লুকে দেন। কাল্লু চলে যায়। গালিব কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, শুকরিয়া পণ্ডিতজী। আপনি সাহায্য না করলে আমি ওর মাকে দাওয়াই কিনে দিতে পারতাম না।

থাক, দুঃখ করবেন না। আমাদের এমন দূরবস্থার অবসান ঘটবে নিশ্চয়ই।

মতিলাল যাবার জন্য উঠে দাঁড়ান। দাঁড়িয়েই বলেন, দিল্লির চিফ কমিশনারের আগমনের কথা শুনেছি। তিনি এলে আপনার পেনশনের একটা সুরাহা হতে পারে হয়তো।

আমিতো বরাবরই কোনো হাকিম দিল্লি এলে তাঁর উদ্দেশে একটি কসীদা

লিখে পাঠাই। এবার কে এসেছেন? তাঁর নাম কি?

স্যার জন লরেন্স।

ঠিক আছে তাঁর প্রশংসায় একটি কসীদা লিখবো।

নিশ্চয় বিজয় ও অভ্যর্থনাসূচক রচনা হবে?

হ্যাঁ, তাই। এর বেশি আর কি।

মতিলাল যেতে যেতে বলেন, হ্যাঁ, এর বেশি আর কি। আর কিছু না।

গালিব ভাবলেন, একটি কসীদা লিখে শুক্রবারই ডাকে পাঠিয়ে দেবেন।

কসীদা লিখবেন বলে ভাবছিলেন তখন উমরাও বেগম এলেন।

কিছু হয়েছে বিবি?

দোকানদার আমাদেরকে ধারে জিনিস দেবে না বলেছে। আজ রাতে শুকনো রুটি খেতে হবে।

গালিব চুপ করে থাকেন।

উমরাও বেগম আবার বলেন, বাচ্চারা এসব খেতে চায় না। ওরা খুব অস্থির হয়ে পড়েছে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে উমরাও বেগম আবার বলেন, এদিকে জিনিসপত্রওতো ঠিক মতো পাওয়া যায় না। আমরা যে কি করবো।

আমি কিছুই জানি না বিবি।

আমি কি করবো? কি হবে বাচ্চা দুটোর?

উমরাও বেগম বলতে বলতে বেরিয়ে যান। তিনি বিছানায় শুয়ে পড়েন। মনে হয় চারদিকে ভীষণ অন্ধকার। এই অন্ধকার কাটার অপেক্ষায় কতকাল থাকতে হবে কে জানে! মনে মনে আওড়াতে থাকেন নিজেরই লেখা শের :

'কানে আর আসে না কোনো বার্তা,
চোখ দেখতে পায় না তার রূপ,
একটি তো হৃদয়, তাও হতাশায় এমন বিক্ষত।'

একটি শের দু'তিন বার আউড়িয়ে তিনি আবার অন্যটিকে সামনে আনলেন :

'বাসনার বর্ণে উজ্জ্বল ফুলবাগিচা তো হেমন্তের স্পর্শে শুকিয়ে গেলো;
তবু বাকি রইলো এমন এক বসন্ত যার রঙ ফিকে,
যার বাতাসে মুমূর্ষু আশার শেষ দীর্ঘশ্বাস।'

একটি শেষ হলে আর একটি শের তাঁর মনে আসে। তিনি আবার সেটি বলতে থাকেন। বলেই যান। তিনি আজ নিজের শেরের ঘোরে ঢুকে পড়েন। বুকভরা আর্তনাদে ভরপুর শেরগুলো আঁকড়ে ধরে তিনি বেঁচে থাকার আশ্রয়

খোঁজেন। ভাবেন এভাবেই তো কাটলো জীবন, সামনে আর কয়দিনই বা আছে? ভাবতে ভাবতে ঘুম আসে তাঁর।

ঘর জুড়ে ধ্বনিত হতে থাকে তাঁর কণ্ঠ :

'একটু সামলে নিতে দাও, হে নৈরাশ্য; এ কী প্রলয় কাণ্ড!
বন্ধুর ধ্যানের যে অঞ্চল প্রান্তটুকু আমার হাতের মুঠোয়
ছিল তা-ও ফসকে যাচ্ছে।'

কণ্ঠস্বর কোনো স্তব্ধতার আড়ালে চাপা পড়ে না। গালিবের কণ্ঠস্বর দিল্লির মাটি ছুঁয়ে ভেসে যায় হিন্দুস্থানের সবখানে—গালিবের কণ্ঠস্বর সময়ের পৃষ্ঠা ছুঁয়ে ভরে দেয় ইতিহাসের খেরোখাতা। স্বপ্নের ভেতরে গালিব তখনও আউড়ে যান নিজের লেখা শের।

পরদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে হীরা সিং। গালিবের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচয়। সে তাঁর সাগরেদও একজন। গালিবের মতে সে একজন সৎ যুবক। নিজের কাজটি ভালো বোঝে। বেশ অনেকদিন পরে দেখা করতে এসেছে। গালিব তাকে দেখে খুব খুশি হলেন।

তুমি কেমন আছ হীরা সিং?

ওস্তাদজী আপনি আমাকে মাফ করবেন। আমি অনেকদিন আসতে পারিনি।

আগে তুমি নিয়মিত আসা-যাওয়া করতে।

আগে নিয়মিত আসা-যাওয়ার সময় ছিল। এখন তো তা নেই।

তোমার জীবনও কি তোমার হাতের মুঠোয়?

সে রকমইতো মনে হয়।

বিনয়ে মাথা নিচু করে রাখে হীরা সিং। গালিব নিশ্চুপ হয়ে যান। আর কি বলবেন? কথা তো এক রকম ফুরিয়ে গেছে বলেই মনে হয়।

হীরা সিং হাতের পোটলা থেকে এক বোতল দেশী মদ বের করে। ওটার দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে গালিবের চোখ।

ওস্তাদজী আমি শুনেছি আপনি এখন আর নিয়মিত শরাব পান করতে পারেন না।

কি করে পারবো? দোকানদার বাকি দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। সংসারের রোজকার জিনিসপত্রই মিলছে না।

কাল্লু মিয়াকে একটি পেয়ালা আনতে বলুন।

কিন্তু হীরা সিং আমি যে গোলাপ জল মিশিয়ে মদ পান করি সেই গোলাপ

জলও এখন আমার মজুত নাই।

আপনি চিন্তা করবেন না। আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি।

হীরা সিং বেরিয়ে যায়। বোতলটা গালিবের পায়ের কাছে রাখা। তিনি সেটা হাতে উঠিয়ে নেড়েচেড়ে দেখেন। তারপর আগের জায়গায় রেখে দেন। কাল্লু মিয়াকে পেয়ালা আনার জন্য ডাকবেন ভাবলেন, কিন্তু ডাকলেন না। অপেক্ষা করলেন হীরা সিংয়ের ফিরে আসার জন্য। সেই সময় শিবজী রামের কথাও মনে হলো। ওতো তাঁর ছেলের মতো। তাঁর ভালো মন্দের দিকে খেয়াল রাখে। একবার দোকানের দেনা শোধ করে এসে দোকানির দেয়া কাগজের উল্টো পিঠে একটা শের লিখে দিতে বলেছিল। অনেক দিন শিবজী রামের দেখা নেই। ও সুস্থ আছে তো? বালমুকুন্দই বা কেমন আছে? শিবজী রামের ছেলে ও। বালমুকুন্দও বাবার মতো ওর দিকে খেয়াল রাখে। কতইবা বয়স ওর? মাঝে মাঝে বাদাম নিয়ে এসে বলতো, দাদু আপনার জন্য। কাল্লু মিয়াকে বলবেন এগুলো যেন আপনাকে গুঁড়ো করে দেয়।

হায় নসীব, কত প্রিয় মুখ এখন পাশে নেই। ফিরে আসে হীরা সিং। হাতে বেশ কয়েকটি গোলাপ জলের শিশি। মদের বোতলের কাছে ওগুলো রাখতে রাখতে বলে, কয়েক তোলা বাদামও এনেছি। আপনি বাদাম খেতে ভালোবাসেন।

ভালোবাসার সবকিছু কি আমার পাশে আছে হীরা সিং?

সময়টাতো খারাপ। থাকবে কি করে?

আমার প্রিয় বন্ধু হরগোপাল তুফতা এখন আমার কাছে নেই। দূরের শহরে বাস করছে এখন।

আপনি ওকে প্রীতির বশে মির্জা তুফতা বলে ডাকেন।

গালিব হেসে বলেন, তুমি মনে রেখেছো দেখছি।

আপনার কত কিছু যে আমার স্মৃতিতে গাঁথা আছে তা আমি আপনাকে বলে শেষ করতে পারবো না।

আহ, হীরা সিং তোমার মতো যুবক হয় না। আসলে ভালোবাসা আর যত্ন পেলে আমি কৃতার্থ হই।

কাল্লু মিয়াকে পেয়ালা আনতে বলি?

বলো।

হীরা সিং কাল্লু মিয়াকে ডাকে। একটু পরে পেয়ালা আসে। কাল্লু মদের সঙ্গে গোলাপ জল মিশাতে থাকে।

গালিব হাসতে হাসতে বলেন, কয়দিন আগে মির্জা তুফতা আমাকে মীরাট

থেকে একটি হাঁড়ি পাঠিয়েছে। চিঠি আর গজল ও সব সময় পাঠায়। এতে ওর ভুল হয় না। বরং গজল পরিমার্জনা করতে দেরি হলে তাগাদা পত্রও দেয়।

কাল্লু মিয়া মদের পেয়ালা বাড়িয়ে ধরে বলে, হুজুর।

শুকরিয়া কাল্লু মিয়া।

কাল্লু বেরিয়ে গেলে হীরা সিংও উঠে দাঁড়ায়। গালিব তার হাত ধরে বলে, আর একটু বোস।

আমার একটু কাজ আছে।

জরুরি কাজ?

হ্যাঁ, একটু জরুরি। আমি আপনাকে দেখতে এসেছিলাম।

নাকি এই বোতলটা দিতে?

দুটোই। দুটো মিলেই একটি।

আবার কবে আসবে?

খুব শিগগিরই। দেখি যত তাড়াতাড়ি পারি।

বড্ড একা হয়ে পড়েছি।

হীরা সিংয়ের মনে হয় বড় মিনতিভরা কণ্ঠ। গালিব তো এমন মানুষ নন। গালিব মদের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলেন, ঠিক আছে যাও।

হীরা সিং চলে যাওয়ার পরও ঘরের দরজা খোলা থাকে। মৃদু বাতাস ঢোকে ঘরে। গালিব আরাম বোধ করেন। একটু একটু করে প্রিয় নেশায় মগ্ন হওয়ার পরও বিষণ্নতা তাড়াতে পারেন না। ভাবতে কষ্ট হচ্ছে যে এই শহরে মুসলমান কত কমে গেছে। আগে শহরের প্রায় প্রতিটি ঘরে তাঁর চেনাজানা ছিল, বন্ধুরা ছিল। প্রায় প্রতিদিনই কেউ না কেউ আসতো। গালগল্প হতো। চৌরস খেলা জমে উঠতো। রাতে সেইসব বাড়িতে আলো জ্বলতো, সকালে চুলোয় ধোঁয়া উড়তো। এখন তেমন কিছুই নেই। যেন নিভে গেছে সব আলো। কোথাও কোলাহল নেই।

তিনি পেয়ালায় শেষ চুমুক দিলেন। নিজেকেই বললেন, এখন আমি নিজের ছায়ার সঙ্গে একাই বসে থাকি। হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে উর্ধ্বমুখী হয়ে ভাবলেন, শের ও কবিতার ঐশ্বর্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখবো কীভাবে? যতক্ষণ প্রবল যন্ত্রণায় মথিত হতে থাকব, ততক্ষণ অন্য কোনো অনুভবই আমাকে ছুঁতে পারবে না।

পরদিনই তেরোটি তোপের শব্দ শুনতে পেলেন তিনি। বুঝতে পারলেন যে চিফ কমিশনার দিল্লিতে পৌঁছে গেছেন। তোপের ধ্বনিতে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়েছে। গালিব খুশি হয়ে উমরাও বেগমকে ডাকলেন।

উমরাও বেগম কাছে এসে দাঁড়ালে বললেন, তোপের আওয়াজ শুনেছো বিবি?

শুনেছি। আপনার কোনো উপকার হবে তাতে?

হতে পারে বিবি। এবার হয়তো পেনসনের ব্যবস্থা হবে।

উমরাও বেগম অবসন্নের মতো বসে পড়েন। তিনি ক্লান্ত এবং বিপর্যস্ত। স্বামীর কথায় খুব একটা উৎসাহিত হন না। ক্লান্ত কণ্ঠে বলেন, যতক্ষণ পেনসন না হবে ততক্ষণ আমার বিশ্বাস নেই।

ধৈর্য ধর বিবি। তোমার ভাই জিয়াউদ্দিন আবার ক্ষমতায় ফিরে আসতে পেরেছে, এটাও আমাকে আশাবাদী করছে।

আপনাকে করতে পারে, আমাকে করছে না।

কেন? তিনি লোহারু বংশের সূত্রে নওয়াব বলে?

না। উমরাও বেগম শক্ত মুখে কথা বলেন।

তবে? গালিব অবাক হন।

তিনি জামা মসজিদের দশজন সদস্যের একজন বলে। এতে আর ক্ষমতার এমন কি হলো?

বিদ্রোহের পরে ইংরেজরা ভারতীয়দের আবার বিভিন্ন কাজে যুক্ত করছে বিবি। এটি একটি আশার কথা।

করতেইতো হবে। ওরা কি জাহাজ বোঝাই ইংরেজ এনে ভারতবর্ষ ভরে ফেলবে নাকি? এত সোজা?

গালিব স্ত্রীর কথায় বিস্মিত হন। উমরাও বেগমতো ঠিক কথাই বলেছেন। একদম খাঁটি কথা। তবে আশার কথা এই যে, শুধু হিন্দুদের প্রশাসনে যুক্ত না করে মুসলমানদেরও করছে। মিউনিসিপ্যালিটি ও জামা মসজিদ কমিটিতে ভারতীয়রা প্রতিনিধিত্ব করছে। তবে যেসব মুসলমানরা মুঘল দরবারের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের ডাকা হলো না। মেরে ধরে শেষ করার পরও এখনও অনেকে কষ্টকর জীবনের পীড়নে দিন গড়াচ্ছে। সে তো তিনি দু'চোখে দেখতে পাচ্ছেন।

আপনি কিছু বলছেন না যে?

তুমি ঠিক কথা বলেছো বিবি। মসজিদ কমিটির ভূমিকা এই যে জামা মসজিদ সৈনিকদের হাত থেকে ছাড়া পেয়েছে। সিঁড়িতে আবার বসেছে কাবাবের দোকান। বিক্রি হচ্ছে মুরগির ডিম আর পায়রা।

গালিব হা হা করে হেসে উঠলেন। উমরাও বেগম অনুভব করলেন যেন দমকা বাতাস বেরিয়ে গেল তাঁর স্বামীর বুকের গহ্বর থেকে।

AMARBOI.COM

হাসছেন যে?

আমি মুরগির ডিম খেতে ভালোবাসি। পায়রার গোস্তও।

নির্বিকার ভঙ্গিতে উমরাও বেগম বললেন, দিল্লি বহুত দূরস্ত।

তুমি আমার সঙ্গে রসিকতা করছ বিবি?

তওবা, তওবা, আমি তা করবো কেন।

কারণ আমরা এখন বিছানা আর পরার কাপড় বিক্রি করে দিন চালাচ্ছি।

উমরাও বেগম কথা বললেন না। কেবল শ্বাস ফেললেন।

গালিব জোরের সঙ্গে বললেন, এতে কি এই মনে হয় না যে অন্যরা রুটি খায়, আর আমি খাই কাপড়। ভয় পাচ্ছি যে সব কাপড় খাওয়া হয়ে গেলে আমাদের কি হবে?

আপনি রসিকতা করছেন। আমি জানি আপনি রসিকতা করতে পছন্দ করেন।

আমিতো খাঁটি কথাই বোঝাতে চাই।

কখনো তা তীরের মতো বুকে এসে বিঁধে।

উমরাও বেগমের কথা পাশ কাটিয়ে তিনি বললেন, ভেবে দেখো বিবি যে এখনও পুরনো চাকর-বাকরদের মধ্যে দু-তিনজন আমাদের ছেড়ে যায়নি।

এটা আমাদের সৌভাগ্য।

ওদেরকে আমার খাওয়াতে হচ্ছে।

ওদের ছাড়া আমাদের চলে না। আমরা ওদের ওপর নির্ভরশীল।

ওরা অনেক কিছু চায় যা আমি পূরণ করতে পারি না। তখন আমার বেঁচে থাকা অসহ্য লাগে। এইভাবে আর কতদিন? এর থেকে মুক্তির নামইতো মৃত্যু? তাই না?

না। আমরা অনেক মৃত্যু দেখেছি। সাতটি সন্তান হারিয়েছি।

হায় বিবি, নসীব আপনা, আপনা।

আপনার দিনলিপিটি লেখা কবে শেষ হবে?

জানি না, জানি না। এমন হতে পারে যে যেটুকু লিখেছি তার বেশি আর লেখা হবে না। আমার পাঠকরা খুবই হতাশ হবে। ভবিষ্যতে নিন্দা আর ধিক্কার ছাড়া আমার ভাগ্যে আর কিইবা থাকবে।

গালিব দু'হাতে মুখ ঢাকেন।

নিশ্চুপ বসে থাকেন উমরাও বেগম। তাঁর মুখে কথা নেই। একজন কবির আর্তনাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কথা বলার সাধ্য কি তাঁর আছে?

এক সময় দু'হাত চুলে ঢোকান তিনি। দাড়িতে হাত বোলান। উমরাও

বেগমের দিকে না তাকিয়েই বলেন, একদিন যদি আমার আবার পেনসন পাওয়া যায় তবুও আমি কি দুঃখ তাড়াতে পারবো? বোধহয় না। যে ঋণ আমার ঘাড়ে আছে সেটাও বোধহয় শোধ করতে পারবো না। আর যদি পেনসন না পাই তাহলে পুরো বুক ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। তখন আমার আর দিল্লিতে থাকা হবে না। অন্য কোথাও চলে যেতে হবে।

উমরাও বেগম উঠে দাঁড়ান।

গালিব মৃদু হেসে বলে, কোথাও যেতে হলে আমি আগ্রায় যাবো।

আমিও আগ্রাতেই যেতে চাই।

আমাদের দুজনেরই প্রিয় শহর। তাই না বিবি?

আহা রে, ছোটবেলার দিনগুলো যদি ফিরে পেতাম!

ওহ সেই যমুনা নদী। যে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আমি সূর্য ডুবতে দেখেছি। সূর্যের শেষ রশ্মির লাল আভায় রঙিন হয়ে যেতো নদীর পানি। এখনও সেটা আমার স্বপ্নের মতো লাগে। সেই আগ্রাতেই আমি কবিতা লিখতে শুরু করেছিলাম।

ঘরে পায়চারি করেন গালিব। বেরিয়ে যান উমরাও বেগম। গালিব ভাবলেন, 'দস্তাম্বু'র শেষ অংশটা লিখে শেষ করা উচিত। তারপর বইটি ছাপতে হবে। ছাপার কাজটি কাকে দেবেন তা ভাবতে থাকেন।

দুদিন পরে আলতফ এলেন। কথা বলার আগেই চোখ মুছলেন। গালিব অস্থিরভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। অপেক্ষা করলেন। তাকে শান্ত হওয়ার সময় দিলেন।

এক সময় গালিব নিজেই জিজ্ঞেস করলেন, বড় ধরনের খারাপ খবর?

আপনিতো জানেন কবি তর্ক ইংরেজরা দিল্লি দখলের পরে আত্মীয়-পরিজনসহ শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, শুনেছিলাম। তিনিই ছিলেন দিল্লির সেরা মহিলা কবি।

তিনি আর নেই।

মানে? নেই মানে?

গালিব বিমূঢ়ের মতো উচ্চারণ করে পরক্ষণে মিনমিনিয়ে বলেন, নেই মানে তো আমি বুঝি। বুঝবো না কেন? কিন্তু এতকিছু মেনে নেয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে। কি হয়েছিল এমন এক অভিজাত বংশীয়ার?

পথের কষ্টে, শ্রমে কাহিল হয়ে পড়েছিলেন।

তাই অকালেই গেলেন। কি চমৎকার কবিতা লিখতেন।

AMARBOI.COM

আপনিতো তাঁকে কোনোদিন দেখেননি?

না, তিনি পর্দার আড়ালে থেকে আমাকে কবিতা শোনাতেন। তাঁর মামার সঙ্গে আমি ওই বাড়িতে যাতায়াত করতাম। ঠিক আছে। থাক তাঁর কথা। আমরাই বা কে কখন যাবো কে জানে।

আজ যাই। তর্ক্-এর মৃত্যুর খবর শুনে মনটা ভালো নেই। আর একদিন আসবো ওস্তাদ।

আর একটুক্ষণ বোস। তোমরা কেউ থাকলে স্বস্তি পাই। এখনতো শহরে আর এক উৎপাত শুরু হয়েছে। সারাদিন ভাঙা আর খোঁড়ার শব্দ কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে। ঘরে শুয়ে বসে থেকেও শান্তি নাই।

ইংরেজদের চোখে আমরা তো সব বিশ্বাসঘাতক। আমাদেরকে উচিত শাস্তি দেয়াই এখন ওদের কাজ। তাই তারা দিল্লি শহরকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে বলে ঠিক করেছে। শুনতে পাচ্ছি লালকেল্লা আর জামা মসজিদ গুঁড়িয়ে দিয়ে সেখানে ভিক্টোরিয়ার নামে প্রাসাদ আর ক্যাথেড্রাল বানানো হবে। শেষ পর্যন্ত কি করবে কে জানে।

এসব দেখার জন্য আমি অতদিন বেঁচে থাকবো না। তুমি থাকবে হালি। তুমি আমার কত ছোট বল তো?

আলতফ আঙুল গুনে বলে, প্রায় চল্লিশ বছর হবে।

হ্যাঁ, তা তো হবেই। আমি ১৭৯৭। আর তুমি ১৮৩৭। নাকি?

আলতফ মৃদু হেসে বলেন, তাই। তবে কষ্ট নিয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না। বেদনা সহ্য করা কঠিন।

এই বেদনা নিয়ে আমি তুফতাকে একটা চিঠি লিখেছি। তোমাকে পড়ে শোনাই হালি?

হ্যাঁ, আমি শুনবো।

দেখো কত দুঃখের কথা লিখেছি। আমারতো বুক ফেটে যায়। আমিতো আমার গজল নিয়ে এই শহরে মেতে ছিলাম। আমার চেয়ে কে আর বেশি এই শহরকে ভালোবাসে।

কথা বলতে বলতে গালিব চিঠিটা বের করেন টেবিলে রাখা কাগজপত্রের মধ্য থেকে। তারপর পড়তে শুরু করেন খুব মনোযোগ দিয়ে—জামা মসজিদের চারপাশের বেশ অনেকটা জায়গা খালি করার জন্য ঘরবাড়ি, দোকান, গাছপালা সব ভেঙে বা কেটে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হলো। বিখ্যাত দারুল বাকাও ভেঙে ফেলা হয়েছে। আজুরদার বানানো এই স্কুলটায় বিনা বেতনে পড়ালেখা শেখানো হতো। শেখানো হতো সাহিত্য, ওষুধ ও ধর্ম বিষয়। এখানে অবশিষ্ট

যা রয়ে গেছে তা হলো আল্লাহর নাম। চারদিক থেকে শোনা যায় কোদালের খোঁড়াখুঁড়ির শব্দ। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সুযোগ-সুবিধার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নির্বিকারে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হচ্ছে। এই শহরে এখন না আছে সংবিধান, না আছে আইন!

এটুকু পড়ে তিনি দম নিলেন। হাতের কাছে রাখা গ্লাস থেকে পানি খেলেন। তারপর আবার শুরু করলেন—বন্ধু একথা সত্য যে দিল্লি চারদিক থেকে আক্রান্ত হয়েছে। এ শহরকে উন্নত শহর হিসেবে গড়ে তোলার কথা ইংরেজরা যতই বলুক না কেন, ওদের কাজের মধ্যে প্রতিশোধ নেয়ার মনোভাবই বেশি দেখা যাচ্ছে। একে একে ঘাসবাজার, উর্দুবাজার, ঘরমকাবাজার ধুলোয় মিশিয়ে ফেলা হয়েছে। ভেবে দেখো এগুলো ছিল দিল্লির বিখ্যাত বাজার। চিরদিনের মতো মুছে ফেলা হলো পুরনো মহল্লার চিহ্ন। সেই সঙ্গে গেলো এলাকার ছোট ছোট বাজারগুলোও। একই সঙ্গে ধুলো হয়ে গেলো শহরের চেনাশোনা জায়গাগুলো। কিংবা বন্ধুদের ছোট ছোট ঘর, অনেক লোক যাতায়াত করে এমন বড় বাড়ি বা রাস্তার ধারের অনেক স্মৃতিচিহ্ন। জায়গায় জায়গায় স্তূপ করে রাখা ইট-পাথর দেখে মনে হয় দিল্লি বুঝি জঞ্জাল সরিয়ে রাখার পরিত্যক্ত জমি। চোখের সামনে দিল্লি মরুভূমি হয়ে গেছে। কুয়োগুলো সংস্কার করার কোনো উদ্যোগ নাই। পানির জন্য মানুষ হাহাকার করে। প্রবল জলকষ্টে আমরা হয়রান হয়ে পড়েছি।

জামা মসজিদ থেকে শুরু করে আশেপাশের রাস্তাঘাট সবই বাতিলযোগ্য জমি। চারদিকে তাকালে আতঙ্কিত হয়ে থাকতে হয়। ভয়ে শরীর হিম হয়ে যায় এ জন্য যে কোথায় সেই দিল্লি? যেখানে মানুষের স্বাভাবিক বাসস্থান ছিল। যাতায়াত ছিল। উৎসব-আনন্দ ছিল। সমস্ত শহরই এখন সেনাদের ঘাঁটি। আমরা এই ঘাঁটিতে বন্দি মানুষ। এখানে কবিতা নেই। মুশায়রা নেই। বন্ধু ভেবে দেখো কি দারুণ আকাল আমাদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে।

এটুকু পড়ে তিনি থামলেন। আবার পানি খেলেন। আলতফের দিকে তাকিয়ে বললেন, আর পড়বো?

আলতফ মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, হ্যাঁ।

গালিব মাথা নেড়ে বললেন, থাক। আর ভালো লাগছে না।

আপনি কি আমাকে চিঠিটা পোস্ট করতে দেবেন?

আজ থাক। আমার আরও কথা লেখার আছে। যদিও আমি জানি আমার এক জীবনে আমি এইসব কথা লিখে শেষ করতে পারবো না।

'দস্তাম্বু' তো শেষ হয়নি?

না হয়নি। হয়ে যাবে। ছাপার কাজটাও তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে হবে।

শরীর ঠিক আছে তো ওস্তাদজী?

শরীর? আবার পানি খেলেন তিনি। তারপর সরাসরি উত্তর না দিয়ে নিজের শের আওড়ালেন :

'একটু কেঁদে নিতে দাও, ভর্ৎসনা কোরো না বন্ধু;
কোনো এক সময়ে তো হৃদয়ের ভার হালকা করবে মানুষ।'

আলতফ আর একটি কথাও না বলে বিদায় নিলেন। যেতে যেতে ভাবলেন, এখন এই একলা ঘরে ওস্তাদজী নিশ্চয় তর্ক্-এর কথা মনে করে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলবেন। তিনি তাঁর কবিতা খুব পছন্দ করতেন। যদিও সেই পর্দানশীন কবিকে কখনও দেখার সুযোগ হয়নি। কিন্তু হৃদয়ের টান কি পর্দা মানে? পর্দা উড়ে যায় মানস চোখের সামনে থেকে। ওস্তাদজীর সামনে এখন পর্দা নেই। তিনি ঠিকই দেখতে পাচ্ছেন সেই রমণীকে, যাঁর মুগ্ধতায় তাঁর অনেক সময় কেটেছে।

আলতফ চলে গেলে নিঃসঙ্গ কবি খোলা দরজার দিকে তাকালেন। দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, রাতের কোন তারাটা তুমি হবে। 'জীবন তো এমনিতেই কেটে যেতো। কেন তোমার পথের কথা মনে এলো।'

তিনি আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। প্রবলভাবে বয়ে আসা চোখের জল দু'হাতে মুছেও শেষ করতে পারছেন না। চোখ আজ কত বড় সাগর হয়ে গেলো? এত জল কতদিন ধরে ওখানে জমা হয়েছে? পরক্ষণে অনুভব করলেন কাঁদতে পারাই তাঁর এই মুহূর্তের স্বস্তি।

কয়েকদিন পরে সন্ধ্যাবেলা কামান গর্জনের শব্দ ধ্বণিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। কাল্লু মিয়া এসে খবর দিলো, হুজুর ইংরেজরা লক্ষ্ণৌ জয় করেছে। তাই এত আনন্দ উল্লাস।

বলেই চলে যাচ্ছিল কাল্লু। তিনি ওকে ডেকে বললেন, লক্ষ্ণৌ আমার প্রিয় শহর কাল্লু। বিদ্রোহীরা শহরটাকে অবরোধ করে রেখেছিল।

তিন মাস তো হয়ে গেলো হুজুর। বিদ্রোহীরা আর বোধহয় ধরে রাখতে পারেনি।

ঠিক আছে তুমি যাও। আরও খবর পেলে আমাকে জানিও।

পরদিনই জানতে পারেন যে ক্যাম্বেল পঁয়তাল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে

লক্ষ্ণৌর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রায় দু'লাখ মানুষ শহরে একত্র হয়েছিল। তারা প্রাণপণ লড়াই করে। কিন্তু তাদের যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। দক্ষ সেনাপতিও না। শেষ পর্যন্ত পরাজিত হতেই হলো তাদের। যদিও এক মাস ধরে যুদ্ধ করেছিল তারা। শহর দখল হয়ে গেলে সিপাহীরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

শরীর খারাপ হয়ে পড়ে। নানা কিছুতে তিনি খুবই কাহিল হয়ে পড়েছেন। একদিকে আর্থিক অনটন। অন্যদিকে মানসিক টানাপোড়েন। শহরের হাকিমের কাছে খেতাব, দরবারী পোশাক আর পেনসনের জন্য আবেদন করেছিলেন। তার কোনো জবাব পাননি। শহরের খারাপ পরিস্থিতির কারণে চিঠিটা ডাকে পাঠিয়েছিলেন। হাকিমের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি।

কিছুদিন পর খবর পান ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া সিপাহীরা বিভিন্ন অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। আর ব্রিটিশরা যে শহর জয় করছে সেখানেই ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে। প্রতিশোধের জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে তারা। নির্বিচার প্রতিশোধের কোনো সীমা-পরিসীমা নাই। পুরুষদের অবলীলায় হত্যা করছে, নারীদের ধর্ষণ করছে, বাড়িঘর লুট করে সর্বস্বান্ত করে দিচ্ছে তাদের, যারা তখনও হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক শব্দ নিয়ে বেঁচে আছে।

গালিব বিছানায় নিস্তেজ পড়ে থাকেন। হাঁটতে ভালো লাগে না। এমনকি বিছানায় উঠে বসে থাকতেও। কাজু মিছরির শরবত আনলে রেগে যান। গ্লাস ছুঁড়ে ফেলতে চান। উমরাও বেগমকেও সইতে পারেন না। মনে হয় শহরটা জনশূন্য হয়ে গেলে শহর জুড়ে নেমে আসুক আকাশের তারা। তারার আলো শরাব হলে তিনি সাকী হবেন। যেন জীবনের অন্তিম সময় ঘনিয়েছে। এমন একটি ইচ্ছা ছাড়া তাঁর আর কিছু চাইবার নাই।

দুদিন পরে শহরের হাকিমের কাছ থেকে আসা চিঠিটা উমরাও বেগমই তাঁর কাছে নিয়ে আসেন। তাঁর বুকের ভেতরে আশা যে হয়তো পেনসন মঞ্জুর হয়েছে এমন একটি খবর আজ পাবেন।

গালিব চিঠি খুললেন।

উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন উমরাও বেগম। তাঁর চিঠি পড়া শেষ হলে বললেন, কি বার্তা এসেছে? ভালো না খারাপ?

ভালো। ভালোই বলতে হবে।

ভালো! হায় খোদা এবার বোধহয় আমরা বেঁচে যাব।

না, বিবি এই চিঠিতে বেঁচে যাওয়ার কোনো খবর নেই।

তাহলে? তাহলে কি লেখা হয়েছে এই চিঠিতে?

হাকিমের কাছে আমি যে তিনটি প্রার্থনা করেছিলাম তার একটি নাকচ করে দিয়েছেন তিনি। আমি খেতাবের জন্য আবেদন করেছিলাম। জানানো হয়েছে যে খেতাব দেয়া সম্ভব হবে না।

এটা ভালোর কি হলো? উমরাও বেগম ভুরু কুঁচকে তাকান স্বামীর দিকে।

এখনতো আমার দরকার রুটি। আমি অভুক্ত থাকছি। আমি খেতাব দিয়ে কি করবো? এটাতো ভালো খবরই।

হায় খোদা, এক নিষ্ঠুর রসিকতা।

উমরাও বেগম আর দাঁড়ান না। গালিব চিঠিটা খামে ভরে বালিশের নিচে রেখে দেন। এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ান। উমরাও বেগম তাঁর কথাকে নিষ্ঠুর রসিকতা বললেন, আসলেই কি নিষ্ঠুরভাবে বলা হয়েছে? তিনি তো সত্যি কথাই বললেন। এইভাবে বেঁচে থাকাই তো চরম রসিকতা। জীবন কি এতই ক্ষুদ্র যে একজন কবিকে এভাবে বেঁচে থাকতে হবে? কখনো বাদশাহর কিংবা কোনো নওয়াবের বৃত্তিভোগী হয়ে? নইলে দেশের শাসনভার যারা গ্রহণ করে তাদের কাছে আর্জি পেশ করে? কেন ওরা আসবে না কবির কাছে? কেন বলবে না যে এই আপনার যোগ্য সম্মান দিয়ে গেলাম? হায়, এই জীবনে আর এই স্বপ্ন দেখতে হবে না।

খেতাব পাওয়ার আবেদন পত্রটি ফেরত পাঠানো হয়েছে, কিন্তু পেনসনের ব্যাপারে কোনো চিঠি পাঠায়নি হাকিমের অফিস।

সেদিন বিকেলে হীরা সিং চিঠিটা দেখে বললো, পেনসন বোধহয় এমনিতে হয়ে যাবে। সে জন্য আবেদনের উত্তর দেয়নি।

গালিব চুপ করে শুনলেন। কিছু বললেন না।

হীরা সিং বাকির আর হুসেনের জন্য কিছু ফল আর মিঠাই এনেছে। দুই ভাই সেগুলো পেয়ে মহা খুশি। ঘরজুড়ে লাফালাফি করছে আর মিঠাই খাচ্ছে। ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে গালিব ভাবলেন, পৃথিবীর আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য!

বাচ্চারা চলে গেলে হীরা সিংকে বললেন, ভাবছি পেনসনের ব্যাপারে মহামান্য চার্লস সন্ডার্সকে আবেদনপত্র পাঠাবো।

হীরা সিং মাথা নেড়ে সায় দেয়। বলে, আবেদন পত্রটি কি এখন লিখবেন? তাহলে আমি ডাকে দিয়ে দিতে পারি?

না। এখন লিখবো না। ডাকে পাঠানোর ব্যবস্থা আমিই করবো।

ছুটে আসে হুসেন। লাফাতে লাফাতে বলে, নানা মনে হচ্ছে আজ একটি ঈদের দিন।

হ্যাঁ, তাইতো। আনন্দের দিনকে ঈদের দিন মনেই হতে পারে।

তাহলে আমাকে দোকানে নিয়ে চলেন।

দোকানে? কেন?

আমি খেলনা চাই। অনেক খেলনা।

খেলনা? গালিব বিষণ্ন দৃষ্টিতে অন্যদিকে তাকান।

হুসেন তার হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে, হ্যাঁ খেলনা, খেলনা, অনেক খেলনা। আমার খেলনাগুলো সব ভেঙে গেছে।

আজ আমার শরীর খুব খারাপ। আমিতো দোকানে যেতে পারবো না ভাইয়া।

কবে পারবেন?

তবিয়ত আচ্ছা হলে।

কবে তবিয়ত আচ্ছা হবে?

গালিব উপরের দিকে হাত তুলে বলেন, আল্লাহ মালুম।

আচ্ছা যাই। নানিকে বলি, আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতে। যেন আল্লাহ আপনাকে ভালো করে দেন।

হীরা সিং দেখলো বাচ্চাটি ঘর ছাড়ার আগেই তাঁর প্রিয় কবির চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়লো।

গালিব শতরঞ্জির উপর পা ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, বাচ্চাটা ঈদের আনন্দের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হচ্ছিল আগে এই শহরে কত না উৎসব হতো। দুই ঈদ ছাড়াও নওরোজ উৎসব হতো। দিওয়ালি, হোলি, মহররম, সলোনো, ফুলের মালা, মুকুট ধারণ উৎসব, শেষ বুধবার এমন কত না উৎসব পালন করতেন বাদশাহ। পৃথিবীতে ফেব্রুয়ারি মাস আর নওরোজ আসতো। ফেব্রুয়ারির দু-চার তারিখে নওরোজ পালিত হতো। নববর্ষের দিন একটি নতুন দিন। আনন্দের শেষ থাকতো না সেদিন। এ বছর ফেব্রুয়ারি কোথা দিয়ে চলে গেলো কেউ খোঁজ রাখলো না।

রাখবে কি করে, সেই অবস্থা তো নেই।

হীরা সিংয়ের কথা ধরে গালিব বললেন, ঠিকই বলেছো। এখন এটা মৃতদের শহর। গালিব কৌতুকের ঢঙে বলেন, আমিই কি জীবিত হীরা সিং?

ওস্তাদজী, এভাবে বলবেন না।

ফেব্রুয়ারি চলে গেলো। কিন্তু এই শহরে বসন্ত এলো না। দেখতে পাচ্ছি, কেউই নতুন বছরের কথা আলোচনা করছে না। রাস্তায়, বাজারে, দোকানপাটে, অন্দরমহলে নববর্ষের ছোঁয়া নাই। কেউ বলছে না যে এটা কততম সাল। এই শহরের জ্যোতিষীদের কি মৃত্যু হয়েছে?

AMARBOI.COM

তিনি থামলেন। দম নিলেন। হীরা সিংহের মুখেও কথা নাই। তিনি একটু কাশলেন। বুঝলেন, বুকে কফ জমেছে। শরীরও গরম হয়েছে। জ্বর এসেছে বোধহয়।

দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, দিনের রাজা সূর্য। কেউ যদি বলে যে দিনের রাজার দিনলিপি লেখা বন্ধ হয়ে গিয়েছে তবে তা মিথ্যা বলা হবে। সূর্য রোজ যে পরিভ্রমণ করে সে কথা সূর্য ভোলেনি। সূর্য ভোলেনি যে ঘাস গজাবে না বা ফুল ফুটবে না। প্রকৃতির নিয়ম কখনো বদলায় না। আকাশও এ নিয়মের বাইরে যেতে পারে না।

হীরা সিং বুঝতে পারে যে গালিবের কণ্ঠস্বর ভার হয়ে গেছে। তিনি খুব আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছেন। এমন একটি মুহূর্তে প্রিয় মানুষের সামনে বসে থাকা খুবই কষ্টকর।

ও বলে, আমি বাচ্চাদের ডাকি?

না, ডেকো না।

ওরা সামনে থাকলে আপনার ভালো লাগবে।

মোটেই তা নয়। আমার বুক ভেঙে যায় যখন ওদের হাসিখুশি উজ্জ্বল মুখের বদলে করুণ চেহারা দেখি।

হীরা সিং মাথা নত করে। তার মনে হয় কবির দিকে না তাকানোই উচিত। আসলে ওর চলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।

তখন গালিব ওকে বলেন, আসলে কি জানো প্রকৃতির কথা ভেবে নয়, কিংবা ফুলের বাগানের কথা ভেবে নয়, আমি নিজের কথা ভেবেই চোখের পানি ফেলছি। বসন্তের প্রতি আমার অভিযোগ নেই। নিজের মন্দ কপালের কথাই স্মরণ করছি। নসীব খারাপ হলে তার নিন্দা করাই উচিত। এসব কথাই আমি 'দস্তাম্বু'তে লিখছি হীরা সিং।

কবে বের হবে 'দম্বাম্বু'?

দেখি, দু'চার মাসের মধ্যেই বের করে ফেলবো।

আজ আমি যাই?

গালিব ঘাড় কাৎ করলেন। বেরিয়ে গেলো হীরা সিং। তিনি 'দস্তাম্বু' যে খাতায় লিখছিলেন সেটা খুলে বসলেন। কলম ঢুকে গেলো দোয়াতে। সাদা পৃষ্ঠায় ভরে ওঠে কালো কালির আঁচড়। মাত্র কয়েকটি বাক্য লিখলেন কবি : পৃথিবী ফুলে রঙিন হয় আর গোলাপের সৌরভে ভরে থাকে। কিন্তু আমি এক কোণায় বসে থাকি। নিরূপায়, অসহায়। আমার কিইবা আর করার আছে! বসন্ত এসেছে। পত্র-পল্লব পূর্ণ হয়ে আছে। আমি হতাশায় ভুগছি। কপর্দকশূন্য এই

আমি। আমার ঘরের দরজা বন্ধ।

রাতেই জ্বর এল তাঁর।

দিনভর প্রবল জ্বরে কাতরালেন।

দু'দিন পরে জ্বর খানিকটা কমলেও সারা গায়ে ফোঁড়ার মতো উঠে ঘা ছড়িয়ে গেল।

লোকজন বলাবলি করতে লাগলো যে খাবার পানি দূষিত হয়ে মহামারীর আকারে দিল্লিতে সোর দেখা দিয়েছে। চারদিকে মানুষের দুর্দশার অন্ত নেই।

কীভাবে কয়দিন কেটে গেল গালিব নিজেও বুঝতে পারলেন না। আধাজাগরণে অচৈতন্যে বারবারই মনে হয়েছে তিনি দীর্ঘ পথে কবি তর্কের সঙ্গী হয়েছেন। দু'জনে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে চলে যাচ্ছেন। কোথাও বিশ্রামের জন্য বসছেন। কোনো নদীর ধারে বসে তৃষ্ণার জল পান করেছেন। নীলিমার দিকে তাকিয়ে দুজনে হাত ধরে হাঁটেছেন। এমন একটি অপরূপ যাত্রাপথে থমকে গেছে কবি তর্ক। তার নশ্বর দেহের ওপর নেমে এসেছে হাজার হাজার পাখির ছায়া। সেই ছায়ার দিকে হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে কাঁদছেন গালিব।

তাঁর গোঙানির শব্দ শুনে উমরাও বেগমকে ডেকে আনে কাল্লু মিয়া। উমরাও নিমীলিত চোখের তারায় আঙুল ছুঁইয়ে বলেন, কি হয়েছে?

তিনি অস্ফুট আর্তনাদের স্বরে বলেন, কষ্ট।

কোথায়? কোথায় কষ্ট?

সবখানে।

কোনো ঘায়ে বেশি কষ্ট হচ্ছে?

বুকের ভেতরে।

বুকের ভেতরে? উমরাও বেগম থমকে যান। বুকের ভেতরে কি ফোঁড়া উঠেছে? সেটার আকার কি সবচেয়ে বড়? আসলে মানুষটা এভাবে নিজের কষ্ট সব জায়গায় ছড়িয়েছেন।

কতদিন যে সময় লাগলো তাঁর ভালো হতে। খেয়ে না খেয়ে বিছানায় গড়াতে গড়াতে, নিজের শরীরের ক্ষতের দুর্গন্ধ সহ্য করে সুস্থ হয়ে উঠতে উঠতে একদিন বসন্ত ফুরিয়ে গেল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন হাকিম মহম্মদের বাড়ির ছাদে বসে আছে একদল কাক। নিঃশব্দ। কণ্ঠে কা কা ধ্বনি নেই। বড় অদ্ভুত লাগছে কালো রঙের কাকগুলোকে দেখতে। তিনি 'দস্তাম্বু'র পৃষ্ঠা খুলে লিখলেন : এই দুনিয়ায় তেষট্টি বছর কাটিয়ে দিলাম। এতদিনের

AMARBOI.COM

হাজার রকম দুঃখ থেকে বুঝে গেছি যে এর থেকে বেরিয়ে আসার আর কোনো আশা নেই আমার। ডুবে থাকতে হবে এই অন্ধকারেই। এই মুহূর্তে আমার শেখ সাদির কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে সাদির লেখা শের :

'হায় আমি যখন থাকব না তখনও পৃথিবীতে
বারবার বসন্ত আসবে, ফুল ফুটবে,
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ স্বর্গের ঋতু আসবে
আমার শরীর তখন ধুলোয় মিশে যাবে।'

এটুকু বলে তিনি থামলেন। শরীর এখন শুকনো ঝরঝরে। লিখতে ক্লান্তি লাগছে না। কিন্তু মন দুঃখবোধ নিয়ে ভারাক্রান্ত। সবকিছু ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টায় আবার লিখতে শুরু করলেন : সত্য কথা গোপন রাখা কোনো ভালো মানুষের ঠিক কাজ নয়। আমি অর্ধেক মুসলমান, ধর্মের নিয়মকানুনে আমি বাধা পড়িনি। বদনাম ও নিন্দায় আমার কিছু যায় আসে না। বুঝে ওঠার পর থেকে আমি শরাবে আসক্ত হই। রাতে ঘুমুনোর আগে শরাব পান করা আমার অভ্যেস। আজকাল শহরে বিদেশি শরাবের মূল্য আকাশছোঁয়া।

আর আমি কপর্দকশূন্য।

কলমটি রেখে দিয়ে, দোয়াত বন্ধ করতে করতে নিজের শের শোনালেন নিজেকে :

'এখানে যাবজ্জীবন বন্দী হয়ে আছে লক্ষ কামনা-বাসনা, অবসাদ,
আমার রক্তাক্ত বক্ষকে কারাগার বলেই জানি।'

শের আওড়াতে আওড়াতে তিনি দরজায় এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন বল্লিমাঁরো গলিটি একদম ফাঁকা। যেন তাঁর শূন্য পকেটের মতো জনশূন্য। রাস্তায় নামলেন তিনি। ভাবলেন, একজন কেউ তো রাস্তায় থাকুক।

পাখির উড়ে যাওয়ার শব্দে উপরের দিকে তাকালেন। কা কা শব্দে উড়ে যাচ্ছে কাকগুলো। হোক পাখির ডাক, তারপরওতো এই মৃতপ্রায় শহরে কোলাহল শোনা গেল। তিনি হাঁটতে হাঁটতে গলির মাথায় এসে দাঁড়ালেন। এই সময়ে প্রিয় শহরকেও কারাগার বলে জানি।

দিনের শেষ ছায়া

জুলাই মাস।

প্রবল বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে শহর। গালিবের মন খারাপ হয়ে থাকে।

অবিরাম বর্ষণের দিকে তাকিয়ে ভাবেন, আকাশের এ কেমন রসিকতা!

মেঘ ঝরছে তো ঝরছেই, যখন শহরের অধিকাংশ মানুষের থাকার জায়গার ব্যবস্থা নেই। গৃহহীন মানুষেরা জড়ো হয়ে আছে পথেঘাটের যেখানে-সেখানে!

তিনি নিজের বাড়ির কোনো কোনো ছাদের দিকে তাকিয়ে হতাশ হয়ে পড়েন। এতই জীর্ণ হয়ে গেছে বাড়ি যে মাঝে মাঝে ভীষণ ভয় করে। যে কোনো মুহূর্তে ভেঙেই পড়বে বুঝি! শ্বশুরবাড়ির দিক থেকে আত্মীয় এবং তাঁর প্রিয় সাগরেদ আলাউদ্দিন খান আলাইকে চিঠি লিখতে বসেন। কাটাকুটি করে শেষ পর্যন্ত লিখেন, মিয়া দিনকাল ভালো যাচ্ছে না। বিপদেই আছি বলতে পারো। অন্দরমহলের কোনো কোনো ঘরের দেয়াল ভেঙে পড়েছে। বিশেষ করে মহিলাদের বসার ঘরটির অবস্থা খুবই শোচনীয়। একই অবস্থা গোসলখানারও। পুরুষদের বৈঠকখানার ছাদ ফেটে জালের মতো হয়ে আছে। থাকার ঘর 'দিওয়ান খানা'র অবস্থা বলে বোঝানো যাবে না। তোমার ফুফু ভয় পান যে তাকে না জ্যান্ত কবরে যেতে হয়। বৃষ্টি যদি টানা দু'ঘণ্টা ধরে হয়, তাহলে ছাদ চুঁইয়ে পানি পড়ে চার ঘণ্টা ধরে।

চিঠিটা লিখে শেষ করলেন না। ভাবলেন, আগামীকাল লিখে শেষ করবেন। শরাবের জন্য প্রবল তৃষ্ণা তাঁকে কাবু করে ফেলে।

অতিবৃষ্টির জন্যই বেশ কিছুদিন ধরে বন্ধুবান্ধবের দেখা নেই। মহেশ দাস চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছিল আঙুর রস দিয়ে তৈরি শরাব নিয়ে আসবে। কিন্তু আর কোনো খবর নেই। হয়তো একদিন এসে যাবে। কিন্তু কবে? সে খবর কে দেবে তাকে?

কদিন পরে কাল্লু মিয়া এসে খবর দিল যে হাকিম মহমুদ খান ছাড়া পেয়েছেন। বিজয়ী সৈন্যরা শহর দখলের পরপরই অনেক মুসলমানের সঙ্গে তাকেও আটক করেছিল। মহমুদ খান গালিবের বাড়িওয়ালা।

খবরটা শুনে তিনি বললেন, আলহামদুলিল্লাহ।

কাল্লু মিয়া আরও জানাল, সেদিন যাদেরকে নিয়ে আটক করেছিল তাদের সবাইকে ছেড়ে দিয়েছে।

যাক সবাই জীবিত ফিরে এসেছে। কারো লাশ আমাদের গলিতে আনতে হয়নি।

জ্বী হুজুর। আমাদের বল্লিমাঁরোতে প্রাণ ফিরে এসেছে।

তোমার খুব আনন্দ লাগছে কাল্লু মিয়া?

জ্বী, হুজুর। মৃত্যু দেখতে দেখতে আমার প্রাণ আমার সঙ্গে ছিল না। মনে হয় আমার প্রাণ বুঝি আমার কাছে ফিরে এসেছে।

গালিব মৃদু হেসে বললেন, খবরটা আমাকে দেয়ার জন্য শুকরিয়া কাল্লু মিয়া।

কাল্লু মিয়া বেরিয়ে যায়। গালিব বারান্দা থেকে দেখতে পান ছেলেটি বল্লিমাঁরো গলিটা এক দৌড়ে পার হয়ে গেলো। ও হয়তো খবরটি আরো অনেককে দেয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে। নিজের আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার জন্য মানুষ এমনই ব্যাকুলতা অনুভব করে। তিনি বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। আকাশে ঘনকালো মেঘ। থমথম করছে চারদিক। বৃষ্টি নেই। খোলা হাওয়ায় হিমেল পরশ পাচ্ছেন তিনি। সবটুকু বিরক্তি সত্ত্বেও বৃষ্টির আবহে এই ভালোলাগা তাঁর মন খারাপ কাটিয়ে দেয়। ভাবেন, মহমুদ খানের সঙ্গে কাল সকালেই দেখা করতে যাবেন।

পরদিন দেখা হয় না মহমুদ খানের সঙ্গে। তিনি অন্য কোথাও বেরিয়ে গেছেন। ফিরে এসে কয়েক ছত্র লেখেন 'দস্তাম্বু'র পাতায় : আমার কান্না আর ভাবনার মাঝে মনে হয় পৃথিবী বড়ই আত্মকেন্দ্রিক। আমার মতো কোনো দুঃখী যদি ফুল ও পাতার সৌন্দর্য না দেখে, যদি মাথার ভেতর ফুলের গন্ধে ভরপুর না রাখে, তাহলে প্রকৃতির সৌন্দর্যে কি কিছুর অভাব ঘটবে না, বাতাসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে কেউ?

ঘরে ঢুকলেন উমারাও বেগম। বললেন, শুনলাম আমাদের বাড়িওয়ালা আর এখানে থাকবে না।

কোথায় যাবে?

আগামীকালই ওরা পাতিয়ালার দিকে রওনা করবে। গোছগাছ করছে। এই বাড়িতে কেউ থাকবে না।

তালা পড়বে?

তাইতো মনে হচ্ছে।

ভবিষ্যতে কি করবে তা আর জানা হলো না। যাহোক, দুঃখ করো না বিবি। আমরা তার বাড়িতে ভাড়া আছি। যতদিন থাকতে পারি থাকবো।

বেশিদিন না থাকাই বোধহয় ভালো। বাড়ির যা অবস্থা!

এ বছরের মতো প্রতি বছরই অতিবৃষ্টি হবে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই বিবি।

আপনি যা ভালো বোঝেন, তাই করেন।

উমরাও বেগম ক্ষুব্ধ হয়ে বেরিয়ে যান।

গালিব ভাবলেন, আমার বোঝাবুঝির কিছু নাই। আমি তো দেখতে পাচ্ছি আমার কি হচ্ছে। ইংরেজরা দিল্লি দখলের পর থেকে পেনসন বন্ধ। লালকেল্লার

সঙ্গে সম্পর্ক ছিল এই অজুহাত। কবে এই দোষ থেকে মুক্তি পাবো কে জানে? ততোদিন আমারতো নতুন কিছু চিন্তা করার শক্তি নেই।

গতকালই মীর মেহেদী তাঁর পেনসনের খবর জানতে চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। তার চিঠিটি আবার খাম থেকে বের করে পড়লেন। পরে কাগজ টেনে লিখলেন, মিয়া বিনা অন্নে বেঁচে থাকার কায়দাকানুন রপ্ত করেছি। বুঝে গেছি যে কীভাবে না খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়। আমার জন্য ভেবো না। একদম নিশ্চিত থাকো। রমজান মাসে রোজা খেয়ে খেয়ে কাটিয়েছি। এরপর রিজিকের মালিক খোদা আছেন। আর কিছু যদি খেতে না পাই তাহলে কিইবা এসে যায়। আমার জন্য দুঃখ অবশিষ্ট আছে। দুঃখ খেয়েই কাটিয়ে দেবো।

চিঠিটি লিখে উমরাও বেগমকে ডেকে বললেন, এই চিঠিটা শোন বিবি।

উমরাও বেগম চিঠি শুনে কড়া চোখে তাকিয়ে বললেন, আবার রসিকতা! মানুষ দুঃখ খায় কীভাবে?

রসিকতা নয় বিবি, এটাই বাস্তবতা। কবি হলে বুঝতে দুঃখ কীভাবে খাওয়া যায়।

আপনার দুঃখ খাওয়ার ব্যাপারটা আপনি বোঝেন। আমি এত নিষ্ঠুর রসিকতা বুঝি না।

উমরাও বেগম চিঠিটা টেবিলের ওপর রাখলেন।

গালিব তাঁর হাত ধরে বললেন, বুঝতেই যদি না পারবে তাহলে এত বছর ধরে ঘর করলে কি করে?

ঘর? ঘর কোথায়? আপনিতো বলেছেন আপনি কারাগারে আছেন। ভুলে গেছেন সেই কথা?

না ভুলিনি। ভুলবো কেন?

বলবো সেই কথাগুলো?

যে কথাগুলো আমি লিখেছিলাম?

হ্যাঁ, আপনিই তো লিখেছিলেন। অন্য কেউ না।

তোমার মনে আছে বিবি?

কলিজার দেয়ালে গেঁথে আছে।

ঠিক আছে বলো। বললে তোমার পোড়া বুকে শান্তি আসবে।

আপনি লিখেছিলেন, ১৮১০ সালের ৯ আগস্ট তারিখে আমার জন্য যাবজ্জীবন কারাবাসের ব্যবস্থা করা হলো। একটি বেড়ি মানে বিবি আমার পায়ে পরিয়ে দেয়া হলো। আর দিল্লি শহরে পাঠানো হলো আমাকে। দিল্লিই ছিল আমার জন্য কারাগার। উমরাও বেগম রাগত স্বরেই বললেন, যে বেড়িটি

AMARBOI.COM

আপনার পায়ে পরানো হয়েছিল সেটি কি লোহার ছিল?

গালিব চুপ করে থাকেন।

উমরাও বেগম আবার বলেন, আমার আব্বাজান আপনাকে দিল্লিতে এনেছিলেন। লোহারু বংশের সবাই আপনাকে এই শহরের কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে সহযোগিতা করেছিল। কে করেনি বলেন?

গালিব চুপ করে থাকেন। উমরাও বেগম যা বলছে তার মধ্যে এক বিন্দুও মিথ্যে নেই। লোহারু বংশের সবাই তাঁর আত্মার আত্মীয়।

কথা বলছেন না যে?

তুমি ঠিকই বলেছো বিবি।

বাদশাহর দরবারে কে নিয়ে গিয়েছিল আপনাকে?

তোমারই বংশের কেউ।

দিল্লি যদি কারাগারই হবে তাহলে ছেড়ে গেলেই তো পারতেন। গেলেন না কেন?

গালিব প্রশ্নের উত্তর দেন না। পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে দু'জনে একসঙ্গেই তো কাটালেন।

আপনি কথা বলছেন না যে?

আমার কথা বলার কিছু নেই।

আপনি আগ্রায় থাকলে আপনি এই গালিব হতে পারতেন না। কবিতার নেশা ছাড়া আপনার জীবনে আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

আহ! বিবি থামো।

থামবোই তো। ইংরেজদের দিল্লি দখলের প্রায় তিন বছর হতে চললো এখনো আপনার পেনসন মুক্ত হলো না।

হবে বিবি হবে, ধৈর্য ধরো।

এখন আমাকে আমার ধৈর্য খেতে হবে। আপনার খাওয়ার জন্য আছে দুঃখ, আর আমার জন্য আছে ধৈর্য। বাচ্চাগুলো খাবে হাওয়া। আর আমাদের আশ্রিতরা খাবে পানি। খাবে কি খাচ্ছেই তো।

বলতে বলতে বেরিয়ে যান উমরাও বেগম।

গালিব কাগজ টেনে একটি গজল লেখার চেষ্টা করেন। মনমতো হয় না। কাগজটি কুটিকুটি করে ছেঁড়েন। উমরাও বেগমের কথাগুলো তাঁকে খুব পীড়িত করে। কিন্তু এমন কথা তিনি অনেকবার শুনেছেন। উমরাও বেগমের অভিযোগের শেষ নেই। কিন্তু তরুণ বয়সে বলা সেই কথাগুলো ফিরিয়ে নেয়ার আর তো কোনো সুযোগ নেই। জীবনের একটি দিককে তিনি যদি কারাগারই

ভাবেন তবে কার কি বলার আছে! কবির জীবন তো কবিকেই বুঝতে হয়। আর এই বোঝার শেষ নেই। তারচেয়ে বেশি আর কে বুঝেছে এই সত্য!

সপ্তাহখানেক পরে বন্ধু মহেশ দাস তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসেন আখের রসের তৈরি শরাবের বোতল। উজ্জ্বল হয়ে ওঠে গালিবের দৃষ্টি।

বন্ধু তুমি!

দেখতে এলাম আপনাকে।

বরাবরের মতো বোতলটা পাঠিয়ে দিলেই পারতে!

পারতাম! কিন্তু ভাবলাম একবার চোখের দেখা দেখে না এলে খুব অন্যায় করা হবে।

আহ, কি মধুর বাক্য! তোমার মতো দরাজ দিল বন্ধু আমার খুব কমই আছে।

মহেশ দাস বোতলের ছিপি খুলে গালিবকে গন্ধ শুঁকতে দেয়। বলে, দেখুন তো কেমন?

হোক দেশি মদ, রঙতো বিলিতি শরাবের মতো। আর গন্ধ তার চেয়েও ভালো। গদরের পর থেকে দেশি রাম আমার বুকের জ্বালা জুড়িয়েছে।

আপনার কাল্লু মিয়াকে পেয়ালা আনতে বলুন।

ডাকতে হয় না। কাল্লু মিয়া পেয়ালা আর গোলাপজল নিয়ে হাজির হয়। মহেশ দাস পেয়ালায় রাম ঢেলে দিলে কাল্লু গোলাপজল মিশিয়ে দেয়। গালিব এক চুমুক দিয়ে বললেন, আমার কাল্লু মিয়া তোমাকে দেখেই বুঝে গেছে যে এখন আমার কি চাই।

হ্যাঁ, ও আপনার খুব বিশ্বস্ত ভৃত্য। প্রভুর সেবায় অনুগত। ঠিক বলেছি কাল্লু মিয়া?

কাল্লু মিয়া লজ্জিত ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে চলে যায়।

গালিব আর এক চুমুক পান করে বলেন, কতদিন ধরেই চাইছিলাম যে আমার মনের বাসনা পূর্ণ হোক। শরাবের দু'এক পেয়ালাও যদি পাই তাহলেও বেঁচে যাব। আজ আমার পোড়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়ালো। তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টায় সার্থক বন্ধু।

মহেশ দাস মৃদু হাসিতে মাথা ঝাঁকালো। বললো, এই শহরে কবিকে বাঁচিয়ে রাখার অনেক লোক আছে। আপনার গুণগ্রাহীর সংখ্যা অনেক।

সমালোচকের সংখ্যাও কম নয়।

সে তো থাকবেই। মিত্রের সঙ্গে শত্রু থাকাই তো জগতের নিয়ম।

AMARBOI.COM

হ্যাঁ, ঠিক। ঠিক বলেছো। আমি শত্রুদের ভয় করি না। শত্রুদের ব্যাপারে উদাসীন থাকাকেই আমি বুদ্ধিমানের কাজ মনে করি। তাতে নিজের বিশ্বাস কলুষিত হয় না।

ঠিক বলেছেন।

তিনি পরপর দুই চুমুক রাম পান করেন। বলেন, মহেশ বড়ই শান্তি দিলে বন্ধু। এখন শহরের খবরাখবর বল?

আপনি তো বোধহয় শুনেছেন যে, মুরাদাবাদও ইংরেজদের দখলে এসেছে।

না, শোনা হয়নি। তবে জানতাম যে, ওই শহর বিদ্রোহীদের আশ্রয়কেন্দ্র ছিল।

ওই শহরের দায়িত্ব নওয়াব ইউসুফ আলী খানকে দেয়া হয়েছে।

তিনি তো খুবই ইংরেজ ভক্ত। তাকে আমি ভালো চিনি। এও জানি যে, তাঁর ক্ষমতা অনেক। তিনি দুনিয়া জয় করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন। রাজত্ব করার জন্যও তার বাসনার শেষ নেই। যে এলাকার শাসনভার পেয়েছেন আমার বিশ্বাস, এই দায়িত্ব তিনি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত পালন করবেন।

মহেশ দাস মৃদু হাসিতে চুপ করে থাকে।

গালিব আবার জিজ্ঞেস করলেন, বেরিলীর খবর কি? দুটি শহরই তো কাছাকাছি?

এটাও দখল হয়ে গেছে। বিদ্রোহীদের এমনভাবে তাড়িয়েছে যে ওদের কেশের দেখাও পাওয়া যাবে না।

আর গোয়ালিয়র? না, দাঁড়াও, দাঁড়াও। কিছুদিন আগে তো গোয়ালিয়র জয়ের খবর পেয়েছি তোপের আওয়াজ শুনে। শহর জয়ের খবর আর বিদ্রোহীদের খতমের খবর বাতাসের বেগে পৌঁছে গেছে ঘরে ঘরে।

গালিব আর এক চুমুক পান করলেন।

মহেশ দাস বললেন, বিদ্রোহীরা গোয়ালিয়র দখল করলে মহারাজ জয়াজি রাও শহর ছেড়ে আগ্রায় চলে গিয়েছিলেন।

ওহ্, তাই নাকি। তারপর?

সেখানে গিয়ে তিনি ইংরেজদের সাহায্য চেয়েছিলেন। ইংরেজরা তাকে সাহায্য দেয়। তিনি সৈন্য নিয়ে দ্বিগুণ বেগে শহর আক্রমণ করেন। বিদ্রোহীরা শহর রক্ষার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল।

শেষ পর্যন্ত পারেনি, তাই না?

হ্যাঁ, তাই। তারা এমন অবস্থায় পড়লো যে লুটপাট করে বেঁচে থাকা ছাড়া

তাদের আর কোনো উপায় ছিল না। এরপর তারা ধরা পড়তে থাকে। তাদের ফাঁসি হয় কিংবা গুলিতে জীবন দিতে হয়।

ওহ নসীব, নসীব।

গালিব অস্ফুট শব্দ করেন। ঠক করে পেয়ালাটা রেখে বললেন, বাহাদুর জঙ্গ খানের কোনো খবর আছে মহেশ? ও তো লালকেল্লায় বন্দি।

শহরের হাকিম তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

তাই নাকি? কবে?

এই তো গত বৃহস্পতিবার।

বাহাদুর জঙ্গ খান নিশ্চয় অনেক আশা নিয়েই হাকিমের সঙ্গে দেখা করেছেন।

হবে হয়তো। তবে খবর একদিক থেকে ভালো, আর এক দিক থেকে ভালো নয়।

তাড়াতাড়ি বলে শেষ করো। আমি ধৈর্য রাখতে পারছি না।

তিনি আবার পেয়ালা হাতে ওঠান। দাড়িতে হাত বোলান।

ভালো খবর হলো যে এ যাত্রা তিনি বেঁচে গেছেন। তাঁকে এক হাজার টাকা করে পেনসন দেয়া হবে।

বাহ্, ভালোই তো।

খারাপ খবর হলো যে তাকে লাহোরে চলে যেতে হবে। নির্দেশ এমনই যে তাঁকে আজীবন ওই শহরে থাকতে হবে। তিনি আর দিল্লিতে আসতে পারবেন না।

ওহ্, নসীব। আবার তাঁর কণ্ঠে অস্ফুট আর্তনাদ। আমি জানি এই হুকুম তাকে মেনে নিতেই হবে। এছাড়া তাঁর আর কোনো উপায় নেই।

না, তাঁর আর কোনো উপায় নেই।

মহেশ দাসও গালিবের কথার প্রতিধ্বনি করলেন।

তোমার কাছ থেকে অনেক খবর পেয়েছি। শুকরিয়া মহেশ।

আজ যাই।

আবার কি দেখা হবে?

দেখা যাক কবে হবে।

আমি জানি তুমি অনেক কাজে ব্যস্ত থাক।

আমি না আসতে পারলেও আপনার জন্য দেশি মদ পাঠাবো। মন খারাপ করবেন না।

আমার মন তো পুড়ে খাক হয়ে গেছে বন্ধু।

AMARBOI.COM

ওই যে বললেন শান্তি পেয়েছেন। এই শান্তিটুকু ধরে রাখুন।

গালিব মাথা নাড়লে মহেশ দাস বেরিয়ে গেল। তিনি পেয়ালা শেষ করে কাল্লু মিয়াকে ডেকে বোতলটা তাঁর কাঠের বাক্সে রাখতে বললেন। রাতের খাবার খাওয়ার পরে 'দস্তাম্বু'তে লিখলেন, এ কথা আমাকে বলতেই হবে যে মহেশ দাস একজন সৎ ব্যক্তি। সে শহরে মুসলমানদের ফিরে আসার জন্য চেষ্টা করছে। চেষ্টাতে ত্রুটি ছিল এমনটি বলতে পারবো না। তবে তার চেষ্টা সফল হয়নি। মনে হয় সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা এমন নয়। তবে হিন্দুরা ভালো আছে। ইংরেজরা তাদের প্রতি সদয়। তারা বেশ খোলামেলা ভাবেই বাস করছে। মহেশ ভাগ্যবান মানুষ। আরাম-আয়েসে জীবনযাপন করে। সবার সঙ্গে সৎ আচরণ করে। আমাকে পছন্দ করে। যদিও তার সঙ্গে আমার অনেককালের পরিচয় নেই। মাঝেসাজে এখানে-ওখানে দেখা হয়। সামান্য কথাবার্তা হয়। মাঝে মাঝে আমাকে উপহার পাঠায়। এতে আমি লজ্জাও পাই।

এটুকু লিখে তিনি ঘুমুতে গেলেন। দিল্লি সোরে ভোগার পর থেকে শরীরটা দুর্বল হয়েছে। আগের অবস্থায় কবে ফিরে আসবে কে জানে। আদৌ ফিরবে কিনা তাই বা কে জানে। বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস আসে। চাইলেন ঘুমিয়ে শরীরকে বিশ্রাম দেবেন, কিন্তু হলো না। দীর্ঘশ্বাস ঘুম উড়িয়ে নিয়ে গেলো। তিনি বিছানায় এপাশ-ওপাশ করলেন। উঠলেন, পানি খেলেন। দরজা খুলে বল্লিমাঁরোর আকাশ দেখলেন। শেষ রাতের দিকে চোখ জড়িয়ে এলো।

পরদিন ঘুম ভাঙলো দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার পরে। চোখ খোলার পরপরই অনুভব করলেন যে শরীর বেশ ঝরঝরে লাগছে। অবসাদ ভাব নেই। তবে কি একটা নতুন জীবন পেলেন? আবার নতুন করে শুরু হলো কবিতা লেখার দিন? তাহলে তো ভালোই হয়েছে, পুরনো দিনগুলো ঝরে গেলে মুক্ত হয়ে যাবেন অভাব থেকে। দুঃখ-কষ্ট থেকে। তিনি ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন।

ঘরের চারদিকে তাকালেন। না সবই তো তেমন আছে। কিছুই বদলায়নি। জানালার ঘুলঘুলি দিয়ে দুপুরের কড়া আলো এসে ঢুকেছে ঘরে। তাপও কম নয়। তার কপালে, গলায়, বুকে ঘাম জমেছে। তিনি বিছানা থেকে পা ঝুলিয়ে দেন। সে পা মেঝে স্পর্শ করে। তিনি চপ্পলের জন্য নিচের দিকে তাকান। পায়ের কাছে চপ্পল নেই। কোথায় গেল? নাতিরা মাঝে মাঝে দুষ্টুমি করে লুকিয়ে রাখে। তাকে খুঁজে বের করতে হয়। আজ আর ওদের ওপর রাগ করলেন না। চপ্পল ছাড়াই বারান্দায় এলেন। দেখলেন বাড়ির উঠোনে গম্মন মিয়া বসে আছে। মাস দুয়েক আগে অভাবের কারণে ও চলে গিয়েছিল। এখন আবার কি চায়?

গালিবকে দেখে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসে। কাঁদতে কাঁদতে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ে।

হুজুর। মাথা চাপড়িয়ে কাঁদতে থাকে। হুজুর। হুজুর।

কতবার যে শব্দটি বলেছে গালিব নিজেও বুঝতে পারেন না। কাঁদতে কাঁদতে হেঁচকি ওঠে ওর।

কি হয়েছে তা বলবে তো গম্মন মিয়া।

হুজুর আমার বেয়াদবি মাপ করে দেবেন আপনি। হুজুর, হুজুর—

আহ, থাম। কি হয়েছে বল। গালিব বিরক্তি প্রকাশ করেন।

হুজুর আমি আপনার কাছে থাকতে এসেছি।

থাকতে এসেছো তো থাকো।

থাকবো, হুজুর আপনি আমাকে থাকতে দিলেন?

দিলাম তো। যাও, ঘরে যাও।

আমি রুটির জন্য মরে যাচ্ছি হুজুর। আপনার এখান থেকে যাওয়ার পর আমি একদিনও ঠিকমতো খেতে পাইনি।

ঠিক আছে যাও, বেগম সাহেবার কাছে যাও।

গম্মন মিয়া গালিবের পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ে যায়। আয়জ এসে টেনে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। গম্মন মিয়া জ্ঞান হারিয়েছে। গালিবের পেছনে এসে দাঁড়ান উমরাও বেগম।

আপনি ওকে আবার থাকতে দিলেন?

কি করবো। আমি তো তাড়িয়ে দিতে পারবো না। বিবি তুমি তো জানো–

হ্যাঁ, আমি তো আপনার সবকিছু জানি। আপনি একজন দিল দরিয়া মানুষ। কিন্তু নিজের অবস্থা কি একবারও ভেবে দেখেন না।

দেখি। দেখবো না কেন? আমিতো পেনসনের চেষ্টা করছি। কমিশনার সন্ডার্সের কাছে পেনসনের আবেদন করেছি। তুমি দেখো বিবি একটা কিছু খবর আমি পেয়ে যাবো। আমাদের আর বেশি দিন কষ্ট করতে হবে না।

খাওয়ার লোকের সংখ্যা কত হয়েছে জানেন?

গালিব আমতা আমতা করে বলেন, আমি কি এত হিসেব রাখি নাকি?

গম্মন মিয়াকে ধরলে নয়জন হবে আজ থেকে।

তোমাকে আমাকে সহ তো?

হ্যাঁ, আপনাকে, আমাকে সহই। উমরাও বেগম মুখ ঝামটা দেন।

গালিব মৃদু হেসে বলেন, তাহলে বেশি না।

বেশি না? কি বলছেন?

মিথ্যে বলিনি বিবি। আমি একাইতো পাঁচজনের সমান। আমাকে বাদ দিলে পাঁচজন কমে যাবে।

আর আমাকে বাদ দিলে?

তোমাকে বাদ দিলেও পাঁচজন।

আমি তো মদ খাই না। আমার মদের খরচ নেই।

উমরাও বেগম রাগ করে চুপচাপ পা ফেলে যাওয়ার সময় গালিব কৌতুকের স্বরে বলেন, এক মিনিট দাঁড়াও বিবি।

কেন? উমরাও বেগম মুখ ফেরান।

আয়জ গম্মন মিয়াকে নিয়ে গেছে। লোকটার জ্ঞান ফিরলে কিছু খেতে দিও। দেখো আমার পেনসন এবার ঠিকই হয়ে যাবে।

উমরাও বেগম চলে গেলে তিনি পানির বালতির কাছে এলেন। মুখ ধুলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো আজ সকালে তিনি কিছু খাননি। উমরাও বেগমের যা মেজাজ দেখলেন তাতে কপালে কি জুটবে কে জানে! তারপরও তিনি নিজেকে উৎফুল্ল রাখার চেষ্টা করেন। কারণ তার হেফাজতে শরাবের বোতল আছে—ওই বোতলটি থাকলেই তো তিনি মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন না। পানীয় তাঁকে শক্তি দেয়। তিনি খোশ মেজাজে ঘরে ফিরে এসে দেখেন কাল্লু মিয়া দস্তরখানা বিছিয়েছে। রেকাব-পিরিচের সংখ্যাধিক্য ঠিকই আছে, কিন্তু খাবারের পরিমাণ খুবই কম। হবেই তো, তিনি গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ভাবলেন। কাল্লু মিয়া কাছেই বসে আছে। তিনি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কাল্লু মিয়া রেকাবি-পিরিচের বাহার দেখছি। আজ কি ভোজনের মাত্রা ভালোই হবে।

কাল্লু মিয়া মাথা নিচু করে। কথা বলে না।

আজকে আমি তো তোমাদেরকে নাস্তা মাফ করে দিয়েছি, তাই না কাল্লু মিয়া?

জ্বী হুজুর। আমি তো দুপুরের খানার জন্য দস্তরখানা বিছিয়েছি। এখন তো দুপুরের খানার সময় হয়েছে।

হ্যাঁ, তাতো ঠিকই।

গালিব দস্তরখানায় বসেন। কাল্লু মিয়া চিলুমচি এগিয়ে দেয় হাত ধোয়ার জন্য। তিনি খাবার খেতে শুরু করার আগে কাল্লু মিয়াকে বলেন, রেকাবি-পিরিচের বহর দেখে মনে হচ্ছে এই দস্তরখানা এজিদের দস্তরখানা। আর খাবার যা দিয়েছ তা দেখে মনে হয় এই দস্তরখানা ফকির বায়জীদ বোস্তামীর দস্তরখানা।

কাল্লু মিয়া তটস্থ হয়ে বলে, হুজুর—

ঘাবড়িওনা কাল্লু মিয়া। আমার পেনসন হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

হুজুর। কাল্লু মিয়ার গলা শুকিয়ে যায়।

গালিব অল্পক্ষণে রুটি আর ডিমের কুসুম খেয়ে শেষ করেন। এক গ্লাস পানি খেয়ে বলেন, মহল্লার কসাইরা কি দোকান খোলেনি কাল্লু মিয়া?

খুলেছে হুজুর। তবে বাকি দিতে চায় না। বলে, আগের দেনা শোধ করতে।

ও হ্যাঁ, তাইতো, তাইতো। তবে পেনসন পেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তখন তুমি কিনে কুলাতে পারবে না। কি বলো, ঠিক বলেছি?

জ্বী হুজুর। আগে তো এভাবেই কিনেছি। বাড়িতে থাকতো কাবাব, কোর্মা, গোস্তের সুরুয়া—

থাম, থাম হয়েছে। তুমি কি জানো এজিদ কে?

তিনি নবীজীর নাতি ইমাম হুসেনকে হত্যা করেছিলেন।

আর বায়জীদ বোস্তামী?

তিনি ফকির দরবেশ মানুষ।

বাহ্, তুমি তো বেশ জ্ঞান রাখ দেখছি। খাঁটি মুসলমান। নাকি?

কাল্লু মিয়া লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করে দস্তরখানা গোটাতে থাকে। গালিব হাসতে হাসতে বলেন, কাল্লু মিয়া নসীব আপনা, আপনা।

কাল্লু মিয়া ঘর ছেড়ে হাঁফ ছাড়ে। হুজুর এমনই। কখন যে কি প্রশ্ন করবে তার কোনো ঠিক নেই।

দিন সাতেক পরে তিনি কমিশনার সন্ডার্সের কাছে গেলেন পেনসনের খোঁজ নিতে। সন্ডার্স তাকে বসতে দিলেন। একটি কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন, এখানে আপনাকে নিয়ে একটি খবর ছাপা হয়েছে।

গালিব কাগজটির দিকে তাকিয়ে বুঝলেন, সেই পুরনো বিষয়টি এই ইংরেজ আবার সামনে আনতে চাইছে। বিদ্রোহের সময় এ দেশীয় একজন ইংরেজদের স্পাই হিসাবে কাজ করতো দরবারে। নানা খবর পাঠিয়ে দিত পাহাড়ে অবস্থিত ব্রিটিশদের আস্তানায়। সে সময়ে এই বলে খবর ছাপা হয়েছিল যে নতুন বাদশাহী মুদ্রায় যে কবিতাটি মুদ্রিত হবে তা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিবের লেখা। তিনি তার কবিতা বাদশাহর কাছে পেশ করেছেন। গালিব কাগজটি হাতে নিয়ে সন্ডার্সের মনোভাব আঁচ করতে পারলেন। এরপরও চুপচাপ বসে রইলেন। ভাবলেন, নিজে কিছু বলার আগে প্রশ্নটি সন্ডার্সের কাছ থেকেই আসুক।

AMARBOI.COM

সন্ডার্স ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কিছু বলার আছে?

এ ব্যাপারে আমি আগেও যে কথা বলেছি এখনো সে কথাই বলতে চাই যে, আমি যদি এ কবিতা লিখে থাকি তাহলে দরবারের কাগজপত্রে আপনারা তার উল্লেখ পেতেন। কিন্তু আমি জানি দরবারের কাগজপত্রে এ বিষয়ে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

কমিশনার সন্ডার্স গম্ভীর মুখে চুপ করে রইলেন। কোনো উত্তর দিলেন না। গালিব তার মুখ দেখে তার মনোভাব বুঝতে পারলেন না। তারপরও বললেন, আপনি হাকিম আহসানউল্লা খানের কাছে এ বিষয়ে জানতে পারেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করুন।

সন্ডার্স এবারও কিছু বললেন না। গালিব বিদায় নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। শুকনো মুখে বাড়ি ফিরলেন। কাউকে কিছু বললেন না। ভাবলেন, দেখা যাক কি হয়।

কয়েকদিনের মধ্যে জানতে পারলেন সন্ডার্স বদলি হয়ে গেছে। তার আগে গালিবের পেনসন বিষয়ে যে নোটটি লিখে যান তা গালিবকে খুব মর্মাহত করেন। সন্ডার্স লিখেছেন আসাদুল্লাহ খান ফারসি ভাষার খ্যাতিমান কবি। কিন্তু তার কবিতা আমাদের বিবেচনার বিষয় নয়। এ ব্যাপারে আমাদের আগ্রহও নেই। তিনি মোগল বাদশাহর কর্মচারী ছিলেন এবং তাঁর মুদ্রার জন্য কবিতা লিখে দিয়েছিলেন। আমার বিবেচনায় তিনি পেনসন পাবার যোগ্য নন।

সেদিনও বাড়ি ফিরে নিশ্চুপ শুয়ে রইলেন। কাউকে কিছু বললেন না। ভাবলেন, তার পেনসন বিষয়ে সরকারের প্রত্যাখ্যান পত্র পেলে তবেই সবাইকে বলবেন। সন্ডার্স যে নোট লিখে রেখে গেছেন তারপর আর তো পেনসনের আশা করা যায় না। সামনের অনিশ্চিত দিনের কথা ভেবে স্তব্ধ হয়ে থাকেন।

পরদিন মির্জা মেহেদীকে চিঠি লিখলেন : ভাবছি দিল্লিতে আর থাকবো না। শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবো।

এটুকু লিখে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললেন। কি হবে লিখে, আগে সরকারি চিঠিটি আসুক।

দৌড়াতে দৌড়াতে বাকির আর হুসেন ঘরে ঢোকে।

কি চাই তোমাদের?

আমরা কলম চাই।

কলম? কলম কি হবে?

হুসেন বলে, আমি যে আরবি পড়তে শিখছি। আমি লিখব।

আচ্ছা ঠিক আছে। তোমাকে কলম দেবো।

এক্ষুণি দিতে হবে।

এখন কোথায় পাবো। কলম তো বানাতে হবে। আমাকে সময় দাও।

আচ্ছা দিলাম। হুসেন ঘাড় কাত করে বলে।

বাকির টেবিলের ওপর রাখা চিঠির টুকরো হাতে নিয়ে বলে, নানাজান আপনি কাগজ ছিঁড়ছেন কেন?

এটা হলো কাগজ ছেঁড়া খেলা।

খেলা?

বাকির অবাক হয় খেলা শুনে। বলে, তাহলে আমরা কাগজ ছিঁড়লে নানিজান বকে কেন?

কারণ কাগজ ছেঁড়া ছোটদের খেলা নয়।

শুধু বড়দের খেলা?

দু'ভাই হেসে গড়িয়ে পড়ে। হাসতে হাসতে বলে, বড়রা কি খেলতে পারে? নানাজান আপনি তো ঠিকমতো হাঁটতেই পারেন না। আপনার আবার খেলা কি? তাহলে চলেন আমাদের সঙ্গে খেলবেন।

তোমরা এখন যাও ভাইয়ারা।

দুই ভাই চলে গেলো তিনি আবার কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন। চিঠির একটি কাগজ ছিঁড়েছেন তো কি হয়েছে, আর একটি লিখবেন। এক বন্ধুকে লিখতে ইচ্ছে না হলে, অন্য বন্ধুকে লিখবেন। ভাবলেন কাকে লিখবেন সেটা পরে ঠিক করবেন, কিন্তু চিঠিটা তো লেখা হোক। কয়েক দশক আগে দিল্লিতে আসার পরে কবিতা লেখা এবং মুশায়রায় অংশ নেয়ার কারণে কতজনের সঙ্গেই তো সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাদের সঙ্গে চিঠির আদান-প্রদান সখ্যের জায়গা বড়ই করেছে। তিনি চিঠি লিখতে এবং উত্তর পেতে আনন্দই পান। এটাও একটি মজার খেলা। বাচ্চারা শুনলে হাসবে, কিন্তু ওদের কি করে বোঝাবেন যে খেলার অর্থ কত হাজার রকম। এক সময় তাঁর কলম চলতে শুরু করে কাগজের উপরে—প্রিয় বন্ধু, দিল্লিতে এখন যারা বসবাস করছে তাদের মধ্যে রয়েছে হিন্দু, পাঞ্জাবি আর ব্রিটিশ। আর অন্যদিকে রয়েছে সৈন্য আর কারিগর। আমি যে ভাষায় কবিতা লিখি তুমি তার প্রশংসা কর। ভেবে দেখো যাদের কথা বলেছি তাদের মধ্যে কয়জন আর আমার ভাষা ব্যবহার করে? বলো বন্ধু, নিজামুদ্দিন, মামনুন কোথায়? জওকই বা কোথায়? আর মোমিন খান? আমরা এদেরকে হারিয়েছি। বেঁচে আছে মাত্র দু'জন কবি। একজন আজুরদা। তিনি এখন নির্বাক হয়ে যাওয়া কবি। বেঁচেই আছেন মাত্র। আর একজন হলেন

গালিব। তিনি হতবাক হয়ে নিজের কাছে নিজেই মুছে গেছেন। বলতে পারো নিশ্চিহ্ন কবি তিনি এখন। কবিতা লেখা আর তার সমালোচনার জন্য কেউ কোথাও নেই। কবিতার ভালো বলার কেউ নেই, মন্দ বলারও না। ফৌজ আর কারিগর যে শহরে সংখ্যায় বেড়ে যায় সে শহরে আত্মা বলতে আর কি কিছু টিকে থাকে বন্ধু?

ইংরেজরা শেষ অবধি শহর পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে খানিকটা নমনীয় হয়েছে। তারা লালকেল্লাকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়নি। প্রতিশোধের স্পৃহাকে দমন করেছে। লাহোর ও দিল্লি তোরণের নাম বদল করে রেখেছে ভিক্টোরিয়া ও আলেকজান্দ্রা। জানোই তো প্রাসাদটিকে আগেই ব্যারাকে পরিণত করা হয়েছিল, আস্তে আস্তে অন্যান্য অনেক সৌধের সঙ্গে জামা মসজিদ আর গাজীউদ্দিন মাদ্রাসাকেও ব্যারাকে পরিণত করা হয়েছে। ভাবতে পারো অপরূপ কারুকাজ করা ফতেপুরী মসজিদ এক হিন্দু ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করা হয়েছে। ওটা এখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি। পরোয়ানা জারি করে জিনাতুল মসজিদকে পাউরুটির কারখানা বানানো হয়েছে।

গালিব আর লিখতে পারলেন না। অসম্ভব কষ্টে তাঁর হাত থেমে গেলো। ভাবলেন নিজের শহরের চিরচেনা ছবিটি বদলে যাওয়ার কষ্ট বহন করার চেয়ে কবিতা নিয়ে ডুবে থাকা কি বেশি ভালো হবে না? পরক্ষণে মনে হলো কই তেমন করে এখন তো আর গজলের অনেক পঙ্‌ক্তি বুকের ভেতর থইথই করে না। তাহলে আমি কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার শেষ ধাপে অবস্থান করছি? এখন কি আমার সময় শুধুই বেঁচে থাকার কারণে বেঁচে থাকা? এখন কি আমার সময় মৃত্যুর দিন গোনার জন্য? তাঁর ভীষণ মন খারাপ হয়। তিনি মানসিকভাবে বিপন্ন বোধ করেন। বলতে থাকেন নিজের শের :

> 'আমার অজস্র নিহত যাচনা মৌনের চাদর দিয়ে ঢাকা রয়েছে;
> নিঝ্‌ঝুম গোরস্থানে আমি একটি নিভে-যাওয়া দীপ ॥'

দুদিন পরে ঠিক করলেন একদিন ঘরের দরজা বন্ধ করে 'দস্তাম্বু'র উপসংহার লিখে শেষ করবেন। তারপর ছাপার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। তাই করলেন। একদিন দিনের শুরুতে নাস্তা খেয়ে কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন।

শুরু করলেন লেখা : এই দিনলিপি লেখার যে সময় আমি নিয়েছি তা গত বছরের মে মাস থেকে এই বছরের জুলাই পর্যন্ত। সব ধরনের ঘটনাই আমি সংযোজন করার চেষ্টা করেছি। আগস্ট মাস থেকে আমি আর লিখিনি। হায় খোদা, যদি আমার তিনটি ইচ্ছা পূরণ হতো! আমি চেয়েছিলাম খেতাব,

খিলঅত ও পেনসন। আমার সব ইচ্ছা এই তিনটি বিষয়কে নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে।

তোমরা দেখতে পাও না যে পাহাড়ের অবয়বজুড়ে বিচিত্র রঙের চিত্রকর্ম সুসজ্জিত হয় রানীর জন্য। তার সিংহাসনকে সম্মান দেখায় সূর্যও। রানী যদি মুক্তা ছড়াতে চান কিংবা বিতরণ করেন তবে সেই অগণিত মুক্তা গণনা করা কার সাধ্যি।

তার সেনাবাহিনী বিস্তৃত সাগর অতিক্রমণীয় পর্বতমালা অতিক্রম করে। তাকে ধ্বংস করার মতো তুলনীয় আর কে আছে?

তার সাম্রাজ্যের গৌরবগাঁথা বলার অপেক্ষা রাখে না। যত বড় বাদশাহই হোক না কে তার সামনে নতজানু হন।

এই করুণাময়, অত্যুজ্জ্বল অবস্থানের দ্বারা পৃথিবীজুড়ে বুদ্ধিমান মানুষেরা উপকার লাভ করেন এবং তাদের দ্বারা উপকৃত হন অন্য মানুষেরা। তার উদারতা সীমাহীন। তার ব্যক্তিত্ব অতুলনীয়। তার ধীশক্তি অপরিমেয়। তার নাম মালিকা-এ-আলম ভিক্টোরিয়া। খোদাতালা তার প্রতি সদয় হোন। তার প্রসাদে এই মহফিল দীর্ঘস্থায়ী হোক।

রানী যদি আমার প্রতি সদয় হন। যদি তার দয়ায় আমি কিছু লাভ করি, তাহলে এ দুনিয়া থেকে আমি নিঃস্ব হয়ে ফিরব না।

এ পর্যন্ত এসে আমি থেমে গেলাম। আমি গল্প শোনাতে চাই না। বইয়ের নাম রাখা হলো 'দস্তাম্বু'। এই বই বিভিন্ন জনকে দেয়া হবে এবং নানা জায়গায় পাঠানো হবে। আমার বিশ্বাস ন্যায়ধর্মী মানুষের কাছে এই ফুলের তোড়াটি রঙিন ও গন্ধময় হয়ে উঠবে। আর কুচক্রী স্বভাবের লোকদের হাতে আগুনে বোমায় পরিণত হবে। আমিন ... (সমাপ্ত)।

চেয়ারে মাথা হেলিয়ে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন। যাক একটি কাজ সম্পন্ন তো হলো। এই বই ইংরেজদের হাতে গেলে তারা রানীর প্রশংসায় প্রীত হবেন। তার পেনসনের সুরাহা হবে। সিপাহিদের প্রতি তার সমর্থন ছিল বলে তাদের যে অবিশ্বাস তার প্রতি, সেটা কাটবে বলেও মনে হয়।

দিনলিপি শেষ করার পরও তাঁর অবসাদ কাটে না। যতই নানাভাবে নিজেকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করুন না কেন তারপরও বারবারই মনে হয় তিনি একজন অসহায় মানুষ। তাঁর চারপাশে সেই পরিচিতজনরা তো নেই যারা তাকে আত্মগর্বী কবি হিসেবে জানতেন। তিনি স্পষ্টবাদিতার জন্য সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। এখন তিনি পরিবার পালনের দায়ে কবিসত্তা হারিয়ে ফেলেছেন। এখন তাঁর কলম চলে না। সাদা কাগজের পৃষ্ঠা ভরে ওঠে না।

এখন তিনি শূন্য পৃষ্ঠার দিকে তাকিয়ে নিজের দীর্ঘশ্বাসই শুনতে পান কেবল।

দিনলিপির পৃষ্ঠাগুলো গুছিয়ে যত্ন সহকারে এক জায়গায় রাখলেন। বই ছাপানোর জন্য কি উদ্যোগ নেয়া হতে পারে সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা শুরু করলেন। অথচ দ্রুত ছাপার কাজ শেষ করে ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে হবে। রানীর কাছে পেশ করতে হবে। নইলে পেনসনের আশা গুড়েবালি হয়েই থাকবে।

মন খারাপ হয়ে গেল দিল্লির অবস্থা ভেবে। এই শহর এখনো স্বাভাবিক নয়। এখানে ছাপার কাজ চিন্তা করাও যাবে না।

তুফতা সিকান্দারাবাদে থাকে। তার সাহায্য নেয়ার কথাই ভাবলেন তিনি। তুফতাই পারবে চমৎকার করে বইটি ছেপে বের করতে। বইটির ছাপার ওপর তাঁর ভবিষ্যতের অনেক কিছু নির্ভর করছে। বইটি পড়লে ইংরেজদের যে অবিশ্বাস তার ওপরে জন্মেছে সেটা দূর হবে। তিনি মনে মনে খানিকটুকু আশ্বস্ত হলেন। তুফতাকে চিঠি লিখতে বসলেন। লিখলেন : বন্ধু, তোমাকে যেভাবে এই চিঠি লিখছি, এই একই হাতের লেখায় আমার দিনলিপির পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছি। বুঝতে পারছ যে টানা হাতেরলেখা। খুব ঘন করে অর্থাৎ শব্দের সঙ্গে শব্দ লাগিয়ে লিখিনি। তবে ফাঁক ফাঁক করেও লিখিনি। এক পাতায় উনিশ থেকে বাইশটি লাইন লিখেছি। সব মিলিয়ে কুড়ি পাতা লেখা হয়েছে।

তুমি তো জানো এখন দিল্লি শহরের অবস্থা কি! তাছাড়া এখানে ভালো প্রেসও নেই। যেটি আছে তার কাজের মান ভালো নয়। আগ্রায় ছাপার কাজ করা গেলে ভালো হয়। যদি করা যায় তাহলে আমাকে চিঠিতে জানিও। তুমি তো জানো আমার টাকা নেই। খুব বেশি হলে পঁচিশ কপির খরচ দিতে পারবো। কিন্তু আমি তো জানি কোনো প্রেসই এত কম সংখ্যার বই ছাপবে না। হাজার কপি ছাপাতে না পারলেও, পাঁচশ কপি তো ছাপাতেই হবে। বিতরণের জন্য অনেক কপি লাগবে আমার। ...

চিঠিটি নিজের বানানো খামে ভরে কাল্লুকে ডাকলেন ডাকে পাঠানোর জন্য। মনে হচ্ছে পারলে কাল্লুর পিঠে ডানা লাগিয়ে পাঠিয়ে দিতেন ওকে। ও উড়তে উড়তে চলে যেতো তুফতার কাছে। এখন যে দেরি করার সময় নেই আর। সময়ের পিঠেই ডানা লেগেছে। ওটা উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছে। সেই ওড়ার সঙ্গে তাল মেলানো কঠিন।

কাল্লু চিঠি নিয়ে চলে গেলে মনে হলো অনেকদিন বন্ধু গুলাম নজফ খানকে চিঠি লেখা হয়নি। যে তাড়না থেকে দিনলিপি ছাপানোর তাগিদ বোধ করছেন সে সূত্র ধরেই চিঠিটা লিখতে শুরু করলেন : বন্ধু, পরিবারের দেখাশোনা করা

আমার কাছে এখন মৃত্যুর অধিক। পারিবারিক বন্ধন আমাকে এতটা জীবন পর্যন্ত কষ্টই দিয়েছে। তুমি তো জানো বন্ধু আমার একজন সন্তানও বেঁচে নেই। আমি সন্তানহীন অবস্থায় জীবন কাটিয়েছি। এজন্য আমি খোদাতালার কাছে শুকরিয়া আদায় করেছি। আমি তো নসীবকে মেনে নিয়েছিলাম। এখন মনে হয় সৃষ্টিকর্তার প্রতি আমি যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলাম সেজন্য তিনি খুশি হননি, গ্রহণও করেননি। যে লোহা দিয়ে তিনি আমার পায়ের বেড়ি তৈরি করেছিলেন, সেই একই লোহা দিয়ে হাতকড়াও তৈরি করে দিয়েছেন। এখন কান্নাকাটি করে আমার আর কি হবে! এই সবই আমার সারা জীবনের দাসত্ব—

আর লিখতে পারলেন না। ভাবলেন, একজনের মানুষের সঙ্গে এত বছর বাস করার পরও সংসার তাঁকে টানতে পারলো না। কেবলই তিক্ত হয়ে ওঠে মন। আসলে কি সংসার তাঁর কাছে বোঝা হয়ে গেছে? এত মানুষের ভরণ-পোষণের ভার আর বইতে পারছেন না? খুবই কষ্ট হচ্ছে—হয় তো তাই।

তিনি অন্দরমহলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। বেশ কয়েকদিন হলো যে তিনি অন্দরমহলে যাননি। বহির্মহলে তাঁর সময় কাটে। এটা তো দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে।

উমরাও বেগমের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলেন তিনি বাচ্চা দু'টোকে নিয়ে বেশ আনন্দে আছেন। লুকোচুরি খেলছেন। বাচ্চারা ঘরের বিভিন্ন জায়গায় লুকোচ্ছে আর তিনি ওদের খুঁজে বের করছেন। দৃশ্যটি তিনি উপভোগ করলেন। ভাবলেন, ভালোই তো আছে ওরা।

এক সময় কাশি দিলে তিনজনই তাঁর দিকে ঘুরে তাকালো।

নানাজান এসেছেন, নানাজান।

বাকির আর হুসেন দৌড়ে এসে তাঁর হাত ধরলো। উমরাও বেগমও এগিয়ে এসে বলেন, আসেন। বসেন।

গালিব ঘরে ঢুকে স্ত্রীর বিছানার উপরে বসেন। উমরাও বেগম মৃদু হেসে বলেন, কি মনে করে অন্দরমহলে ঢুকলেন?

কিছু তো মনে হয়নি বিবি। কেন এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে?

না, মানে, আমি তো আপনার পায়ের বেড়ি।

এখন আমি মন ভালো করার জন্য তোমার কাছে এসেছি বিবি।

মন ভালো নেই? উমরাও বেগম ভুরু কপালে তোলেন।

চারদিকের চাপে আমার দিল পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, আপনার ওপর চাপ বেশি। কি আর করবেন।

সবই খোদার ইচ্ছা। কাল্লুর মা কেমন আছে বিবি?

এখন ভালো।

মাদারির বউ?

সেও ভালো আছে। ঠিকমতো কাজ করছে। কোনো ঝামেলা করছে না।

হুসেনের দেখাশোনার জন্য যাকে রাখা হয়েছে সেই মহিলা?

হুসেন তুমি বলো তোমার খাদিমা কেমন আছে?

খাদিমা খুব ভালো আছে নানাজান।

তোমাকে ঠিকমতো দেখাশোনা করে তো?

হ্যাঁ, করে। অনেক আদর করে আমাকে। আমি খাদিমাকে ডেকে আনবো?

না, না এখন ডাকতে হবে না।

তাহলে আমি খাদিমার কাছে যাই।

দু'ভাই ছুটে বেরিয়ে যায়। বারান্দায় ওদের পায়ের শব্দ শোনা যায়।

ওরা আমাকে অনেক শান্তিতে রেখেছে। ওরা না থাকলে আমি অসুস্থ হয়ে যেতাম।

সবই আল্লার ইচ্ছা বিবি। মনে করো আমাদেরও শৈশব ছিল।

ছিল। খুবই চমৎকার দিন কাটিয়েছি আমি।

দিল্লিতে আমাদের কোনো আনন্দের স্মৃতি তোমার মনে আছে বিবি?

উমরাও বেগম এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলেন, আছে, আছে। একটা সুন্দর, স্মৃতি আমার মনে আছে।

গালিব কোলবালিশে পিঠ হেলান দিয়ে বলেন, বলো বিবি, বলো। একটা সুন্দর স্মৃতির মধ্যে বর্তমানের সময় ভুলে থাকতে চাই। আমার জীবনে এমন দোজখে থাকা আর কখনো হয়নি। তোমার সুন্দর স্মৃতির কথা বলো বিবি।

মনে আছে আমার আব্বা আমাদের দুজনকে সলোনো উৎসবে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা লালকেল্লায় গিয়েছিলাম। সেদিন আমরা দুজনে বাদশাহকে দেখেছিলাম।

সলোনো মেলা দেখে খুব মজা পেয়েছিলাম। সলোনো মেলা ছিল রাখী উৎসব। আমরা দুজনে দুজনকে রাখী বেঁধে দিয়েছিলাম।

আমি যখন তোমাকে রাখী বেঁধে দেই তখন তুমি খুব লজ্জা পেয়েছিলে। দোপাট্টা দিয়ে মুখে ঢেকে রেখেছিলে।

আপনি কোনো লজ্জা পাননি। আমি যখন আপনাকে রাখী বেঁধে দিই আপনি মিটিমিটি হাসছিলেন।

গালিব সোজা হয়ে উঠে বসে বলেন, আমি লজ্জা পাবো কেন? আমি না পুরুষ।

তখন আপনার রূপের খুব বাহার ছিল। লোকে আপনার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতো। আপনার খুব আনন্দ হতো, না?

হতোই তো। হবে না কেন? মানুষের দৃষ্টির সামনে রাজপুত্রের মতো ঘুরে বেড়াতে আমি খুব মজা পেতাম। ভাবতাম দিল্লি শহরের সব অবিবাহিত মেয়েরা আমার দিকে তাকিয়ে থাকুক।

কথা বলে নিজেই হাসলেন।

উমরাও বেগমের গায়ে হাসির শব্দ জ্বালা ধরায়। তিনি হাসি উপেক্ষা করে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকেন। খানিকটা বিরক্ত বোধ করেন। যদিও মনে মনে স্বীকার না করে পারেন না যে যৌবনে মানুষটি অসম্ভব সুদর্শন ছিলেন। নিজেও মুগ্ধ ছিলেন তাঁর প্রতি। কখনো দূর থেকে দেখতেন, কখনো বিছানায়। নানাভাবেই তো তাঁকে দেখেছেন তিনি। কিন্তু নানা কারণে সম্পর্কে চিড় ধরলো। মাতাল মানুষটিকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। বেহিসাবি খরচপত্রে সংসারে অভাব তৈরি করতেন। এটিও তিনি সইতে পারতেন না।

তাঁর ভাবনার রেশ কেটে গেলো গালিবের ডাকে। গালিব তাঁর হাত ধরে বললেন, বিবি, তুমি আমার প্রথম নারী, যার রূপে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু বিয়ের বন্ধনে তুমি আমার পায়ের বেড়ি হয়ে গেলে। নইলে আমি তোমাকে নিয়ে পঙ্খীরাজ নৌকা ভাসাতাম যমুনায়। তুমি দেখতে পেতে নদীর দু'ধারে মানুষ আমার দিকে ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছে। কারণ আমি ওদেরকে শুনিয়েছিলাম প্রেমের কবিতা।

প্রেম? হেসে ওঠেন উমরাও বেগম। প্রেম কি?

গালিব বিব্রত হয়ে চুপ করে থাকেন। ভাবলেন, যে নারীকে পায়ের বেড়ি বলেছিলেন তার কাছে প্রেম কি? সত্যি তো, উমরাও বেগমতো প্রেম নিয়ে প্রশ্নই করবে।

চুপ করে গেলেন যে? উমরাও বেগমের প্রশ্ন।

গালিব কিছু বললেন না।

উমরাও বেগম তাঁর মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, প্রেমের একটি শের শোনান আমাকে। কতদিন পর আমার বিছানায় এসে বসলেন।

তুমি খুশি হওনি বিবি?

খুশি? হ্যাঁ খুশি তো হয়েছি।

গালিব হেসে বললেন :

'প্রেমের কৃচ্ছসাধকদের খবর আর কী শুনবে,

তারা ক্রমশ আপাদমস্তক দুঃখের মূর্তি হয়ে গেলো ॥'

উমরাও বেগম বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন, এমন প্রেমের শের আমি শুনতে চাইনি।

গালিব বললেন :

'শতবার প্রেমের বন্ধন থেকে আমি মুক্ত হলাম,
কিন্তু কী করি, হৃদয়ই মুক্তির পরিপন্থী ॥'

হলো না। খুশি হতে পারলাম না।

তোমাকে আর কি দিয়ে খুশি করবো বিবি। আমার সাধ্যই বা কী। তাহলে আর একটি শের শোন :

'বুলবুলের কাণ্ডকারখানা দেখে ফুল হাসছে—
যাকে প্রেম বলে সে তো মস্তিষ্কের বিকার ॥'

শব্দ করে হেসে ওঠেন উমরাও বেগম। হাসতে হাসতে বলেন, থাক, আর বলতে হবে না।

তুমি খুশি হওনি বিবি?

উমরাও বেগম কি বললেন তা বুঝতে পারেন না। শেষে বলেন, আমরা সলোনো মেলার কথা বলছিলাম। সেটা একটা দারুণ খুশির দিন ছিল।

আমি তোমাকে সেই মেলার কথা বলি?

উমরাও বেগম পা গুটিয়ে বসেন। সুন্দর স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত ঘটনাটি তাঁকে কৈশোরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। তিনি স্মৃতি ধরে রাখতে চান। সংসারের টানাপোড়েনে কিছু কিছু জিনিস হারিয়ে ফেলা ঠিক নয়। যেমন এই বয়সে তার স্বামী প্রেমের আনন্দ হারিয়েছেন। যে আনন্দ নিয়ে তিনি যমুনা নদীতে পঙ্খীরাজে চড়ে প্রেমের গজল গাইতে চেয়েছিলেন সেই প্রেম এখন তাঁর হৃদয়ে নেই। উমরাও বেগম এজন্য দুঃখ পান না। বরং সুখ অনুভব করেন। ভাবেন, আজ রাতটি তিনি ভালোভাবে ঘুমিয়ে কাটাতে পারবেন।

সেই রাখী বন্ধনের ঘটনাটা শুনবে না?

শুনবো তো। আপনি বলুন।

আমাদের বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরের দাদা ছিলেন শাহ আলম। তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন তার উজির গাজিউদ্দিন খান। একদিন উজির তাকে হত্যা করে রাস্তার ধারে ফেলে রাখে। সেদিন ভোরবেলা যমুনা নদী থেকে স্নান করে ফিরে আসার সময় ব্রাহ্মণকন্যা সলোনো বাদশাহর মৃতদেহ দেখতে পান।

তিনি চিনতে পারেন যে সেটি বাদশার লাশ। সলোনো একা একা লাশ পাহারা দেন। কোনো ওয়ারিশ সেখানে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি লাশ ছেড়ে

সেখান থেকে সরে যাননি। পরবর্তী সময়ে সিংহাসনে বসেন দ্বিতীয় আকবর শাহ। তিনি সলোনোকে বোনের মর্যাদা দেন। সলোনোও বাদশাকে ভাই মনে করতেন। হিন্দু রীতি অনুযায়ী তিনি বাদশাকে রাখী বন্ধনে বরণ করেন।

বাহ্ সুন্দর। উমরাও বেগম উৎসাহিত হন।

পরের ঘটনা আরো সুন্দর। প্রতি বছর রাখী মিলনের দিনে সলোনো মিষ্টির থালা নিয়ে আসতেন বাদশাহর কাছে। নিজের হাতে বাদশাহকে মিষ্টি খাইয়ে দিতেন। হাতে লাল সুতো বেঁধে দিতেন। আর বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর শাহ মুক্তোর মালার রাখী বেঁধে দিতেন সলোনোর হাতে। তারপর স্বর্ণমুদ্রা আর রুপি উপহার দিতেন তাকে।

উমরাও বেগম উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, বাহ্ কি সুন্দর!

তারপর কি হলো জানো? আমাদের বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরও এই একইভাবে সলোনোকে বরণ করতেন। তাঁকে আনার জন্য সুসজ্জিত পালকি পাঠাতেন। তিনি ওই পালকিতে করে কেল্লার ভেতরে যেতেন। তারপর তিনি সলোনোর মেলা উদযাপন শুরু করেন। এর মাধ্যমে সলোনোর সন্তান-সন্ততির সঙ্গে বাদশাহর সুসম্পর্ক বজায় থাকে।

তাছাড়া রাখী মেলা সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে।

মানুষে মানুষে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠার জন্য এটা একটি ভারি সুন্দর দিন ছিল।

এখন তো বাদশাহ নেই। রাখী মেলা কি আর হবে?

গালিব চুপ করে থেকে বলেন, কি জানি হবে কিনা। হলে বেশ ভালোই হয়।

আপনি কি এমন সুন্দর দিনের কথা মনে করে খুশি হয়েছেন?

হ্যাঁ, আমি খুব খুশি হয়েছি বিবি। তোমাকে হাজার শুকরিয়া।

তিনি উমরাও বেগমকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। উমরাও বেগম বুঝলেন তাঁর স্বামী আজ তাঁর বিছানায় রাত কাটাবেন। শোকর আল হামদুল্লিহ।

কয়েকদিন পর আগ্রা থেকে এলেন মুনশী শিবনারায়ণ আরাম। তুফতা তাকে পাঠিয়েছে। আগ্রায় ছাপাখানা আছে আরামের। নতুন কাজে তার খুব উৎসাহ। গালিবের একটি বই ছাপতে পারবে জেনে তার খুশির সীমা নেই।

গালিবের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে আছে আরাম। গালিব খুশি হয়ে বললেন, আমার বই ছাপানোর জন্য তুফতা তোমাকে আসতে বলেছে? বাহ খুবই খুশির

খবর। আর তুমিতো সুদর্শন যুবক। বয়সও বেশি নয়। কি কর তুমি?

আমার ছাপাখানা থেকে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করি।

বাহ্ বেশ তো।

আমি আপনার জন্য এক প্যাকেট খাম উপহার এনেছি।

খাম এনেছো? আমার চিঠি পাঠানোর খাম আমি নিজেই বানাতে ভালোবাসি। আমি বানাইও।

এখন থেকে আপনি এই খাম ব্যবহার করবেন।

ঠিক আছে দাও। শুকরিয়া।

তাহলে আমার প্রেসেই আপনার দিনলিপি ছাপা হবে।

তুমি কাল আসো। আমি সবকিছু ভেবে ঠিকঠাক করবো।

আরাম চলে যায়।

গালিব 'দস্তাম্বু'র পৃষ্ঠা গোছাতে বসেন। পৃষ্ঠা সংখ্যা ঠিক করেন। প্রতি পাতায় গাঢ় গালি দিয়ে সংখ্যা লেখেন। আরাম যেন ভুল না করে।

গতকাল ইন্দোরের উম্মীদ সিং বাহাদুরের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছেন। তিনি তাঁর পঞ্চাশ কপি বইয়ের দাম দিতে রাজি হয়েছেন। তিনি তাঁকে বলেছেন, তুফতার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। মন খুশি হয়ে যায়। বেশ সুখবর পাচ্ছেন। 'দস্তাম্বু' ছাপা হলে ইংরেজদের হাতে তুলে দেবেন। যতোদূর সম্ভব ততো তাড়াতাড়ি। তাহলেই তাঁর ওপর থেকে সন্দেহ কাটবে। পেনসন পাবেন। মনের খুশিতে পাণ্ডুলিপির কাজ শেষ করলেন।

পরদিন আরাম এলো।

গালিব হেসে বললেন, তোমার হাতে তুলে দেয়ার জন্য আমার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত।

শুকরিয়া মির্জা নওশা সাহেব।

আরামের সপ্রতিভ ভঙ্গিতে গালিব খানিকটুকু চমকিত হন। বেশ চটপটে ছেলে তো। সময়মতো বইটি শেষ করে দিতে পারবে।

আগ্রায় তোমার বাড়ি কোথায়? তোমার আব্বার নাম কি?

আরাম মুখে হাসি ছড়িয়ে বলে, আমার দাদু আপনার ছেলেবেলার বন্ধু। দাদুর কাছে আপনার অনেক গল্প শুনেছি।

বন্ধু! আমার একজন প্রিয় বন্ধু আছে। নাম কি তোমার দাদুর?

বংশীধর।

বংশী! বংশী তোমার দাদু। আহ্ কি শান্তি। তাহলে তুমিও আমার নাতি।

শুকরিয়া মির্জা নওশা সাহেব।

গালিব থমকে গিয়ে বলেন, মির্জা নওশা আমার ডাক নাম।

আমি দাদুর কাছে এই নামই বেশি শুনেছি।

তা শুনতে পারো। কিন্তু আমার বইয়ের নাম হবে আসাদুল্লা খান গালিব। ঠিক আছে?

হ্যাঁ, ঠিক আছে।

তুমি কাজ শুরু করো। দরকার হলে আমি নির্দেশ দেবো। তুফতা আর মৌলানা মিহরকেও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবো। মনে রেখো একটি আরবি শব্দ থাকলেও সেটি বদল করতে হবে। ফারসি শব্দ ঢোকাতে হবে।

আচ্ছা। আপনার নির্দেশ মতো কাজ হবে।

বইটির ব্যাপারে আমি খুব উদগ্রীব। বইটির উপরে আমার ভবিষ্যতের অনেক কিছু নির্ভর করছে। এই বইয়ের প্রতিটি শব্দের সঙ্গে আমার রক্তবিন্দু মিশে আছে আরাম। তুমি বুঝবে না এ বইটি ছাপার ব্যাপারে আমি কতোটা উদ্বিগ্ন।

আমি আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো। কোনো ভুল হবে না। আপনি আমাকে ভরসা করতে পারেন।

খুব খুশি হলাম তোমার কথা শুনে।

আমি তাহলে আজকে যাই মির্জা নওশা সাহেব।

ও বেরিয়ে যাবার পরে গালিব খানিকটা আতঙ্কিত হলেন। ছেলেটি বইয়ে আবার মির্জা নওশা নাম ছাপিয়ে না দেয়? তুফতাকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দেয়ার জন্য চিঠি লিখতে বসলেন। মৌলানা মিহরকেও লিখবেন ভাবলেন।

পরদিন বিকেলে আলতফ এলেন দেখা করতে।

কেমন আছেন ওস্তাদজী?

এমন একটি প্রশ্ন না করলেই আমি খুশি হই হালি।

আপনি কি জানেন রামপুরের নওয়াব ইউসুফ খান চেষ্টা করছেন ইংরেজদের সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তালিকা থেকে আপনার নামটি বাদ দিতে?

হ্যাঁ, আমি তা শুনেছি। আমিতো ভাতার জন্য তার কাছে আবেদন করেছিলাম।

শোনা যাচ্ছে ইংরেজরা আপনার পেনসন ছেড়ে দেবে। ওটা আর আটকে রাখা হবে না।

গালিব ভুরু কুঁচকে আলতফের দিকে তাকান। কথা বলেন না। এটা তাঁর জন্য একটি বড় খুশির খবর হতে পারতো, কিন্তু কোথায় যেন কাঁটা আছে।

কাঁটা ফুটে রক্ত ঝরছে হৃৎপিণ্ড থেকে। গালিব দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলেন, প্রভুরা যদি সহৃদয় হন তাহলে তো আমি ধন্য হবো। আমার পরিবার বেঁচে যাবে।

আপনি কার ওপর রাগ করছেন?

নিজের ভাগ্যের ওপর।

ভাগ্য! আলতফ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকান।

ভাগ্যই তো। আমি এখন স্বাধীন হতে চাই হালি। আমি স্বাধীনতার খোঁজ করছি।

স্বাধীনতা? আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

ভাবছি আমি একা হয়ে গেলে আমি বোধহয় অনেক স্বাধীন হয়ে যেতে পারতাম।

একা হয়ে যাবেন?

লোহারুর নওয়াব আমিনউদ্দিনের ছেলে আলাউদ্দিন খানকে তো তুমি চেনো?

হ্যাঁ চিনি। আপনার স্ত্রীর ভাইয়ের ছেলে।

তাকে আমি একটা চিঠি লিখেছি।

আলতফ হাসতে হাসতে বলেন, চিঠি লেখা আপনার নেশা। অনবরত চিঠি লেখেন।

চিঠিই তো যোগাযোগ। চিঠি ছাড়া তো যোগাযোগের উপায় নেই।

তা ঠিক। তবে সবাই চিঠি লিখতে পারে না। এই আমিই তো আপনার মতো এতো চিঠি লিখতে পারি না।

হালি তুমি কি আমার সমালোচনা করছো?

না ওস্তাদজী, আমি আপনার ধৈর্যের প্রশংসা করছি। আপনি আলাইকে কি লিখেছেন চিঠিতে?

লিখেছি আলাই যেন তাঁর ফুপু ও নাতি দু'জনকে তাঁদের কাছে নিয়ে যায়।

মানে? আলতফ সোজা হয়ে বসে।

মানে তো সোজা। বলেছি, ওরা যেন ওদের জ্ঞাতিগুষ্টিকে নিজেদের কাছে নিয়ে যায়। তাহলে আমি ওদের হাত থেকে মুক্তি পাই।

মুক্তি? আলতফ ঢোক গেলে।

ওহ্, হালি তুমি কি শব্দ বুঝতে পারো না? আমাকে বারবার প্রশ্ন করছো কেন?

ঠিকই বলেছেন, আমি অনেক কিছু বুঝতে পারছি না। আমার অনেক শব্দ অচেনা মনে হচ্ছে।

তাইতো আমিও ভাবছি। তোমাকে কেমন বোকার মতো লাগছে।

আচ্ছা আমি আর প্রশ্ন করবো না। আপনি চিঠির কথা বলুন।

আমি আলাইর দাদী, আব্বা এবং চাচাকে জানিয়ে দিয়েছি যে তাদের কাছ থেকে আমি কি চাই। অবশ্য আমার বিবি ও নাতিরা যদি লোহারু যেতে রাজী থাকে তাহলেই তারা কাজটি করতে পারে। ওদের আত্মীয়কে ওরা নিজেদের কাছে নিয়ে যাবে। এই আর কি!

আপনি কি করবেন?

আমি কারো দায় না টেনে স্বাধীন হবো। পেনসন যদি আবার পাওয়া যায় তাহলে তা শুধু নিজের জন্য খরচ করবো। আরও কাউকে ভাগ বসাতে দিতে চাই না।

তারপর কি করবেন?

অন্য কোথাও চলে যাবো। যেখানে ভালো লাগবে সেখানে গিয়ে থাকবো। সেখানে থাকতে ভালো না লাগলে অন্য কোথাও চলে যাবো। এভাবে বাকি দিন কয়েকটা শেষ করে দিতে চাই।

আলতফ মৃদু হেসে বলে, আপনার পেনসন চালু হলেও আপনি কোথাও গিয়ে থাকতে পারবেন না।

পারবো। পারতেই হবে আমাকে। এই শহর আমার আর ভালো লাগছে না। শহরটা আর শহর নেই।

শহরটা গোল্লায় গেলেও আপনি দিল্লিতেই থাকবেন। এই শহর ছেড়ে চলে যাওয়া আপনার হবে না। আপনি পারবেন না।

পারবো না?

এই পঞ্চাশ বছরে যখন পারেননি তখন আর পারবেন কবে?

হয়তো তুমি ঠিকই বলেছো হালি।

আপনার পরিবারকেও আপনি কারো ঘাড়ে তুলে দিতে পারবেন না ওস্তাদজী। এতো কষ্টের মধ্যেও আপনি গম্মনকে বাড়িতে জায়গা দিয়েছেন।

বড় কষ্ট হচ্ছে হালি। গালিব বিষণ্ন ম্রিয়মাণ কণ্ঠে বলেন।

সেই কণ্ঠস্বর আলতফের বুক ভারী করে দেয়। জোর দিয়ে বলেন, নওয়াব ইউসুফ খান আপনার পেনসনের ব্যাপারে একটা কিছু করেই ছাড়বেন।

আল্লাহ মালুম।

তারপর তিনি উঠে গিয়ে টেবিল থেকে এক টুকরো কাগজ টেনে এনে বলেন, দিল্লির কথা কি লিখেছি একটু পড়ব?

হ্যাঁ, আমি শুনব। আপনি পড়ুন।

AMARBOI.COM

গালিব কাগজটা চোখের কাছে উঠিয়ে উঁচু করে ধরে পড়তে শুরু করেন—একসময় দিল্লি বলতে বোঝাতো লালকেল্লা, চাঁদনি চক, জামা মসজিদ, জামা মসজিদের কাছে মাছের বাজার, যমুনা নদীর সেতুর উপর ঘুরে বেড়ান, ফুল ব্যাপারিদের বছরে একবার ফুলের মেলা। এখন এর কোনো কিছু অবশিষ্ট নেই। এসব ছাড়া কি আমি দিল্লির কথা ভাবতে পারি? কোথায় সেই দিল্লি এখন? আমি যা বর্ণনা করেছি একসময় দিল্লি বলতে তাই বোঝাতো।

গালিব থামলে আলতফ বললেন, সঠিক বর্ণনা। যারা দিল্লিকে ভালোবাসে তাদের সবারই এখন চোখে পানি। প্রিয় শহরের মরণদশা কেইবা সহ্য করতে পারে!

এছাড়াও অনেক কষ্ট আছে।

গালিব রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, বড় অসহায় হয়ে যাই, বড় ক্ষুদ্র হয়ে যাই যখন দেখি অভিজাত মুসলমান ঘরের নারী ও মেয়েরা বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করছে। ওদের অবস্থা দেখলে হৃদয় পাষাণ হয়ে যায়। এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখার চেয়ে মৃত্যুই ভালো ছিল হালি।

তিনি দু'হাতে চোখের জল মোছেন। মাথা নিচু হয়ে যায় আলতফেরও।

উঠে গিয়ে আর একটি কাগজ এনে বলেন, এটা পড়বো এখন।

আলতফ কিছু না বলে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকেন। গালিব চোখের পানি মুছে আবারও পড়েন—দিন তো আমার প্রায় শেষ হয়েই এলো। কতোদিনই বা আর বাকি? এরপর সৃষ্টিকর্তার কাছে চলে যাবো। সেখানে ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-গ্রীষ্ম কোনো কিছুই বুঝতে হবে না। সেখানে কোনো শাসককে ভয় পেতে হবে না। সেখানে রুটি সেঁকার জন্য চুলা জ্বালাতে হবে না—বলা যায় সে এক আলোর দুনিয়া—খাঁটি আনন্দের জায়গা। ওই জায়গার সঙ্গে অন্য কোথাওর তুলনা চলে না। ওই আনন্দ জীবনের সবচেয়ে শুদ্ধতম আনন্দ।

বাহ্ চমৎকার লিখেছেন। আলতফ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে। আমার মনে হচ্ছে আপনি একটি চমৎকার গজল লিখেছেন। মনে হয় এখনই দু'চোখ বুজে যাক। চলে যেতে চাই আপনার ধারণার শুদ্ধতম আনন্দের স্থানে।

বড় শান্তি দিলে। তুমি আমার সাগরেদ, তোমার মুখে এই কয়টি বাক্য শুনে আমি ধন্য হয়ে গেলাম।

ওস্তাদজী অনেক সময় আপনাকে আমরা তাড়াতাড়ি বুঝতে পারি না। বুঝতে সময় লাগে।

গালিব হাসতে হাসতে বলেন, কখনো আবার বোঝার জন্য নিজেরা যুক্তি খুঁজে নাও। তাই না? ঠিক বলেছি?

একদম ঠিক বলেছেন। আমরা আপনাকে ভালোবাসি ওস্তাদজী। আপনি আমাদের প্রিয় মানুষ।

আমার শত্রুও অনেক।

শত্রুজনকে মাফ করতে হবে।

গালিব মাথা নেড়ে চুপ করে থেকে বলেন, আমি তো ফেরেশতা নই।

আপনি কবি। আপনার কবিতা আছে। আপনাকে আশ্রয় দেয় কবিতা। কবিতা আপনাকে তার বুকে ধারণ করে। মুছে দেয় আপনার যন্ত্রণা।

হ্যাঁ, তা করে। কবিতার জন্যই আমার বেঁচে থাকা। দিল্লি শহরে চিৎকার করে অনবরত বলতে চাই, আমি কবি। দেখো আমাকে।

গালিব দু'হাতে মুখ ঢাকেন। আলতফ বিদায় নেয়ার জন্য অপেক্ষা করেন। তিনি বুঝতে পারেন কবি দু'হাতের তালু নিজের চোখের জলে ভিজিয়ে দিচ্ছেন। ভিজুক হাতের তালু। ভিজুক শুকনো দিন। কাঙ্ক্ষিত বর্ষণে ভরে উঠুক কবির শস্যক্ষেত্র।

'দস্তাম্বু' ছাপার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।

তুফতা ও মৌলানা মিহরকে অনবরত নির্দেশ দিয়েছেন। সবকিছুই ঠিকঠাক মতো হচ্ছে। তার আগের প্রকাশিত বইগুলোর চেয়ে এই বইয়ের ব্যাপারে তিনি অনেক বেশি সংবেদনশীল। অনেক বেশি মনোযোগী। প্রবল অস্থিরতায় তার দিন কাটছে।

এর মধ্যে তুফতার চিঠি পেলেন।

তুফতা লিখেছে, 'দস্তাম্বু' ছাপানোর কাজ করতে করতে তার আর আরামের মনে হয়েছে তাঁর একটি উর্দু চিঠির সংকলন প্রকাশ করা যেতে পারে।

গালিব চিঠিটি কয়েকবার পড়লেন। শেষে ঠিক করলেন এই চিঠির সংকলন ছাপা ঠিক হবে না। তুফতাকে লিখলেন : অনেক ভেবে দেখেছি তোমার প্রস্তাবটিতে সায় দেয়া ঠিক হবে না। চিঠিগুলো খুব যে যত্ন করে লিখেছি তা নয়। বেশির ভাগ চিঠিই অযত্নে অবহেলায় লেখা। চিঠিগুলোতে যত্নের ছাপ নেই। চিঠিগুলো সেভাবে লেখা নয় যার দ্বারা একজন কবিকে বুঝতে পারবে কেউ। আমার মনে হয় চিঠিগুলো ছাপা হলে আমার সুনাম ক্ষুণ্ন হবে। তবে ফারসি ভাষায় লেখা আমার চিঠিগুলো অন্যরকম। এই চিঠিগুলো নিয়ে আমি গর্ব করতে পারি। লাইব্রেরি লুট হওয়ার ফলে আমার কোনো বইয়ের পাণ্ডুলিপি আর নেই। আমি সবাইকে বলেছি কোথাও আমার বই পেলে কিনে রাখতে। এভাবে আমার হারানো বই সংগ্রহ করতে হবে। ফারসি

দীওয়ান, উর্দু দীওয়ান, পনজ আহঙ্গ, মিহর-ই-নিমরোজ বইয়ের পাণ্ডুলিপি আমার খুব দরকার। এগুলো না পেলে আমি বুঝি পাগলই হয়ে যাবো বন্ধু।

এই চিঠিটি ডাকে পাঠানোর দু'দিন পরে আগ্রা থেকে আরামের চিঠি পান। ও লিখেছে, 'পনজ আহঙ্গ'-এর একটি কপি পেয়েছে।

চিঠিটি পড়ে তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। চিঠির গায়ে চুমু দিলেন। একজন কবির জীবনে এর চেয়ে বড় স্বস্তি আর কি হতে পারে! এর আগে 'পনজ আহঙ্গ' দুবার ছাপা হয়েছিল। ছাপা দেখে তিনি খুশি ছিলেন না।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে আরামকে চিঠি লিখলেন : খোদার অশেষ মেহেরবাণী যে তুমি আমার বইটি পেয়েছো। আমার বিশ্বাস তোমার হাতে বইটি এবার সুন্দরভাবে ছাপা হবে। তুমি লিখেছ, মিহর-ই-নিমরোজ ছাপতে চাও। এ বইটি এখনই ছাপার দরকার নেই। আমার এখন একটি সংকট মুহূর্ত চলছে। আমার পেনসনের জন্য এখন দরকার ব্রিটিশদের সহযোগিতা। এই সময়ে মুঘল বাদশাহর জীবন কাহিনী ছাপলে ক্ষতি হবে। বুঝতেই পারো যে হিতে বিপরীত হবে।

চিঠি খামে ভরতে ভরতে নিজেকেই শোনালেন নিজের শের :

'দর্দ মিন্নত কশ্-এ-দবান হুয়া
য্যায় ন অচ্ছা হুয়া বুরা ন হুয়া।
যন্ত্রণায় ওষুধে কিছু হলো না,
আমি ভালো হলাম না, খারাপও হলাম না।'

কাল্লু মিয়া ঘরে ঢুকে বললো, হুজুর রামপুরার নওয়াবের কাছ থেকে আপনার কাছে লোক এসেছে।

গালিব ভুরু কুঁচকালেন, নওয়াব ইউসুফ আলী খান? তবে কি ভাতার ব্যাপারে কোন খবর? ...

কাল্লু মিয়া ওকে এখানে নিয়ে এসো।

তিনি একরকম হাঁক দিয়েই বললেন, যেন বড় কিছু ঘোষণা করার মতো খবর ঘটতে যাচ্ছে একটু পরে।

রামপুরের নওয়াবের পাঠানো লোক ঘরে ঢোকে। হাতে গালা দিয়ে লাগানো লেফাফা। চিঠিটি গালিবের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, নওয়াব বাহাদুরের অফিস থেকে এই চিঠি আপনাকে পাঠিয়েছে হুজুর।

শুকরিয়া। দিন।

লোকটি চিঠি দিয়ে চলে যায়। কাল্লু মিয়ার কাছ থেকে চিঠির খবর শুনে দরজার বাইরে জড়ো হয়েছে বাড়ির কাজের লোকেরা। প্রত্যেকে খবরটা

শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব।

গালিব চিঠি খুলে পড়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

দরজার আড়াল থেকে ঘরে ঢোকে গৃহকর্মীরা।

হুজুর কোনো খবর আছে? ভালো-খবর?

হুজুর আমাদের বেঁচে যাওয়ার খবর আছে?

হুজুর—হুজুর—হুজুর—

গালিব চমকে সবার দিকে তাকান। একটি দুটি নয়, মনে হয় তাঁর কানে শত শত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হচ্ছে। তিনি ওদের দিকে তাকিয়ে দ্রুতকণ্ঠে বলেন, হ্যাঁ, আছে, আছে।

কি খবর হুজুর?

প্রত্যেকে ঘরে ঢুকে ঘিরে ধরে তাঁকে।

রামপুরের নওয়াব আমাকে প্রতি মাসে একশ টাকা করে ভাতা দেবেন।

শোকর আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছে। যাই সবাইকে খবর দিই।

হুড়মুড়িয়ে চলে যায় লোকেরা।

একটু পরে দুই নাতিসহ আসেন উমরাও বেগম। হাসিমুখে বলেন, আপনার ভাতা পাওয়ার সুখবরে বাড়ির লোকের দুশ্চিন্তা কেটে গেছে। ওরা আনন্দে মেতেছে।

আমিও ওদের হাসি-আনন্দ শুনতে পাচ্ছি বিবি।

নানাজান আমরাও খুব খুশি হয়েছি। আমাদেরকে মিঠাই কিনে দিতে হবে।

নানাজান আমাকে খেলনা কিনে দিতে হবে।

সব হবে, তোমরা শান্ত হও।

দুই ভাই আশ্বস্ত হয়ে দৌড়ে বাইরে চলে যায়।

গালিব মৃদু হেসে বলেন, তোমার কিছু চাওয়ার নাই বিবি?

আছে। আমি আমার আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যাবো। কুতুব সাহিবে লোহারু পরিবারের অনেকে থাকে। এতোদিন অভাবের যন্ত্রণায় তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। পারবো তো যেতে?

হ্যাঁ, পারবে। পারবে না কেন? তবে তোমার কি ভালো লাগবে দেখে যে কুতুব সাহিবের কত বাড়িঘর ভেঙে ফেলা হচ্ছে। নতুন করে গড়া হচ্ছে দিল্লি।

এটাই আমার দুঃখ।

দুঃখ আর কি বিবি। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি খুশিই হচ্ছি যে দিল্লি

AMARBOI.COM

শহরকে ভেঙে চুরমার করা হচ্ছে।

খুশি? খুশি হচ্ছেন? উমরাও বেগমের কণ্ঠে আতঙ্ক।

গালিব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, এখানকার কতো মানুষ কতো দিকে চলে গেলো। শহরের অধিবাসীরাই যখন চলে গেছে, তখন শহর থেকে লাভ কি? ইট-পাথর দিয়ে তো শহর হয় না। মানুষ নিয়ে শহর। ভেবে দেখো বিবি কতদিন মুশায়ারায় বসি না। বসবো কার সঙ্গে? এখন তো কবিতার সমঝদার নেই। আছে শহরের কারিগররা। আছে ব্রিটিশ আর পাঞ্জাবিরা। আছে হিন্দুরা। মুশায়ারায় বসার জন্য কেউ নেই।

থাক, দুঃখ করবেন না। খুশি হন যে মাসিক ভাতা পেয়েছেন। খুশি হন যে আর অল্পদিনে আপনার বই ছাপা শেষ হয়ে যাবে।

শুকরিয়া বিবি। তোমার কথা শুনে খুশি হয়েছি।

সেদিন সন্ধ্যায় এক বোতল মদ নিয়ে মহেশ দাস আসে। গালিব ওকে দেখে বলেন, বাহ, বাহ আজ আমার চারদিকে খুশির পেয়ালা। পেয়ালাভরা খুশি আমি পান করে চলেছি।

আপনার ভৃত্যকে পেয়ালা আনতে বলুন।

কাল্লু মিয়াকে ডাকতে হয় না। মহেশ দাসের হাতে বোতল দেখে পেয়ালা ও গোলাপ জল নিয়ে হাজির হয় ও। গালিব খুশি হয়ে বলেন, আমার পোড়া বুকটাকে ও দেখতে পায় মহেশ।

হ্যাঁ, তাই তো দেখতে পাচ্ছি। ও আপনার যোগ্য সাগরেদ।

কাল্লু মিয়া মদ আর গোলাপ জল মিশিয়ে পেয়ালা গালিবের হাতে তুলে দেয়। তিনি তৃষ্ণার্ত চাতকের মতো পেয়ালায় চুমুক দেন। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকান মহেশ দাসের দিকে।

আপনি শুনেছেন তো আমার নতুন বই ছাপার কাজ হচ্ছে।

হ্যাঁ, শুনেছি। আপনার শরীর ভালো আছে তো?

না, শরীর তো এখন আর ভালো থাকে না। সেই যে দিল্লি সোরে ভুগলাম। তারপর থেকে শরীর আর ভালো হলো না। কি ভুগাটা যে ভুগেছিলাম। তখন তো আপনি আমাকে দেখেননি।

মহেশ লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন, হ্যাঁ, তখন আপনার কাছে আসতে পারিনি। শহরের যা অবস্থা ছিল!

এখনই কি শহর ঠিক হয়েছে? আমি বেঁচে থাকতে এই শহর আর ঠিক হবে না। শহরের ভালো দিন আমার দেখা হবে না।

আপনি হয়তো জানেন না যে দিল্লিতে একটি নতুন প্রথা চালু হয়েছে।

নতুন প্রথা? সেটা কি?

টাউন ডিউটি মানে শহর কর চালু করা হয়েছে।

টাউন ডিউটি! গালিব কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করে বললেন, কাল্লু আমাকে পাউন টুটি না কি যেন বলছিল।

মহেশ দাস হেসে বললেন, লোকের মুখে মুখে টাউন ডিউটি পাউন টুটি হয়ে গেছে।

শব্দ যাই হোক বিষয়টি কি?

ইংরেজরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা করেছে। যে কোনো মালামাল শহরে আনতে হলে শুল্ক দিতে হবে। অবশ্য এর মধ্যে খাদ্যশস্য আর গোবর বাদ।

গালিব পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন, ও আচ্ছা। শুল্ক আদায়ের দায়িত্ব দিয়েছে কাদের?

আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

গালিব চোখ বড় করে তাকালে মহেশ দাস সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আমার সঙ্গে আছে সালিগ রাম ও চুন্নালাল। পাঞ্জাব থেকে বড় বড় অফিসার এসে এ নিয়ে মিটিং করেছে।

গালিব এবারও কথা বললেন না। আবারও পেয়ালায় চুমুক দিলেন। তারপর বললেন, শহরে ঢোকার ব্যাপারে তো খুবই কড়াকড়ি করা হয়েছে। সৈনিকরা তো শহর পাহারা দিচ্ছে, তারপরেও পুলিশ অফিসার মোতায়েন করা হয়েছে। তাই না?

হ্যাঁ, ঠিকই। পুলিশ অফিসার লাহোর গেটে চেয়ার নিয়ে বসে থাকে। যদি কোনো লোক সৈনিকের চোখ ফাঁকি দিয়ে শহরে ঢোকার চেষ্টা করে, তাকে ধরে দফতরে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

গালিব মহেশ দাসের কথা টেনে নিয়ে বলেন, শুনেছি যাদেরকে ধরা হয় তাদেরকে দু'টাকা জরিমানা করা হয়। তা নাহলে তাদেরকে কমিশনারের আদেশে পাঁচ ঘা বেত মারা হয়।

মহেশ দাস মাথা নাড়েন।

গালিব পেয়ালা রেখে বলেন, তারপরও তাদেরকে আট দিন জেলে রাখা হয়। আরও কঠিন কথা হলো যে পারমিট ছাড়া যারা শহরে বাস করছে তাদের খুঁজে বের করার জন্য সব থানায় আদেশ দেয়া হয়েছে।

মহেশ দাস বিব্রত কণ্ঠে বলে, আপনি সব জানেন দেখছি।

AMARBOI.COM

জানবো না, আমাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পুলিশ ইন্সপেক্টর এসেছিল।

আপনি কি বলেছেন?

আমি কি বলেছি তা আমার কাছে লেখা আছে। বয়স হয়েছে। পরে ভুলে যেতে পারি এই ভয়ে লিখে রেখেছি। পড়ে শোনাই?

হ্যাঁ, আমি শুনবো। মহেশ দাস আগ্রহ নিয়ে বলে।

গালিব টেবিলের ওপর থেকে কাগজটা টেনে বের করে পড়েন—আমি পুলিশ ইন্সপেক্টরকে বলেছি, আপনার তালিকায় আমার নাম লিখবেন না। আলাদা একটি কাগজে লিখুন। এভাবে লিখুন যে, পেনসনার আসাদুল্লা খান ১৮৫০ সাল থেকে পাতিয়ালার মহারাজার ভাইয়ের বাড়িতে বসবাস করছেন। সিপাহীদের বিদ্রোহের পরে তিনি এই বাড়ি থেকে বের হননি। ইংরেজরা শহর দখল করার পরও তিনি বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যাননি। অবশ্য এটাও ঠিক তাকে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করা হয়নি। কর্নেল ব্রাউন সাহেব তাকে এই বাড়িতে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। সেই আদেশ এখন পর্যন্ত কেউ বাতিল করেননি। এখন কর্তৃপক্ষ যা ঠিক করেন তাই পালন করা হবে।

পড়া শেষ করে গালিব কাগজটা ভাঁজ করে আবার টেবিলে রাখেন। বলেন, আমি যা বলেছি ইন্সপেক্টর তা লিখে নিয়েছেন।

এরপর তো আর কিছু হয়নি?

না। তবে পরস্পরের কাছ থেকে শুনেছি মহল্লার লোকদের তালিকার সঙ্গে আমার আবেদন পুলিশের বড় কর্তার কাছে পেশ করা হয়েছে।

আমার মনে হয় আর কিছু ঘটবে না।

না ঘটলেই ভালো। বুড়ো বয়সে নতুন ঝামেলা আর সহ্য হয় না।

একজন কবির মুখে এসব শুনলে আমাদের কষ্ট হয়। কবি তো আমাদের প্রাণের কথা লেখেন।

গালিব মৃদু হেসে পেয়ালাটা উঁচু করে ধরে বলেন, হোক দেশীয় মদ, তারপরও এটুকুতেও কবির বেঁচে থাকা সহজ হয়। কবি প্রাণ ফিরে পায়।

একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন, শহরের আর কোনো খবর আছে?

আপনি হয়তো শুনেছেন যে সাধারণ মানুষের জন্য দিল্লির গেট খুলে দেয়া হয়েছে।

না, শুনিনি তো। কাদেরকে আসতে দেয়া হচ্ছে?

যাদের শহরে বাড়ি আছে তাদেরকে ঢোকার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে শহরের অনেক দিনের পুরনো বাসিন্দা, কিন্তু নিজের বাড়ি নেই, ভাড়া বাড়িতে বাস করে এমন লোকদেরও শহরে আসার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

হাকিম আহসানউল্লাহ খানের কোনো খবর আছে? তিনি কি আসতে পেরেছেন?

হ্যাঁ, তিনি আসতে পেরেছেন।

আমি তো জানি সিপাহীরা তার বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি কোথায় আছেন?

তার সবচেয়ে ভালো বাড়িটি ভেঙে ফেলেছে সিপাহিরা। তার তো আরও কয়েকটি বাড়ি আছে। তিনি তার একটিতে বাস করছেন।

সবই নসীব। গালিব আবার পেয়ালা হাতে তুলে নেন। বুঝতে পারেন নেশা জমে উঠেছে। তারপরও খুব বিষণ্ন কণ্ঠে বলেন, আহসানউল্লাহ কেমন আছেন? তবীয়ত ঠিক আছে তো?

তিনি গৃহবন্দি অবস্থায় আছেন। বাড়ি থেকে বের হওয়া নিষেধ। এমনকি শহর ছেড়েও তিনি বের হতে পারবেন না।

গালিব পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, যার বাড়ি সিপাহিরা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করলো, তাকেই ইংরেজরা গৃহবন্দি করলো।

তিনি মহেশের মুখের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলেন। বলেন, মুসলমানদের ঘরে ফেরার হুকুম তো এখনো হয়নি? না?

হয়নি। আমি তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য খুব চেষ্টা করছি। তবে শুনতে পাচ্ছি পয়লা জানুয়ারি থেকে সবাইকে ঘরে ফেরার অনুমতি দেয়া হবে। যারা পেনসন পান তাদের বকেয়া টাকাও দিয়ে দেয়া হবে। দেখা যাক কি হয়।

তাহলে তো আমি আশায় থাকতে পারি। দেখা যাক নতুন বছর আমার জন্য কি সুসংবাদ বয়ে নিয়ে আসে। মানুষকে তো আশায় আশায় থাকতেই হয়।

মহেশ দাস বিদায় নিয়ে চলে যায়।

'দস্তাম্বু' ছাপার কাজ শেষ হয়েছে।

বিভিন্ন জায়গায় বই পাঠাচ্ছেন গালিব। প্রভাবশালী ইংরেজদের কাছে পাঠানো হয়েছে। কেউই বাদ পড়েছে বলে তিনি মনে করেন না। মনে ক্ষীণ আশা এই যাত্রা হয়তো পেনসন মুক্ত হতে পারে।

তুফতা চিঠি পাঠিয়েছেন। লিখেছেন, ইন্দোরের রাজা উম্মীদ সিং তাঁর পুরো ঠিকানা জানতে চেয়েছেন।

গালিব চিঠিটা দু'বার পড়ে তুফতাকে লিখতে বসলেন, বন্ধু যে কবিকে সবাই চেনে তার মহল্লা লেখার দরকার হয় না। বিষয়টি তোমার চেয়ে ভালো

আর কে জানে। ফারসি ও ইংরেজিতে লেখা সব চিঠি আমার কাছে অনায়াসে চলে আসে। আমি একজন দীন ব্যক্তি হলেও ডাক বিভাগের লোকদের চোখের আড়ালে থাকি না। বন্ধু, এমনটাও দেখেছি যে কোনো কোনো ফারসি চিঠিতে মহল্লার নাম লেখা থাকে না, আর ইংরেজি চিঠিগুলোয় তো শুধু দিল্লি লেখা থাকে। তারপরও চিঠি হারায় না।

চিঠির নিচে তুফতাকে লিখেছিলেন নিজের শের :

'এমন কে আছে, যে গালিবকে না জানে?
কবি তো সে ভালোই, তবে তার বদনাম খুব।'

পরদিন খবর পেলেন মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রকাশ্য ঘোষণা অনুযায়ী ভারত শাসনের দায়িত্ব নিয়েছে ব্রিটিশরাজ।

মহল্লার গলিতে লোকজন বেরিয়ে এসে আলাপ-আলোচনায় মেতে উঠেছে। গালিব নিজে গিয়েও সবার সঙ্গে দাঁড়ালেন।

একজন বলে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তুলে দেয়া হয়েছে।

অন্যজন বলে, ইংরেজদের হত্যাকাণ্ডে যারা সরাসরি অংশগ্রহণ করেনি এমন বিদ্রোহী সামন্তদের এই ঘোষণায় সাধারণ ক্ষমা করার আশ্বাস দেয়া হয়েছে।

এসব কথা শুনে গালিব বেশ স্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। ইংরেজদের অত্যাচারে বন্ধুহীন হয়ে গেছে শহর। বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ জীবন এখন তাঁর। যে দু'চারজনের দেখা পান তাতে মনের তিয়াস মেটে না।

তাঁর ভাবনার মাঝে অন্যজন বলেন, এই ঘোষণায় ভারতীয় সামন্তদের জায়গীরের অধিকার নিশ্চিত করা হবে বলে বলা হয়েছে।

কেউ একজন বড় গলায় বললো, সামন্তপ্রভুরা স্বার্থরক্ষার আশ্বাস পেয়েছে। এখন তারা নিজেদেরকে বিদ্রোহ থেকে গুটিয়ে ফেলবে।

বিদ্রোহের আগুন তো কমবেশি নিভেই গেছে। এখন আগুনের শেষ শিখাটুকুও আর থাকবে না।

একজন সবাইকে থামিয়ে দিয়ে গম্ভীর গলায় সতর্ক ভঙ্গিতে বললো, ইংরেজদের ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে। এবার ওরা ভারতবর্ষকে পরাধীন রাখার কাজে মন দেবে। ওদের সামনে আর কোনো বাধা নেই। ওদের পুরনো কাজে যে ভুল ছিল তার সংশোধন করবে। নতুন নীতি বানাবে। ওদের দুয়ার খুলে গেছে।

আহ থামুন—কেউ একজন চাপা কণ্ঠে বলে।

স্তব্ধ হয়ে যায় মহল্লার গলিতে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন মানুষ।

তাদের মাঝে গালিব একজন।

তাঁর বুকের ভেতর তোলপাড় করে। বারবারই মনে হয় অনেক দেখা হলো। আর কয়দিনই বা বাঁচবেন? তিনি ধীর পায়ে ঘরে ফেরেন। ঘরে ফিরতে থাকে অন্যরা। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না। যেন মহারানীর একটি ঘোষণায় হতচকিত বিহ্বল মানুষেরা। গুটিয়ে থাকার জন্য ঘরের ভেতর আশ্রয় নিচ্ছে। ঘরের ভেতরে পা রাখার আগে গালিব ঘাড় ঘুরিয়ে গলির দিকে তাকালেন। একজন মানুষও রাস্তায় নেই। খাঁ খাঁ করছে ছোট রাস্তাটি। মানুষেরা কোথায় লুকাবে? লুকোলেই কি রক্ষা পাবে তারা? এই শহরেরই বা কি হবে? শহরটাকে তো বদলে দিচ্ছে ইংরেজরা। ভেঙে ফেলছে পুরনো আদল, গড়ছে নতুন করে। নিজেদের পছন্দ মতো। প্রিয় শহরটা বদলে যাচ্ছে ভিনদেশী মানুষের হাতে।

তিনি ঘরে ঢুকে চুপচাপ বসে থাকেন। আগ্রা থেকে আরামের চিঠি পেয়েছেন। ওর সংবাদপত্র আফতাব-ই-আলমতাব-এর জন্য কয়েকজন গ্রাহক চেয়েছে ও। কাকে তিনি গ্রাহক হতে বলবেন? দিল্লির অভিজাত ধনীদের অবস্থা তো খুবই খারাপ। খবরকাগজ কেনার সামর্থ্যটুকু নেই। দু'একজনকে বলার পরে আহসানুল্লা খান গ্রাহক হতে রাজি হয়েছেন। আর কাউকে পাওয়া যায়নি।

তিনি চুপচাপ বসে না থেকে আরামকে চিঠি লিখতে বসলেন। বেশ তিক্তভাবে লিখলেন—সেইসব ব্যক্তিকে কোথায় খুঁজে পাবো যারা খবরের কাগজ কিনবে? দিল্লিতে এখন যাদের হাতে টাকা আছে তারা ব্যাপারি ও মহাজন। ওরা শুধু জানতে চায় যে কোথায় সস্তায় গম পাওয়া যাবে। খবরকাগজ পড়ার সময় ওদের নাই। ইচ্ছাও নাই। ওরা যদি সৎ ও উদার হয় তাহলে তোমার কাছে সঠিক মাপে গম বিক্রি করবে। তা নাহলে পাল্লায়ও ফাঁকি থাকবে। খবরের কাগজ কিনে পয়সা নষ্ট করবে কেন ওরা? তোমার সংবাদপত্রের গ্রাহক জোগাড় করতে পারা কঠিন।

চিঠিটি লিখে তার বুক আবার ভার হয়ে গেলো। ভাবলেন, দিল্লি শহরের এমন পরিণতি তাঁর স্বপ্নেরও অতীত। ক্রমাগত বুক ভার হয়ে যায়। অভিজাতদের হাত থেকে দিল্লি চলে যাচ্ছে বণিক শ্রেণীর হাতে।

তিনি জানেন আরাম কবিতা লেখে। ও একজন ভালো কবি। তাঁর প্রিয় সাগরেদদের একজন। ওর পুরো নাম রায়বাহাদুর মুনশী শিবনারায়ণ আরাম এলাহাবাদী।

গালিব চিঠি খামে ভরে গাম দিয়ে আটকালেন। তারপর কাল্লুকে ডেকে তাকে মদ দিতে বললেন।

কাল্লু অবাক হয়ে বললো, হুজুর এখন?

হ্যাঁ, এখনই।

তাহলে পেয়ালা নিয়ে আসি।

সেদিন পুরোটা সময় তিনি মদ খেয়ে কাটালেন। কারো কথা শুনলেন না। উমরাও বেগমেরও না। তারপর দিন ঘুম ভাঙলো তার ভর দুপুরে। বিছানায় উঠে ভাবার চেষ্টা করলেন যে কতোটা সময় পার হয়ে গেছে, নাকি সময়টা তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে? বলছে, গালিবের ঘুম ভাঙুক। তারপরে পা বাড়াবো।

সেদিন বিকেলে বাড়িতে এলো হাফিজ মাম্মু। গালিবের অনেক দিনের পরিচিতজন। বিপদে-আপদে কাছে থাকে। ওর শুকনো চেহারা দেখে গালিব বুঝলেন যে কিছু হয়েছে। হাফিজ ধপ করে শতরঞ্জির ওপর বসে পড়ে।

কি হয়েছে? বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে? কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে পেরেছো?

হাফিজ মাম্মু একটুক্ষণ দম নিলো। অনেকটা পথ হেঁটে আসার কারণে বুকে হাঁফ ধরেছে।

তোমাকে পানি দিতে বলবো।

মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানায় হাফিজ। গালিব আয়াজকে পানি আনতে বলেন। পানি খেয়েও হাফিজ মাম্মু চুপ করে বসে থাকে।

সম্পত্তি ফেরত পাওয়ার জন্য কাগজপত্র যা তৈরি করতে বলা হয়েছিল, করেছিলে?

সব করেছিলাম। কাগজপত্রে কোনো ভুল নেই।

তাহলে সমস্যা কোথায়?

সমস্যা আমার নামে।

হাফিজ মাম্মুর চোখ জলে ভরে যায়। গালিব অবাক হন। তারপরের কথা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকেন। হাফিজকে কিছু জিজ্ঞেস করেন না।

হাফিজ চোখ মুছে বলে, কমিশনার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন হাফিজ মহম্মদ বখশ কে? আমি বললাম, আমি। তিনি বললেন, তাহলে হাফিজ মাম্মু কে? বললাম, হুজুর দু'টো নামই আমার। আমার আসল নাম হাফিজ মহম্মদ বখশ। লোকে আমাকে হাফিজ মাম্মু বলে ডাকে। কমিশনার রেগে উঠলেন। বললেন, সব নামই আপনার একার। ভালোই বলেছেন। কিন্তু এতে আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কাকে আমি এই বাড়ি ফেরত দেবো? এর কিছু করা যাবে না। কেস বাতিল। আপনি যান। আমাকে খালি হাতে ফিরে আসতে হলো।

এখন আমি কি করবো? আমি তো নিঃস্ব হয়ে গেলাম।

দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ে হাফিজ। গালিব ওর মাথায় হাত রাখেন। আয়েজকে ডেকে আর এক গ্লাস পানি আনতে বলেন। একসময়ে নিঃশব্দে উঠে চলে যায় মাম্মু।

গালিব মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকেন। মহল্লার লোকজনের কাছে যা শুনলেন তাই হলো। ওরা বলাবলি করে, সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার আর ক্ষতিপূরণ দেয়ার ক্ষেত্রে সরকার স্বেচ্ছাচারি আচরণ করে। যা খুশি তাই করে। আগেকার প্রথা, নতুন আইন, নিয়মকানুন বা যুক্তির কোনো মূল্য নেই তাদের কাছে।

হাফিজ মাম্মু নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার খবরে প্রথমে মন খারাপ হলেও পরে ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন গালিব। তুফতাকে চিঠিতে লিখলেন—জানতে পেরেছি যে লাহোরে একটি ক্ষতিপূরণ বিভাগ চালু করা হবে। এই অফিসের মাধ্যমে শতকরা দশভাগ মূল্যে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। তবে দেয়া হবে তাদেরকে যাদের সম্পত্তি সিপাইরা লুট করেছিল। নিয়ম করা হলো এমন যে যাদের এক হাজার টাকার দাবি নির্ধারণ করা হবে সে পাবে একশ টাকা। মজার বিষয় হলো যে দিল্লি দখল করার পরে সাহেবরা যে লুট করেছে তার কোনো কিছুই ক্ষতিপূরণের মধ্যে পড়বে না। সাহেবরা যা লুট করেছে তা মওকুফ করে দেয়া হবে। বন্ধু, ভেবে দেখো কতো কষ্ট প্রতিদিন জমা হয় বুকের ভেতর। এখন থেকে কেমন করে হাফিজ মাম্মুর মুখের দিকে তাকাব? দুঃখে ভারাক্রান্ত হাফিজ কি আর আগের মতো আমার কাছে আসবে? খোশগল্প করার মন কি ওর আর থাকবে? দেখতে পাচ্ছি অনবরত পরিচিতজনদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। বেশিরভাগ দিনই আমার সঙ্গীহীনভাবে একা একা কাটে। কথা বলার লোক কম পাই। চিঠি লিখে বন্ধুর সঙ্গ পাই। এখন কলম আমার সঙ্গে। আর সঙ্গী নিজের ছায়া। বন্ধু আমার জন্য প্রার্থনা কর। ঘরোয়া মুশায়রার আসরে এখন আর শুনতে পাই না বহুৎ আচ্ছা, মারহাবা ধ্বনি! ওহ্ কি ভয়ঙ্কর দিনের ছায়া আমার মাথার উপরে বিছিয়ে আছে!

চিঠি শেষ করে খামে ঢোকালেন। যত্ন করে নিজের হাতে তৈরি করা খাম।

একইসঙ্গে চিঠি লিখলেন কমিশনারকেও। লর্ড ক্যানিং ইংল্যান্ডের রানীর কাছ থেকে এ দেশের প্রতিনিধি শাসক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। তাকে একটি কসীদা পাঠাবেন ঠিক করলেন। সঙ্গে এক কপি 'দস্তাম্বু'ও। সেদিন শহরটিকে আলো দিয়ে সাজানো হয়েছিল। কিন্তু তাতে কি? তাতে তাঁর মন আলোকিত হয়নি।

দুই নাতি বায়না ধরেছিল, নানাজান আমরা বাতি দেখতে যাবো আপনার সঙ্গে। আপনি আমাদের নিয়ে চলেন।

তিনি যাননি। তিনি গম্মনকে বলেছিলেন ওদের বাতি দেখাতে নিয়ে যেতে। এখন আর এসবে তাঁর উৎসাহ নেই।

খবর পেয়েছেন তাঁর বই 'দস্তাম্বু' ভালো বিক্রি হচ্ছে। তিনি বইয়ের পাঁচ কপি বিশেষভাবে তৈরি করার জন্য বলেছিলেন আরামকে।

আরাম হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করেছিল, বিশেষ পাঁচ কপি বই কার জন্য মির্জা নওশা সাহেব?

তিনি নির্বিকার কণ্ঠে বলেছিলেন, পাঁচ বিশেষ ব্যক্তি হলেন পাঞ্জাবের প্রধান কমিশনার, গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং, কুইন ভিক্টোরিয়া এবং ব্রিটিশ সরকারের নির্দিষ্ট দুজন সচিব।

আরাম হেসেই বলেছিল, এতে পেনসনের একটা সুরাহা হতে পারে।

ওই পেনসন ছাড়া আমার তো কোনো উপার্জন নাই।

গম্ভীর হবেন না মির্জা নওশা। আমি পুরো বিষয়টি জানি। আমি আপনাকেও বুঝতে পারি। আভিজাত্যের অহমিকায় আপনি ভীষণ পরিতৃপ্ত।

অভিজাত মানুষের পরিতৃপ্ত থাকাই তো উচিত।

তাহলে কষ্ট পান কেন?

কবি যে, তাই।

হো-হো করে হেসেছিল আরাম।

গালিব এখন চিঠি লিখছেন—'দস্তাম্বু' বেশ বিক্রি হচ্ছে। আমার এক বন্ধু অনেকগুলো কপি বিক্রি করে দিয়েছে। লেফটেন্যান্ট গভর্নর প্রশংসা করে চিঠি লিখেছেন। ভেবে অবাক হই যে কারা এই বইগুলো কিনলো—ইংরেজ না ভারতীয়? আমি তো দেখতে পাই ভারতবর্ষ থেকে আলো মিলিয়ে যাচ্ছে। যারা প্রদীপের মতো জ্বলতো তারা আর নেই। এ দেশের মাটি প্রদীপশূন্য। লক্ষের ওপরে মানুষ জেলে বন্দি। যারা জেলের বাইরে আছে তাদের বই কেনার সামর্থ্য নেই। ইচ্ছে থাকলেও সাধ্য নেই। যারা আমার বই কিনেছে বলে ধারণা করি তারা ইংরেজ। আর তারা কেনা কপিগুলো পাঞ্জাবে পাঠিয়েছে। আমরা তো জানি পাঞ্জাব সব সময় ব্রিটিশদের পক্ষে ছিল।

পরদিন বিকেলে কবি মজরুহ তাঁর জন্য এক বাক্স উপহার পাঠালেন। মীর মেহেদী মজরুহ গালিবের বন্ধু ও সাগরেদ, উর্দু ভাষায় লেখেন! উপহারটি নিয়ে এলেন সৈয়দ আহমদ হুসেন। সঙ্গে একজন ভৃত্য এলো। বাক্সটি দেখে গালিব মনে মনে খুশি হলেন। ভাবলেন নিশ্চয় মদ আছে। সেই যে মহেশ দাস এক

বোতল দিয়ে গেলো সে তো কবেই শেষ। এখন দিন বড় শুকনো। পিপাসায় কাতর তিনি।

হুসেনকে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছেন আমার কবি বন্ধু? তাঁর লেখালেখি হচ্ছে তো? উপহারের জন্য তাঁকে আমার শুকরিয়া জানাবে।

সৈয়দ আহমদ হুসেন চলে গেলে ছুটে আসে নাতিরা।

নানাজান বাক্সে কি আছে?

কাল্লুকে ডাক।

দু'জনে ছুটে গিয়ে কাল্লুকে ধরে নিয়ে এলো। খোলার পরে দেখা গেলো বাক্সভর্তি আম। গালিব প্রথমে মন খারাপ করলেন। পরে ভাবলেন আম তাঁর প্রিয় ফল। বাচ্চারা খাবে। উমরাও বেগম খাবে। সবাই মিলে খেলে আম-খাওয়ার উৎসব হবে। ক্ষতি কি?

কাল্লু মিয়া বললো, হুজুর আপনার জন্য কেটে নিয়ে আসি।

না কেটো না। আমি গোটা আম চুষে খাবো।

আপনি তো এভাবে খান না।

আজ খাবো। তুমি বাক্স নিয়ে যাও।

কাল্লুর সঙ্গে বাচ্চারা চলে গেলে তিনি অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। আমের সঙ্গে তাঁর বাদশাহর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। কেমন আছেন তিনি রেঙ্গুনে? মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গণা মাত্র কি? একবার বাদশাহ আমের মওসুমে তাঁর সভাষদদের নিয়ে হায়াত বখশ উদ্যানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। বাগান ভর্তি ছিল আমগাছ। গাছভর্তি ছিল আম। নানা রকম আম। তবে সেই উদ্যানের আম বাদশাহ, মহলের বেগমরা, শাহজাদা-শাহজাদীরা ও শাহী কর্মচারীরা খেতেন। আর কারো খাওয়ার হুকুম ছিল না। গালিব বাগানে ঘুরতে ঘুরতে খুব মনোযোগ দিয়ে আম দেখছিলেন। বাদশাহ তাঁর দিকে তাকিয়ে কৌতুকের সঙ্গে বলেন, মির্জা এতো মনোযোগ দিয়ে কি দেখছেন?

তিনি বলেছিলেন, হুজুর একজন দরবেশ বলেছিলেন, খাদ্যের প্রতিটি দানায় খাদকের এবং তার বাপ-দাদার নাম লেখা থাকে। তাই আমি খুঁজে দেখছিলাম যে কোন আমে আমার এবং আমার বাপ-দাদার নাম লেখা আছে।

সেদিন বাদশাহ তাঁর রসবোধে প্রীত হয়েছিলেন। হাসতে হাসতে কর্মচারিকে বলেছিলেন, তাঁর বাড়িতে এক ঝুড়ি আম পাঠিয়ে দিতে। সেদিনই তার বাড়িতে আমের ঝুড়ি পৌঁছে গিয়েছিল।

অল্পক্ষণে উমরাও বেগম এসে হাজির। খুশিতে চকচক করছে তাঁর দৃষ্টি। বলেন, বাচ্চারা আম পেয়ে তো ভীষণ খুশি। কতোদিন যে ওরা আম খায়নি।

বিবি আমাকে অপরাধী করছো?

মোটেই না। আমি আপনার বন্ধুদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনার বন্ধুরা আপনাকে কত যে উপহার পাঠায়।

আমার বন্ধু তো শুধু দিল্লিতে নেই বিবি। আমার বন্ধু আছে হিন্দুস্থান জুড়ে।

উমরাও বেগম বলেন, চিঠি দিয়েই আপনার বন্ধুত্ব।

চিঠি দিয়েই তো যোগাযোগ রেখেছিলাম। গদরের আগে কতজন আমার এখানে আসতো।

তা ঠিক। এখনকার মতো এত একা একা আপনাকে থাকতে হয়নি।

নসীব। গালিব দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

উমরাও বেগম উঠে যেতে যেতে বলেন, আম খান। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, মনে আছে একদিন আপনি হাকিম রজিবউদ্দিন খাঁকে কি বলেছিলেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ খুব মনে আছে। তোমারও মনে আছে দেখছি।

আম দেখলে আপনার কৌতুকের কথা মনে হয় আমার।

তাহলে, আর একটু বসো। দু'জনে মিলে কৌতুকটা স্মরণ করি। বিবি এইসব দিনে হাসি খুব দুর্লভ হয়ে গেছে।

উমরাও বেগম বসলেন।

গালিব বললেন, রজিউদ্দিন আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমরা বৈঠকখানায় বসে গল্প করছি। একজন লোক তার গাধা নিয়ে গলি দিয়ে যাচ্ছিল। গলিতে পড়েছিল আমের খোসা। আমরা তো জানি গাধা অনেকসময় কোনো একটা জিনিস হয়তো খাবে না, কিন্তু শুঁকে ছেড়ে দেয়। রজিউদ্দিন আম পছন্দ করতো না। খেতোও না। তিনি জানতেন আমি আমপাগল মানুষ। আমাকে খোঁচা দেয়ার জন্য বললেন, মির্জা সাহেব দেখলেন, আম কি রকম জিনিস, যেটা গাধাও খায় না। আমি সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলাম, হ্যাঁ, অবশ্যই গাধারা তো আম খায়ই না।

তিনি আমার রসিকতা বুঝেছিলেন। লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল তার চেহারা।

উমরাও বেগম হাসতে হাসতে চলে গেলেন। গালিব নিজেও হাসলেন। তারপর গোটা আম দাঁত দিয়ে ফুটো করে চুষে চুষে খেলেন।

খেয়ে-দেয়ে মজরুহকে লিখলেন, তোমার উপহার বাক্সটি দেখে ভেবেছিলাম তুমি বুঝি আমার জন্য বোতল পাঠিয়েছ। দেশী শরাব। বুকে বড় পিপাসা। বাক্স খুলে পেলাম আম। মন্দের ভালো বলতে হবে। আমি তো আম

খেতে ভালোবাসি তুমি তা জানো। তোমার পাঠানো আম দিয়ে মনের ক্ষুধা মিটিয়েছি একভাবে। ধরে নিয়েছি এক একটি আম এক একটি পেয়ালা। পেয়ালায় ভরা আছে দ্রাক্ষাজাত আসব। আর এ পেয়ালা এমনই সুন্দরভাবে পূর্ণ যে এক ফোঁটাও ছলকে পড়ার ভয় নেই। একরকম ইংরেজি মদ আছে, যার নাম লিকার। অপূর্ব পানীয়, দেখতেও সুন্দর, চমৎকার রঙ। আর এতো সুস্বাদু যে মনে হবে চিনির পাতলা সিরাপ খাচ্ছো। বন্ধু, তোমার লিখনশৈলী এমন মিষ্টি। তোমার গজল যখন পড়ি তখন মনের আনন্দে পূর্ণ হই। তুমি বর্তমান সময়ের উর্দু কবির একজন। প্রার্থনা এই যে কাল যেন তোমাকে ফেলে না দেয়।

চিঠি শেষ করে খামে ঢোকালেন। কাল্লুকে দিয়ে পাঠালেন ডাকে দেয়ার জন্য।

পরদিন দিল্লির কমিশনারের কাছ থেকে চিঠি পেলেন দেখা করার জন্য। খুবই খুশি হলেন। পেনসনের ব্যাপারে আশাবাদী হলেন। তাকে 'দস্তাম্বু' পাঠিয়েছেন। রামপুরার নওয়াব বরাবরই ইংরেজদের পক্ষে। তিনি তার পেনসনের জন্য চেষ্টা করছেন। স্যার সৈয়দ আহমদও চেষ্টা করছেন। হয়তো এবার একটা কিছু হবে।

তিনি নির্দিষ্ট দিনে ঠিক সময়ে গেলেন। কর্মচারী জানালো, আজকে দেখা হবে না। গালিব আহত স্বরে বললেন, হবে না?

না, হবে না। স্যার, শিকার করতে যাচ্ছেন। আপনি কাল আসেন।

গালিব নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরলেন। পরদিন আবার গেলেন।

কমিশনার হাসিমুখে তাকে বসতে বললেন। জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছেন?

ভালো আছি। মাথা নেড়ে বললেন।

কমিশনার তাঁকে চার পৃষ্ঠার একটি চিঠি দেখিয়ে বললেন, ম্যাকলড সাহেব এই চিঠি পাঠিয়েছেন। তিনি আমাকে আপনার ব্যাপারে খোঁজ নিতে বলেছেন। তাকে একটি প্রতিবেদন পাঠাতে বলেছেন।

গালিব মুখে কিছু বললেন না। কিন্তু মনে মনে খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। দেখলেন কমিশনার কি একটা কাগজ পড়তে শুরু করলেন। গালিবের মনে পড়লো গতবার যখন দিল্লিতে এসেছিলেন তখন আনুষ্ঠানিকভাবে দরবার বসানো হয়েছিল। এটাই সৌজন্যমূলক প্রথা। লর্ড হার্ডিঞ্জ দিল্লিতে যখন শেষ দরবার করেছিলেন তখন তাঁর জন্য একটি সম্মানসূচক আসন রাখা হয়েছিল। ডানদিক থেকে দশম স্থানটি তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। তাঁকে একটি চাদর,

AMARBOI.COM

রত্নখচিত সূক্ষ্ম কারুকাজ করা পাগড়ি, মুক্তোর মালা এবং সিল্কের জোব্বা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এবার অনেক অভিজাতকে দরবারে আমন্ত্রণই জানানো হয়নি। তার মধ্যে তিনিও ছিলেন। এজন্য তিনি অনেক মনঃক্ষুণ্ন হয়ে আছেন। আজকে কমিশনারের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পেয়ে খানিকটুকু প্রীত হয়েছেন। খুশি মনেই অপেক্ষা করছেন। তাঁর ধারণা কমিশনার নিশ্চয়ই 'দস্তাম্বু' পেয়েছেন।

তখন কমিশনার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি বই লিখেছেন?

গালিব 'দস্তাম্বু'র কথা বিস্তৃতভাবে বললেন।

কমিশনার খুশি হয়ে বললেন, ম্যাকলড সাহেব এই বইয়ের আর একটি কপি চেয়েছেন। আমাকেও আর একটি কপি দেবেন।

জরুর।

আপনার পেনসনের ব্যাপারে দরখাস্ত পেয়েছি। বিষয়টি আমি দেখছি। আপনি সোমবারে আসবেন।

সোমবারে যথাসময়ে কমিশনারের অফিসে হাজির হলেন। বই এবং ম্যাকলড সাহেবকে দেয়ার জন্য একটি দরখাস্ত নিয়ে এসেছেন। কমিশনারকে এসব দেয়ার পরে তিনি বললেন, আমি আপনার পেনসনের ব্যাপারে এজারটন সাহেবকে লিখেছি। আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন।

গালিব খুশি মনে বাড়ি ফিরলেন।

সব শুনে উমরাও বেগম খুশি হয়ে বললেন, আল্লাহ এতোদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন। খোদা মেহেরবান।

পুরো বকেয়াটা পেলে তো আমার আনন্দের সীমা থাকবে না বিবি। সব টাকা পেলে আমার নিজের জন্য কিছু খরচ করবো।

আমার দুঃখ হয় এজন্য যে আপনার পছন্দের পোশাক তো বিক্রি করতে হয়েছে। এখন ভালো পোশাক বলতে কিছুই নেই। এখন তো আপনাকে নানা জায়গায় যেতে হচ্ছে।

এটাও অবশ্য ঠিক, এখন আমার যৌবন নেই। বয়সও নেই। পোশাকে আর কিইবা আসে যায়।

বয়সকালে আপনার নিত্যনতুন পোশাক না হলে চলতো না। আমার আব্বা আপনাকে অনেক পোশাক বানিয়ে দিতেন।

আমার শ্বশুর আমাকে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর বাড়িতে আমি খুব যত্ন-আদরে ছিলাম।

আপনাকে শুকরিয়া যে আপনি আমার আব্বাজানের কথা এভাবে মনে রেখেছেন।

বিবি, আমি তো বেঈমান না।

উমরাও বেগম কোনো কথা না বলে ঘর ছাড়েন। তাঁর নিজের জীবনে অনেক দুঃখ আছে। বেদনার সবটুকু যে ভুলে গেছেন তাতো নয়। বাইরে বাচ্চাদের হই-হল্লা শোনা যাচ্ছে। ওদের পোশাকও জীর্ণ হয়ে গেছে। পেনসনের বকেয়া পেলে ওদেরকেও ভালো পোশাক বানিয়ে দিতে হবে।

কদিন পরে কমিশনার আবার ডেকে পাঠালেন গালিবকে। তিনি জানালেন, গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং পাঞ্জাবের গভর্নরকে লিখেছেন আপনার পেনসন মিটিয়ে দিতে। অবশ্য যদি দিল্লির কমিশনার আপনার পক্ষে রিপোর্ট দেন।

গালিব চুপ করে শোনেন।

তিনি আবার বলেন, এরপর থেকে আপনাকে মাসে মাসে নিয়মিত পেনসন দেওয়া হবে।

এর জন্য কতোদিন অপেক্ষা করতে হবে তার কি কোনো নির্দিষ্ট তারিখ আছে?

না, তা নেই। তবে আপনি ইচ্ছা করলে এককালীন একশ টাকা অনুদান নিতে পারেন।

গালিব ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, অন্যরা যখন এক বছরের বকেয়া টাকা পেয়েছেন তখন আমি মাত্র একশ টাকা নেবো কেন?

কমিশনার বললেন, কিছুদিনের মধ্যেই আমি আপনাকে পুরো টাকাটা দিতে পারবো। পেনসনও পেয়ে যাবেন।

তার কথা শুনে গালিব নিজেকে শান্ত করলেন। কয়েকদিন পরে একশ টাকা তুলে নিলেন।

দিন গড়ালো। মাস গড়ালো।

একদিন বকেয়াসহ পেনসন পেলেন গালিব।

তিন বছরের বকেয়া পেলেন। টাকার অঙ্ক দু'হাজার দুশো পঞ্চাশ। এর মধ্যে থেকে বাদ গেছে একশ টাকা, যেটা তিনি অনুদান হিসেবে নিয়েছিলেন। অন্যান্য খাতের হিসাবে আর দেড়শ টাকা বাদ গেলো। থাকলো দুই হাজার টাকা।

একজন মহাজন এসে সামনে দাঁড়ালো।

তার কাছ থেকে ধার নিয়েছেন দেড় হাজার টাকা। ধার করেই তো বেঁচে

AMARBOI.COM

ছিলেন এই তিন বছর।

মহাজন বললো, আমার পুরো টাকাটা শোধ করে দিন। পাঁচশ টাকা নিয়ে বাড়ি যান।

গালিব বললেন, আর একজনের কাছে আমার এগারোশ টাকা ধার রয়েছে। তাকেও তো আমার কিছু টাকা শোধ করতে হবে।

আমি অতশত জানি না। আমার টাকা আমি আগে নেবো।

আমার তো আরও পাওনাদার আছে। সবার দাবি আমার কাছে সমান।

গালিব রাগ করতে করতে ফিরে আসেন বাড়িতে। সোজা অন্দরমহলে যান। উমরাও বেগমকে বলেন, বকেয়া টাকা যা হাতে পাবো তার সবই চলে যাবে ধার শোধ করতে।

উমরাও বেগম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, ধার করেই তো আমরা বেঁচে আছি এই তিন বছর। দেনা তো শোধ করতেই হবে।

যা টাকা পাবো তা দিয়ে সব দেনা শোধ হবে না।

বলতে বলতে গালিব উমরাও বেগমের শোবার ঘরে আসেন। পেছনে পেছনে উমরাও বেগমও আসেন। শোবার ঘরে দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়ান।

আপনি পোশাক বানাবেন বলেছিলেন।

হবে না।

তাতে কি, না হয় আবার ধার করবেন। তবু নতুন পোশাক তো চাই।

গালিব মৃদু হেসে বলেন, তোমাকে শেখ আলী হাজিনের একটি শের শোনাবো বিবি?

বলেন।

গালিব বেশ দরাজ গলায় আবৃত্তি করেন,

'ধার করে পরতাম পোশাক যখন অল্প ছিল বয়স,
প্রেমিক হৃদয়ে ছিল অপরূপ উন্মাদনার আবেশ।
এখন পরনে জোব্বা জীবনের শেষ,
লজ্জা দেয় না তাই আমার এ বেশ ॥'

গালিব থামলে উমরাও বেগমের চোখ ছলছল করে। গালিব তাঁর দিকে তাকিয়ে থমকে যান।

উমরাও বেগম বলেন, আপনার কষ্ট হচ্ছে?

তিনি সজোরে মাথা নেড়ে বলেন, না।

আমার কষ্ট হচ্ছে। আপনি নতুন পোশাক পরতে ভালোবাসতেন।

গালিব আবারও সজোরে বলেন, না।

আমি আপনাকে পঞ্চাশ বছর ধরে দেখে আসছি।

হ্যাঁ, আমরা তো একসঙ্গে এতোগুলো বছর কাটালাম। সুখে-দুঃখে আমাদের জীবনটা কেটে গেলো।

গালিব বিড়বিড় করে বলেন, কেটেই গেলো। তারপর একই ভঙ্গিতে বলেন নিজের শের :

'প্রেমেই জীবনের স্বাদ পেলো আমার মন;
ব্যথার ওষুধ পেল, এমন ব্যথা পেল যার ওষুধ নেই ॥'

শের শুনে ওড়নায় চোখ মুছলেন উমরাও বেগম। কান্নার অস্ফুট ধ্বনিও বেরিয়ে এলো। গালিব তাঁর হাত ধরলেন। তাঁকে টেনে নিয়ে দু'জনে পাশাপাশি বসলেন। উমরাও বেগমের ঘাড়ে হাত রেখে বললেন, পেনসনের বকেয়া টাকা পেলে আগে তোমার জন্য ঘাঘরা আর ওড়না কিনবো বিবি।

না, আমার জন্য না। আপনারটা আগে।

আচ্ছা, ঠিক আছে, দু'জনের জন্যই কিনবো।

আর দেনা?

দেনা করলাম আর মদ খেলাম। এভাবেই জীবন উড়িয়ে দিলাম। আর কটা দিনই বা বাঁচবো! এভাবেই কাটুক না শেষ দিনগুলো।

উমরাও বেগম স্বামীর হাত শক্ত করে ধরলেন। যেন কিশোরী বেলার গালিব তাঁর কাছে ফিরে এসেছে। বলছে, চলো বাগানে যাই। সবচেয়ে সুন্দর ফুলটি তোমাকে দেবো।

AMARBOI.COM

শেষ হয়ে যায় বসন্তের দিন

নিজের ছোট কুঠুরিতে একা একা বসে থাকেন গালিব। চেষ্টা করেন কিছু লিখতে। হয়ে ওঠে না ঠিকমতো।

এখনও শহরের অবস্থা ঠিক হয়নি। পুরো শহরই তছনছ হয়ে আছে। মানুষেরা কলের পুতুলের মতো দিন কাটাচ্ছে। মাঝে মাঝে শহর কেঁপে ওঠে সৈনিকের বুটের শব্দে। সেই শব্দ তাকেও যে চমকে দেয় না, তা নয়।

স্বস্তি এটুকুই যে জীবন আবার একটা ছকে এসেছে। রামপুরের নওয়াবের দেয়া বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্রিটিশ সরকারের পেনসন। ধারের বোঝা কমে এসেছে, এটাও স্বস্তির কারণ। ভাবেন, যেটুকু বাকি আছে তা আস্তে আস্তে শোধ হয়ে যাবে। যাবে কি? ভয়তো নিজেকে। বন্ধুদেরতো অনরবত লিখেন যে,

মরতে ভয় পাই না, কিন্তু আরামের অভাব শঙ্কিত করে। আরাম ছাড়া বাঁচতে চাই না। আর প্রতি রাতে চাই শরাব। শরাবের ব্যবস্থা হয়েছে এ জন্য হাজার শোকর।

কষ্ট একটা যে বন্ধুদের সঙ্গে আগের আড্ডা আর বসে না। আড্ডা ছাড়া তাঁর জীবনতো পানিবিহীন মাছের মতো। ডাঙায় পড়ে তড়পাতে হয় শুধু। বসে বসে কাগজে আঁকিবুকি কাটলেন আর বন্ধুকে লিখলেন, গভর্নর জেনারেল দিল্লি আসবেন শুনেছি। আগের বারের দরবারের সময় ছয়জন জায়গীরদার নিজের নিজের দরবার বসিয়েছিলেন। তারা হলেন ঝর্ঝর, বল্লভগড়, ফারুকনগর, দোজানা, পাতৌদি ও লোহারু। প্রথম চারটি রাজ্যইতো সিপাহী বিদ্রোহের সময় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। দোজানা আর লোহারু হানসি-হিসার পরগণার প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। যে রাজ্যটি রক্ষা পেয়েছে সেটি হলো পাতৌদি। বন্ধু তোমাকে এটা বুঝতে হবে যে হিসার-পাতৌদি ও লোহারু কমিশনার যদি দুজন নওয়াবকে সঙ্গে করে নিয়ে যান তাহলে মনে করতে হবে যে তারা হলেন আসলে তিনজন। মুসলিম অভিজাতদের মধ্যে মাত্র তিনজন জীবিত আছেন। একজন দিল্লিতে মোস্তফা খান, আর একজন সুলতানজীতে মৌলভী সদরুদ্দিন। অন্যজন বল্লিমাঁরো মহল্লার এই অধম, যাকে হিন্দুস্থানের মানুষ আসাদ বলেই চেনে। এঁরা সকলেই ছিল অভিযুক্ত, অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত এবং আঘাতে আঘাতে জর্জরিত।

এটুকু লিখে নিজেকে মৃদু ধমক দিলেন তিনি।

তুমিতো এখন ভালো আছো মির্জা নওশা। কেন অতীত খোঁড়।

আহ, আমি এই ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হৃদয় কার কাছে জিম্মি রাখব? কে এর দায় নেবে?

কেউ না। ভার বইতে হবে তোমাকেই।

আমি আমার বন্ধুদের দেখতে চাই। আড্ডা চাই। কবিতার মুশায়রা চাই।

হাঃ হাঃ হাঃ...। হাসছো কেন?

ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় শব্দ। গালিব নিঃশব্দ বসে থাকেন। বাজুক, দু'কান ভরে বাজুক দিল্লির যাবতীয় শব্দরাজি।

ছুটে আসে কাল্লু মিয়া।

হুজুর।

গালিব নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকান।

ব্রিটিশ সৈন্যরা জামা মসজিদ ছেড়ে চলে গেছে হুজুর।

গালিবের ভুরু কুঁচকে যায়। তিনি চোখ বড় করে তাকান।

নামাজের জন্য জামা মসজিদ খুলে দিয়েছে হুজুর।

কাল্লু মিয়ার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আমরা আজকে জামা মসজিদে নামাজ পড়তে যাবো। বাকির, হুসেনও যাবে।

ওদের কি টুপি আছে কাল্লু মিয়া?

আমি এখন ওদের জন্য টুপি কিনতে যাবো। বেগম সাহেবা রুপিয়া দিয়েছেন হুজুর।

আচ্ছা যাও।

কাল্লু মিয়া দু'পা এগোলে তিনি পেছন থেকে ডাকেন।

কাল্লু শোন।

জ্বী হুজুর।

আমার শরাব কয় বোতল আছে?

সতের বোতল হুজুর।

গোলাপ জল?

কাল্লু ঘাড় নেড়ে বলে, মজুদ আছে।

বহুত আচ্ছা। যাও।

গালিবের মনে হলো তাঁর নিঃসঙ্গতা মুছে যাচ্ছে। তিনি আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন। নিজেকে এখন আর পরিত্যক্ত আঘাত-জর্জরিত মানুষ মনে হচ্ছে না। অনেক কাল আগে এমন একটি সময় ছিল তাঁর জীবনে, এখন সেই সময়টা অন্ধকারে ডুবে গেছে। তিনি আলোর দেখা পাচ্ছেন। দিনের প্রথম আলোয় ভরে গেছে তাঁর ঘর।

সেদিন বিকেলে আলতফ এলেন।

কি খবর হালি?

খবর? খবরতো এখন প্রতিদিনই জন্ম নেয়। খবরের কি শুরু বা শেষ আছে।

বোস।

কি করছেন?

দিন গুনছি।

কবিতা লেখা?

হয় না। দিনগুলো বুকের ওপর বোঝা হয়ে আছে যে!

চিঠি লিখছেন না?

লিখছি। কিন্তু তেমন জবাব পাচ্ছি না। আমার চিঠি ঠিকমতো প্রাপকের

AMARBOI.COM

কাছে পৌছাচ্ছে কিনা সেটা নিয়ে সন্দেহ লাগছে। মনে হচ্ছে ডাক বিভাগের পরিষেবা এখনো ঠিক মতো দাঁড়ায় নি। বন্ধই হয়ে আছে কিনা কে জানে। ডাকহরকরাদের যাতায়াত করাইতো কঠিন হয়ে গেছে। নাকি? তুমি কি চিঠি পাও হালি?

পাচ্ছিতো কিছু কিছু।

তাহলে আমি যাদের লিখছি তারা আমাকে লিখছে না। হয়তো নানা ঝামেলায় আছে।

সেটাই হবে। আপনি লিখতে থাকুন। তুফতা আর আরামতো আপনার উর্দু চিঠির সংকলন ছাপতে চেয়েছিল।

আমি রাজী হইনি। উর্দুতে লেখা চিঠিগুলোতে ফারসির মতো সাহিত্য গুণ নেই।

আপনার এখন ঘুম হয়তো? যদিও বিদেশী মদ এখনও পাওয়া যায় না।

তাতে অসুবিধা হচ্ছে না। যা পাচ্ছি তাই যথেষ্ট। বহুকালের অভ্যেসতো। আর ছাড়তে পারবো না। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এভাবেই চলবে।

আলতফ কিছু বললো না।

গালিব ছটফটিয়ে উঠে বললেন, আড্ডা হারিয়ে আমি খুবই মুষড়ে পড়েছি। তোমার সঙ্গে কথা বলছি ঠিকই কিন্তু জমছে না। আশৈশব যাদের সঙ্গে কাটিয়েছি তারা সব কে যে কোথায় ছিটকে পড়লো, হায় খোদা।

তাঁর বেদনার্ত কণ্ঠস্বর ছুঁয়ে যায় আলতফকে। বুঝতে পারেন একজন কবি অন্য কবিদের সাহচর্যের অভাব খুব বোধ করছেন। যাদের সঙ্গে তিনি দীর্ঘ বছর ধরে সাহিত্য আলোচনা করেছেন, কবিতা পরিমার্জনা করেছেন, আবেগ এবং বুদ্ধির জায়গা থেকে খোশগল্প করেছেন, তাঁরা আজ নেই। এই একাকীত্ব তাই তাঁকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। আলতফ মৃদুস্বরে ডাকে, ওস্তাদজী।

গালিব চোখ মুছে তাকান।

যাঁরা নেই ওরা আমার হৃদয়ের সাথী ছিল হালি।

আমি বুঝতে পারছি ওস্তাদ।

আরও একটা জিনিস আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে।

গালিব দু'হাতে চোখ মুছে স্থিত হন।

কিসের কষ্ট?

কষ্টতো অনেক। ইংরেজদের বিজয়ের পর থেকে এই শহরটাকে খালি করার কাজ শুরু হয়ে গেছে। এখন যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা দিয়ে দশ বছর আগের সময়কে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

গালিব কুঁজো থেকে পানি ঢেলে নিজে এক গ্লাস খান। আলতফকে এক গ্লাস দেন। আলতফ কথা বলতে পারছিলেন না। গালিবের ভাবনার সঙ্গে নিজের ভাবনা মিলিয়ে দেখেন। বোঝেন, কথাগুলো খুবই সত্যি। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যাবে না।

গালিব আরও বলেন, আর একটি কঠিন সত্য আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। আস্তে আস্তে ঘটবে। তবে ঘটবেই। সেটা দেখার জন্য আমি বাঁচবো না, তুমিও হয়তো থাকবে না। কিন্তু দেখবে আমাদের পরের বংশধররা।

খুলে বলুন ওস্তাদজী। আমার ভয় করছে।

ভয়তো করবে। কারণ যে সংকট তৈরি হচ্ছে সেই সংকট মোকাবেলা করার সাধ্য অভিজাতদের নাই। দিল্লি শহর থেকে তাদের ছিটকে ফেলে দেয়া হচ্ছে। দিল্লি শহর চলে যাচ্ছে বণিক শ্রেণীর দখলে।

কীভাবে? আলতফের কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে যায়।

ভেবে দেখো যে জায়গীরদাররা বিদ্রোহের পক্ষে ছিল তাদের মেরে ধ্বংস করা হয়েছে। যারা ভূ-সম্পত্তির মালিক, বিদ্রোহীদের সহযোগিতা করেছে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে ব্রিটিশরা। এরা এসব আর ফিরে পাবে না। তাহলে বোঝ অভিজাতরা সর্বস্বান্ত হয়েছে।

আলতফ স্তব্ধ হয়ে কথা শোনেন। চুপ করে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন গালিবের দিকে।

গালিব আবার পানি খেয়ে বলেন, যেসব বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে ব্রিটিশরা তাদের ক্ষতিপূরণ দেবে ঠিক করেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের পরিমাণও স্থির করেছে। যারা ক্ষতিপূরণ পাবে তাদের টিকিট দেয়া হয়েছে।

আমিতো জানি। আমার পরিচিত অনেকে টিকিট পেয়েছে। এই টিকিট দেখালে ওরা বাজেয়াপ্ত করা জমিতে বাড়ি বানাতে পারবে।

গালিব তীক্ষ্ণ চোখে তাকান আলতফের দিকে। বলেন, বাড়ি বানানো কি এতো সোজা? যেটুকু টাকা পেয়েছে ওই দিয়ে কি বাড়ি হবে?

তা হবে না। ওদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। ক্ষতিপূরণের টাকায় নতুন বাড়ি হবে না।

গালিব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, যারা ঘরবাড়ির মালিক ছিল তারা হয়ে গেল ফকির। আর কিছু সংখ্যক মানুষ খুবই কম দামে বিশাল জমির মালিক হয়ে যাচ্ছে। আর ব্রিটিশরা বাকি যে জমির নিলাম ডাকল সেগুলোও কিনে নিল বণিকশ্রেণীর মানুষেরা। এখন বল কি দাঁড়াল এই শহরে?

আলতফ এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, সাবেক অভিজাত শ্রেণীর মানুষের বদলে লুটতরাজেরা জায়গা করে নিল ব্রিটিশ বেনিয়াদের ছত্রচ্ছায়ায়।

হাউমাউ করে কেঁদে উঠল আলতফ হুসেন হালি। গালিব চুপ থেকে বললেন, এখন আমাদের চোখের জল ফেলার ইতিহাস তৈরি হচ্ছে হালি। সত্যকে মেনে নিয়ে চোখের জল মোছ।

চোখের জল মুছতে আলতফের সময়ই লাগল। দু'হাতে মুখ ঢেকে মাথা চেপে বসে রইলেন।

গালিব বলতে থাকেন, একদিন আমার পূর্বপুরুষেরা সম্পদে ও সম্মানে অভিজাত মানুষ ছিলেন। আমি নিজেও ছিলাম তাঁদের মধ্যে একজন। সেই অবস্থানের স্বীকৃতি অনুযায়ী সম্মানসূচক রাজন্য ভাতা পেতাম। যে পরিমাণ সম্পত্তিতে আমার মালিকানা স্বীকৃত ছিল তার পরিমাণ ছিল অনেক। আমার ঐশ্বর্যভরা অতীতের কথা আমি এখন নিজেই ভুলে যাই।

আলতফ আবার শব্দ করে কেঁদে ওঠেন।

তুমি কি আমার কথা শুনে কাঁদছো?

এ অবস্থা আপনার একার না। আমি সবার জন্য কাঁদছি।

আর আমি কেঁদেছি সইফতা আর ফজল হকের জন্য। ওহ আমার প্রিয় দুজন মানুষ। ওহ্ আমার সবচেয়ে বড় শুভাকাঙ্ক্ষী। আমার চারপাশে আর কেউ থাকল না। আমি কার কাছে গিয়ে মনের কথা বলব।

আলতফ চোখ মুছে সোজা হয়ে বসেন। যে দুটো নাম গালিব উচ্চারণ করেছেন তাঁদের জন্যও তাঁর বুকের ভেতরে হাহাকার আছে। দু'জনে কবি, বিদ্বান মানুষ। সজ্জন মানুষ। তাঁদের আচার-ব্যবহারের তুলনা হয় না। আলতফের মনে হয় ওর বুকের ভেতরে গুড়গুড় করছে। ওর দম ফেলতে কষ্ট হচ্ছে।

গালিব আলতফের হাত ধরে বলেন, তুমি বলো আলতফ নওয়াব মুস্তাফা খাঁ, যাঁকে আমরা সইফতা ডাকি, তাঁকে সাত বছর কারাদণ্ড দেয়া হলো। আর কোনো দিন কি তাঁর সঙ্গে দেখা হবে? আমি আর কয়দিনই বা বাঁচবো!

আলতফ জোর দিয়ে বলেন, সাত বছর বেশি সময় নয় ওস্তাদ। আপনি বাঁচবেন। আমাদের সবার প্রার্থনা আছে আপনার আয়ুর জন্য।

আহ থাম হালি। মনে হয় সইফতার সঙ্গে আমার দেখা হলেও হতে পারে, কিন্তু ফজল হকের সঙ্গে আর কোনোদিন দেখা হবে না।

হ্যাঁ, তাঁকে তো দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়েছে। আজীবনের নির্বাসন! ওহ!

আলতফের কণ্ঠে আবার অস্ফুট ধ্বনি। গালিব সে ধ্বনির অনুরণন নিজের

ভেতর অনুভব করেন।

একদিন সইফতার বাড়িতে যাই তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য। বাড়ির সামনের কার্নিশের নিকট বেশ অন্ধকার ছিল। আমি কার্নিশের নিচে দিয়ে তাঁর বৈঠকখানার দিকে এগিয়ে দেখলাম তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন আমাকে স্বাগত জানানোর জন্য। আমি তাঁকে দেখে বললাম, বেহেশতের অমৃত ঝরণাতো অন্ধকার ফাঁক করে বের হয়। তিনি মৃদু হেসে আমার হাত ধরে বললেন, শুকরিয়া হজরত।

বৈঠকখানার বারান্দাটা ছিল পূর্বমুখী। ঘরে ঢুকে বারান্দার দিকে চোখ পড়তেই মন ভরে যায়। রোদের আলোয় ভেসে আছে বারান্দা। উৎফুল্ল হয়ে বললাম, 'ঈ খানাতমাম আফতাব অস্ত'—সারা ঘরে শুধু সূর্য আর সূর্য।' দেখলাম তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিনয়ের হাসিতে ভরিয়ে দিল আমাকে। আমি যে তাঁকে প্রশংসা করেছি তা বুঝতে তাঁর একটুও সময় লাগেনি। খুবই বিদগ্ধজন। তাঁকে কারাগারের অন্ধকারে রেখে আমাদের আত্মাকে দমিয়ে দেয়া হয়েছে।

দুঃখ পাবেন না ওস্তাদজী।

দুঃখ! দুঃখতো পাবোই। না পেয়ে উপায় কি? উপায় নেই। একদিন দরবারে বাদশাহ আমার শেরের প্রশংসা না করে আমার আবৃত্তির প্রশংসা করেছিলেন। আমি বুঝলাম বাদশাহ ইচ্ছে করেই আমার গজলের প্রশংসা করেননি।

সেদিন কেল্লা থেকে বাড়ি ফেরার পথে আমি সইফতার বাড়িতে গিয়েছিলাম। তুমি তো জানো আমি আমার সব পরিচিতজনদের বাড়িতে যাই না। যাঁরা আমার বাড়িতে আসেন আমি শুধু তাঁদের বাড়িতে যাই। সইফতা আমার খুব কাছের মানুষ। আমার মানসিক সংকটে সব সময় তাঁর সাহায্য পেয়েছি।

গালিবের গলা ধরে এলে তিনি থামলেন।

কেল্লা থেকে কষ্টভরা মন নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। সইফতাকে বললাম কেল্লার ঘটনা। বাদশাহর কথা। তিনি আমাকে বললেন, বাদশাহ আপনার গজলটি বোঝেননি মির্জা সাহেব। দুঃখ পাবেন না।

আমি তাঁর সান্ত্বনার ভাষায় মুগ্ধ হই। কত শান্ত স্বরে তিনি আমাকে দুঃখ ভোলার কথা বলেছিলেন। তাঁর সুন্দর কথায় আমার তাপিত হৃদয় শীতল হয়েছিল।

সেদিন তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হলো কবিতা নিয়ে। কবিতার সমঝদারি

নিয়ে। যে কতক্ষণ সময় সেখানে থাকলাম বুঝলাম তিনি কবিতার কত বড় সমঝদার। তিনি শুধু বিত্ত বৈভবের মালিক না। তাঁর আছে ঐশ্বর্যভরা মস্তিষ্ক, সম্পদ ভরা হৃদয়। এমন মানুষ কমই হয়।

গালিব থামলেন। আলতফ বুঝলেন যে কবি আসাদুল্লাহ খান গালিব দিল্লি শহরে কবিতার সমঝদারের অভাবে কত কাতর, এমন আর অন্য কিছুতে নয়। কাতর হওয়ার অনেক জায়গা থাকা সত্ত্বেও এই একটি জায়গাই তাঁকে মরমে মারছে। এই মুহূর্তে এর থেকে পরিত্রাণের আর কোনা পথ খোলা নেই।

গালিব ধীরে ধীরে বললেন, সেদিন আমি সইফতাকে একটি শের শুনিয়েছিলাম। তুমিও শোন :

'দিল হি তো হ্যায় না সঙ্গ র খিশত, দর্দ সে ভর না আয়ে কিঁয়ো?
রোয়েঙ্গে হম্ হ্জার বার, কোই, হঁমে সতায়ে কিয়োঁ?
এতো হৃদয়ই, ইট-কাঠ-পাথর নয়, দুঃখে কাতর হবে না কেন
কাঁদবো আমি হাজার বার, কেউ দুঃখ দেবে কেন?'

আলতফের বুকের ভেতর শব্দ গুড়গুড় ধ্বনি তোলে। কেউ দুঃখ দেবে কেন? কেউ দুঃখ দেবে কেন...। দুঃখতো মানুষই দেবে। দুঃখ দেয়ায় আনন্দ আছে। স্বার্থ আছে। দুঃখতো মানুষের কাছ থেকে আসতেই থাকবে। একজন কবিকে এই সত্য বুঝিয়ে দেয়ার সাধ্য কি কারো আছে? কবির দুঃখের কথা কবিকেই বুঝতে হবে।

কদিন ধরে ফজল হকের চিন্তা গালিবকে খুবই পীড়িত করছে। এমন এক ঘনিষ্ঠজনকে হারিয়ে তিনি তাঁর শোকের মুহূর্ত কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। যাবজ্জীবন দীপান্তর। এমন শাস্তি মানুষ যেন কখনো পায় না! মানুষকে বাঁচতে দিয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দেয়া। এটা শুধু নিষ্ঠুরতা নয়, বর্বরতা। গালিব পায়চারি করেন, পানি খান, লেখার টেবিলে বসেন, চিৎকার করে নিজের শের আবৃত্তি করেন—নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা তাঁর জন্য খুব কষ্ট হয়ে যায়।

তাঁর উচ্চকণ্ঠ শুনে উমরাও বেগম আসেন।

কি হয়েছে?

তিনি থমকে থাকেন। চোখ বড় করে তাকান। উমরাও বেগমের মনে হয় তাঁর বড় চোখের পাতায় গাঢ় অন্ধকার। একফোঁটা আলো নেই। মরে গেছে কি তাঁর স্বামী? এমন মৃত্যুতো তিনি কখনো দেখেননি। তাহলে?

আবারও বলেন, কি হয়েছে?

গালিব নিমগ্ন কণ্ঠে বলেন, কিছু না।

তাহলে চিৎকার করছিলেন যে?

অভিশাপ দিচ্ছিলাম।

কাকে?

বর্বর মানুষদের।

বর্বর মানুষ? কারা?

অভিজাত মানুষ হয়ে যাদের কাছ থেকে সরকারি পেনসন নেই।

ওহ! উমরাও বেগম দু'হাতে মুখ ঢাকেন।

বিবি আমাদের অনেক কষ্ট।

হ্যাঁ, কষ্টই তো। লোহারু বংশ শেষ হয়ে গেলো। যেটুকু বাকি আছে তার আয়ু বেশি দিন নেই।

আমার কষ্ট অন্য রকম।

গজলের কষ্ট। মুশায়রা না থাকার কষ্ট।

এই মুহূর্তে একজন বড় মানুষের জন্য কষ্ট।

ফজল হকের জন্য?

তুমি কি করে বুঝলে?

আমার মনে হয়েছে আপনার আশেপাশে যত কবি আছে তার মধ্যে ফজল হকের সঙ্গেই আপনার ভালোবাসা গভীর। তাঁর শাস্তি যাবজ্জীবন দীপান্তর হওয়ায় আমিও খুব কষ্ট পেয়েছি। তার জন্য আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি।

তাঁর পরামর্শে আমি আমার উর্দু দীওয়ান আবার সম্পাদনা করেছিলাম।

আপনিতো আপনার নিজের গজলের ব্যাপারে কারো কথা শুনেন না।

আমি তাঁকে মান্য করি। তাঁর জ্ঞানকে শ্রদ্ধা করি। তিনি আমাকে বলেছিলেন ব্রিটিশের অধীনে কাজ করার সময় তাঁকে বেশ অপমান করা হয়েছিল। আমি জানি তিনি চেয়েছিলেন মুঘল শাসনের অধীনে পুরনো হিন্দুস্থান আবার ফিরে আসুক।

উমরাও বেগম বিষয়টি না বুঝে অন্য প্রসঙ্গে যান। বলেন, শহরের মুসলমানরাতো ফিরে আসার অনুমতি পায়নি।

জানি। পারমিট নিয়ে ওরা শহরে আসা-যাওয়া করে। কিন্তু থাকতে পারে না।

কবে ওদের অনুমতি দেয়া হবে?

জানি না।

উমরাও বেগম যাবার জন্য উঠে দাঁড়ান। বলেন, আপনি কি মিছরির শরবত খাবেন?

হ্যাঁ, পাঠিয়ে দিও। কাল্লু গোশত আনতে পেরেছে?

এখনতো আপনি রোজই শামী কাবাব, গোশতের সুরুয়া সবই খাচ্ছেন।

গোশতের অভাবে আমি অর্ধেক মরা হয়ে গিয়েছিলাম।

আমি তা জানি। আপনার খাবার তো ওই একটাই। গোশত না খেলে—

গালিব হেসে বলেন, থাক আমাকে আর বাঘের কথা বোল না। আমি বাঘ নই যে গোশত ছাড়া অন্য কিছু খাই না। এই তিন বছর বেঁচে থাকলাম কি করে? বিবি মানুষই পারে মানুষ থাকতে।

উমরাও বেগম কোনো কথা না বলে বেরিয়ে আসেন। ভাবেন, এই মানুষটির সঙ্গে ঘর করতে করতেই তাঁর দিন ফুরিয়ে গেল। সাতটি সন্তান মরে গেছে। কোনো একজনের জন্মের সময় তিনিও তো মরে যেতে পারতেন, কিন্তু মারা যাননি। মানুষটির সঙ্গে শেষ দিন পর্যন্ত কাটানোর আয়ু খোদাতালা তাঁকে দিয়েছেন। তিনি আর কোথায় যাবেন? না বেহেশতে, না দুনিয়ায়—বাকিটুকু তিনি আর ভাবতে পারলেন না। মন খারাপ হয়ে যায় তাঁর। কেবলই মনে হয় বড় বেশি দুর্ভাগ্যের জীবন কাটিয়েছেন। সুখ তাঁর জীবনে অলীক পাখি। তিনি ঘরের দরজার সামনে এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন। বুক ভরে বাতাস নিলেন। আগ্রার কথা মনে এলো। যমুনা নদী ছবির মতো তাঁর স্মৃতিপটে আটকে আছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন, শৈশবই সুন্দর ছিল। সুন্দরের দিন বেশি দিনের হয় না। সুন্দর খুব তাড়াতাড়ি মরে যায়।

তিনি রান্নাঘরে গেলেন। শামী কাবাব তৈরি হচ্ছে। সুন্দর গন্ধ আসছে। তাঁর স্বামী খাবেন সন্ধেবেলা। তারপর মদ। মদ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বেন। তিনি চুলোর কাছে এসে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকলেন।

কি হয়েছে মাইজী?

তিনি চমকে তাকালেন। তাঁর চোখ ঝাপসা হয়ে এলো।

কি হয়েছে মাইজী?

আজ শুকনো কাঠে এত ধোঁয়া হচ্ছে কেন?

আজ তো ধোঁয়া কমই হচ্ছে মাইজী। অন্যদিন আরও বেশি হয়।

ও আচ্ছা।

আপনি আপনার ঘরে যান মাইজী। আমি বালতিতে পানি দিয়ে আসবো। চোখ ধুয়ে ফেলেন। চোখ লাল হয়ে গেছে।

উমরাও বেগম নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে ভাবলেন, চোখ কি ধোঁয়াতে লাল হয়েছে? ধোঁয়াতো তাঁর চোখ পর্যন্ত আসতেই পারেনি। নিজের জন্য তাঁর খুব মায়া হলো। একটি সন্তানও বেঁচে নেই। তিনি একজন সন্তানহীন

নারী। স্বামীর সঙ্গে যে ঘর, এটাও ঠিক ঘর না। জোড়াতালির ঘর। ভালোবাসা কি বুঝলেনই না। বোঝার বয়স কোনোকালে যে ছিল এটাও তিনি ভুলে গেছেন।

নিজের ঘরের সামনে বারান্দায় দাঁড়ালেন তিনি। নিজের কবি স্বামীর একটি শের মনে করার চেষ্টা করলেন। অনেক শেরই তাঁর মুখস্থ আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে কিছুই মনে আসছে না। তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে। প্রাণপণ চেষ্টা করছেন দুটো পঙ্‌ক্তি মনে করার। পারছেন না। পারছেন...

আম্মা আপনার জন্য পানি।

রাখো।

এক আঁজলা পানি মুখে ছিটানোর সঙ্গে সঙ্গে বুক চিরে বেরিয়ে আসে একটি শের :

'আমার ঘন নৈরাশ্যের মধ্যে কালের গতি রুদ্ধ;
যে দিন মিশকালো তার প্রভাতই বা কী, সন্ধ্যাই বা কী'।

উমরাও বেগম পানিভরা বালতির সামনে বসে পড়েন। দু'হাতে ছড়াতে থাকেন পানি। ভিজে যায় শরীর। তারপরও মনে হয় কোথাও জলের স্নিগ্ধ স্পর্শ নেই। সবটাই শুকনো কাঠের উত্তাপ এবং ধোঁয়া। তিনি পাগলের মতো বালতির পানিতে আলোড়ন তোলেন।

কিছুদিন পরে গালিবের কাছে খবর এলো যে ফজল হকের ছেলে ও বন্ধুরা যে তাঁর শাস্তির বিরুদ্ধে আপীল করেছিলেন আদালত তা নাকচ করে দিয়েছে। বরং ফল হয়েছে উল্টো। বলা হয়েছে দীপান্তরের আদেশ দ্রুততার সঙ্গে কার্যকর করতে। গালিব বিমর্ষ হয়ে গেলেন। শুনলেন, তাঁরা ইংল্যান্ডের আদালতেও আপীল করেছেন। নিজেকেই বললেন, এর দ্বারাও কিছু হবে না। কোনো লাভ নেই। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি এই শিক্ষা পেয়েছেন। পেনসনের মামলায় হেরে গিয়ে তিনি কলকাতা থেকে ফিরে এসে ইংল্যান্ডের আদালতে আপীল করেছিলেন। কোনো বিচারই পাননি। গদরের পরেতো অবস্থা আরও অনেক বেশি খারাপ। বিদ্রোহে যাঁরা সমর্থন দিয়েছিলেন তাদেরতো হত্যা করা হয়েছে। যাঁরা আয়ুর জোরে বেঁচে আছেন তাঁদের নানাভাবে দমন করা হচ্ছে। এই অরাজকতার শহরে তাঁদের জন্য কোনো আইন নেই।

ওহ, ফজল হক। কেমন করে আন্দামানে কাটাবেন তিনি। যেখানে ভয়ঙ্কর আসামিদের পাঠানো হয় সেখানে একজন পণ্ডিত মানুষ কি করে দিন কাটাবেন!

দু'হাতে চোখের জল মুছতে মুছতে তিনি বিড়বিড় করে বলতে থাকেন, ওহ্

ফজল হক! আপনার ঋণ যদি আমার জীবন দিয়ে শোধ করতে পারতাম তাহলে আমি তাই করতাম।

কয়দিন পরে বন্ধু সরুরের চিঠি পেলেন। সরুর তাঁর চিঠির সংকলন করার চিন্তা করছে। চিঠি সংগ্রহের কাজও শুরু করেছে।

সরুর লিখেছে : পেনসনের বকেয়া দিয়েতো আপনার ধার শোধ হবে না। হায়দ্রাবাদের নিজামকে কসীদা লিখে পাঠান। তিনি আপনাকে সাহায্য করতে পারেন। কিছু আর্থিক সাহায্য পেলে দুর্ভোগ মোকাবেলা সহজ হবে।

চিঠিটা দু'তিনবার পড়লেন। পড়ে ব্যথিত হলেন। সরুরকে ব্যথিত মনের প্রকাশ ঘটিয়ে একটি চিঠি লিখতে বসলেন। এখন আর আগের মতো লেখা হয় না। বসলেই কোনো কাজ করা হয়ে ওঠে না। ভাবতে ভাবতে সময় গড়িয়ে যায়। ভাবলেন, বয়স তাঁকে কাবু করে ফেলছে। তিনি নিজেকে সুস্থির করে দোয়াতে কলম ডোবালেন। লিখতে শুরু করলেন : লেখাটি শুরু করছি এভাবে যে তুমি ভাববে এসব কথার কি দরকার ছিল। কিন্তু আমার মনে হয়েছে কথাগুলো তোমাকে জানাতে হবে। না জানালে কেন লিখছি সেই লেখাটা তোমার কাছে অন্যরকম অর্থ নিয়ে হাজির হবে, বন্ধু। আমি তোমার বোঝায় অস্পষ্টতা রাখতে চাই না।

আমাকে যারা চেনে তারা সবাই জানে যে আমার পাঁচ বছর বয়সে আমার আব্বা মারা যান। তেমন করে কিছুই বুঝিনি। কেঁদেছিলাম কিনা তাও মনে নাই। বন্ধু, স্মৃতিতে জমেছে অনেক সঞ্চয়।

আমার নয় বছর বয়সে মারা যান আমার চাচা। চাচার ভূ-সম্পত্তির বদলে আমার ও আমার আত্মীয়দের পাওয়ার কথা ছিল দশ হাজার। হিসেব সে রকমই করা হয়েছিল। কিন্তু লোহারুর নওয়াব আহমদ বখশ এই পরিমাণ টাকা দিতে রাজি হলেন না। তিনি বলে দিলেন, তিন হাজার টাকার বেশি দিবেন না। ফলে আমার ভাগে পড়লো মাত্র সাড়ে সাতশো টাকা।

এই অসঙ্গতি দেখে আমি ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। আমি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলাম। দিল্লির রেসিডেন্ট কোলরুক সাহেবের কাছে গেলাম।

কলকাতায় গেলাম। কলকাতার সরকারি সচিব আমাকে বলেছিলেন যে, আমি যা দাবি করেছি তা ন্যায়সঙ্গত। আমার দুর্ভাগ্য এমনই যে এর পর পরই দিল্লির রেসিডেন্ট পদচ্যুত হলেন। আর সচিব অকালে মৃত্যুবরণ করলেন।

কয়েক বছর পরে দিল্লির বাদশাহ আমার জন্য পঞ্চাশ টাকা মাসিক বৃত্তি মঞ্জুর করলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী ধার্য করলেন বছরে চারশো টাকা। দুর্ভাগ্য

এমন যে দুই বছর পরে সেই উত্তরাধিকারী মারা যান। অযোধ্যার নওয়াব ওয়াজিদ আলি শাহ বছরে পাঁচশো টাকা ভাতা দেয়ার কথা বললেন। দু'বছরের মধ্যে তাঁর রাজত্ব আর থাকলো না। ধ্বংস হয়ে গেলো। তাঁর ধ্বংসের আগে আমি সাত বছর তাঁর রুটি খেয়েছি। দুর্ভাগ্য আমার পায়ে পায়ে চলে। যারা আমার পৃষ্ঠপোষক ও শুভাকাঙ্ক্ষী তারাই একের পরে এক ধ্বংস হচ্ছে। এখন যদি আমি দক্ষিণের শাসকদের দিকে হাত বাড়াই তাহলে সেটা আমার জন্য ভালো হবে না। প্রচেষ্টা সফল হবে বলে মনে হয় না। শুধু শুধু কসীদা লিখব, কিন্তু ভাতা মঞ্জুর হবে না।

হায়দ্রাবাদের নিজামকে কসীদা লেখার বিপক্ষে তাঁর মনোভাবের কথা এভাবে জানিয়ে দেন। চিঠি লেখা শেষ করে প্রতিদিনের কাজ নিয়ে বসেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে, বিভিন্ন জনের কাছ থেকে আসা গদ্য-পদ্য সংশোধনের কাজ। যথেষ্ট পরিশ্রম হয়, তারপর কাজটি তিনি রোজ করেন। লেখাগুলো শুধু দিল্লি থেকে আসে না, আসে বেরিলি, লক্ষ্ণৌ, কলকাতা, বোম্বে এবং সুরাট থেকে।

বাকির ইদানিং এসব ব্যাপারে নানা প্রশ্ন করে। ও বেশ বড় হয়েছে। ওর চাঞ্চল্য কমেছে। ধীরস্থির স্বভাবের বাকির নানাজানের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করে। মাঝে মাঝে অনুযোগ করে বলে, নানাজান আপনি খুব খাটুনি করছেন। আপনার চোখ বসে গেছে।

একটা চোখে তো প্রায় কিছুই দেখতে পাই না। আর একটা চোখেই যা কিছু দেখা।

তাহলে এসব কাজ থাক নানাজান। চোখ নষ্ট হয়ে গেলে তখনতো আরও বিপদ হবে।

দুনিয়া দেখা হবে না। তুমি যে দিনে দিনে বড় হয়ে যাচ্ছ এটাও দেখা আমার হবে না।

তাহলে এইসব কাজ আর করবেন না। থাক এসব।

ও কাগজগুলো গুছিয়ে সরিয়ে রাখতে চায়।

গালিব বাধা দেন। বলেন, এটুকু করতে দাও আমাকে। আর মাত্র অল্প বাকি।

অল্প কোথায়? এটাকে আমি কাগজের পাহাড় বলবো।

বাকির দু'হাত রাখে কাগজের ওপর।

গালিব মৃদু হেসে বলেন, আমি এরপর থেকে তোমার কথামতো কাজ করবো।

আপনার চোখ আমাদেরকে বাঁচাতে হবে নানাজান। যেটুকু দৃষ্টি বাকি আছে সেটুকু শুধু গজল লেখার জন্য থাকবে, আর কোনো কাজের জন্য না।

গালিব খুশি হয়ে বলেন, আচ্ছা ঠিক আছে। কেউ তাঁর যত্ন নিচ্ছে ভাবতেই তাঁর বুকের ভেতর আনন্দের ঢেউ ওঠে। অনুভব করেন তাঁর চারদিকে সুবাতাস। আহ্, কি আনন্দ! এমন আনন্দের সঙ্গে এতদিন তাঁর কোনো যোগ ছিল না। খোদা মেহেরবান।

বাকির দ্রুত হাতে টেবিলটা গুছিয়ে দেয়। বলে, নানাজান আপনার শুনতে অসুবিধা হয়। এখন কেমন আছে আপনার কানের মেজাজ?

দু'কানেরই মেজাজ ভালো নেই। আমার চেয়ে আমার কান বেশি বুড়ো হয়ে গেছে। যত তাড়াতাড়ি পারছে তত তাড়াতাড়ি কবরের দিকে চলে যাচ্ছে আমার শোনার শক্তি।

আহারে, আমার নানাজান। বাকির দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে।

এতদিন আপনি আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করেছেন। এখন আমাদের করা উচিত। আমি আর একটু বড় হলে আপনাকে কিচ্ছু করতে দেবো না।

তাহলে আমি কি করবো?

খাবেন আর ঘুমুবেন।

নেশা করবো না?

করবেন।

করবো? বাহ তুমিতো দারুণ নাতি আমার। কত অনায়াসে পারমিশন দিয়ে দিলে। তোমার নানিজান তো একদম সহ্যই করতে পারে না।

নানিজানের বয়স হয়েছে না। নানিজানের কত কষ্ট! একটি বাচ্চাও বাঁচেনি। আপনারওতো কষ্ট আছে নানাজান!

গালিব চুপ করে থাকেন। এই ছেলেটি বুঝি হঠাৎ করে তাঁর সামনে বড় হয়ে গেলো। এই সেদিন নাচতে নাচতে জামা মসজিদে নামাজ পড়তে গেলো! এই সেদিন বুঝি কিছু একটার বায়না করেছিল—অবুঝ বালকের মতো। আসলে ও একটু একটু করে বড় হয়ে গেছে। ওর বড় হওয়া তিনি খেয়ালই করেননি। হায় বাচ্চা, তুমি এখন আমার অভিভাবক হয়ে গেছ! গালিব ওর দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকেন।

হাসছেন যে নানাজান?

এখন থেকে তুমি আমার গার্জিয়ান।

বাকির হঠাৎ লজ্জা পেয়ে দ্রুতপায়ে ঘর ছাড়ে। যেতে যেতে বলে, আমি আবার আসব।

গালিব আনন্দ-মুগ্ধতায় বিগলিত বোধ করেন। জীবনের এই গভীর রহস্য তাঁর অনুভবে ছিল না। হঠাৎ করে একটি বিশাল দরজা খুলে গেছে তাঁর সামনে। তিনি অবাক হয়ে সেই বিস্ময়কে অবলোকন করে। এই নতুন ভালোলাগা তাঁর এতকালের জীবনযাপনকে উল্টে দিয়েছে। নিজের এই প্রাপ্তি তাঁর কাছে বিশাল হয়ে ওঠে। তিনি ভাবতে থাকেন কোনো একটি গজল দিয়ে তিনি তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করবেন। প্রতিদিনের সাহচর্য পাওয়া দুটি বালকের একজন কিশোর হয়ে উঠেছে। চারপাশ বুঝে ওঠার অভিজ্ঞতা হয়েছে। তিনি এতকাল নিজেকে নিয়েই মগ্ন ছিলেন। এখন সেই কিশোর নিজেই সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলছে, দেখো আমাকে। গালিব নিজের শের আবৃত্তি করলেন :

'এদিকে আমি—শত সহস্র আর্তনাদ;
ওদিকে তুমি—এক পরমাশ্চর্য না শোনা।।'

পরক্ষণে আরও একটি শের মনে করে তিনি আপ্লুত হলেন :

'শত শোভা রয়েছে চোখের পাতা তোলার অপেক্ষায়,
চোখের দানে ধন্য হবার সামর্থ্য কি আছে তোমার?'

কিছুদিনের মধ্যে দুই বালককে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ হলো তাঁর। বাকির বড় বলে ও নানা কিছু বুঝে উঠতে শুরু করেছে। হুসেন এখনও অবুঝ বালক। গালিব বুঝতে শুরু করেছেন যে দুই বালকের কাছ থেকে তিনি দুই ধরনের আনন্দ পাচ্ছেন। এখন তিনি একটি নতুন ভুবনে ঢুকেছেন। এই ভুবনের আলো-অন্ধকার তাঁর আগামী দিন।

চরম দারিদ্র্য থেকে রেহাই পেয়েছেন। আনন্দের নতুন জমিন পেয়েছেন। ত্রিশ বছর পরে দিল্লি থেকে বাইরে যাওয়ার সুযোগ এসেছে।

নওয়াব ইউসুফ খাঁর পরগণা রামপুরা যাবেন। নওয়াব তাঁকে একশ টাকা করে মাসিক ভাতা দিচ্ছেন। ওস্তাদের সম্মানদক্ষিণা। প্রয়োজনে মাঝে মাঝে বাড়তি টাকাও পাঠান। এই যোগাযোগ কাজটি করে দিয়েছিলেন ফজল হক। তাঁরই পরামর্শে গালিব নওয়াবের নামে কাসীদা লিখে পাঠিয়েছিলেন। এতে কাজ হয়েছিল। নওয়াব রাজী হলেন। প্রবল দুঃসময়ে ফারসিতে একটি কাতা লিখে পাঠিয়েছিলেন বছর দুয়েক আগে। সে সময় নওয়াব কোনো জবাব দেননি। এবার গালিব নওয়াবের শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। নওয়াবের লেখা কবিতা অনবরত সংশোধন করে পাঠিয়েছেন। ওস্তাদ হিসেবে সম্মান পেয়েছেন। নওয়াব তাঁকে নানা উপহার পাঠিয়েছেন। নওয়াবের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এখন তিনিই নওয়াবের আমন্ত্রণে রামপুরা যাচ্ছেন। সঙ্গে বাকির আর

হুসেন। তাঁদেরকে দেখাশোনার জন্য আছেন দু'জন অনুচর।

বাকির আর হুসেনের খুশির সীমা নেই।

নানাজান আমরা কয়দিনে রামপুরা পেঁছাবো?

ছয়দিন লাগবে।

বাকির বিজ্ঞের মতো বলে, আমাদেরকে অনেকগুলো জায়গা পার হয়ে যেতে হবে বলে শুনেছি নানাজান।

হ্যাঁ, বেশ কয়েকটা। গালিব আঙুল গুনে বললেন, যেমন ধরো মুরাদনগর, মীরাট, শাহজাহাঁপুর, গড়মুক্তেশ্বর ও মুরারাদাদ।

বাকিরও আঙুলে গুণছিল। গালিব চেঁচিয়ে বললেন, পাঁচটা জায়গা দেখতে দেখতে যাওয়া হবে।

আমার মনে হচ্ছে পুরো দুনিয়াটা আমার দেখা হয়ে যাবে নানাজান।

গালিব মৃদু হেসে ওর মাথায় হাত রাখেন।

একদিন তাঁরা পৌছে গেলেন রামপুরা।

নওয়াব তাঁর ওস্তাদের যত্নের ত্রুটি করলেন না। নিজে তাঁকে সাদরে বরণ করলেন। থাকার জন্য বড় একটি বাড়ি দিলেন। প্রতিদিন সময় মতো যেন খাবার পৌছে যায় সে ব্যবস্থাও করলেন। খাবারের আয়োজনে গালিব প্রীত হয়ে গেলেন।

রাতের বেলা দু'ভাই বলে, আমরা এখান থেকে যাবো না নানাজান।

আমরাতো মেহমান।

মেহমানতো কি হয়েছে? আপনিতো নওয়াবের ওস্তাদ। যতদিন ইচ্ছা ততদিন থাকবেন।

তা কি হয়? এতো ভালো দেখায় না। লোকে বলবে আমরা নওয়াবের ঘাড়ে উঠেছি।

হুসেন গাঁইগুঁই করে বলে, দিল্লি গেলেতো আমরা এত খাবার খেতে পারবো না।

এখনতো দিল্লিতে আমাদের আর কষ্ট নেই। তোমরা রোজ রোজ গোশত-রুটি খাচ্ছ, ফল-মিঠাই-দুধ খাচ্ছ।

সে খাবারগুলো এ রকম না—হুসেন গোঁ গোঁ করে বলে।

বাকির ওকে হাত ধরে বাইরে টেনে নিয়ে যায়। যেতে যেতে বলে, পরের খাবারে লোভ করতে হয় না ভাইয়া।

হুসেন জেদের সঙ্গে বলে, আমি এখানেই থাকবো।

ওরা থাকতে না দিলে? ওরা যদি বাড়ি থেকে বের করে দেয়? যদি খাবার না দেয়?

ভাইয়ের কথা শুনে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে হুসেন।

বাকির বলে, চলো নদীর ধারে যাই।

বাচ্চাদের মুখে নদীর কথা শুনে গালিব নিজেও ভাবেন, নদীর কাছে যাবেন। কাছেই কোশী নদী। কিন্তু অতটা পথ হাঁটতে পারবেন না ভেবে দমে গেলেন। কি সুন্দর নদী, যেমন স্বচ্ছ পানি, তেমনি ঠাণ্ডা। হাত ছোঁয়ালে শরীর সজীব লাগে। খেতেও ভালো। মিষ্টি স্বাদ আছে। মাঝে মাঝে কাজের লোকদের ডেকে, কুঁজো ভরে নদীর পানি আনতে বলেন।

বাকির নদীর পানি খুব পছন্দ করে। বলে, দিল্লিতে আমরা নদীর পানি খাইনি নানাজান।

হ্যাঁ, ওখানে আমাদেরকে কুয়োর পানি খেতে হয়।

কুয়োর পানির চেয়ে নদীর পানি অনেক ভালো।

এই পানি খেয়ে আমার কলিকের ব্যথা ভালো হয়েছে। খাবার হজমও হয়।

কোশী নদীকে আমরা দিল্লি নিয়ে যেতে পারি না?

নদী কি মালামাল যে ঘাড়ে তুলে নিয়ে যাবে?

গালিবের মৃদু হাসিতে লজ্জা পায় বাকির। বলে, এখানকার বাড়িগুলো মাটির তৈরি। বেশ ঠাণ্ডা। বাস করতে ভালো লাগছে।

রামপুরে পাথর পাওয়া যায় না। সেজন্য বেশির ভাগ বাড়ি মাটি দিয়ে তৈরি হয়। দেখছো না, মাত্র কয়েকটি ইটের ইমারত।

আজ যখন নানিজানকে চিঠি লিখব তখন এসব কথাই লিখব।

কি লিখবে?

লিখব যে এখানে আমরা কেমন ভালো আছি। নদীর কথা, মাটির বাড়ির কথা লিখব।

খাবার দাবারের কথা লিখবে না?

খাবারের কথাতো আগেই লিখেছি। এমন খাবার আমরা দিল্লিতে খাইনি সেকথা লিখেছি।

তোমার নানিজান মন খারাপ করবে। ভাববে, নাতিরা তার দেয়া খাবারের কদর করছে না।

বাকির চুপ করে যায়। এ বিষয়টি ও ভেবে দেখেনি। ওর বুদ্ধিই বা কি! ওকে আরও অনেক কিছু শিখতে হবে। ও একটু লজ্জা পায়। নানিজানের কথা

AMARBOI.COM

ভেবে মন খারাপ করে। তারপরে দু'ভাইয়ে নানিজানকে চিঠি লিখতে বসে।

গালিব নিজেও চিঠি লিখতে বসেন। বিভিন্ন জায়গায় সব সময় চিঠি না লিখলে তার দিন কাটতে চায় না, এটাতো দীর্ঘকালের অভ্যেস। তার ওপর দিল্লির বাইরে আছেন। কোথাও থেকে তাঁর জন্য কোনো খবর থাকলে সেটা পেতেও তাঁর দেরি হবে।

চিঠি লেখা শেষ করে দু'ভাই নানার সামনে এসে বলে, নানাজান আমরাতো নানিজানকে চিঠি লিখছি, কিন্তু নানিজান কীভাবে চিঠি পড়বেন? তিনি তো চিঠি পড়তে পারেন না।

তোমরা কি ভুলে গেছ যে আমি গুলাম নজফ খানকে বলে এসেছি যে আমাদের চিঠি তাঁকে পড়ে শোনাতে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ আমাদের মনে পড়েছে।

হুসেন দু'তিন লাফ দিয়ে কথাটা বলে। তারপর গালিবের সামনে এসে দু'হাত ধরে বলে, আমি আর এখানে থাকবো না। আমি নানিজানের কাছে যাবো।

ঠিক আছে যাবো।

না, আমি কালকেই যাবো। ও জেদ করে।

কালকেতো আমি যেতে পারবো না। আমি এখানে নওয়াবের মেহমান। তিনি যেদিন আমাকে ছাড়বেন আমি সেদিন যাবো।

তাহলে আমাকে পাঠিয়ে দিন।

তুমি কেমন করে যাবে? একা?

একাতো আমি যেতে পারবো না। আমাকে কারো সঙ্গে পাঠিয়ে দিন।

আগে তোমার চিঠি পাঠিয়ে দেই। তোমার নানিজানের কাছে আমি লিখবো যে তোমরা ফিরে যেতে চাও। তিনি যদি বলেন, তোমাকে পাঠিয়ে দিতে, তাহলে আমি পাঠিয়ে দেব। ঠিক আছে?

আচ্ছা। হুসেন ঘাড় কাত করে।

দু'ভাই হাত ধরে ছুটে যায় মাঠে।

গালিব বারান্দায় বসে ওদের খেলতে দেখেন। এ কয়দিনে ওদের জন্য জমা হয়েছে দু'তিনটে বকরী, বেশ অনেকগুলো পায়রা, কয়েকটি তিতির, নানা আকারের একগাদা ঘুড়ি। বাকির ঘুড়ি ওড়াতে ভালোবাসে। মাঝে মাঝে আর একজনের হাতে নাটাই দিয়ে দৌড়ে এসে তাঁকে বলে, ঘুড়ি যখন আকাশের দিকে যেতে থাকে তা দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। ইচ্ছে হয় ঘুড়ির মতো উড়ে আকাশ ছুঁয়ে আসি। সে জন্য যখন নাটাইয়ের সুতো ছাড়ি তখন সবচেয়ে

বেশি আনন্দ পাই। মাঝে মাঝে ঘুড়িটা আপনার ছবি হয়ে যায়।

বাহ, তুমিতো বেশ ভাবতে পারো। তোমার আব্বার মতো কবি হবে নাকি?

না, আব্বার মতো না। হলে আপনার মতো হবো। আপনার মতো কবিতার আকাশ হবো। সবাই আমাকে আপনার মতো ভালোবাসবে।

গালিব ওর ভাবনায় মুগ্ধ হয়ে যান। মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওকে দেখেন। মাথায় হাত দিয়ে বলেন, বড় হও।

বাকির আবার এক দৌড়ে মাঠে চলে যায়।

গালিব বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করেন। এখানে আসার পরে শরীর ভালো লাগছে। এই শান্ত-স্নিগ্ধ এলাকা তাঁর দুঃখের ওপর পরশ বুলিয়ে দেয়। অবসাদ ঘুচিয়ে দেয়। মন সতেজ রাখে। এক ঘুমে রাতটা বেশ পার হয়ে যায়।

নওয়াবের সঙ্গে তিন দিন দেখা হয়েছে তাঁর দরবারে। আপ্যায়নের ত্রুটি নেই। দেখতে দেখতে মাস দুয়েক পার হয়ে গেছে। একদিন একটি চিঠি পেলেন দিল্লি থেকে। গুলাম নফজ খান পাঠিয়ে দিয়েছেন। লিখেছেন পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্নর রবার্ট মন্টগোমারীও। তিনি তাঁকে লিখেছেন, খান সাহেব আপনার পাঠানো বই 'দস্তাম্বু' পেয়েছি। কসীদাটিও পেয়েছি। খুব সুন্দর কসীদা।

গালিব চিঠি পড়ে খুব খুশি হলেন। তিনি শুনেছেন তাঁর সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য নওয়াব ইউসুফ চেষ্টা করছেন। নওয়াবের দরবারের কেউ কেউ বলছেন, শিগগির গভর্নর জেনারেল দরবারে তাঁর নির্দিষ্ট সম্মানসূচক আসন এবং তাঁর পোশাক পুনর্বহাল করবেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁর এই সম্মান ফিরিয়ে দিলে তিনি চূড়ান্তভাবে বিজয়ী হবেন। এটা হবে কবিতার জয়। অহংকারের জয়। কোনো দয়া বা করুণা নয়। কদিন ধরে সরকারের এমন মনোভাবের কথা ভেবে তিনি আত্মগরিমায় রুখে দাঁড়ান। নিজের ভেতরে শক্তি অনুভব করেন। নিজেকে বলেন :

'দেখো তার বাক্যের চমৎকারিতা, সে যা বলে—
আমার মনে হয় এ-ও যেন, আমার হৃদয়ের মধ্যেই ছিল।'

সেদিন হুসেন এসে গালিবের কাছে টাকা ধার চাইলো। গালিব দু'ভাইকে দু'টাকা করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তোমাদের মাসের হাতখরচ।

দুজনে দশদিনের মধ্যে টাকা খরচ করে ফেলে। মহাফুর্তিতে আছে তারা। খরচের হিসাব-নিকাশও তাদের নেই।

হুসেন এসে সরাসরি বললো, নানাজান একটা টাকা কর্জ দিন।

কর্জ? গালিব কৌতুকের চোখে তাকান।

হ্যাঁ, কর্জ। শোধ দিয়ে দেব।

কবে শোধ দেবে?

হুসেন মাথা চুলকিয়ে ভাবে। আঙুল গুণে কিছু হিসেব করে। তারপর মাথা নেড়ে বলে, তা জানি না।

তাহলে তো শোধের কোনো সময় থাকলো না।

ও বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলে, তাই তো মনে হয়।

গালিব হাসতে হাসতে ওকে কয়েকটি পয়সা দিয়ে বলেন, শোধ দিতে হবে না। তোমাকে কর্জ না, উপহার দিলাম।

উপহার? ছোট্ট উপহার। আচ্ছা ঠিক আছে। তবে আমি চাইলে আমাকে কর্জও দিতে হবে।

ও চলে যায়। গালিব নাতির কর্জের ব্যাপারে কৌতুক বোধ করেন। মনে মনে বলেন, নাতি নানাজানের স্বভাব পেয়েছে। নানাজানের মতো দেনাজর্জরিত জীবন না পেলেই রক্ষা।

দু'চার দিনের মধ্যেই ছেলেরা দিল্লি ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। হুসেন বলে, নানিজান বোধহয় আমাদের জন্য কান্নাকাটি করছে। নানিজানতো আমাকে চোখের আড়ালই করতে চায় না। একটু না দেখলে বলে, কোথায় গেলি হুসেন।

বাকিরও গম্ভীর হয়ে বলে, এখানে অনেক আনন্দে আছি। কিন্তু আমার আর থাকতে ভালো লাগছে না। আমরা কালই চলে যাবো নানাজান।

কাল? কালতো নওয়াব আমাকে যেতে দেবে না।

আপনি তাহলে থাকেন। আমরা চলে যাবো। আমরা আর থাকবো না।

কালকের দিনটা আমাকে সময় দাও। আমি ভেবে দেখি।

ওরা যেতে যেতে বলে, বেশি ভাবতে দেবো না কিন্তু। মাত্র একদিন সময়।

সেদিনই দিল্লি ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন গালিব। অনুচরদের উপর নির্ভর করে এত লম্বা রাস্তা তিনি ওদের ছাড়তে চাইলেন না।

দিল্লিতে নিজের বাড়ির ছোট ঘরটিতে এখন তাঁর দিন কাটছে।

প্রতিদিনই কাউকে না কাউকে চিঠি লিখছেন। মজরুহকে লিখলেন, বাচ্চারা ফিরে আসার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ছেলেদেরকে শুধু লোক দিয়ে দিল্লিতে পাঠাতে সাহস করিনি। যদি পথে কোনো বিপদ ঘটে যেত তাহলে

কীভাবে নিজেকে সান্ত্বনা দিতাম, বলো বন্ধু। নিজেকে আমি ক্ষমা করতেও পারতাম না। সেজন্য আমাকে ফিরে আসতে হলো। আমি মনে করি ঠিকই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তা না হলে আমার গ্রীষ্ম ও বর্ষা রামপুরা কাটাবার কথা ছিল। বন্ধু, জীবনের অনেক আনন্দ আমি একা উপভোগ করেছি। এই ছেলে দুটো আমাকে জীবনের ভিন্ন ভুবনে নিয়ে গেছে। ওরা না থাকলে এই আনন্দ আমার পাওয়া হতো না।

চিঠিটা খামে ভরতে ভরতে তিনি চেঁচিয়ে কাল্লুকে ডাকেন।

ঘরে আসেন উমরাও বেগম।

কাল্লু মিয়াকে গোশত কিনতে পাঠিয়েছি।

গোশত! গালিব হাসি ছড়িয়ে বলেন, গোশত না হলে খেয়ে আরাম পাই না।

একথা আমার চেয়ে আর বেশি কে জানে।

তুমি তো জানবে। আমার কি অন্য কোনো বিবি আছে।

উমরাও বেগম সে প্রসঙ্গে না গিয়ে বলেন, রামপুরায় থাকায় আপনার স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে।

ওরা আমাকে খুব যত্ন করেছে। প্রত্যেক বেলায় ভালো ভালো খাবার দিয়েছে। বাচ্চারা আসতে না চাইলে আরও কিছুদিন থেকে আসতাম।

বাচ্চাদেরকে চাকরদের সঙ্গে না পাঠিয়ে ভালো করেছেন। ওরা আমাদের চোখের মণি।

ওদের আব্বাজান কবি আরিফ আমার চোখের মনি ছিল। ওর মৃত্যু আমাকে সবচেয়ে বেশি কাঁদিয়েছে। কত অল্প বয়সে ও ঝরে গেলো। হায়, ও কবিতার ফুল হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখতো।

উমরাও বেগম ওড়নায় চোখ মুছলেন। আরিফ ছিল তার ভাইয়ের ছেলে। তিনিও ওকে নিজ সন্তানের মতো ভালোবাসতেন। তাঁর দুই শিশু পুত্রকে দত্তক নিলেন দু'জনে।

উমরাও বেগম বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন, আপনি আরিফকে নিয়ে যে শের লিখেছেন তা আমার মনে আছে।

বলো, বিবি বল, আমরা দুজনে আরিফকে স্মরণ করি।

উমরাও বেগম গালিবের চোখে চোখ রেখে বলেন :

'হে আকাশের পীর, আরিফ যুবক ছিল,
ক্ষতি কি হতো, যদি রইতো কিছুদিন আরও?'

গালিব নিজে পরের অংশ বললেন :

'তুমি ছিলে গৃহের জ্যোতি আমার
কেন রইল না সে শোভা কিছুদিন আরও।'

বাকিটা আমি বলি। উমরাও বেগম জলভরা চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন :

'আমাকে ঘৃণা, সূর্যের সাথে লড়াই
শিশুদের তামাশা দেখতে কিছুদিন আরও?
গুজরি না বহর হাল য়ে মুদ্দত খুশ বা না খুশ
কারণা যা জওয়া মর্গ! গুজারা কোঈ দিন অন্তর।
আনন্দে-নিরানন্দে কাটলো না দিন
কাটানো যেতো না কিছুদিন আরও।'

থামলেন গালিব। তাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে বেড়ায় ঘরজুড়ে। কাটানো যেতো না কিছুদিন আরও? কার কাছে জানতে চাইবেন এই প্রশ্নের উত্তর? আরিফের মৃত্যু শুধু একজনের চলে যাওয়া নয়। দুটি বালকের ছায়ার মধ্যে বেঁচে আছে সে—আছে স্মৃতি, আছে কবিতা, আছে বেদনা—আছে দুঃখ ভোলার দিন। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা উমরাও বেগমের দিকে তাকিয়ে গালিব অন্যমনস্ক স্বরে বলেন, রামপুরায় আমি একটি নদী পেয়েছিলাম বিবি। আমার গজলের মতো নদী। শরীর শীতল করে দিয়েছিল।

নদী। উমরাও বেগম অস্ফুট কণ্ঠে বলেন, নদীর নাম কি?

কোশী। ভারী সুন্দর পানি। একদম মিঠা পানির মতো।

আমি একটাই নদীর নাম জানি।

যমুনা। যমুনা তোমার আমার নদী।

এতক্ষণে উমরাও বেগম মৃদু হাসেন। শৈশব প্রসঙ্গ তাঁকে সব সময় আনন্দ দেয়।

ছেলে দুটো নদী দেখে খুব খুশি হয়েছে।

ওরা নদীর অনেক গল্প করেছে আমার কাছে।

যাক, আমি খুশি যে রামপুরা ওদের ভালো লেগেছে।

আপনার ভালো লাগেনি?

নওয়াবের ওস্তাদ হিসেবে ওরা আমার খুব সম্মান করেছে। এত সম্মান আমার ভাগ্যে ছিল আমি তা ভাবতে পারিনি।

আল্লাহর কাছে হাজার শোকর যে আপনি সম্মান পেয়েছেন। দিল্লিতেতো আপনার চারদিকে আছে পাওনাদার আর হিংসা করা লোকেরা।

এখানে আমার বন্ধুরাও ছিল বিবি।

এখন নাই।

গদরের পরে প্রিয় মানুষের সংখ্যা নব্বই ভাগই কমে গেছে।

উমরাও বেগম আর কথা বাড়ান না। এই প্রসঙ্গ ধরে বলার মতো কথা আর তার নাই। গালিব নিজেই বলতে থাকেন, রামপুরা থেকে আসার পরে কত ধরনের কথা যে শুনতে হলো।

কে আবার আপনাকে কথা শোনালো?

মহল্লায় কি কথা শোনানোর লোক কম আছে? মানুষের হিংসের শেষ নেই বিবি। লোকে বলাবলি করেছে যে, নওয়াব কম করে হলেও গালিবকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছে। আবার কেউ বলেছে আসাদুল্লাহ নওয়াবের কাছে গিয়েছিল চাকরির খোঁজে। কিন্তু তার আশা পূরণ হয়নি।

গালিব শতরঞ্জির উপর পা ছড়িয়ে দিয়ে হাসলেন। তাঁর হাসি থামলে উমরাও বেগম বললেন, আপনি হাসছেন? আমারতো শুনে রাগ হচ্ছে।

আরও কি বলেছে শুনলেতো তোমার আরও রাগ হবে। শুনবে?

হ্যাঁ শুনবো। শুনলে মানুষের মনোভাব জানতে পারবো।

লোকেরা একধাপ বাড়িয়ে বলেছে যে, নওয়াব আমাকে চাকরি দিয়েছিল। দু'শো টাকা বেতন ঠিক হয়েছিল। কিন্তু লেফটেন্যান্ট গভর্নর আমাকে দেখে ভীষণ রেগে গেলেন। বললেন, গালিবকে এখনই এখান থেকে বিদায় করেন। নইলে আমাদের সঙ্গে আপনি ভালো সম্পর্ক রাখতে পারবেন না।

উমরাও বেগম ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকেন। বলেন, তারপর?

ওদের কথামত তারপর নওয়াব আমাকে তাড়িয়ে দিলেন।

আপনি ওদেরকে কিছু বললেন না?

না। কিছুই বলিনি। কেন বলবো? ওরা যা বলে বলুক। আমার আর মন খারাপ হয় না। আমি বিচলিত বোধও করি না।

কিন্তু আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে। মনে হচ্ছে মহল্লার লোকদের ঘরে ঘরে গিয়ে বলি—

মাথা ঠাণ্ডা রাখ বিবি। উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই।

কিন্তু এসব কথা কি শুনতে ভালো লাগে?

সেটা করাই সঙ্গত। ওদের সঙ্গে ঘাস খেতে ময়দানে নামলে আমিও একটা বকরি হয়ে যাবো। আমি বকরি হতে চাই না বিবি।

ঠিক আছে আমি যাই।

কোথায় যাবে? কি করবে?

মাথায় তেল আর পানি দেবো।

দু'ভাই কাছাকাছি কোথাও ছিল। ছুটে এসে উমরাও বেগমের হাত ধরে।

ওরা চলে যেতেই গালিবের মনে হয় সুযোগ পেলে তিনি আবার রামপুরে যাবেন। ইউসুফ নওয়াবের দরবারে যে সম্মান তিনি পেয়েছেন লালকেল্লায় সে সম্মান পাননি। রামপুরের নওয়াবের দরবারে তাঁর সবচেয়ে ভালো সময় কেটেছে। মানুষের জীবনে এমন সৌভাগ্য কমই হয়। রামপুরে আবার যাওয়ার যে ইচ্ছা তার হয়েছে তা কি পূরণ হবে? দেখা যাক উপরওয়ালা কি করেন! তিনিই তো জগতের মালিক! নিজেকে বললেন :

'যদি আকাশের রথচক্র থেমে যেত গালিব
যে যুগ ধ্বংস হলো, কেনই বা হলো?'

কয়েকদিন পরে আলতফ এসে জানাল খবরটি।

উৎফুল্ল আলতফ বললো, ওস্তাদজী আপনার জন্য খবর আছে।

খবর?

সইফতার সাত বছর দণ্ড মওকুফ হয়েছে।

সইফতা এখন কোথায়?

মীরাটে।

মীরাটে? মীরাটেতো ওর কেউ নেই।

এক বন্ধুর সঙ্গে আছে।

বন্ধুর সঙ্গে। গালিব আফসোস করে বললেন, এক সময়ের অভিজাত সইফতা এখন সর্বস্বান্ত। আমি কারাগারে বন্দী ছিলাম তখন বন্ধুদের মধ্যে সইফতা আমার সঙ্গে দেখা করতে যেত। আমরা দুজনে কিছুক্ষণ গল্প করতাম। তখন শইফতাকে আমার পরম আত্মীয় মনে হতো। অল্প কিছুক্ষণ সময় আমরা এক সঙ্গে কাটাতাম। মনে হতো অনন্ত সময়। আমি কখনো সেই সময়ের কথা ভুলি না।

গালিব থামলেন।

আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে যাব আলতফ।

মীরাটে?

হ্যাঁ মীরাটেই। মেল ট্রেনে যাবো।

পারবেন যেতে?

পারতেই হবে। বন্ধু আমার তুমি ভালো থাকো।

একজন অনুচর নিয়ে যাবেন কিন্তু।

দেখি কি ব্যবস্থা করতে পারি।

কবে যাবেন?

কালই।

আলতফ এই সিদ্ধান্তে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। মুখে কিছু বলেন না।

গালিব বলেন, বছর কয়েক আগে মেল ট্রেনে করে হাকিরকে দেখতে যেতে চেয়েছিলাম। হাকির তখন আলীগড়ে ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার যাওয়া হয়নি। হাকিরকে কথা দিয়েও আমি যেতে পারিনি। কিন্তু এবার আমার কথার নড়চড় হবে না। আমি যাবই।

আলতফ বুঝলেন যে গালিবের বুকের ভেতরে টান পড়েছে। না গিয়ে তিনি থাকতে পারবেন না।

আমি কি আপনার জন্য টিকিট কেটে আনবো?

হ্যাঁ, দুটো টিকিট কাটবে।

কে যাবে আপনার সঙ্গে?

একজন অনুচর তো যাবেই। ভেবো না বন্ধু।

তিনি আলতফকে টিকিট কাটার জন্য টাকা দিলেন। জামাকাপড় গুছিয়ে দিল কাল্লু। গম্মন তাঁর সফরসঙ্গী হলো।

ট্রেনে উঠে তিনি ভাবলেন, কখনো সময়ের গতি এমন তীব্র হয়। তখন কোনো দিকে তাকানোর ফুরসত থাকে না। এখন তিনি সময়ের তীব্র গতি নিজের মধ্যে ধারণ করেছেন। শীতলতা সেই গতির উৎস। কখনো মানুষ এভাবে নিজেকে উৎসের কাছে নিয়ে গিয়ে নিজের বন্ধ কুঠুরির দরজা খোলে। সে কুঠুরির অন্ধকার-আলো-বাতাস অনুভব করে। মানুষের জীবনে অনেক কুঠুরি থাকে। অনেক সময় সেগুলোর দরজা খোলাই হয় না।

ট্রেনের ঝাঁকুনিতে তাঁর ঝিমুনি এলো। তিনি কামরার দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুঁজলেন। করোটিতে ঘুরপাক খায় নিজের শের :

'হেমন্ত কী, বসন্তই বা কাকে বলবো—যে ঋতুই আসুক,
সেই আমি, সেই খাঁচা আর সেই কেটে ফেলা পালকের জন্য বিলাপ।'

মাথার ঘূর্ণিতে আবর্তিত হয় ঋতুচক্র—ফুল-পাখি-গাছ-সবুজমাঠ-প্রান্তর-দিগন্ত। গালিব ঘুমিয়ে পড়েন। বুঝতে পারেন যে কত হাজার বছরের ক্লান্তি তাঁকে ছেয়ে আছে। তিনি বুঝি আর এই ঘুম থেকে জেগে উঠতে পারবেন না।

রেল স্টেশনে এসে থামে।

মানুষের হৈচৈয়ে ঘুমের আমেজ কেটে যায়। মাথা বেশ ঝরঝরে লাগছে।

হুজুর।

এসে গেছি আমরা?

হ্যাঁ হুজুর।

পোটলা-পুঁটলি নিয়েছো?

সব গুছিয়ে নিয়েছি। আমরা নেমে যেতে পারি।

গালিব স্টেশনে নেমে চারদিকে তাকালেন। কি সুন্দর লাগছে চারদিক। মৃদু বাতাস এসে ছুঁয়ে যায় শরীর। অপূর্ব লাগছে শ্বাস নিতে।

একজন এসে জিজ্ঞেস করলো, তিনি দিল্লি থেকে আসা অতিথি কিনা?

আমি মুশরফির অতিথি।

তিনি আপনার জন্য পালকি পাঠিয়েছেন। আসুন।

ষোল বেহারার পালকি। পালকি দেখেই তিনি খুশি হয়ে গেলেন। অনেকদিন এত বড় পালকিতে চড়া হয়নি। পালকির হুম হুম ধ্বনি শুনে কাওয়ালির মতো মনে হচ্ছিল, যেন চারদিক থেকে কাওয়ালির ধ্বনি উঠে আসছে। খানিকটুকু আনন্দের সুখ মনের মধ্যে অনুরণিত হতে থাকলেও বাড়িতে এসে স্তব্ধ হয়ে গেলেন গালিব।

সইফতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারলেন না। হাতটা বাড়িয়ে তাঁকে ধরতেও পারলেন না।

দুই বন্ধু অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকেন।

কতক্ষণ?

তাঁরা জানেন না।

কতক্ষণ?

তাঁদের কোনো সময়ের হিসেব নেই।

কতক্ষণ?

তাঁরা হিসেব রাখতে শেখেন নি।

মুশরফি এসে বলেন, আপনাদের কি হয়েছে?

দুই বন্ধু চমকে তার দিকে তাকান।

আপনারা আসুন আমার সঙ্গে। এখানে বসুন। কতদিন পরে দু'বন্ধুর দেখা হলো?

কেউ কোনো কথা বলে না। এক সময় দু'জনে দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে।

গালিব রুদ্ধকণ্ঠে বলে, কত শুকিয়ে গেছ তুমি।

জেলে বসে তোমাদের কথা খুব মনে হতো।

আবার দুজনে চুপ হয়ে যান। দুজনেরই মনে হয়েছিল তাদের অনেক কথা জমে আছে। বুকভরা কথা গলগল করে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু ফল হলো

উল্টো। দু'জনের কেউই কথা বলতে পারছেন না। যেন দুজনের কেউ কখনো কবিতা লেখেনি। শব্দ ব্যবহার করতে জানে না। নিজেকে প্রকাশ করতেও তাঁরা ভুলে গেছেন। দুজনেই ছটফট করেন। অস্বস্তি কাটাতে চান।

সন্ধ্যার আগে মুশরফি বলে, চলুন আমরা মাঠে হেঁটে আসি।

গালিব বিভ্রান্ত বোধ করেন।

মাঠে হাঁটতে যাবো?

হ্যাঁ, মাঠে হাঁটবেন। একটু পরে সূর্য ডুববে। আপনারা সূর্য ডোবা দেখবেন।

সইফতা গালিবের হাত ধরে বলেন, চলো বন্ধু। আমরা সূর্য ডুবে যাওয়া দেখতে শিখবো। আমরাতো কত কিছুই ভুলে গেছি।

তাঁরা বেশ কিছুক্ষণ মাঠে হাঁটাহাঁটি করেন। তাঁরা সূর্য ডোবা দেখেন। শেষ আলোর বিকিরণ দেখেন। তাঁরা সন্ধ্যা নামতে দেখেন। পাখিদের ঘরে ফিরতে দেখেন। সূর্যাস্তের সোনালি আলোর পরে অন্ধকার গাঢ় হয়। তাঁরা দুজনে হাত ধরেন।

বাতাস বেশ ভালো লাগছে।

মনে আছে আমি যখন জেলে ছিলাম তুমি আমাকে দেখতে যেতে।

খুব মনে আছে। মনে থাকবে না কেন? আমি তোমার দুঃখের সময় ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিলাম।

তুমি তা পেরেছিলে। কারাগারে তোমাকে দেখলেই আমার মনে হতো পৃথিবীতে আমার কেউ আছে।

তখনকার সময় এবং এখনকার সময় একদম ভিন্ন।

আমি তোমাকে দেখতে এসেছি দুঃখ ভোলার জন্য।

আমরা আর দুঃখ ভোলা হবে না।

কেন?

কারণ আমাদের সিপাহীদের বিদ্রোহ সফল হয়নি। আমরা হেরে গেছি। তুমি কি বাদশাহর খবর জানো বন্ধু?

রেঙ্গুনে তিনি কেমন আছেন তা আর জানি না।

নির্বাসিত মানুষের থাকা আর না থাকা।

সইফতার কথার পরে গালিব আবার নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। বাদশাহর দরবার, মুশায়রা—না তিনি আর ভাববেন না। কবিতা লেখার দিনতো বুঝি তার ফুরিয়েছে। এখনতো আর মাথায় কিছু আসে না।

বিশাল অন্ধকারের পটভূমিতে সইফতার কণ্ঠস্বর ভেঙে চৌচির হয়ে যায়।

AMARBOI.COM

বলেন, বাদশাহর কোনো খবর পেলে আমাকে একটা চিঠি লিখে দিও।

খবর?

তুমি দিল্লিতে থাকবে। খবরতো তোমার কাছে আগে আসবে।

গালিব রূঢ়কণ্ঠে বলেন, কি খবর পেতে চাও তুমি?

যে কোনো খবর।

তাও বলতে পারছো না যে মৃত্যুর খবর।

হ্যাঁ, মৃত্যুর খবরই শুনতে চাই। তাঁর জীবনে আর কোনো খবর অবশিষ্ট নেই।

অন্ধকার ভেঙে চৌচির হতে থাকে। মুশরফি বলে, আপনারা বাড়িতে চলুন।

সইফতার কাছে চারদিন থাকলেন গালিব। প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটিয়ে ওঠার পরে দু'জনে বেশ ভালো সময় কাটালেন। সইফতার জাহাঙ্গিরাবাদের জমিদারি নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। সরকার বাজেয়াপ্ত করে রেখেছে। সইফতার পেনসনের ব্যাপারেও ফয়সালা হয়নি। সংকট এবং দুশ্চিন্তা তাঁকে কাবু করে রেখেছে। গালিবের সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়ে তিনি আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছেন।

বলেন, দণ্ড মওকুফ হওয়াতেই আমি বেশি স্বস্তি পেয়েছি। কারণ আমি কারাগারে মরতে চাইনি।

সরকার তোমার জমিদারি ছেড়ে দেবে। এ প্রক্রিয়ায় কাজ শুরু হয়েছে।

কবে কি হবে কে জানে!

পেনসনও হয়ে যাবে।

এটাই বা কি করে ধরে নেব যে হবে।

অভিজাত মুসলমানরাতো সরকারের দু'চোখের বিষ। আমার চেয়ে এটা আর কে বেশি ভালো বুঝবে।

ধৈর্য ধরো বন্ধু।

এখন প্রাণটা বেরিয়ে গেলেই রক্ষা পাই।

এই চারদিনে মন ভালো হয়েছে তোমার। মনটাকে আর খারাপ হতে দিও না। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দাও। ভালো থাকার চেষ্টা করো।

সইফতা মৃদু হেসে বললেন, আর ভালো থাকা। আমরা তো একই সাগরের ঝড়ে পড়েছি। ঝড়ে কারো জাহাজ পুরোই ডুবে গেছে। কেউ নিখোঁজ হয়ে গেছে। কেউ খড়কুটো ধরে ভাসছে। আমি এই শেষের দলে। ভাসতে

পারবো কিনা জানি না। কোনো একদিন হাত থেকে খড়কুটো ছুটে যাবে, আর—

গালিব দু'হাত উপরে তুলে বলেন, থাক, আর কি তা আমাদের জানার দরকার নেই।

হো হো করে হেসে ওঠেন সইফতা। প্রাণখোলা হাসি। অন্যরাও হাসিমুখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন। বেশ কিছুক্ষণ হাসলেন সইফতা। হাসি থামলে বললেন, অনেকদিন পরে হাসতে পারলাম। বুক ফাটানো হাসি।

গালিব হাসিমুখেই বললেন, মৃত্যু আমাদের কাছে এখন একটি বড় রসিকতা। মৃত্যুর কথা মনে করে আমরা হাসতে পারি।

পারিইতো। দিল্লির অভিজাত মুসলমানদের মৃত্যু চিনিয়েছে ইংরেজরা। সিপাহী বিদ্রোহে আমরা জয়ী হলে আমরা ইংরেজদের মৃত্যু চেনাতাম। বন্ধু আমাদের সামনে এমন দিন আসবে। আমরা প্রতিশোধ নেব।

কতদিনে? গালিব ভুরু কোঁচকান। আবার বলেন, দেখে যেতে পারবো কি?

সইফতা ঘাড় নাড়িয়ে হাত উঁচিয়ে বলেন, দিনের হিসাব করতে পারবোনা। সময়টা লম্বাও হতে পারে। ওরা বিজয়ী হয়েছে। নিজেদের মতো করে গোছাচ্ছে। এটাই ভাবনার বিষয় এখন যে আমাদের কত বছর লাগবে ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য। তুমি কি বলো বন্ধু?

আমি ভাবতে পারি না। বয়স হয়ে গেছে ভাবার সাধ্যও নাই। একশ বছরও লেগে যেতে পারে কে জানে!

সইফতা উচ্চ কণ্ঠে বলেন, তার কমও লাগতে পারে। তবে সময়টা লম্বা হবে এটুকু মনে হয়। আমরা দেখে যেতে পারবো না।

আর কথা হয় না। নিস্তব্ধ হয়ে থাকে সময়। এবং কবিদের চিন্তাও। দুজন কবি নিজেদের অনাগত দিনগুলো নিয়ে আর কিছু ভাবতে পারেন না। বর্তমানকে অতিক্রম করার চিন্তা করেন।

চারদিন বন্ধুর সঙ্গে কাটিয়ে দিল্লিতে ফিরে আসেন গালিব।

ছুটে আসে বাকির ও হুসেন।

তোমাদের জন্য দেখো কি এনেছি? ফল আর মিঠাই।

দু'ভাই হাত বাড়িয়ে ফল আর মিঠাই নিয়ে যেতে যেতে বাকির ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, নানাজান ওখানে নদী আছে?

নদী? নিশ্চয়ই নদী আছে। কিন্তু আমি যে বাড়িতে ছিলাম সে বাড়ির কাছে নদী ছিল না।

আপনি ঘুড়ি উড়িয়েছিলেন?

না তো। ঘুড়ি উড়াইনি।

তাহলে তেমন ভালো মজা হয়নি।

গালিব হাসতে থাকেন।

এবার আমরা কোথাও গেলে নানিজানকে নিয়ে যাবো। নেবেনতো নানাজান?

তোমাদের নানিজান কি যেতে চাইবে? এখন জিজ্ঞেস করো?

না, আমরা পরে জিজ্ঞেস করবো। এখন ফল-মিঠাই খেতে যাই।

গালিব উমরাও বেগমের দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমার শরীর খারাপ?

না। ভালোই আছি।

খারাপ খবর আছে কিছু?

বাড়িওয়ালা বাড়ি ছাড়তে বলেছে।

তাই নাকি? কবে?

এইতো আপনি যাওয়ার পরে।

একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। গত বর্ষায় অতি বৃষ্টিতে আমাদের খুব কষ্ট হয়েছে। বাড়ির যা অবস্থা।

গালিব খানিকটা স্বস্তি পাওয়ার চেষ্টা করেন। যদিও জানেন এই সময়ে বাড়ি পাওয়া বেশ কঠিন কাজ।

আমাদের একটা নতুন বাড়ি খুঁজতে হবে।

উমরাও বেগম বাড়ি বদলের চিন্তায় ম্রিয়মান। তবুও স্বামীকে কথাটা স্মরণ করান তাগাদা জানানোর ভঙ্গিতে। বাড়ি বদলের কথা ভাবতেও তাঁর খারাপ লাগছে। ঝক্কি-ঝামেলা সহ্য করাও কঠিন।

কিন্তু গালিবের চিন্তা অন্যত্র। বাড়ি কোথায় পাবেন? দিল্লির শত শত বাড়ি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। রাস্তা চওড়া করা হচ্ছে। ভিক্টোরিয়ান সৌধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। মহল্লার পর মহল্লা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। চোখের সামনে ঘটে যাওয়া এত কিছুতে তিনি ক্লান্ত। গালিব বাড়ি ছাড়ার কথায় নিজেও ক্লান্তি বোধ করেন। চাঁদনি চক আর খারি বাওলি পর্যন্ত রাস্তাটুকু শুধু ছাড় পেয়েছে। এক সময়ের ঘনবসতি আর দোকানপাটে ভরা এলাকাগুলো বিলীন হয়ে গেছে। খসবাজার নাই। উর্দুবাজার নাই। খানমকা বাজার নাই। এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এসব এলাকা যে কারো সাধ্য নেই খুঁজে বের করার যে তার বাড়িটি কোথায় ছিল।

উমরাও বেগম উঠতে উঠতে বলেন, গত দশ-বারো বছর ধরে আমরা এই

বাড়িটিতে থাকলাম। এখন ছেড়ে যেতে মায়াও লাগবে।

মায়া! পরের বাড়িতে মায়া কেন বিবি?

পরের বাড়ি হলে কি হবে নিজের বাড়ির মতোই তো থেকেছি। তাছাড়া বাড়ির মালিক হাসান খান আমাদের ভালোই দেখাশোনা করতেন।

বাড়ির যা হাল হয়েছে, ভাবতে আমার ভয় করে। বৃষ্টি হলে জিনিসপত্র একবার এদিকে টানতে হয় আর একবার অন্যদিকে। চার ঘণ্টা বৃষ্টি হলে ছাদ দিয়ে ছয় ঘণ্টা পানি ঝরে।

থাক, এসব বলে আর কি হবে! বাড়ির মালিকও তো বদল হয়ে গেছে। নতুন মালিক যখন ছাড়তে বলেছে ছেড়ে দেয়াই ভালো। এখনকার মালিকের নাম গুলাম উল্লাহ খান। আপনি তার সঙ্গে কথা বলেন।

আচ্ছা বিবি আজই কথা বলবো।

গুলাম বলেছে বাড়ি মেরামত করবে।

আচ্ছা, দেখি কি করি।

লোকটা বেশ বদরাগী। বাড়ির মালিক হয়ে দেমাগ বেড়েছে বলে মনে হয়।

অর্থ মানুষকে দেমাগী করে।

গালিব লেখার কাগজপত্র গোছাতে বলে উঠলেন।

উমরাও বেগম যেতে যেতে বলেন, আপনার মতো লোকেরা টাকা পয়সা হাতে রাখতে পারে না। নেশা করে উড়িয়ে দেয়। সে জন্য দিল্লি শহরে একটা বাড়ি করতে পারলেন না।

কথাগুলো বলে উমরাও বেগম গালিবের উত্তর শোনার অপেক্ষা করেন না। দ্রুতপায়ে চলে যান। গালিব এক মুহূর্ত ভাবলেন, বিবির কি বাড়ি না থাকার জন্য আক্ষেপ আছে? পরক্ষণে হাত ওলটালেন। থাকতেই পারে। লোহারু পরিবারের মেয়েতো। তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন এই বলে যে, আমার আক্ষেপ নাই। যার সন্তান নাই, তার আবার নিজের বাড়ির চিন্তা কি! থাকা, না থাকা সমান।

তিনি নিজের লেখার সরঞ্জাম গোছালেন। কিছুক্ষণ পরে এলেন গুলাম উল্লাহ খান।

আপনি? গালিব জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

আমি এই বাড়ির মালিক গুলাম উল্লাহ খান। বাড়িটি হাকিম মুহম্মদ হাসান খানের কাছ থেকে কিনেছি।

কার থেকে কিনেছেন সেটা আমি জানতে চাইনে। গালিবের কণ্ঠ রূঢ়।

AMARBOI.COM

গুলাম উল্লাহ এক মুহূর্ত থমকে গিয়ে বললেন, আপনাকে জানাতে চেয়েছি।

আমি প্রায় বারো বছর এই বাড়িতে আছি। আমি মালিকের নাম জানি। তিনি অত্যন্ত সজ্জন মানুষ।

গুলাম উল্লাহ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আমি আগামীকাল থেকে বাড়ির মেরারত কাজ শুরু করবো।

আমাকে তো কয়েকদিন সময় দেবেন নতুন একটি বাড়ি খুঁজে বের করার জন্য।

আমি তো সময় দিয়েছি। আজ আমি আবার বলছি আমি কাল থেকে বাড়ি মেরামতের কাজ শুরু করবো।

আমার বাড়ি খুঁজতে সময় লাগবে না?

সেটা আমি জানি না। আপনি কি করবেন তা আমি জানি না।

গুলাম উল্লাহ খান আর দাঁড়ায় না। হনহনিয়ে চলে যায়। গালিব ওর যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন। অবাক হন না। শহরটা এখন এমনই হয়ে গেছে। এটা আর কবিতার শহর নেই, এটা এখন বাণিজ্যের শহর। বাদশাহর শাসনের সময় যমুনা নদীর সেতুর ওপর ফুলের বেসাতি হতো। এখন এই শহরে আর ফুল বিক্রি হয় না। লোকে এখন মালিক-ভাড়াটিয়ার সম্পর্কতো এভাবে দেখবে। একজন অভিজাত মানুষের মূল্য তার কাছেই বা কি!

যেই কথা সেই কাজ।

পরদিন থেকে বাড়ি ঠিকঠাক করার কাজ শুরু হয়ে যায়।

বাকির এসে বলে, নানাজান আমি কি দুজন লোকের পিঠে ঘুষি লাগাবো?

গালিব মৃদু হেসে ওর দিকে তাকান।

হাসছেন যে?

ওরা শাবল-হাতুড়ি দিয়ে কাজ করছে। ঘুষি খেয়ে ওরা কি চুপ করে থাকবে?

তা হয়তো থাকবে না। হাতুড়ি দিয়ে আমার মাথা ফাটিয়ে ফেলবে।

তাহলে?

বাকির অস্থির হয়ে ঘরে ঘুরপাক খায়।

এই শব্দ আমার অসহ্য লাগছে।

চলো তুমি আর আমি বাড়ি খুঁজে দেখবো।

কোথায় খুঁজবো?

এই মহল্লাতেই। বল্লিমাঁরোতে।

ঠিক আছে চলেন।

দুজনে বাড়ির বাইরে বের হন।

প্রথমে দেখা হয় নুজ্জাত হুসেনের সঙ্গে। সে সালাম দিয়ে বলে, হজরত কোথায় যাচ্ছেন?

বাড়ি খুঁজতে।

আপনি বাড়ি খুঁজবেন কেন? আমরা খুঁজে দেবো। আমরা শুনেছি গুলাম উল্লাহ আপনাকে বাড়ি ছাড়তে বলেছে।

ওর বাড়ি ও ছাড়তে বলতে পারে। কিন্তু সময় তো দেবে!

হ্যাঁ, তা তো দেবেই। আপনি ঘরে থাকুন। আমরা এই মহল্লায় কোনো বাড়ি খালি থাকলে আপনাকে জানাবো।

কয়দিন লাগবে?

আজ আর কাল।

ঠিকতো?

এখনতো আমার এটাই কাজ। আর কোনো কাজ নাই।

আচ্ছা যাও।

নুজ্জাত হুসেন চলে যায়। বাকির নানার হাত ছাড়িয়ে নুজ্জাতের সঙ্গ ধরে।

আমিও আপনার সঙ্গে বাড়ি খুঁজবো।

চলো। তুমিতো এখন ভালোই বড় হয়েছো। আর এক দুয়েক বছরের মধ্যে চাকরি করবে। তারপর বিয়ে...

হা হা হাসিতে ভেঙে পড়ে নুজ্জাত। বাকির লজ্জায় কথা বলে না। পেছনে দাঁড়িয়ে থাকেন গালিব। বাকিরের চলে যাওয়া দেখেন। এই প্রথম ও একটি কাজের দায়িত্ব নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছে। ও এখন থেকে কাজের দায়িত্ব নেবে। ওকে আর কেউ ফেরাতে পারবে না। গালিব গভীর আনন্দে ডুবে যান। ভীষণ ভালো লাগে না। বাড়ি মেরামতের কাজ তাঁকে আর কাবু করে না। তিনি বলতে থাকেন :

'হো চুকেঁ গালিব বলায়েঁ সব তমাম্
এক মর্গ-এ নাগহানী অওর হ্যায়।
গালিব, সব দুঃখ ঘুচে গেছে
শুধু অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু রয়ে গেছে।'

তিনি ঘরে ফিরতে ফিরতে শেরটি আরও দুবার আওড়ালেন। মাঝে তিনি

AMARBOI.COM

নিজেই মৃত্যু বিষয়ে জ্যোতিষ গণনা করেছিলেন। বন্ধু-বান্ধবদের বলেছিলেন, তিনি ১২৭৭ শকাব্দে মারা যাবেন। নিজের মৃত্যু গণনার তারিখ ঠিক করেছিলেন ইসলামী সাল অনুযায়ী। বন্ধুরা অনেকে বিশ্বাসই করেনি। তাঁর ধারণা ছিল যে তিনি যা বলেছেন সেটা ঠিক হবে, কিন্তু হয়নি। সময় নিজের নিয়মে পার হয়ে গেছে। পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা গালিবের শরীর ছুঁয়ে দেখেনি। ভেবেছে বুঝি ওই শরীরে হাত বাড়ানোর সময় হয়নি। কিন্তু গালিব নিজে লজ্জা পেয়েছেন। তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী যাঁরা বিশ্বাস করেনি তাঁরা নানা প্রশ্ন করে তাঁকে নাজেহাল করেছে। হাসি-ঠাট্টা করেছে।

বেশতো কাটাচ্ছিলেন দিন, তবে কেন মৃত্যুর সাল ঘোষণা করেছিলেন?

এমনইতো ইঙ্গিত পেয়েছিলাম আমার আয়ুরেখায়। করতল মেলে দেখেছি।

ভুল দেখেছেন।

হয়তো তাই হবে।

ভুল কথা প্রচার করা ঠিক হয়নি। দিল্লি শহরে গালিব থাকবে না এটা কেইবা ভাবতে পারে। যমুনা নদী বলে গালিব, গালিব।

আমাকে আর লজ্জা দেবেন না।

এই মুহূর্তে হাতুড়ি আর শাবলের শব্দ শুনতে শুনতে সবকিছু তাঁর কাছে মৃত্যুর ঘন্টাধ্বনির মতো মনে হয়। তারপরও তিনি আবার সেই শেরই বলতে থাকেন :

'গালিব সব দুঃখ ঘুচে গেছে
শুধু অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু রয়ে গেছে।'

পরক্ষণে নিজেকে প্রশ্ন করলেন, তাই কি? সব দুঃখ কি ঘুচে যায়? মানুষের সব দুঃখ ঘুচে গেলে মানুষতো ফেরেশতা হয়ে যাবে। যে কবির দুঃখ থাকে না সে কবির কবিতা লেখা হবে না।

ঘরে ফিরে এলেন। দিনভর দেখলেন তাঁর বাড়ির উঠোনে আবর্জনার স্তূপ জমা করছে বাড়ির মালিকের মিস্ত্রিরা। তিনি দরজা বন্ধ করে রাখলেন। উমরাও বেগম অভিযোগ করতে এলেন।

এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা সম্ভব না।

নুজ্জাত হুসেন বলেছে, কালকের মধ্যে একটা বাড়ি ঠিক হতে পারে। বিবি তুমি জিনিসপত্র গোছগাছ করো।

আমার চাকর-নফররা সবই গুছিয়ে ফেলেছে প্রায়। বাকিটা বাড়ি ঠিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলবো।

গালিব হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে বলেন, আমাদের বাকির কাজের ছেলে হয়েছে। সংসারের অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে। বিবি ও নিজেও বাড়ি খুঁজতে গেছে।

উমরাও বেগম উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, খোদা মেহেরবান, ও এতবড় হয়েছে! ও আমাদের কথা ভাবতে শিখেছে।

দোয়া করতে করতে উমরাও বেগম বেরিয়ে যান। গালিব মনে মনে বলেন, একটা ফাঁড়া কাটলো। নইলে উমরাও বেগমের বিরক্তি দেখতে হতো।

সেদিনও বাড়ি পাওয়ার কোনো খবর হলো না।

পরদিন আলীগড় থেকে বন্ধুর চিঠি পেলেন। তিনি জানিয়েছেন মুনশী নবী বকশ হাকির ইন্তেকাল করেছেন। স্তব্ধ হয়ে রইলেন চিঠি পড়ে। তারপর মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন—আল্লাহর জন্যই আমরা এবং তাঁর কাছেই আমরা ফিরে যাবো। চিঠিটা বুকে চেপে ধরলেন। নিজেকেই বললেন, একজন কবির মৃত্যু সহ্য করা কঠিন। হাকির আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু ছিল। কবিতার একজন খাঁটি সমঝদার ছিল। আলীগড় থেকে দিল্লিতে এলেই দুজনের আড্ডা হতো। কবিতার আলোচনায় মেতে থাকতেন তাঁরা। কখনো সারাদিন চলে গেছে নিজেদের আবেগ-অনুভব প্রকাশে। নিজেদের অভিজ্ঞতার ভাগাভাগি করতেন তাঁরা। আহা, কি মধুর ছিল সে দিনগুলো। গালিবের চোখ দিয়ে জল গড়ায়। তিনি মুছলেন না। জল গড়াতে দিলেন। বললেন, হে বন্ধু বিদায়। চলে গেছে বসন্তের দিন।

তিনি চিঠিটা বুকে চেপে রাখলেন।

বয়সে তুমি আমার ছোট বন্ধু, অসুস্থও ছিলে না, তারপরও তুমি আমার আগে চলে গেছো। হায় আল্লাহ!

তিনি পানি খেলেন। গ্লাস হাতে নিয়ে পায়চারি করলেন। কাল্লুকে ডেকে বললেন, পেয়ালা এনে মদ আর গোলাপ জল মেশাতে। বড় অস্থির লাগছে।

কাল্লু এলে বললেন, মিস্ত্রিদের আজ যেতে বলো। ওরা যেন কাল আবার আসে। আমার ভীষণ মাথা ধরেছে।

কাল্লু গিয়ে ওদের কাজ থামাতে বললে, তারা বলে, না আমরা তা পারবো না। এটুকু শেষ না করে চলে গেলে সারাদিনের মজুরি দেবে কে? তোমার সাহেব? যাও, এখন সরো। পারলে বাড়ি ছাড়ো।

গালিব ঘরে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনলেন। তারপর চিঠিটা আবার পড়লেন। হাতুড়ির শব্দ এসে মাথায় লাগছে। চিঠিটা আবার পড়লেন। আবার। কাল্লু মদের পেয়ালা রেখে চলে গেছে। তিনি পেয়ালা হাতে নিয়ে বললেন :

'ভালোবাসা চায় ধৈর্য, বাসনা অধীর।
আঘাতে আঘাতে হৃদয় আরও কঠিন হবে;
ততোদিন কি দিয়ে ভোলাবো তাকে?'

সেদিন ঘুমুনোর আগে পর্যন্ত মদ পান করলেন। সন্ধ্যায় অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশি শামী কাবাব খেলেন। যেন রাক্ষুসে ক্ষুধা তাঁকে পেয়ে বসেছে। গোশতের সুরুয়ায় রুটি ভেজাতে ভেজাতে বললেন, এগুলো রেখে দিও আগামী বর্ষার জন্য। যখন ছাদ চুঁইয়ে বৃষ্টির পানি পড়বে তখন ঘরের কোণে বসে এগুলো খাবো। আর আমার বন্ধু হাকিরকে বলবো—কি যেন বলবো ভাবলাম—এখন আর মনে করতে পারছি না।

কাল্লু মিয়া দ্রুত পিরিচ-রেকাবি সরিয়ে নিতে থাকে। ও বুঝলো, হুজুর মাতাল হয়ে গেছে। এখুনি হয়তো শতরঞ্জির ওপর গড়িয়ে পড়বে। তাকে ধরে বিছানায় তোলা যাবে না। তিনি লাথি মারবেন।

কাল্লু মিয়া একপ্রস্ত রেখে এসে আর এক প্রস্ত তোলার জন্য ঢুকতেই দেখলো তিনি চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছেন। পা ফাঁক করা। হাত ছড়ানো। মাথা কাত হয়ে আছে। কাল্লু মিয়া হ্যাজাক বাতিটা কমিয়ে রেখে বেরিয়ে যায়। আজ রাতে ওর আর কিছু করার নাই।

বিল্লিমাঁরো মহল্লাতে একটি বাড়ি পাওয়া যাবে বলে আশ্বাস দিয়েছে নুজ্জাত হোসেন। এদিকে ভাঙাচোরা আবর্জনায় ভরে উঠছে বাড়ির উঠোন। ওরা কোনো অনুরোধ শুনছে না। মিস্ত্রিদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। ওরা হুকুমের দাস। জানপ্রাণ দিয়ে প্রভুর হুকুম পালন করছে।

উমরাও বেগম বলে, মরার আগে দোজখ দেখা হয়ে গেলো। এখন শান্তিতে মরতে পারলে বেঁচে যাই। আপনি কি করে সহ্য করছেন?

সহ্যতো করছি না।

সহ্য না করলে আছেন কি করে?

দাঁতে দাঁত চেপে।

ছেলেরা থাকলে আপনার এই কথা শুনে হাসতো। আমি হাসতে পারছি না। শুধু ভাবছি আপনার দাঁত কত শক্ত!

আল্লাহ জানে কত শক্ত! আমি বান্দা কি করে জানবো! জানলেতো ওই হাতুড়ি-শাবল দাঁত দিয়ে কামড়ে ভেঙে দিতাম।

উমরাও বেগম কোনো কথা না বলে দু'হাতে কান চেপে ধরে ঘর ত্যাগ করেন।

তিনদিন দোজখে কাটানোর পরে মুক্তি লাভ হয়। বল্লিমাঁরো মহল্লাতেই বাড়ি পাওয়া যায়। তিনি যেমন চেয়েছিলেন তেমন পাওয়া যায়নি। তবে আগের বাড়ি থেকে বেশ ভালো বলা যায়। ছেলেরা খুশি।

বাকির নিজেই দেখেশুনে পছন্দ করেছে। আশ্রিতদেরও পছন্দ হয়েছে। উমরাও বেগম বললেন, আর যে কয়দিন বাঁচবো এখানে কাটাতে পারলেই হবে। অতিবৃষ্টিতে ঘরের ছাদ বেয়ে পানি পড়বে না। দেয়ালগুলোও মজবুত। ভালোই হয়েছে।

গালিব নিজেও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কাল্লু তাঁর লেখার সরঞ্জাম ঠিকঠাক মতো গুছিয়ে দিল। তিনি এখন সইয়া, জুনুন, তুফতার কবিতা সংশোধন করেন। তারা নিয়মিত তাঁদের লেখা পাঠান।

কিন্তু নিজের লেখা হচ্ছে না। আগের মতো কবিতা আর মাথায় আসে না। মাঝে মাঝে নিজের ওপর বিরক্ত হন। তাহলে কি তিনি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছেন? নাকি নতুন কিছু শুরু করার জন্য তাঁর ভিতরটা তৈরি হচ্ছে? তিনি তা জানতে পারছেন না? এমন যদি হয় তাহলেতো ভালোই হয়। দেখা যাক, অপেক্ষার পরে দেখা যাবে গালিব আবার নতুন করে জ্বলে উঠেছে।

মাঝে মাঝে কারও স্মরণে কিছু লিখে দেন। সেগুলো কবিতা নয় বলে তিনি মনে করেন। মাঝে মাঝে কারো অনুরোধে দু'একটি তারিখি লিখে দেন। এগুলোও কবিতা নয়। তারিখি তো হলো কবিতা দ্বারা তারিখ প্রকাশ করার পদ্ধতি। এটাকে কি কবিতা বলা যাবে? না, কখনো না। তাছাড়া সংখ্যার হিসেব করে লেখা এক রকম ঝকমারি। আনন্দের চেয়ে বিরক্তিই বেশি।

শহরে কলেরার প্রকোপ দেখা দিয়েছে।

প্রায়ই মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে। খুব সতর্কতার সঙ্গে দিন কাটাচ্ছে পুরো পরিবার। এখন পর্যন্ত সকাল ভালোই আছে। উমরাও বেগম সকলের সুস্থতার প্রার্থনায় বেশির ভাগ সময় জায়নামাজের ওপরে থাকেন। কয়েকদিনের মধ্যে কলেরার প্রকোপ কমে যায়। সপ্তাহখানেক পরে মজরুহর চিঠি আসে। শহরে কলেরার মহামারীর খবর শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে চিঠি লিখেছেন। গালিব ও তাঁর পরিবারের খবরাখবর জানতে চেয়েছেন।

গালিব কৌতুক করে চিঠি লিখলেন : বন্ধু তুমি মহামারীর খবর জানতে চেয়েছ। আমার পরিবারের সবাই সুস্থ আছে। এই বাড়িতে কলেরা ঢোকেনি। কিন্তু ঢোকার সুযোগ ছিল। আর কারো জন্য না হোক আমার জন্যতো বটেই। আমার ভাগ্যের মালিক যিনি তাঁর জন্য এই একটি তীর বাকি ছিল। তিনিতো

তেমন তীরন্দাজ যার লক্ষ্য কখনো বিপথে যায় না। এই শহরে নির্বিচারে হত্যা হয়েছে, অবাধে লুণ্ঠন হয়েছে, দুর্ভিক্ষ হয়েছে, জ্বরের মহামারীতে মারা গেছে অনেকে—তখনতো কিছু হয়নি। এখন এই মহামারী আর কি করবে? তোমার চিঠি পেয়ে ভেবে দেখলাম একটি সাধারণ মহামারীতে মৃত্যু হওয়া আমার জন্য মোটেও সম্মানজনক নয়। এমন ঘটনা ঘটলে তা আমার জন্য খুবই অসম্মানের হতো। ভেবে দেখো আমি ঠিক বলেছি কিনা? আমি একটি সম্মানজনক মৃত্যু চাই বন্ধু। আমার জন্য প্রার্থনা করো।

বেশ অনেকদিন পরে আলতফ এলো দেখা করতে। ওকে থেকে গালিব খুব খুশি হলেন, আবার অভিমানও করলেন।

তুমি কি আমাকে ভুলে গেছো হালি?

ওস্তাদজী, আপনাকে ভোলার সাধ্য আমার নাই। আমি অসুস্থ ছিলাম। পারিবারিক ঝামেলাও ছিল। এখনও শরীর আগের মতো ঠিক হয়নি। একটা খবর আপনাকে দেয়ার জন্য না এসে পারলাম না।

খবর? ভালো না খারাপ?

গালিব উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন।

রেঙ্গুনে বাহাদুর শাহ জাফরের মৃত্যু হয়েছে।

তিনি স্খলিত কণ্ঠে বললেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন।

দুজনে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। দু'জনেই চোখ মুছলেন। দু'জনেই দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

গালিব মৃদুকণ্ঠে বললেন, রামপুরা থাকার সময় সইফতা আমাকে বলেছিল এই খবরটি পেলে আমি যেন ওকে জানাই।

চিঠি লিখবেন?

আজই লিখবো। আজই—

শহরটায় যে কতকিছু ঘটে যাচ্ছে, ভাবলে কষ্ট হয়। মেনে নিতেও পারি না।

নতুন কি হয়েছে?

মিউনিসিপ্যালিটি ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়েছে।

ও আচ্ছা। তারা কারা?

অভিজাত কেউ নয়। সবাই সদ্য গজিয়ে উঠেছে।

বুঝেছি। ওরা ব্রিটিশদের প্রতি বিশ্বস্ত।

ওরা শুধু বিশ্বস্ত না। ওরা অতি ধনী একটি শ্রেণী। সেই পাঁচটি পরিবার যারা ক্ষমতার উৎসে এসেছে।

বলতো তারা কে কোথাকার?

তাঁরা হলেন শালগ্রাম গিরিধার লালের দুটি জৈন পরিবার, চুন্নালাল গুরুওয়ালা ও নাহেরওয়ালা পরিবার। এরা সবাই ক্ষাত্রী সম্প্রদায়ভুক্ত। হিন্দু মিউনিসিপ্যাল কমিশনের সভাগুলো নতুন বানানো টাউন হলে বেশ ঘটা করে পালন করা হচ্ছে।

গালিব চেঁচিয়ে বলেন, হোক গিয়ে। আমার এসব শুনতে আর ভালো লাগছে না।

হঠাৎ করে চেঁচিয়ে ওঠায় তাঁর মাথা ঝিমঝিম করে। তিনি দু'হাতে মাথা চেপে নিজেকে সামলান।

ওস্তাদজী, আপনার কি খারাপ লাগছে?

হ্যাঁ, লাগছে, লাগছে। মনে হচ্ছে শহরটাকে ভেঙেচুরে শেষ করি।

আমি এখন যাই?

যাও।

আলতফ চলে গেলে তিনি শোকাহত হয়ে বসে থাকেন। বাদশাহ নির্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন এটাই বড় কথা এখন। দিল্লিতে আর কি হলোই বা না হলো তাতে তাঁর কি এসে যায়। তিনি আর এই শহর নিয়ে ভাববেন না বলে ঠিক করেন। তারপরও ভাবনা এড়ানো যায় না। মনে হতে থাকে, বাদশাহর দাফনের জন্য তাঁর নিজ দেশে তিন হাত জমি পাওয়া গেল না।

মন শান্ত হলে সইফতাকে চিঠি লিখতে বসেন। প্রথমে বেশ আবেগ দিয়ে খানিকটুকু লিখলেন, তারপর আবার কাটলেন। আবার লিখলেন। না, হচ্ছে না। শেষে সংক্ষেপে লিখলেন : ৭ নভেম্বর, শুক্রবার আবদুল জাফর সিরাজুদ্দিন বাহাদুর শাহ রেঙ্গুনে একই সঙ্গে কারাগার এবং তাঁর নশ্বর দেহের কাঠগড়া থেকে মুক্তি লাভ করেছেন।

তারপরে আরও দু-একটি বাক্য লিখবেন ভাবলেন। কিন্তু পারলেন না। কোথায় যে কি আটকে আছে। শোকের পাথর সরছে না। আটকে দিচ্ছে চোখের জল এবং অনুভবের আবেগ। নিজের সঙ্গে রাগ করতেও পারলেন না। শেষ পর্যন্ত থিতিয়ে গেলেন। খামের ওপর ঠিকানা লেখার সময় বুঝতে পারলেন শরীরের তাপ বাড়ছে।

দু'দিনের জ্বরে কাবু হলেন গালিব।

জ্বর ছাড়ছে না। অসহ্য ব্যথা। গায়ে-মাথায়। মাথা তোলার সাধ্যি নেই। দু'দিন পরে ডান পায়ে এবং দুই হাতে বেশ বড় আকারের ফোঁড়া দেখা দিল।

AMARBOI.COM

আস্তে আস্তে ফোঁড়া লাল হয়ে পুঁজে ভর্তি হয়ে গেলো। দু'দিন পরে দেখা দিল ঘা।

উমরাও বেগমের মুখ শুকিয়ে গেলো। বাড়ির অন্যরা থমথমে চেহারা নিয়ে কাজকর্ম করে। সবাই উদ্বিগ্ন। এমনকি ছোট হুসেনও নানাজানের বিছানার পাশে শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি কাঁদে বাকির।

ফোঁড়ার ক্ষত শুকোয় না। বরং ক্ষত গভীর হয়। হাকিম-বৈদ্যের চিকিৎসায় কাজ হয় না। তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকেন। যন্ত্রণায় গোঙান। ক্ষত শুকোয় না। শেষ পর্যন্ত একজন সার্জন ডাকা হয়। তিনি ভারতীয়, কিন্তু বাইরে থেকে লেখাপড়া করে এসেছেন। দেখেই বললেন, এই ক্ষততো কখনোই শুকোবে না। মাংস পচতে শুরু করেছে। ক্ষতের চারপাশের পচা মাংস কেটে ফেলতে হবে।

বাড়িতে কান্নার রোল ওঠে।

ডাক্তার সান্ত্বনা দিয়ে বলে, আপনারা কাঁদবেন না। ওনার এখন এই একটাই চিকিৎসা আছে। এই চিকিৎসা হলে তিনি সুস্থ হয়ে যাবেন।

গালিব ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বলেন, ডাক্তার সাহেব আমাকে সুস্থ করেন... আমি ঘুমুতে চাই... আমার ঘুম নাই... যন্ত্রণা... যন্ত্রণা...

আধো আধো উচ্চারণে, জড়িয়ে যাওয়া শব্দে তিনি যা বলেন তা ডাক্তার ঠিক মতো না বুঝলেও তাঁর কষ্টের কথা বোঝেন। তাঁকে মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা দেন।

আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন মির্জা সাহেব। আমি কালকে এসে আপনার পা ঠিক করে দেবো। আপনার ব্যথা কমে যাবে। আপনি ঘুমাতে পারবেন।

গালিব তার কথা শুনে স্বস্তি বোধ করেন। ঘাড় নেড়ে সাড়া দেয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না। হাসতে চেষ্টা করেন। হাসতেও পারেন না। তিনি শুধু তাকিয়ে থেকে দেখেন যে ডাক্তার চলে গেলো। তার সঙ্গে গেলো ঘরে দাঁড়িয়ে থাকা কেউ কেউ। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা উমরাও বেগম ঘরে ঢুকলেন। বিছানার পাশে বসলেন। মাথায় হাত রাখলেন। দাসী গোশতের সুরুয়া নিয়ে এলে তিনি চামচ দিয়ে একটু একটু করে খাওয়ালেন।

পরদিন ডাক্তার আসেন। সঙ্গে দুজন সহকারী প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে আসে। ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে ক্ষতের চারপাশের পচা মাংস কেটে ফেলে ওষুধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দেয়।

কাজ করতে করতে দুপুর গড়িয়ে যায়।

চেতনে-অবচেতনে আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন গালিব। মনে হয় কষ্ট কি তা তিনি

জানেন না। শরীরের কোথাও কিছু ঘটে গেছে তা তিনি টেরই পাচ্ছেন না। শুধু মনে হয় ঘরজুড়ে প্রবল অন্ধকার। আকাশ সামিয়ানা হয়ে বিছানার ওপর নেমে এসেছে। তিনি গায়ে জড়িয়ে ধরেছেন পুরো আকাশ।

দিন যায়। আস্তে আস্তে ব্যথা কমে।

দু-চার দিন পর পর ডাক্তার এসে দেখে যান। সহকারীরা এসে ক্ষতের পরিচর্যা করে। কিন্তু শুকোতে সময় লাগছে।

এদিকে পা ফুলে গেছে। পায়ে জুতো ঢোকে না। হাঁটতে কষ্ট হয়।জুতো না পরতে পারার কারণে বাইরে যাওয়া একদম বন্ধ। মাঝে মাঝে অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করলে শব্দ ছুটে যায় ঘরের দেয়াল ফুটো করে। তখন তিনি গোঙানির শব্দে আউড়ে যেতে থাকেন নিজের শের :

'প্রত্যেকের জীবনেই
একটি দিন আছে
যা মৃত্যুর জন্য নির্ধারিত
তাই রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে
মৃত্যুভয়ে কাটানো কেন?'

তিনি একটু থামলে কাল্লু মিয়া নরম কণ্ঠে ডাকে, হুজুর।

তিনি গোঙানির শব্দ থামাতে পারেন না। সে শব্দ দিয়েতো কোনো প্রিয়জনের ডাকের উত্তর দেয়া যায় না। তিনি গোঙাতেই থাকেন।

কাল্লু মিয়া চোখে জল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরে ঢোকে উমরাও বেগম।

কাল্লু কি হয়েছে?

নতুনতো কিছু না। আমি আর সহ্য করতে পারি না। নতুন করে মলম লাগিয়ে দেবো?

দাও।

কাল্লু ব্যান্ডেজ করা পায়ের ওপর হাত রাখে। ক্ষত থেকে এখনো পচা গন্ধ আসছে। যদিও গন্ধের তীব্রতা কমেছে। কাল্লু মিয়া আস্তে আস্তে ব্যান্ডেজ খুলতে থাকে। আস্তে আস্তে পুরনো মলম মুছে ফেলে। তিনি পা নাড়াতে চান। পারেন না। পা ভারি হয়ে আছে।

কাল্লু মিয়া—তিনি গোঙানির স্বরে ডাকেন।

হুজুর।

পানি খাবো।

তুমি তোমার কাজ করো কাল্লু। আমি পানি নিয়ে আসছি। উমরাও বেগম

AMARBOI.COM

বেরিয়ে যান। ফিরে আসেন পানি নিয়ে। মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলেন, হাঁ করেন।

গালিব হাঁ করলে পানি দেন উমরাও বেগম। পরপর কয়েক চামচ খেয়ে মুখ ফেরান।

আর খাবেন না?

না।

তিনি হাত উঠিয়ে মুখ মোছেন। তারপর নিজের ডান হাত দিয়ে উমরাও বেগমের বাম হাত ধরেন।

একটু দাঁড়াও বিবি।

ব্যথা কমেছে?

না। মৃত্যুর আগে কমবে না।

ধৈর্য ধরেন।

ধৈর্য ধৈর্য। ধৈর্য আর বুঝি না। ব্যথা আমাকে বন্দি করেছে। বিবি আর কতদিন লাগবে এই বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেতে? আমি মুক্তি চাই, মুক্তি।

গালিব সজোরে মাথা নাড়েন।

গম্মন তাঁর হাত ধরে বলে, হুজুর শান্ত হন। কাল্লু মলম লাগাচ্ছে। নড়াচড়া করলে মলম ঠিক জায়গায় লাগানো যাবে না।

তিনি মাথা নাড়ানো বন্ধ করে বলতে থাকেন, 'প্রত্যেকের জীবনেই একটি দিন আছে, যা মৃত্যুর জন্য নির্ধারিত...

আহ, চুপ করুন, থামুন। উমরাও বেগমের কণ্ঠ কঁকিয়ে ওঠে।

তিনি চোখ বড় করে তাকান। উমরাও বেগমের বুক ধক করে ওঠে। আহ, কি বড় এই চোখ। এই চোখ একদিন অদ্ভুত সুন্দর ছিল। এখন এই চোখে ভাষা নেই। নিষ্প্রাণ চোখ। উমরাও বেগম দু'চোখ বন্ধ করে আল্লাহর কাছে হাত ওঠান। তারপর বেরিয়ে যান।

বাকির এসে বিছানার পাশে দাঁড়ায়।

আমি আপনার জন্য কি করবো নানাজান? বাড়ির ছাদে উঠে ঘুড়ি উড়াবো?

তোমার বয়সে আমি অনেক ঘুড়ি উড়াতাম। নানা রঙের ঘুড়ি।

আমি ঘুড়ি উড়ালে আপনার কষ্ট কমে যাবে?

আমি মনে করবো আমি তোমার বয়সে ফিরে গিয়েছি। আমার মনে আনন্দ ফিরে আসবে। আমি কষ্টের কথা ভুলে যাবো।

তাহলে আমি ঘুড়ি উড়াতে গেলাম। ঘুড়ি যখন অনেক দূরে উড়ে যাবে আমি খোদাকে বলবো, খোদা মেহেরবান, আমার নানাজানের কষ্ট কমিয়ে দিন।

গালিবের মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। বাকির চলে গেলে সন্তানের আনন্দে তিনি বিহ্বল হন। মুহূর্তের জন্য মনে হয় শরীরের কোথাও বুঝি ব্যথা নাই। আহ, এভাবেই যদি পুরো জীবনটা কেটে যেতো।

কাল্লু মিয়া ব্যান্ডেজ শেষ করলে তিনি চোখ বোঝেন। এখন খানিকটুকু আরাম লাগছে। কিন্তু আরাম বেশিক্ষণ থাকে না। শুরু হয় যন্ত্রণা। যন্ত্রণায় রাতে ঘুমুতে পারেন না।

রাতের পর রাত নির্ঘুম কেটে যায়। দিন গড়ায়। মাস গড়ায়। বছরও শেষ হতে চলেছে।

শারীরিক দুর্বলতা এমন যে নিজেকে দাঁড় করাতে সময় লাগে। একদিন বাকির হাত ধরে টেনে ওঠাবার সময় বলে, নানাজান আপনি এত দুর্বল হয়েছেন। উঠতে এত সময় লাগে!

গালিব হাঁফ ছেড়ে বলেন, অনেক সময় না? যে সময় ধরে আমাকে উঠতে হয় এই সময়ে মানুষ সমান একটা পাহাড় তুলে ফেলা যায়।

বাকির হাসতে গিয়ে থমকে যায়। মুহূর্তে ভাবে, নানাজান তো কষ্টের কথা বলেছেন, এটা মোটেই হাসির কথা নয়। তারপরও নানাজান কৌতুক করেই বললেন। পারেনও বলতে।

বাকির তাঁকে বসিয়ে দেয় মাত্র। তারপর পা সোজা করেন। আস্তে আস্তে পা ঝুলিয়ে দেন। একটু একটু করে তিনি দাঁড়ান। তারপর লাঠি দিয়ে ঘরের মধ্যে কয়েক পা হাঁটেন।

এর মধ্যে বছর ফুরিয়ে গেলো।

একটি বছর বিছানায় পড়ে থেকে অভ্যেস এমন হয়েছে যে এখন বেশির ভাগ শুয়েই কাটান। কাল্লুকে মাঝে মাঝে বলেন, এটাই এখন আমার বিলাস কাল্লু মিয়া।

বুঝেছি হুজুর। পানি দেবো?

গোলাপ জল মিশিয়ে দিবে।

হাকিমতো দেশী মদ খেতে মানা করেছে।

বেশি কথা বলবে না কাল্লু। যা বলেছি তা করো। জীবন এখন তলানিতে এসে ঠেকেছে। এখন দিন কাটে যৌবনের কথা স্মরণ করে।

কাল্লু চলে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে পেয়ালা ভর্তি করে নিয়ে আসে। মৃদু স্বরে ডাকে, হুজুর।

তিনি শুনতে পান না। ও আবার ডাকে, হুজুর। এবারও তিনি শুনতে পান না। কাল্লু মিয়া তাঁর হাতে পেয়ালা ধরিয়ে দেয়। তিনি ওর দিকে ফিরে তাকান।

AMARBOI.COM

বুঝতে পারেন অনেক দিন আগে থেকেই ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছেন না, সেটা দ্রুত খারাপের দিকেই যাচ্ছে। এখন শুনতে পান না বলা যায়। চোখেও ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছেন না। বেশির ভাগ সময় কাল্লুর সাহায্য নিতে হয়। এখনও পেয়ালা হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি আমাকে ডাক দিয়েছিলে?

দিয়েছিলাম।

আমি শুনতে পাইনি, না?

কাল্লু চুপ করে থাকে। তিনি এক চুমুকে পান করে বলেন, আর কয়দিন পর আমি তোমাকে দেখতে পাবো না। আর কিছুদিন পর হয়তো আমার কিছুই মনে থাকবে না। তখন আমি কি করব? কীভাবে দিন কাটবে আমার?

তিনি দু'হাতে পেয়ালা আঁকড়ে ধরে ঘন ঘন চুমুক দেন। দেখতে পান তাঁর সামনে কাল্লু নেই। ঘরে কারো ছায়া নেই। তিনি ভীষণ একা। এক সময় জীবনকে কতভাবে উপভোগ করেছেন। সেই সব স্মৃতি এখন দুঃখের অনুভব দেয়। বুকের ভেতরে হাহাকারের রব ধ্বণিত হয়। তিনি এক চুমক পান করেন, আর নিজের গজল আবৃত্তি করতে থাকেন :

'সেই সব দিন পার হয়ে গেছে
যখন শেষবারের মতো
প্রিয়াকে কাছে পেয়েছিলাম
এবং পাত্রভর্তি সুরা
সমবেত সুধীমণ্ডলীকে
আলোকিত করেছে।'

তিনি থামলেন। মনে হচ্ছে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। তিনি আবার চুমুক দিলেন পেয়ালায়। আবার বলেন :

'আবার নিজেকে শ্বাসরুদ্ধ মনে হচ্ছে
এইসব নিয়মের
বাঁধাবাঁধিতে,
সেসব দিন পার হয়ে গেছে
শেষ যখন সমস্ত বাঁধা ঝেড়ে ফেলেছিলাম।'

আবার থামলেন তিনি। দম নিলেন। এখন নিঃশ্বাসও তাঁকে সহযোগিতা করে না। এই বিরূপ আচরণ করছে শরীর। মনের জন্য শরীরের ভালোবাসা উবে গেছে। কবিতা লেখার জন্যও শরীর আর কোনো সহযোগিতা করতে রাজি নয়। হায় খোদা, এমনই কঠিন দিন দিলে আমাকে! আবার নিজের মগ্নতায় ঢুকে বলতে থাকেন :

'রাত পানীয়ের চুমুকে
কোথায় গেল
সেইসব মাদকতা
এসো উঠে পড়
ভোরবেলা ঘুমোবার
আনন্দই তো চলে গেছে।'

যৌবনের স্মৃতি তাঁকে দুমড়ে-মুচড়ে দিচ্ছে। তিনি বারবার মনে করছেন শরীরকে অভিশাপ দেয়ার সময় কি এখন? শরীরতো বিছানা থেকে নামতে চায় না? দিনের আলো দেখতে চায়না। মনে করে এখন অন্ধকারই দিন।

তিনি পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে বলেন :

'সময়ের পরিবর্তনে
গালিব,
অনেক মূল্য দিতে হয়েছে
যৌবনের সেইসব আশা
কোথায় উঠে গেল।'

তিনি আর কিছু ভাবতে পারলেন না। নিজের নিঃস্ব অবস্থা তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করে। অনেকক্ষণ পরে কাল্লু ফিরে এসে দেখে তাঁর হাতের পেয়ালাটি টুকরো টুকরো হয়ে মেঝেয় পড়ে আছে।

তাঁর মাথা হাঁটুতে গোঁজা। শরীর থর থর করে কাঁপছে। তিনি কাঁদছেন।

কাল্লু মিয়া কাছে গিয়ে দাঁড়ায় না। নরম স্বরে ডাকেও না। নিঃশব্দে শতরঞ্জির উপর বসে পেয়ালার ভাঙা টুকরোগুলো কুড়িয়ে তোলে। কান খাড়া করে কান্নার ধ্বনি শোনে। মুখ তুলতেই দেখতে পায় উমরাও বেগম দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ভুরু উঁচিয়ে ইশারায় জিজ্ঞেস করেন, কি হয়েছে?

কাল্লু মিয়া মাথা নেড়ে বলে, জানি না।

দু'জনেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। দুজনেই ভাবে, মানুষটা কেঁদেকেটে শান্ত হোক। উমরাও বেগম আরও ভাবলেন, মানুষটার কাঁদার ইচ্ছা হয়েছে। মানুষটা কাঁদুক। তাঁর কাঁদাই উচিত। যত পাপ করেছে তারতো কিছু প্রায়শ্চিত্য লাগে। পাপ, পাপ, পাপের শাস্তি হচ্ছে এখন তাঁর।

এসব ভাবনার মাঝে নিজের ঘরে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন উমরাও বেগম। ভীষণ বিরক্তির সঙ্গে ভাবলেন, টাকার ব্যবস্থা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাতের শরাব আবার চালু হয়ে গেছে। এখন শরাব পান না করে তিনি ঘুমাতে যান না। এ জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করেছেন। হায় আল্লাহ।

AMARBOI.COM

উমরাও বেগম দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এই মানুষের সঙ্গে, সংসারটা এভাবেই কাটলো।

কয়েকদিন পরে গালিব খবর পেলেন যে আজুরদা ছাড়া পেয়েছেন। তাঁর বিচার শেষ হয়েছে। গত চার বছর ধরে তিনি জেলে আটকে ছিলেন। গালিব দু'হাত তুলে শোকর আদায় করে বললেন, খোদার মেহেরবানী যে তিনি প্রাণে বেঁচে গেছেন। কিন্তু তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এই খবরে আনন্দ এবং কষ্ট পেলেন গালিব। শরীরের এই অবস্থায় আজুরদার সঙ্গে দেখা হবে না। দেখা করতে যেতে পারবেন না। আজুরদা তাঁর খুব প্রিয় মানুষ।

মাসখানেক পরে শুনতে পেলেন আজুরদা লাহোর চলে গেছেন। ওখানে তাঁর বাড়ি আছে। ওখানে কমিশনার ও লেফটেন্যান্ট গভর্নর তাঁর সম্পত্তির একটা অংশ তাঁকে ফেরত দিয়েছে। এইসব থেকে যা পান তাই দিয়ে সংসার চলে। সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে প্রিয় শহর দিল্লি ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হয়েছে। মুশায়রার আসর তাঁর সামনে নেই। পরিচিত যে মানুষগুলোকে ঘিরে তাঁর একটি জায়গা গড়ে উঠেছিল সে জায়গাটি থেকে আলাদা হয়ে তিনি এখন একটি নির্জন কুঠুরির বাসিন্দা।

উমরাও বেগম একদিন বলেছিলেন, আপনি বন্ধুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন কেন?

উনিতো অনেক কষ্ট পেয়েছেন। দুঃখের ভাগ আমি নেবো না কেন?

আপনি নিজের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

বিবি, যখন আমি প্রতি রাতে শরাব পান করতে পারতাম না। তখন আমি নিজের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতাম। ভেবে দেখো তখনকার অবস্থা। ভাতা পেতাম একশো বাষট্টি টাকা। দিতে হতো পাওনাদারদের টাকা, আয়কর শোধ করতে হতো, দারোয়ানের বেতন দিতে হতো, পরিচারকদের বাবদ খরচ হতো, আর তোমার-আমার-নাতিদের খাওয়া পরার খরচতো ছিলই। যে টাকা পেতাম তাতে তো কিছু হতো না। তখন কুড়ি টাকা বাঁচানোর জন্য আমি রাতের শরাব পান ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমি কি ঠিক কাজটি করিনি বিবি? বন্ধুরা আমাকে জিজ্ঞেস করতো, সকাল-সন্ধ্যার শরাব ছাড়া তোমার দিন কাটছে কীভাবে? আমি বলতাম, সবই উপরের ইচ্ছা।

উমরাও বেগম তিক্ত কণ্ঠে বলেন, এখনতো আপনার আর সেই দিন নেই। এখনতো আবার রোজ শরাব খেতে শুরু করেছেন।

গালিব খানিকটা রূঢ় কণ্ঠে বলেন, এখনতো সংসারের কেনাকাটা করতে পারছি আমি।

উমরাও বেগম কথা না বাড়িয়ে খানিকটা রোষের সঙ্গে উঠে পড়েন।

গালিব চিৎ হয়ে শুয়ে থাকেন। কয়েকদিন আগে আলাইয়ের ছোটবেলার এক শিক্ষক মৌলভী হামজা খানের কথা লিখে আলাই তাঁকে চিঠি পাঠিয়েছেন। হামজা খান তাঁকে মদপান ছেড়ে দিতে বলেছেন। গালিব আলাইয়ের উপরে প্রথমে রাগলেন। কোন কালে একজন তাঁকে পড়িয়েছে সেই শিক্ষকের কথা আবার এভাবে লিখে পাঠাতে হবে নাকি? হামজা নাকি ওকে আরও লিখতে বলেছে যে, গালিবের উচিত হাফিজ যেমন লিখেছেন তেমনভাবে চলা।

ফুঃ! গালিব ক্রোধে ক্ষিপ্ত হন। হাফিজের শের তারচেয়ে বেশি আর কে মনে রাখে। হাফিজ লিখেছিলেন:

'হাফিজ, বয়স তো অনেক হলো,
এখন আবার মধুশালায় কেন?
নারীসঙ্গ ও মদ্যপান কম বয়সের ধর্ম।'

ফুঃ! হাফিজ কি ভুলে গিয়েছিলেন যে কবিদের বয়স নেই। কবিদের বয়সের হিসেব করার দরকার নেই। কোনটা কম বয়সের ধর্ম, কোনটা বেশি বয়সের ধর্ম এটা কবিদের বেলায় খাটে না। ফুঃ।

তিনি এভাবে ক্রোধ প্রকাশ করতে থাকেন।

দুপুরের খাবারটি পছন্দমাফিক হওয়ার পরও তিনি ক্রোধ সামলাতে পারেন না। তাঁর ঘুম আসে না। বিশ্রাম হয় না। তিনি আইলাকে চিঠি লিখতে বসেন। বেশ কড়া করেই লিখেন : হামজা খানকে আমার সালাম জানিও। আর তাঁকে বলো যে আমি বলেছি, 'যে তুমি শরাবের মর্ম বোঝ না, তোমায় বলছি/আমরা পান করি অবিরাম।' আমি ঠিকই ভালো করে জানি যে কীভাবে খোদাতালা আমাকে শরাব পানের অনুমতি দিয়েছেন। মৌলভী হয়ে বেনিয়াদের আর পানওলার ছেলেদের পাঠদান করা এক বিষয়। ধর্মীয় নিয়ম অনুসারে ঋতুচক্র আর প্রসব পরবর্তী রক্তপাতের সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করাও ওই একই বিষয়। আর বড় কথা হলো এই পৃথিবী নিয়ে ভাবা এবং খোদার অস্তিত্ব তার প্রকাশকে বুকের ভেতরে গভীরভাবে অনুভব করা অন্য বিষয়।

চিঠিটি লিখে খামে ভরলেন। খামের উপরে ঠিকানা লিখতে লিখতে নিজেকেই বললেন,

'পেরে উঠতেই হবে, গালিব,
অবস্থা সঙ্গীন এবং প্রাণ প্রিয়।'

কাল্লুকে ডেকে চিঠিটা পাঠাতে বলেন। হঠাৎ অবাক হয়ে কাল্লুর দিকে তাকান। ভাবেন, কত বছর ধরে ছেলেটি তাঁর কাছে আছে। কোনোদিন বাড়তি কিছু চায়নি, কখনো বলেনি কষ্ট হচ্ছে। কত অনুগত, যেন পরিবারের খুবই আপন কেউ। ওর দিকে তাকিয়ে থাকলে ও খানিকটা বিব্রত হয়ে বলে, হুজুর।

গালিব মৃদু হেসে ওকে পয়সা দিয়ে বলেন, যাও চিঠিটা পাঠাও।

কাল্লু চলে যায়।

তিনি বিছানায় ফিরতে ফিরতে বলেন,

'না চাইতেই যদি দেন তিনি তো তার স্বাদই আলাদা;
সেই ভিখারী শ্রেষ্ঠ, হাত পাতার অভ্যেস হয় নি যার।'

এখন নিজের শেরের ভেতরে নিজেকেই ফিরে ফিরে দেখতে হয়। নিজের সঙ্গে এক দারুণ খেলা। শুধু কবিই পারে এমন খেলা খেলতে। আর কেউ না। খোদাতালা কবিকেইতো এমন শক্তি দিয়েছেন। হা হা হা—কবিই খোদাতালার প্রিয় বান্দা।

তিনি খানিকটুকু পায়চারি করার চেষ্টা করলে অনুভব করেন তাঁর পায়ে শক্তি ফিরে এসেছে। তিনি হাঁটতে পারছেন। খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাঁর ম্রিয়মান হয়ে থাকা চেহারা।

ছুটে আসে বাকির।

নানাজান আপনি হাঁটতে পারছেন?

পারছিতো। হাঁটতে ভালোই লাগছে।

উহ্ কি বিপদ থেকে যে আপনি রক্ষা পেয়েছেন নানাজান। আমি জামা মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়ে আপনার জন্য অনেক দোয়া করেছি।

গালিব ওর হাত ধরে বিছানায় বসেন। বালিশে বা দেয়ালে হেলান না দিয়ে তিনি বসতে পারেন না। বাকির ঠিকমতো বসতে সাহায্য করে। হুসেনও কাছে এসে দাঁড়ায়। গালিব আদর করে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেন।

হুসেন বলে, আপনার অসুখের সময় আমি অনেক কেঁদেছি। কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর কাছে আপনার প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছি।

ওহ, রে আমার ভাইয়া। গালিব চোখ মোছেন।

তখন আপনাকে দেখতে আমার ভয় লাগতো।

ভয় লাগতো? গালিব ভুরু কুঁচকে ওদের দিকে তাকান।

আপনার সারা শরীরে কয়টি ফোঁড়া হয়েছিল আপনি তা জানেন নানাজান?

কুড়িটার মতো হবে।

বাকির মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, উঁহু হলো না। আমি একটা একটা করে

গুণেছিলাম। পা থেকে মাথা পর্যন্ত মোট বারোটি ফোঁড়া ছিল। ফোঁড়াগুলো বড় বড় গর্তের মতো হয়ে গিয়েছিল। সে জন্য হুসেন ভয় পেতো। ও কাঁদতে কাঁদতে মাঝে মাঝে বলতো, ওই গর্তে পড়ে গেলে আমি ডুবে যাবো।

হ্যাঁরে হুসেন, তাই? তোমার এত ভয় করতো?

গর্ত দেখে ভয় করতো না নানাজান। আপনার কষ্ট দেখে ভয় করতো। মনে হতো আপনি যদি মরে যান তাহলে আমি কাকে নানাজান ডাকবো। কে আমাকে আদর করবে। আমারতো আব্বাও নাই আম্মাও নাই।

আহ, ভাইয়ারা থামো। তোমরা এভাবে কথা বলো না। আমিতো ভালোই হয়ে গেছি।

ভালোতো হবেনই। প্রতিদিন কত মলম যে দেয়া হয়েছে তার হিসেব আপনাকে আমি বলতে পারবো না। আমি শুধু দেখেছি।

এখনতো তোমরা খুব খুশি?

হ্যাঁ খুব খুশি। আমরা অনেক দোয়া পড়েছি। খোদাতালা আমাদের কথা শুনেছেন।

গালিব পকেট থেকে একটি টাকা বের করে বাকিরের হাতে দিয়ে বলেন, যাও দুজনে মিলে কিছু খেয়ে এসো।

দু'ভাই টাকা নিয়ে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে যায়। গালিব চোখ বুঁজে বলেন, আহ শান্তি! ভাগ্যিস ওরা দুজনে তাঁর জীবনে আছে।

কয়েকদিন পরে বাকির আর হুসেন এসে বায়না ধরে। বলে, নানাজান আমরা ফুলওয়ালোঁ কা মেলা দেখতে যাবো।

ফুলের মেলা?

হ্যাঁ নানাজান। আপনি আমাদেরকে এই মেলার অনেক গল্প করেছেন।

কিন্তু মেলা তো গদরের পর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে।

কাল্লু বলেছে এ বছর থেকে ফুলের মেলা আবার হবে। নানাজান আমরা কিন্তু মেলায় যাবো।

মেলা? বুকটা তোলপাড় করে ওঠে গালিবের। বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরের সময়ে ধুমধামের সঙ্গে মেলা বসতো। ওহ, কি আনন্দে কাটতো সে কটা দিন। দ্বিতীয় আকবর শাহের আমলে মেলার সূচনা হয়েছিল। জাফর শাহের বাবা তিনি। বাবা যে উৎসবের সূচনা করেছিলেন সম্রাট তা কত যত্নের সঙ্গে পালন করতেন। যা কিছু সুন্দর, যা কিছু আনন্দের তার দিকেই মানুষটির খেয়াল ছিল খুব। স্মৃতি স্মরণ করে গালিব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। নাতিদের বলেন, ঠিক আছে তোমরা ফুলের মেলায় যাবে।

AMARBOI.COM

পয়সা দেবেনতো? ফুল কিনবো।

হুসেন দু'হাত জড়িয়ে ধরে বলে, আপনার জন্য লাল রঙের গোলাপ কিনবো নানাজান।

বাকির মুখ উজ্জ্বল করে বলে, আপনি কবি। আপনার এত সুনাম চারদিকে। আমাদের এখন সুযোগ হয়েছে একটা বড় লাল গোলাপ আপনাকে উপহার দেয়ার।

গালিব হা-হা করে হাসেন। বাচ্চারা খুশিতে তালি বাজায়। তারপর ছুটে বেরিয়ে যায়। গালিব উচ্ছ্বসিত হয়ে শের আওড়ান :

'মঞ্জুর হবে যদি নিশ্চিত জানো তবে প্রার্থনা করো না,
অর্থাৎ এক প্রার্থনাহীন হৃদয় ছাড়া আর কিছু চেয়ো না।'

কিন্তু পরক্ষণে আবার মন খারাপ হয়। সেই ফুলের মেলাই আবার জমবে, কিন্তু সম্রাট নেই। এই জগতেই নেই। গালিব দু'হাতে চোখের জল মুছলেন।

একবার তিনিওতো একগুচ্ছ গোলাপ নিয়ে গিয়েছিলেন সম্রাটের সামনে। বলেছিলেন, বাদশাহ হুজুর, হযরত শাহেনশাহ, এই ফুল আপনার জন্য। এই ফুলের সুবাস আপনার কবি খ্যাতি বয়ে নিয়ে যাক হিন্দুস্থানের সব মানুষের কাছে।

ভাবতে গিয়ে উত্তেজনায় তিনি উঠে বসেন। বালিশে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে দেন বিছানার উপর। ইতিহাস স্মরণ করেন। আকবর শাহের মেজ ছেলে, মির্জা জাহাঙ্গীর একগুঁয়ে বদমেজাজী লোক ছিলেন। যখন তখন যে কারো সামনে দিল্লির ইংরেজ রেসিডেন্টকে উপহাস করতেন। 'কুলু' বলে ব্যঙ্গ করতেন। একবার রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর তুমুল বেঁধে যায়। এর কারণে রেসিডেন্ট তাঁকে শাস্তি দিলেন। পাঠিয়ে দিলেন এলাহাবাদে। তাঁর মা ছেলের এই শাস্তিতে খুব আঘাত পেলেন। ছেলে দূরে থাকাতে কষ্ট পেলেন। মানত করলেন ছেলে দিল্লিতে ফিরে এলে হজরত খাজা কুতুবদ্দীনের মাজারে চাদর ও ফুল বিছিয়ে দেবেন। একদিন মায়ের মানত পূর্ণ হয়। বন্দি অবস্থা কাটিয়ে ফিরে আসে ছেলে। মা মাজারে চাদর ও ফুলের তোড়া অর্পণ করেন। মানত পূরণ করেন। সেখানে একটি ফুলের মেলা বসে।

আহ্ কি আনন্দ! গালিবের মনে হয় তিনি যেন ইতিহাস থেকে ফুলের সৌরভ পাচ্ছেন। লোকমুখে শোনা গল্প কোনোদিন ভোলেননি আরও একটি কারণে। এই ফুলের মেলা হিন্দু-মুসলমানের মিলন মেলায় রূপ নিয়েছিল। সেদিন ফুলবিক্রেতারা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীর মাজারে ও যোগমায়া মন্দিরে ফুলের স্তবক অর্পণ করেছিল। কয়েকদিন ধরে হযরত কুতুবের মাজারে

মেলা চালু ছিল। শহরের হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে এই মেলায় অংশ নিয়েছিল। ফুলের উৎসবে মানুষের প্রাণে যমুনা নদীর জোয়ার উঠেছিল।

বাদশাহ এই দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। বাদশাহ বছরে একবার এই অনুষ্ঠান পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন মুসলমানরা হযরত কুতুবের মাজারে আর হিন্দুরা যোগমায়া মন্দিরে ফুল অর্পণ করবে। শামসি পুকুর থেকে মিছিল শুরু হয়ে মেহের ওলির বাজার পার হয়ে জঙ্গলি মহলে গিয়ে শেষ হবে। সেখানে অভিবাদন জানানো হবে সম্রাটকে।

ফুল দেয়া হতো একদিন যোগমায়া মন্দিরে, অন্যদিন হজরত কুতুবের মাজারে। উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানরা যেন হিন্দুদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে, হিন্দুরা মুসলমানদের সঙ্গে। মেলা চলতো বুধবার থেকে শুক্রবার—তিন দিন।

গালিব চোখ বুঁজে স্মৃতির সুখ অনুভব করেন। বাদশা দসহারী আর দিওয়ালি উৎসব উদ্‌যাপন করতেন। সেসব উৎসব গালিবের স্মৃতির দিন। কখনোই ভুলবার নয়। ভুলবেন কবরে যাওয়ার পরে।

উমরাও বেগম এসে ঘরে ঢোকেন। সরাসরি জিজ্ঞেস করেন, আপনি নাকি বাকির আর হুসেনকে মেলায় যেতে দেবেন?

হ্যাঁ, দেবো। বাচ্চারা ফুলের মেলায় না গেলে ওদের সুন্দর স্মৃতি থাকবে না। এই আমি যেমন এখন মারা যাওয়ার আগে সুন্দর স্মৃতি নিয়ে দিন কাটাচ্ছি।

আমি বারান্দায় পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে ফুলের মেলার মিছিল দেখতাম। বাচ্চাদেরকে তো কিছু পয়সা দিতে হবে?

দেবো। ফুল কেনার আনন্দ ওদেরতো পেতে হবে।

কার সঙ্গে যাবে ওরা?

ভাবছি, গলির কেউ যদি যায়। শাহ সুজা ওর ছেলেকে নিয়ে যেতে পারে। তার সঙ্গে দেবো। কাল্লুতো থাকবেই।

উমরাও বেগম স্বস্তির সঙ্গে মাথা নাড়েন। নির্ভরযোগ্য কারো সঙ্গে না দিতে পারলে তিনি নাতিদের যেতে দিবেন না। তাঁর এই মনোভাব গালিব বুঝতে পারেন।

ভালোই হলো, বাচ্চারা এই প্রথম একটি উৎসবে যাবে।

ওরা আর একদম বাচ্চা নেই বিবি।

আমার কাছে ওরা বাচ্চাই। ওদের আব্বাজানও আমার কাছে বাচ্চাই ছিল।

ওহ্, আরিফ, কবি আরিফ। ও বেঁচে থাকলে একজন বড় কবি হতে

পারতো। আমিও ওর মুখ ভুলতে পারি না। ছবির মতো আমার বুকের ভেতর আটকে আছে ওর সুন্দর চেহারা। কত ভদ্র আর বিনয়ী ছিল ও।

উমরাও বেগম ওড়নায় চোখ মোছেন।

থাক, এসব কথা। বলতো বিবি, বাদশাহ যেসব উৎসব আয়োজন করতো তার মধ্যে কোনটা তোমার বেশি ভালো লাগতো?

উমরাও বেগম এক মুহূর্ত ভেবে বললেন, হোলি।

হ্যাঁ, হোলি আমারও ভালো লাগতো। লালকেল্লায় ধুমধামের সঙ্গে হোলি পালন করা হতো।

কি যে আনন্দ হতো! কত ধরনের বাদ্য বাজতো শহরের রাস্তায়। আমি বারান্দার চিকের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতাম। খুব ইচ্ছে হতো ছুটে বেরিয়ে যেতে। মনে হতো আপনার হাত ধরে বেরিয়ে যেতে।

কোনো দিন তো একথা বলোনি আমাকে।

লজ্জা পেতাম। তাছাড়া বেপর্দা হয়ে বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না সেটাও ভাবতাম।

তবে আমি হোলি উৎসবে খুব মজা করতাম। দেখতাম গলিতে, বাজারে বাড়িতে বাড়িতে রঙের খেলা চলছে। নানা জায়গায় রঙিন পোশাক পরে বাইজিরা নাচছে। যারা রঙ ছড়াচ্ছে তারা লাইন করে লালকেল্লায় আসছে। প্রাসাদের বারান্দায় বসে বাদশাহ সেসব দৃশ্য দেখছেন। একদিকে বাদশাহ আমীর-ওমরাদের নিয়ে বসে আছেন। অন্যদিকে শাহজাদীরা এবং আমিরদের মেয়েরা বসে আছে। রঙ-ছড়ানো লোকেরা একে একে এসে বাদশাহর কাছ থেকে পুরস্কার নিচ্ছে।

এটুকু শোনার পরে উমরাও বেগম উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, যাই।

কেন?

আপনার এসব কথা আমার শুনতে ভালো লাগছে না।

তাহলে দসহারা দিনের কথা বলি? একটু বসো বিবি?

সব উৎসবই আপনার আনন্দ। আমার না।

তাহলেও একটু বসো।

উমরাও বেগম অনিচ্ছা সত্ত্বেও বসলেন।

গালিব বলেন, দসহারার দিন বাদশাহ সকালে দরবার বসাতেন। সবার বসা হলে শুরু হতো উৎসবের আয়োজন। বাদশাহ প্রথমে একটি নীলকণ্ঠ পাখি ছেড়ে দিতেন। তারপর দুটি বাজপাখি নিয়ে বাদশাহর পাশে দুজন দাঁড়াতো। বাদশাহ বাজপাখি দুটো দু'হাতে ধরতেন। এর অর্থ হলো যে বাদশাহর সামনে

শত্রুমিত্র একঘাটে পানি খায়। তারপরে হিন্দু আমির-ওমরাওরা বাদশাহকে নজরানা দিতেন। নয় দিন পর্যন্ত রাসলীলার শোভাযাত্রা চলতো। দশম দিনে ভরতের পুনর্মিলনের পরে উৎসবটি শেষ হতো।

এটুকু শোনার পরে উমরাও বেগম আবার উঠে দাঁড়ান। বলেন, যাই।

গালিব মাথা নাড়লেন। বুঝলেন দ্বিতীয়বার বসতে বললে উমরাও বেগম আর বসবেন না। কোনো কারণে তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। হতেই পারে, হোক। যেতেই যখন চাইছে, চলে যাক।

তিনি আবার নীরব হয়ে গেলেন। চিৎপাত শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কয়েকদিন পরে আলতফ এলেন। মাঝে কয়েক মাস তাঁর দেখা মেলেনি। এক ঠোঙা আঙুর নিয়ে এসেছেন।

গালিব মৃদু হেসে বললেন, কেমন করে এতদিন ভুলে থাকলে আমাকে?

আমি তো দিল্লিতে ছিলাম না।

চিঠি তো লিখতে পারতে?

আলতফ সে প্রসঙ্গে না গিয়ে বলে, আঙুর খান। আপনার শরীর বেশ ভালো হয়েছে।

ভালো হয়েছে বুঝতে পারি। কারণ আমার নাতিরা আমাকে দেখে ভয় পেতো। তুমিও ভয় পেয়েছিলে আলতফ।

কি যে বলেন ওস্তাদ।

গালিব হাসতে হাসতে নিজের শের আবৃত্তি করেন,

'প্রেমের আবেগ বিনয়ীকে মহিমান্বিত করে,
একটি বালুকণাকে মরুভূমি ধরে রাখে,
সমুদ্র একটি জলকণাকে।'

এক সময় থেমে গিয়ে বলেন, আমি আলোয়ারে যাবো ঠিক করেছি।

এ সময়ে আলোয়ারে যাওয়ার চিন্তা করা কি ঠিক হবে?

কেন নয়?

মাত্র অসুস্থতা কাটিয়ে উঠলেন।

কিন্তু আলোয়ারের জন্য মন খুব টানছে। আমার পাঁচ বছর বয়সে আমার আব্বা বখতাওর সিং বাহাদুরের জন্য লড়াই করতে গিয়ে মারা গেলেন। সরকার থেকে আব্বার তনখাহ আমার নামে ঘোষণা করা হলো। তালরা নামের গ্রামও দান করা হলো। ভাবতে পারো হালি যে দুধ খাওয়া বন্ধ হওয়ার পরে আমি

AMARBOI.COM

আলোয়ারের রুটি খেতে শুরু করেছিলাম।

আলতফ তাঁকে রেকাবি ভরে আঙুর এগিয়ে দিয়ে বলেন, খান।

তিনি একটি আঙুর আলতফকে দেন, একটি নিজের মুখে পুরেন। একটি খেয়ে আর একটি। এভাবে বেশ কয়েকটি খেয়ে বলেন, দিল্লির জৌলুস আর নেই। উৎসব নেই। মুশায়রা নেই। বন্ধু যারা ছিল তারাও বেশির ভাগ নাই। শুধু চিঠি লিখেই যোগাযোগ করছি। চিঠিই এখন আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তারপর হেসে নিজের শের বলেন :

'আমি এখনো ভেঙে পড়িনি, অপেক্ষা করছি
আরো কি ঘটে তা দেখার জন্য।'

আলতফ প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করেন আপনার কাছে এখন কি বই আছে?

সেই পুরনো বইটি যেটা নিয়ে আমার বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চলছে। মৌলভী মোহাম্মদ হুসেন তাববিজীর লেখা ফারসি শব্দকোষ বুরহান-ই-কাতে। আমি বইটি আবার নতুন করে দেখছি।

কিন্তু যে কারণে আপনার বিরুদ্ধে এত প্রচারণা সেটাতো আপনি আর ফেরাতে পারছেন না। তাহলে বইটি নিয়ে আবার ঘাঁটাঘাটি কেন করছেন?

যারা আমার বিরুদ্ধে লিখছে তারা বাড়াবাড়ি করছে বলে আমার মনে হচ্ছে।

আপনি লিখেছেন কাতে-ই-বুরহান আর এর বিপরীতে বই বেরিয়েছে মুহরিকে কাতে, কাতে কাতে, মোওয়য়দে বুরহান, সাতে বুরহান ইত্যাদি কত রকম পুস্তিকা।

আমি জানি। সবই দেখেছি। আমি এটাও মনে করি যে আমি যেসব ভুল ধরেছি তা যথার্থ।

ওস্তাদজী আমার মনে হয় যে বই দুশো বছর আগে লেখা হয়েছে তার ভুল ধরাটা বুরহানের অনুরাগীরা মানতে পারছে না। তারা এ কাজকে যথার্থ মনে করছে না।

গালিব উত্তেজিত হয়ে বলেন, ভুল ধরে আমি ঠিক কাজ করেছি। আমি আমার ফারসি ভাষার জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছি। আর ওরা আমার সমালোচনার জন্য আমাকে গালাগালি করে চিঠি লিখছে। অশ্লীল ভাষায় নিন্দা করছে।

আপনিতো এতদিন এসব হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, গাধা লাথি মারলে কি গাধাকে লাথি মারতে হবে?

তুমিতো জানো হালি যে পাতিয়ালের মিয়া আমিনউদ্দিন 'কাতে-কাতে' নামে বই লিখে আমাকে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করেছে। আমি ভেবেছি এর

বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। আমি ব্রিটিশ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের কোর্টে আমিনউদ্দিনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবো।

গালিব টেবিলের ওপর থেকে কয়েকটি কাগজের টুকরো এনে হালিকে দেখান।

হালি ইশতেহারগুলোর দিকে একনজর তাকিয়ে বলেন, এগুলোর বিষয়ে আমি জানি। আপনাকে বাজে ভাষায় আক্রমণ করে লিখেছে।

তুমি কি এদের সঙ্গে একমত?

হালি মাথা নিচু করেন।

গালিব হালির উত্তরের অপেক্ষা না করে বলেন, আমিতো তোমাকে আগেই বলেছি, 'বুরহান-ই-কাতে' যারা পড়বে তাদের শব্দকোষ বিষয়ে বিদ্যা থাকতে হবে, ফারসি ভাষা শুদ্ধভাবে জানতে হবে, ভাষার জন্য ভালোবাসা থাকতে হবে। এমন মানুষই আমার মতামতের মূল্য দিতে পারবে। অন্যরাতো মুর্খের মতো আচরণ করবে। কিন্তু যে ভাষায় আমিনউদ্দিন আমাকে আক্রমণ করেছে, তার কোনো মাত্রাজ্ঞান নেই। যাঁরা এসব কুৎসা রটনা করছে তাদের মনে রাখা উচিত যে আমি একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। সম্রাট আমাকে 'সাম্রাজ্যের নক্ষত্র' উপাধি দিয়েছিলেন।

গালিব থামলে আলতফ বলেন, আপনি যা বলছেন তা ঠিক।

তাহলে কি আমিনউদ্দিন ঠিক কাজ করেছে?

তা আমি বলতে পারবো না। তবে ওস্তাদ আপনার পক্ষে-বিপক্ষে যাঁরা আছেন তাঁরা দিল্লির সাহিত্য জগতের নামজাদা ব্যক্তি। এঁদের সঙ্গে লড়াইটা কঠিন হবে।

কঠিন হবে? আমি কাউকে ভয় পাই না।

গালিব ক্ষুব্ধস্বরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। বলেন, আমি দেখতে পাচ্ছি শব্দকোষ নিয়ে জ্ঞানের আলোচনার চেয়ে আমাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করছে বেশি। ওরা কবি গালিবকে সহ্য করতে পারছে না। আমি সবই বুঝি। ওই বইয়ের সমালোচনা যা করেছি তা আমি ঠিকই করেছি।

ওস্তাদজী শান্ত হন।

শান্ততো হয়েই আছি। তবে মামলা আমি করবোই।

আলতফ মৃদুভাবে বিনয়ের সঙ্গে বলেন, ওস্তাদ আমি বলি কি আপনি এখন থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন। শারীরিক কারণে যদি দাঁড়িয়ে পড়তে না পারেন তবে বসে পড়েন। প্রতীকীভাবে পড়েন। যেভাবে আপনার সুবিধা হয় সেভাবে পড়েন। পানি দিয়ে ওজু করা সব সময় সম্ভব না হলে বালি দিয়ে ওজুর

কাজ সারতে পারেন। কোনোভাবে নামাজ পড়া বাদ দেয়া চলবে না।

তুমি আমাকে উপদেশ দিচ্ছ হালি?

গালিব স্থির চোখে হালির দিকে তাকিয়ে থাকেন। চোখের পলক পড়ে না।

হালি মাথা নিচু করে থাকেন।

গালিব আবার ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলেন, আমার বয়স হয়েছে। মৃত্যু আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি আমার পুরো জীবন কাটিয়েছি পাপ কাজ করে। তোমাদের ভাষায় পাপ। তার জন্য আমি অনুতাপ করি না। আমি নামাজ পড়িনি, রোজা রাখিনি, ভালো কোনো কাজও করিনি। বাকি যে কয়দিন বাঁচবো সে কয়দিন নামাজ পড়লে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হবে? তুমি কি তাই ভাবো হালি?

হালি উত্তর দেন না। চুপ করেই থাকেন। মাথা তুলে গালিবের দিকে তাকান না।

তবে ভালো হয় একটি কাজ করলে।

গালিবের কণ্ঠ বিদ্রূপের ধ্বনিতে হালির কানে এসে বাজে। হালি তারপরও মাথা তুলে তাকাতে পারেন না।

গালিব হালির অবস্থান উপেক্ষা করে বলতে থাকেন, সবচেয়ে ভালো হবে আমার মৃত্যুর পরে আমার বন্ধু এবং আত্মীয়-স্বজনরা যদি আমার দাফনের ব্যবস্থা না করে যদি মুখে কালি লাগিয়ে, পায়ে দড়ি বেঁধে দিল্লি শহরের রাস্তায়, গলিতে, বাজারে ঘোরায়। তারপর যদি কুকুর, চিল ও কাকের খাদ্য হবার জন্য ফেলে দেয় শহরের বাইরে। অবশ্য সেইসব প্রাণী যদি আমার শরীরের মতো জিনিস খেতে রাজী থাকে। কি বলো হালি?

হালি এবারও নিশ্চুপ থাকেন।

গালিবের বিদ্রূপের কণ্ঠ চারদিক ছড়িয়ে যায়। কণ্ঠস্বর উঁচুও হয়। বলতে থাকেন, আমার মনে হয় আমার পাপের পরিমাণ এত বেশি যে শুধু এইটুকু শাস্তিতে তার ভার লাঘব হবে না। এর চেয়েও বড় শাস্তি আমার পাওনা হয়। আমি হ'লফ করে বলবো যে আমি এক এবং অদ্বিতীয় আল্লায় বিশ্বাস করি। আমি যখন একা থাকি তখন সারাক্ষণ বলি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'—আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ঈশ্বর নাই—সবকিছুর মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্ব বিরাজমান।

হঠাৎ করে আকস্মিকভাবে রেগেমেগে বলেন, বুঝলে বুঝলে হালি, এরপরও তুমি বলবে না যে আমি নামাজ না পড়ে পাপ করছি।

ওস্তাদজী, আমি আজকে যাই।

যাও, যাও। সরো চোখের সামনে থেকে।

হালি নিঃশব্দে বেরিয়ে যান। গালিব আরও উত্তেজিত হোক এটা তিনি চাননি। দেখতে পান গালিব নিজের উত্তেজনা সামলাচ্ছেন। বালিশে হেলান দিয়ে পা সোজা করে দেন।

রাস্তায় বেরিয়ে হালি ভাবলেন, আমিতো ওস্তাদের ভক্ত। তারপরও স্বীকার না করে পারছি না যে ওস্তাদের কিছু ভুল আছে। বোধহয় তিনি লেখাটি লিখেছিলেন স্মৃতি থেকে। মূল বইগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারেননি বোধহয়। দেখলে ভুল কম হতো। তাছাড়া তিনি যে কটু মন্তব্য লিখেছিলেন সেগুলো সম্পর্কে আর একটু সতর্ক হলে বিরোধী পক্ষ এমন আক্রমণের সুযোগ পেতো না। ওস্তাদ যে মন্তব্য করেছিলেন তার বিরুদ্ধে কত যে প্রচারপত্র ছাপা হয়েছে। এখন চারদিকে তাকালে মনে হয় পুরো শহরটি বুঝি গালিবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তিনি নিজে শহরের রাস্তায় বের হলে বুঝতেন অবস্থা কত খারাপ! যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালেন হালি। ভাবলেন, আসলে এতকিছু ঘটছে এ কারণে যে ওস্তাদ শহরের নামকরা এক লেখক গোষ্ঠীর মূলে আঘাত করেছেন। সে জন্য ওরা ক্ষেপেছে। এই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠার মাত্রা রাখেনি তাঁরা। সব শালীনতা পার হয়ে গেছে। ওরা এত বাড়াবাড়ি না করলেই পারতো। হালি নিজে নিজে ভাবলেন এবং বুড়ো কবির অসুস্থাবস্থার পরে এমন নাজেহাল হওয়ার বিষয়টি ভেবে মন খারাপ করলেন।

কয়েকদিন পর ব্রিটিশ অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনারের কোর্টে মামলা দায়ের করলেন গালিব। বিবাদী আমিনউদ্দীন। মামলার মূল বিষয় আমিনউদ্দীন তাঁর প্রচার পুস্তিকায় গালিব সম্পর্কে যা লিখেছেন তা আসলেই অশ্লীল কিনা। গালিবের পক্ষে দাঁড়ালেন অনেকে। বিপক্ষে গেলেন দিল্লি কলেজের অধ্যাপক রিয়াজউদ্দিনসহ আরও অনেকে। সবাই সাহিত্য জগতের নামকরা ব্যক্তি। যত দিন গড়াচ্ছে গালিব বুঝতে পারছেন যে তাঁর ন্যায়বিচার পাওয়া সহজ হবে না। উপরন্তু ব্রিটিশ কমিশনার বিতর্কের বিষয়টি ঠিকমতো বুঝতে পারছে না। একজন বিদেশির পক্ষে বাদ-বিচারের পরিপ্রেক্ষিত বোঝা কঠিন। গালিব বিধ্বস্ত, শরীর ঠিক মতো চলে না, তারপরও বুঝতে পারছেন মামলাটি খুব বাজে অবস্থার দিকে যাচ্ছে। জ্ঞানীগুণীরাও একজন লেখকের অশালীনতাকে সমর্থন দিচ্ছে। সাহিত্যকে বারবণিতার পর্যায়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এই বয়সে এতকিছু মেনে নেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

আমি তো বিনা দ্বিধায় শরাবের প্রতি আমার ভালোলাগা জানিয়েছি। লুকিয়ে ছাপিয়ে শরাব পান করিনি। আমিতো আল্লাহর অস্তিত্বের বিশ্বাসী। কিন্তু ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা আমি মেনে চলি না। এটিও সবাই জানে। তারপরও ওরা

আমার জীবনযাপন নিয়ে অশ্লীল কথা বলে। আমার সৎ নিষ্ঠাকে ওরা সাধুবাদ জানাতে পারে না। তাহলে এ মামলা চালিয়ে আর লাভ কি। আয়ুতো শেষ হয়েই এসেছে। আরও দ্রুত শেষ হবে মাত্র।

নিজের সঙ্গে তিনি বোঝাপাড়া করলেন।

একদিন মৌলভী জিয়াউদ্দিন আদালতে দাঁড়িয়ে সবার সামনে বললেন, আমিনউদ্দিনের বইতে গালিবকে আগ্রার শুঁড়ি বলা হয়েছে। এটি কোনো দোষের কথা নয়। কারণ গালিব একজন মাতাল, পাঁড় মাতাল। মদ ছাড়া তাঁর দিন চলে না। এছাড়া 'কাতে কাতে' গ্রন্থে যেসব মন্তব্য করা হয়েছে তিনি তার উপযুক্তই লোক। এতে সত্যের অপলাপ হয় না।

এসব শুনে গালিব বুঝলেন, যারা তাঁকে বুঝতে পারলো না তাদের বিরুদ্ধে মামলা চালানো বৃথা।

তিনি আবেদন করে অভিযোগ প্রত্যাহার করলেন। ভাবলেন যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবেন। যে হৃদয় পুড়ে যাচ্ছে সেটাতো রোধ হবে।

কিন্তু হলো না। বিরোধী পক্ষ তাঁকে ছাড় দিতে রাজী নয়। বেনামী চিঠি আসা শুরু হলো। চিঠিতে নাম নেই, ঠিকানা নেই। তাই ভাষা আরো অশ্লীল। কুৎসিত।

এত আক্রমণ নিয়েও তিনি সোজা হয়ে রইলেন। কোনো অনুশোচনায় ভেঙে পড়লেন না। কিন্তু শারীরিক জোর ভেঙে পড়েছে, প্রবল শক্তি নিয়ে প্রতি আক্রমণ করতে পারছেন না। তারপরও দুর্বিনীত হয়ে থাকতেই পছন্দ করলেন। কোনো সমঝোতা নয়। কারো কাছে নতিস্বীকারও নয়।

মাঝে মাঝে বাকিরের কথা খুব মনে হয়। এই সময় ও কাছে থাকলে খানিকটা জোর পেতেন। সাহসও পেতেন। বাকির মাসোহারার ভিত্তিতে চাকরি নিয়ে আলোয়ারে গিয়েছে। ওখানেই থাকে। যা সামান্য আয় তা দিয়ে নিজের সংসার চালাতেই কষ্ট হয় ওর।

সেদিন দুপুরবেলায় মাংসের সুরুয়া আর রুটি খেতে বসেছেন। হাল এসেছেন। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই খাবারের সময় হয়ে যায়। কাল্লু খাবার নিয়ে আসে।

তখন পিয়ন চিঠি নিয়ে আসে। সুরুয়া মাখানো এক টুকরো রুটি মুখে দিতেই মনে হয় বমি পাচ্ছে। তিনি বাম হাত দিয়ে চিঠিটা হালির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, খুলে পড়ো। আমিতো জানি ওই চিঠিতে কি থাকতে পারে।

হালী চিঠিটি পড়ে বিব্রতবোধ করলেন। এত কুৎসিত ভাষা যে চিঠিটি জোরে পড়া যাবে না। তিনি চুপ করে রইলেন।

গালিব বললেন, বুঝেছি। পড়তে পারছো না। দাও, আমাকেই দাও।

তিনি টেনে নিয়ে চিঠিটা পড়েন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই পড়েন। চিঠিতে এক জায়গায় মা তুলে গালাগাল দিয়েছে।

পড়া শেষ করে হালির দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, গালাগালি করার জন্য চিঠিটা লিখেছে। কিন্তু গালাগালি করতেও শেখেনি। শোনো, বুড়ো বা মাঝবয়সীদের লজ্জা দেয়ার জন্য মেয়ে তুলে গাল দেয়া হয়। তরুণদেরকে বৌ তুলে গাল দেয়া হয়। কারণ বৌয়ের প্রতি তার টান বেশি হয়। আর ছোট বালকদের মা তুলে গাল দেয়া হয়। কারণ তখন পর্যন্ত মা ছাড়া সে কিছু বোঝে না। আর এই বদমাশটি একজন বাহাত্তর বয়সী লোককে তার মাকে নিয়ে গালি দিয়েছে। এর চেয়ে বেকুব আর কে আছে বলো হালি? আমারতো মনে হয় এ তোমারই কোনো আসল শিষ্য? নাকি?

হালি লজ্জায় মুখ ফেরালেন। আর তিনি খাবারে মনোনিবেশ করলেন। খাওয়া শেষ করার আগে আর কোনো কথা বললেন না।

হালি বুঝলেন যে তাঁকে এই খোঁচাটি দিলেন তিনি। কারণ তিনি একদিন তাঁকে নামাজ পড়ার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। কাল্লু যখন তাঁকে হাত ধোয়াচ্ছিলো তখন হালি উঠে পড়লেন। গালিব গামছায় হাত মুছতে মুছতে নিজে নিজে বললেন, আমার কোনো অনুশোচনা নেই। আমি যা করেছি তা আমার জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে করেছি। জেনেশুনেই করেছি। আমার শব্দকোষে ভুল নেই। ভুল করে তো কিছু করিনি তাহলে অনুশোচনাই বা কিসের!

হুসেন এসে ঢোকে।

নানাজান খাওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ, শেষ করেছি।

তুমি খেয়েছো?

খেয়েছি।

গালিব স্নেহের দৃষ্টিতে হুসেনের দিকে তাকালেন। বাকির আলোয়ারে যাওয়ার পরে ও একা হয়ে পড়েছে। কোনো মাসোহারা ওর নেই। ওর খরচ গালিবকেই টানতে হচ্ছে। বয়সও হয়েছে। দেখতে সুন্দর। স্বাস্থ্য ভালো। ওর বিয়ে দেয়া দরকার। উমরাও বেগম বিয়ের কনে ঠিক করেছেন। কিন্তু আর্থিক কারণে কোনো কিছু হচ্ছে না। কিছু টাকা দেনা আছে। সেটাও শোধ করতে পারছেন না।

হুসেন তাঁর ঘরের এ মাথা ও মাথা ঘুরে ফিরে তাঁর কাছে এসে বসে। ওকে দেখেই গালিব বিষণ্ন হয়ে যান। ওর বিয়ের জন্য দু'বার তারিখ ঠিক হয়েছিল,

কিন্তু অর্থের কারণে হয়নি। কবে হবে সেটাও জানা নেই। গালিব ওর মাথায় হাত রাখেন।

হুসেন বলে, আমিও আলোয়ারে যাই নানাজান? ওখানে গিয়ে কিছু হয় কিনা দেখি। বেকার বসে থাকতে আমার ভালো লাগছে না।

তোমাকে ছাড়া আমি কেমন করে থাকবো ভাইয়া? তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না।

নানিজানও এই কথাই বলেন। কিন্তু আপনারতো অনেক কষ্ট হচ্ছে।

তুমি বলো যে আমাকে ছেড়ে যাবে না?

হুসেন এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে, আচ্ছা যাবো না।

গালিব পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে ওকে দেন।

হুসেন হেসে বলে, এখন লাগবে না। টাকা আপনার কাছে থাকুক। পাওনাদাররা খুব জ্বালাচ্ছে আপনাকে।

মৃত্যুর আগে ওদের টাকাটা শোধ করতে চাই। এক হাজারের চেয়ে সামান্য বেশি কিছু টাকা শোধ করতে হবে। কি করে শোধ করবো ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারছি না। দেনা শোধ না করে মরে যাওয়াতো মুসলমানের ধর্ম নয় হুসেন।

নানাজান আপনি চিন্তা করবেন না। একটা কিছু হবে। নিশ্চয় আপনার দেনা শোধ হবে। আমি আর ভাইয়া মিলে দেনা শোধ করে দেবো।

দেনার কথা মনে হলে আমার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। আমি শরমে মরে যাই। পাওনাদাররা বাড়িতে এলে মান-মর্যাদা কিছু থাকে না হুসেন।

আপনি শান্ত হন।

আমিতো জানি আমার মৃত্যুর পরে দেনা কেউ শোধ করতে পারবে না। তোমার নানিজানকেই বা কে দেখাশোনা করবে।

হুসেন চুপ করে থাকে। কি বলবে ও? এখন পর্যন্ত ও বেকার। ভবিষ্যতের কথা ও এখনই বা কি বলবে? গালিব আর্তনাদের কণ্ঠে বলেন, এখন আমি দেনা নিয়ে চিন্তা করছি। ভবিষ্যতের কথা ভাবছি। অথচ জীবনভর টাকা পয়সাকে তুচ্ছ করেছি। সাধ্যের বাইরে টাকা পয়সা উড়িয়েছি। আর এসব করতে গিয়ে ডান-বামে না তাকিয়ে ধার করেছি।

গালিব দু'হাতে মুখ ঢাকেন। হুসেন নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়।

কয়েকদিন পরে টাকা পয়সার আশায় তাঁর শেষ ভরসাস্থল রামপুরার দরবারে আবেদন করলেন। সময়টা ছিল জুলাই মাস। বর্ষাকাল। সংসারের আর্থিক টানাটানিতে মনে হচ্ছিল দিন যেন আর কাটছে না। চিঠিতে প্রথমে

বকেয়া দেনাটুকু শোধ করার জন্য আবেদন জানালেন। দ্বিতীয়ত হুসেনের বিয়ের জন্য আর্থিক অনুদান চাইলেন। তৃতীয়ত তাঁকে যে একশত টাকা বৃত্তি দেয়া হয় সে বৃত্তি তাঁর মৃত্যুর পরে হুসেন ও বাকিরকে পঞ্চাশ টাকা করে দেয়ার অনুরোধ করলেন।

কিন্তু কোনো জবাব পেলেন না। কোনো অর্থ সাহায্যও এলো না। গালিবের দু'চোখে অন্ধকার নামলো। শরীর ভেঙে পড়লো।

শরীরে যেসব রোগ আগে থেকেই ছিল তার মাত্রা ছাড়িয়ে গেলো। সেই বৃষ্টিমুখর শীতার্ত রাতের কথা মনে পড়ছে বারবার। এইতো কিছুদিন আগে বছর দুয়েক হবে রামপুরা থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন। রামপুরার নতুন নওয়াবের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে মুরাদাবাদের ঠিক আগে নদী পার হওয়ার সময় সেতু ভেঙে পড়ে। তিনি অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন। যে পাল্কিতে ছিলেন তিনি তাঁর মাথা ছুঁয়ে সেতুটি পড়ে। সেদিন আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানিয়েছিলেন। গরুর গাড়িতে ছিল জিনিসপত্র আর পরিচারকরা। সবাই মিলে রাস্তায় আটকে পড়েছিলেন। একটি পান্থশালা জোগাড় করে রাত কাটিয়েছিলেন। পান্থশালার খাবার ভালো ছিল না বলে রাতে না খেয়ে থাকলেন। ভয়াবহ শীত। তার সঙ্গে ঝড়বৃষ্টি।

নানা দুর্ভোগ পার হয়ে বাড়ি ফেরার পরে সেই যে স্বাস্থ্য ভাঙলো আর ঠিক হতে পারলেন না। ঠিকমতো দেখতে পান না, কানেও শোনেন না—এতো বেশ কয়েক বছরের অসুস্থতা। এখন স্মৃতিও লোপ পেয়েছে। কলম ধরতে পারছেন না। হাত কাঁপে।

এখন হাঁটতেও পারছেন না। পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছেন। উমরাও বেগম আর তেমন দেখাশোনা করতে পারেন না। বাগানে শুয়ে থাকেন। দুজন লোক পাঁজকোলা করে তুলে বাগানের পাশের একটি কুঠুরিতে রেখে যায়। ঠিকমতো জানালা নেই। প্রায় অন্ধকার কুঠুরি।

সারাদিন সেখানে পড়ে থাকেন।

সমস্ত দিন পার হয়ে যায়। দুপুরে মাংসের সুরুয়া খান। খাটিয়ায় পড়ে থাকেন। ঘুম আসে না। নিজের কোনো শের মনে পড়ে না। দরজা দিয়ে বাইরে তাকান। দিন না রাত বুঝতে পারেন না। সন্ধ্যায় দুজন লোক আবার একইভাবে পাঁজকোলা করে ঘরে নিয়ে আসে। শুইয়ে দেয় খাটে।

রাতের খাবার দু-তিনটে ভাজা কাবাব। আর ঘুমানোর আগে পান করেন বাড়িতে তৈরি পাঁচতোলা সুরা। তারপর রাত কীভাবে কাটে তা ভাবা তাঁর জন্য এক মর্মান্তিক যন্ত্রণা। দিনরাত এখন সমান। মানতে পারেন না কিছুই। চিৎকার

করতে ইচ্ছা করে। সবকিছু ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে।

লেখালেখি পুরো বন্ধ। কিন্তু মস্তিষ্ক সচল। ভাবতে পারেন। বহুদিনের অভ্যেস চিঠি লেখা। প্রিয় একটি কাজ। কাউকে মুখে মুখে বলে দেন। সে চিঠিটি লেখে। এর মধ্যে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে কবিতা আসে সংশোধনের জন্য। জমে থাকে সেসব লেখা। গত বছর এসব কবিতা না পাঠানোর জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে খুব কাজ হয়নি। যারা তাঁর সাগরেদ তারা পাঠাতেই থাকে। গালিব নিজেকে বলেন, যারা আমার বিরুদ্ধে লেগেছিল, আমাকে আদালতে যেতে বাধ্য করেছিল তারা দেখো গালিব কত সম্মানিত, এখনো কত প্রিয় মানুষের কাছে। তোমরা ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে পারনি। তোমাদের বাঁধ ভেঙে ওরা জলের স্রোতের মতো আমার কাছে পৌঁছে যায়। এই গালিব, এই গালিবের সামনে কোনো বাঁধ কাজ করে না।

হুসেন তাঁর বিছানার কাছে বসে থাকে। ও জানে রামপুরার নওয়াবের কাছে অর্থের জন্য আবেদন করেছেন তাঁর নানাজান। তাঁকে যে একশ টাকার বৃত্তি দেয়া হয় সে রশিদটি পাঠানো হয়নি বলে জানিয়েছে রামপুরার দরবার থেকে।

গালিব মাঝে মাঝে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। জ্ঞান ফিরলে স্বাভাবিক কথা বলেন। তাঁর মন খুব সজাগ। সক্রিয়। কথাবার্তা স্বাভাবিক, তা প্রলাপের মতো নয়। জ্ঞান ফিরলে হুসেনকে জিজ্ঞেস করলেন, রশিদটি কি নওয়াবের দরবারে পৌঁছেছে?

আমি তা জানি না নানা।

নওয়াব কলব আলী খান আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন।

কেন নানা?

আমি তাঁর লেখার সমালোচনা করেছিলাম। একটু থেমে বলেন, সমালোচনাতো করবোই। ভুলকে আমি ভুলই বলি। কারো মুখের দিকে চেয়ে তাকে আমি ঠিক বলতে পারি না। সেই থেকে তিনি আমার ওপর নাখোশ। তবে আমার বৃত্তিটি বন্ধ করেননি।

হুসেন তাঁর হাত চেপে ধরে বলে, আমিতো জানি আপনি মাসে মাসে বৃত্তির একশ টাকা পেয়ে যাচ্ছেন।

গালিব মৃদু হেসে চুপ করে থাকেন। তারপরে বলেন, তোমার দাদীকে ডাকো।

হুসেন ছুটে যায়। অল্পক্ষণে উমরাও বেগম আসেন।

ডেকেছেন কেন? খারাপ লাগছে?

না, বিবি তবিয়ত ঠিক আছে। না, ঠিক বললাম না। ওটা ঠিক নেই। তবিয়ত যেমন ছিল তেমনই আছে।

উমরাও বেগম বিছানার কাছে বসেন। দোয়া পড়েন।

গালিব বলেন, আমিতো আর বেশিদিন নাই। যে কোনো সময়ই চলে যেতে পারি।

এভাবে বলবেন না। আল্লাহকে ডাকুন।

আমি ভাবছি আমার মৃত্যুর পরে তুমি কীভাবে চলবে বিবি।

আমারও তবিয়ত ভালো নেই। আমিও বেশিদিন বাঁচবো না।

তারপরও ধরো তুমি যদি দুই মাস বেশি বাঁচো।

আমার জন্য বাকির আছে, হুসেন আছে। আমার ভাই আমিনউদ্দিন, জিয়াউদ্দিন আছে। আমার দিন কেটে যাবে। আপনি চিন্তা করবেন না। আমি আপনার জন্য পেস্তাজল নিয়ে আসছি।

উমরাও বেগম চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে যান।

কয়েকদিন পরে গালিবকে দেখতে আলতফ আসেন। গালিবের জন্য তাঁর টান প্রবল। বিভিন্ন সময়ে না এলে নিজেই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। সময়ের তিনিই সেই মানুষ যিনি গালিবকে স্বচ্ছভাবে বুঝতে পারেন। বিছানার কাছে বসে হাত ধরতেই গালিব চোখ খুলে তাকান।

আমি হালি।

চিনেছি। তোমার চেহারা ভুলে যাইনি। তুমি আমার সাগরেদদের মধ্যে সবচেয়ে কাছের।

আপনি কেমন আছেন?

গালিব উত্তর না দিয়ে চোখ বন্ধ করেই রাখেন। কিন্তু হালির হাত ছাড়েন না। হালি তাঁর নিমীলিত চোখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ভাবেন, এই মানুষটি জীবনের শেষবেলায় কত ভয়াবহভাবে নিঃসঙ্গ—তাঁর সামনে দিল্লির শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর নেই। যিনি নিজে গোঁড়া মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও গালিবের সব ধরনের আচরণকে সহজভাবে দেখতেন। সম্রাট বেঁচে থাকলে তাঁকে এমন দুঃসহ জীবনযাপন করতে হয়তো হতো না। কে জানে! হালি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

অভিজাত গোষ্ঠীর মুসলমানরা গালিবকে পছন্দ করতেন। তাঁকে সব ধরনের সহযোগিতা দিতেন। গদরের পরে তাঁরা একদম বসে গেছে। কারো আর সেই অবস্থা নেই যাঁরা তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবেন। কয়েক দিন আগে আজুরদা মারা গেছেন। এই খবর কি কবিকে দেয়া দরকার? না থাক। কী হবে

AMARBOI.COM

মৃত্যুর খবর জানিয়ে তাঁকে কষ্ট দেয়ার! শহরে আজুরদা থাকলে এই নিঃসঙ্গ কবির এত কষ্ট হতো না!

এই সময়ে ব্রিটিশরা যে নতুন বণিকশ্রেণী গড়ে তুলেছে তারা সাহিত্য বুঝে না। বাণিজ্য বুঝে। তাদের কাছে একজন বড় কবির কোনো মূল্য নেই। তাই কবিকে নিঃসঙ্গ থাকতেই হবে। তিনি এখন অসুস্থ বৃদ্ধ এবং দেনাগ্রস্ত।

তখন গালিব মৃদুকণ্ঠে ডাকেন, হালি। আমি একটি লিখিত বিবৃতি দিয়েছি।

বিবৃতি? কি ধরনের বিবৃতি?

আমি আলাইকে আমার উর্দু কবিতা ও গদ্যের উত্তরাধিকারী করেছি। আমার মৃত্যুর পরে যারা আমাকে মানে, আমার অধিকার স্বীকার করে তারা আলাইকেও একই অধিকার নিয়ে স্বীকার করবে। এটা আমি সীলমোহরের উপর লিখে রেখেছি। তুমিও জানলে হালি।

ঠিক আছে। আমি জানলাম।

আমার বালিশের নিচে আলাইয়ের একটি চিঠি আছে। বের করে পড়ো।

হালি বালিশের নিচ থেকে চিঠি বের করে পড়েন।

গালিব আলতফকে বলেন, চিঠিটা আবার পড়ো।

হালি বলেন, চিঠি পড়ে কি হবে। লোহারুর নওয়াব আলাউদ্দিন খান আপনার স্বাস্থ্য বিষয়ে জানতে চেয়েছেন।

তুমিতো জানো হালি এই আলাইকে আমি খুব বেশি ভালোবাসি।

আমি জানি। লোহারু পরিবারের মধ্যে তিনিই আপনার সবচেয়ে বেশি স্নেহধন্য।

ও আমাকে দেখতে আসেনি।

অভিযোগ করে গালিব আবার চোখ বুঁজলেন। একটু পরে চোখ খুলে বললেন, তুমি আমার একটি জওয়াব লিখে দাও।

হালি কাগজ কলম নিয়ে এলেন। গালিব বলতে থাকেন, কেমন আছি জানতে চেয়েছো। কি হবে জেনে? কেন জানতে চেয়েছো? দু-একদিন পরে প্রতিবেশী, বন্ধু বা আত্মীয়দের কাছে খোঁজ নিও যে আমি কেমন আছি।

এটুকু বলে তিনি থামলেন। হালি বুঝলেন যে চিঠি এখানেই শেষ। তিনি চিঠি ভাঁজ করে খামে ঢোকালেন। ঠিকানা লিখলেন। তখন শুনতে পেলেন আকস্মিকভাবে গালিব বলে যাচ্ছেন :

'বিপদ বিধ্বস্ত গালিবের

অভাবে

কোনো কাজই কি

থেমে থেকেছে?

এত কান্নাকাটির প্রয়োজন নেই

প্রয়োজন নেই

উচ্চস্বরে বিলাপ করবার।'

কয়েকবার বিড়বিড় করে খানিকটুকু বলে থেমে গেলেন। হালি বুঝলেন জ্ঞান হারিয়েছেন। হালি অপেক্ষা করলেন। কিন্তু আর চোখ খুললেন না। হুসেন বললো, নানাজানের তো এমন অবস্থাই চলছে। কিছুক্ষণের মধ্যে জ্ঞান ফিরে আসবে।

হালি ওর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। হুসেনকে বোধহয় কিছু বলা উচিত ছিল, ভাবলেন। কিন্তু কি বলবেন তা ভেবে পেলেন না। বল্লিমাঁরো মহল্লায় তিনি স্তব্ধ হয়ে সামান্যক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর হাঁটতে শুরু করলেন। মনে হলো কাসিম জান গলি পার হতে বুঝি পারবেন না। বুঝি এই গলিটুকু পার হতে দু'দিন দু'রাত চলে যাবে। তিনি শোকার্ত চিত্তে ঘোরের ভেতর পথ হাঁটতে শুরু করলেন। গলির মাথায় কাল্লু মিয়া তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হুজুর আপনি চলে যাচ্ছেন?

কাল আবার আসবো।

হালির চোখ থেকে জল ঝরলো। কাল্লু মিয়ারও।

রাত কেটে গেলো। বিছানার চারপাশে অচেতন গালিবকে ঘিরে বসে রইলো কেউ কেউ। পরদিন ভোর। জ্ঞান ফিরলো না। সারাদিন কেটে গেলো। সন্ধ্যা হবো হবো করছে। বল্লিমাঁরো মহল্লার বাড়িগুলোর মাথায় সূর্যের শেষ স্পর্শ লেগেছে। কাসিম জান গলির মানুষেরা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ভাবে, কোথায় কি যেন ভেঙে পড়ছে। তখন মাগরিবের আযান ভেসে আসে। মুয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বর প্লাবিত হয় মহল্লায়।

উমরাও বেগম হুসেনকে বললেন, তিনিতো এতটা সময় অচেতন থাকেন না হুসেন।

হুসেন তাঁর দিকে না তাকিয়ে বলে, নানিজান আযান শেষ হয়ে গেছে।

তাহলে আমি নামাজ পড়ে আসি।

উমরাও বেগম বেরিয়ে যান।

মাগরিবের নামাজের সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মীর্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব।

তখন বসন্তকাল। দিল্লির বাতাস স্নিগ্ধ। শহরের উপর রাতের অন্ধকার

নামছে। গ্যাস বাতি জ্বলে উঠেছে রাস্তায়।

সেদিন ১৮৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। বছরের প্রথম মাসটি পার হয়েছে মাত্র। কলরব করছে শহর। যে শহরকে তিনি কারাগার ভেবেছিলেন যৌবনে, যে শহরে বাস করে নিজেকে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—সে শহরের বুকে স্নিগ্ধ বাতাসে উড়ে যায় তাঁর কবিতার চরণ—

'বন্ধু, তোমাদের পুষ্পোদ্যানে আমি
এক আগাছা
যদি চলে যাই
দুঃখ পেয়ো না।
সাইপ্রাস ও সুগন্ধী ফুল
তোমরা, আমি নই।
যদি ভালোবাসা নাও থাকে
তবু বাহবা দিও উচ্চকণ্ঠে,
যে কবিতা তোমাদের দিলাম
তার শেষ পারিশ্রমিক
দিতে ভুলো না।
জানি ভুলে যাবে
বন্ধুজন আনন্দ সমাবেশে
হয়তো পড়বে মনে কোনওদিন
কোনও কবিতার মজলিসে।'

পরদিন দুপুরবেলা। গনগনে দুপুর মাথার ওপর রোদ ছড়িয়েছে।

দাফন করার জন্য কবির মরদেহ আনা হয়েছে ফকির নিজামুদ্দিন আউলিয়ার কবরের কাছে। এখানে আছে লোহারু বংশের পারিবারিক গোরস্থান। লোহারু বংশের যে প্রিয় মানুষটি তাঁর কবিতা সংরক্ষণ করতেন তিনি মরদেহের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন—নওয়াব জিয়াউদ্দিন খান। আরও আছেন হাকিম আহসানউল্লাহ খান, নওয়াব মুস্তাফা খান সইফতা।

তখনো বসন্তের বাতাসে স্নিগ্ধতা। কিন্তু শোকার্ত মানুষের হৃদয়ে সে স্নিগ্ধতার স্পর্শ নেই। অগণিত মানুষ এসেছে জানাজায় যোগ দিতে। শিয়া সম্প্রদায়ের একজন বললেন, মির্জা সাহেব শিয়া ছিলেন। তাই শিয়া প্রথা অনুযায়ী তাঁর দাফন করতে চাই।

নওয়াব জিয়াউদ্দিন খান দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, আমার চেয়ে বেশি আর তাঁকে কে চেনে? আমার কিশোর বয়স থেকে আমি তাঁকে চিনি। তিনি সুন্নী মুসলমান

ছিলেন। তাঁর শেষ কাজ সুন্নী মতে হবে।

সম্পন্ন হলো শেষ কাজ। চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন মির্জা গালিব।

একে একে চলে যাচ্ছে সবাই। তখনো দাঁড়িয়ে আছেন নওয়াব জিয়াউদ্দিন। সূর্য হেলেছে পশ্চিমে। চারদিকে রোদের ছায়ায় ঝিম ধরানো দুপুর। জিয়াউদ্দিন ভাবছেন বাড়ি ফিরবেন, কিন্তু নড়তে পারছেন না। কেউ যেন জিজ্ঞেস করলো, যাবেন না?

তিনি মুখের দিকে না তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বললেন, যাবো।

তারপরও দাঁড়িয়ে আছেন। বুকের ভেতরে গালিবের কণ্ঠস্বর গমগম করছে। বুকের ভেতরে বয়ে যাচ্ছে যমুনা নদী। যমুনা নদীর পাড়ে দিল্লি শহর। এ শহরে একদিন গালিব থাকতেন। এখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর ঘুম ভাঙবে না।

কিন্তু যমুনা নদীতে বসেছে মুশায়রার আসর। কলকল স্রোতে ভাসছে গালিবের কণ্ঠস্বর :

'এখন চলো, এমন একটা জায়গায় গিয়ে থাকি,
যেখানে কেউ, কেউ নেই
সেখানে কথা বলার এমন কোনো জন নেই
যে তোমার ভাষায় কথা কয়।
... ...
অসুখ বিসুখে পড়লে এমন কেউ নেই সেখানে
যে তোমায় যত্নআত্তি করে,
আর যদি মরেও যাও
এমন কেউ নেই সেখানে অঝোরে কাঁদবার।'

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে জিয়াউদ্দিন নিজেকে সামলালেন।

তারপর দু'হাতে চোখের জল মুছলেন। দেখলেন জল বাঁধ মানছে না। তিনি প্রায় নীরব হয়ে যাওয়া গোরস্থানে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদলেন।

AMARBOI.COM

তথ্যসূত্র

১. গালিবের গজল থেকে, আবু সয়ীদ আইয়ুব ॥ দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, প্রথম প্রকাশ ১ জানুয়ারি ১৯৭৬।

২. গালিব : নির্বাচিত কবিতা, সম্পাদনা : জ্যোতিভূষণ চাকী, শঙ্খ ঘোষ ॥ সাহিত্য অকাদেমী, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লি, প্রথম প্রকাশ ২০০৪।

৩. Ghalib : The Man The Times, Pavan K. Varma ॥ Penguin Books, New Delhi, First Published 1989.

৪. গালিব, এম মুজিব ॥ অনুবাদ : মণিভূষণ ভট্টাচার্য ॥ সাহিত্য অকাদেমী, নতুন দিল্লি, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৯।

৫. গালিবের স্মৃতি, মৌলানা আলতফ হুসেন হালি ॥ অনুবাদ : পুষ্পিত মুখোপাধ্যায় ॥ সাহিত্য অকাদেমী, প্রথম প্রকাশ ২০০১।

৬. মির্জা গালিব ও তার সময়, পবনকুমার ভার্মা ॥ অনুবাদ : মন্দার মুখোপাধ্যায় ॥ সাহিত্য অকাদেমী, নতুন দিল্লি, প্রথম প্রকাশ ২০০৬

৭. Mirza Ghalib, A Biographical Scenario, Gulzar ॥ Rapa & Co 7116 Ansary Road, Daryaganj, New Delhi, First Published : 2006.

৮. ধ্বংসস্তূপে কবি ও নগর, সৈয়দ শামসুল হক ॥ ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ ২০০৯।

৯. কত জনপদ কত ইতিহাস, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন (অব) ॥ পালক পাবলিশার্স, ১৭৯/৩ ফকিরেরপুল, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০।

১০. বাহাদুর শাহ জাফর : শেষ মুঘল সম্রাট, জাফর আলম ॥ অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২২ সেগুনবাগিচা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

১১. মির্জা গালিব, সঞ্চারী সেন ॥ উর্বী প্রকাশন, ২৮/৫ কনভেন্ট রোড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০৭।

১২. Empire of the Moghul : Brothers at War, Alex Rutherford ॥ Publisher : Headline Review, 338 Euston Road, London, First Published 2010.

১৩. মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭, সম্পাদক : পি.সি যোশী ॥ অনুবাদ : প্রিয়দর্শী চক্রবর্তী ॥ ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, প্রথম প্রকাশ ২০১০।